অভীক সরকার

পটমঞ্জরী



পটমঞ্জরী

অভীক সরকার

পটমঞ্জরী



পত্রভারতী®

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০২২
দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০২২, তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০২২, চতুর্থ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০২৩
পঞ্চম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
পত্রভারতী বুকস প্রাইভেট লিমিটেড, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সুব্রত মাজি

PATAMANJARI
A Historical Novel *by* Avik Sarkar
Published by PATRA BHARATI BOOKS Pvt. Ltd.

‘বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার আমার দেশ’

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত লেখকের বই

পেতবত্থু
খোঁড়া ভৈরবীর মাঠ



ভূমিকা

লেখকের কৈফিয়তের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সত্যকথন। আমি আদ্যন্ত অলস মানুষ, মহান কাজকর্মের নাম শুনলেই আমার গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে। তাই বলে রাখি যে এটি বস্তুতপক্ষে একটি ফরমায়েশি উপন্যাস।

বক্তব্যটা খুলে বলা দরকার।

সালটা ছিল ২০১৮, মাস এপ্রিল। বাংলা নববর্ষ সমাগত। কলেজ স্কোয়্যারে তখন সেই উপলক্ষ্যে একটি বইমেলা চলছে। এক শনিবারের বিকেলে মেলায় ঢুঁ মারলাম। শ্রীত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় তখন পত্রভারতীর স্টলের বাইরে বসে কারও সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমি হঠাৎ দেখি ত্রিদিববাবুও আমার দিকে তাকিয়ে! চোখাচোখি হতেই জিগ্যেস করলেন, তুমিই অভীক সরকার? ঘাড় নাড়তেই বসিয়ে দিব্যি আলাপ করলেন। বললেন একদিন অফিসে আসতে।

পরের সপ্তাহেই পত্রভারতীর অফিসে গেলাম। ত্রিদিববাবু তো ছিলেনই, আলাপ হল আরেক লিভিং লিজেন্ড-এর সঙ্গে, অনীশ দেব।

সেইদিনই ত্রিদিববাবু আমাকে বলেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের নিজস্ব ম্যাগাজিন 'বইমেলা'র জন্য একটি উপন্যাস লিখে দিতে, যেটি আসন্ন, অর্থাৎ ২০১৯-এর বইমেলায় প্রকাশিত হবে।

সেই রাতে বাড়ি ফিরে 'পটমঞ্জরী' লেখায় হাত দিই।

বাংলার গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে লেখার সুপ্ত ইচ্ছে মনের মধ্যে ছিলই। ঠিক করলাম গোপালদেবের রাজ্যাভিষেক নিয়েই একটি উপন্যাস লিখব।

গোপাল কীভাবে রাজা হন তার বহুতর বিবরণ আছে। ধর্মপালের তাম্রলিপি ''খলিমপুর তাম্রশাসন আমাদের জানাইতেছে মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরকুল-চূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'' (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ)। এই খলিমপুর তাম্রলিপি থেকেই আমরা গোপালদেবের পিতা বপ্যট এবং পিতামহ 'সর্ববিদ্যাবদাত' দয়িতবিষ্ণুর নাম জানতে পারি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জনসাধারণ ঠিক কীভাবে বাংলার রাজত্বভার গোপালদেবের হাতে তুলে দিলেন?

এই প্রসঙ্গে লামা তারানাথের লেখা বহুল প্রচলিত কাহিনিটি অনেকেই জানেন। তিনি লিখছেন, যে সেই সময়ে বহু বছর 'ভঙ্গাল' দেশে কোনও রাজা ছিলেন না। জননায়করা মিলিত হয়ে রাজ্যের সুশাসনের জন্য একজন রাজা নির্বাচিত করলেন। কিন্তু পূর্বতন রাজার কোনও মহিষী নাগীর রূপ ধরে সেই রাজাকে হত্যা করলেন। এই ঘটনা চলতেই থাকল। ইতিমধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের কাছাকাছি কোথাও জনৈকা ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভে বৃক্ষদেবতার ঔরসে এক বীরপুরুষের জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর আরাধ্যা দেবী চুন্দার উপাসনা করে একটি কাষ্ঠনির্মিত গদা আশীর্বাদ হিসেবে পান। তারপর দেবীর আদেশে তিনি ভঙ্গালদেশে আসেন এবং বহুতর ঘটনার পর সেই দৈবী গদার আঘাতে রাক্ষসীরূপিণী নাগীকে হত্যা করেন। তখন তাঁকেই গোপাল নাম দিয়ে দেশের স্থায়ী রাজা হিসেবে নির্বাচিত করা হল।

ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করছি বেশ কয়েকবছর। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে হর্ষবর্ধনোত্তরকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের গৌরব-রবি অস্তমিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র ভারতের পূর্বদিকে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের কালও বটে। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবেশ করছে বিভিন্ন লৌকিক আচার এবং দেবদেবীরা।

আমরা জানি যে সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের গতি বারবার রাজনীতির প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে এবং তার উল্টোটাও ঘটেছে বারংবার। বাংলার ইতিহাস তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বাদ দিয়ে হয় না। বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা হিসেবে তাঁদের ধর্মনায়কদের ভূমিকা রাজপুরুষদের থেকে কিছুমাত্র কম নয়।

হয়তো বা এই সূত্র ধরেই বাংলার ইতিহাসের ওই ক্রান্তিকালে অভূতপূর্ব গণজাগরণ হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন বিভিন্ন শৈব এবং সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকবর্গ এবং কয়েকজন স্বপ্নদ্রষ্টা বিদ্রোহী নায়ক। সেই ভাবনার সূত্র ধরে এলেন বপ্যট এবং মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ। গোপালদেবের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালেন বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের এক অলোকসামান্য মহাপুরুষ—পদ্মসম্ভব। এলেন শান্তরক্ষিত, মন্দর্ভা, ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র জয়াপীড়, দেদ্দদেবী, শবরবজ্র।

আর এলেন প্রকাশচন্দ্র। তাঁর সমস্ত তামসিক, বিধ্বংসী প্রতিভা নিয়ে। এলেন বাংলার রানি, লামা তারানাথের সেই রাক্ষসীরূপী নাগিনী।

স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভালো যে ইতিহাসাশ্রয়ী হলেও এটি আদতে একটি উপন্যাস। পাঠকদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ, একে ইতিহাসের বই হিসেবে না পড়ে উপন্যাস হিসেবেই পড়বেন।

সম্পূর্ণ উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম বা আদিপর্ব প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৯ সালের বইমেলায়, পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের পত্রিকায়। বাকি দুটি পর্ব (মধ্যপর্ব এবং অন্ত্যপর্ব) লিখতে প্রায় তিন বছর লেগে গেল। এই যাত্রাপথে অনেক গুণীজনের কাছ থেকে বিভিন্ন সাহায্য পেয়ে ঋদ্ধ হয়েছি। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। দুইজনের কথা বলতেই হবে। বইটির প্রাথমিক সম্পাদনা করেন অগ্রজ সাহিত্যিক শ্রীরাজা ভট্টাচার্য মহাশয়। অন্তিম সম্পাদনা এবং মার্জনা করেন শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্ত্রী সঙ্ঘমিত্রা এবং কন্যা আরাত্রিকাকে, এই দীর্ঘ সময়ে আমার সাংসারিক কর্তব্যের ত্রুটিবিচ্যুতি সহ্য করার জন্য। প্রণাম জানাই আমার বাবা এবং মা'কে, যাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া আমার কোনও উদ্যোগই সুসম্পন্ন হয় না।

সবশেষে প্রণাম জানাই পাঠকদের। অলমিতি।

অভীক সরকার

দুর্গাষষ্ঠী। ১৬ই আশ্বিন। ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
দমদম।



যুদ্ধ শুরুর আগে

সন্ধ্যা নেমে আসছে দ্রুত। আকাশের পশ্চিমদিক রক্তাভ। দেব দিবাকর অস্তাচলগামী। নীড় প্রত্যাশী পাখিদের কলকাকলিতে চারিদিক মুখরিত।

কলস্বিনী মেঘান্দ বয়ে চলেছে পূর্বসমুদ্রের দিকে। এই শীর্ণা, ক্ষীণা মেঘান্দকে দেখে কে বলবে, প্রবল বর্ষায় কী ভয়ঙ্কর রূপই না ধারণ করে এই নদী। স্রোতে, গর্জনে, উথাল পাথাল ঢেউতে তার সে কী মহানাগিনী রূপ।

বাতাসে হিমের পরশ। হেমন্তের রিক্ততা প্রকৃতির সর্বাঙ্গে। যতদূর চোখ যায় শুধু শূন্যতা। নদীর তীরে স্থির হয়ে বসেছিলেন এক পুরুষ। বসেছিলেন বজ্রাসনে। সুঠাম এবং ঋজু দেহ। কুঞ্চিত কেশদাম চূড়া করে মাথার ওপরে বাঁধা। চোখদুটি তীব্র এবং অন্তর্ভেদী। আপাতত সেই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ মেঘান্দ'র স্রোতের দিকে।

একটু পিছনে শ্মশানভূমি। তার একপাশে দুটি অস্থায়ী কুটির। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বা ছন্নছাড়াদের সাময়িক আবাস।

একটি কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরেক বিশালদেহী পুরুষ। ইনি একজন অরণ্যচারী শবর। কটিদেশ পশুচর্মাবৃত, পিঠে শবরধনু ও তূণ।

নদীতীরে বজ্রাসনে বসে থাকা পুরুষটির প্রতি ইতস্ততভাবে প্রশ্ন ভাসিয়ে দিলেন শবর, 'আচার্য, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে এখানে?'

আচার্য গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, 'জানি না মিত্র। তবে আদিনাথ স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন যে আজই আমি সন্ধান পাব সেই অব্যর্থ অস্ত্রের।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শবর পুরুষ। কজঙ্গলের অরণ্য ছেড়ে এই অস্থায়ী কুটিরে থাকতে তাঁর ভালো লাগছে না। কিন্তু আচার্য'র অনুরোধ বা আদেশ উপেক্ষা করার সাহস তাঁর নেই।

কথাটা ভেবেই লজ্জা পেলেন তিনি। এই মহাযোগীকে কি শুধু ভয় করেন তিনি? তা তো নয়। ভালোও তো বাসেন।

নিখাদ, নিষ্পাপ ভালোবাসা। তাই তো এঁর এক ডাকে এখানে এসেছেন। কুটির বেঁধে আছেন।

মাসখানেক পূর্বে মহাযোগী অবস্থান করছিলেন তাঁর কাছে। আসন্ন মহাবিপ্লবের কিছু পরিকল্পনার জন্য। সেখানেই আদিনাথের স্বপ্নাদেশ পান। একমাস পর পূর্ণিমার দিনে সন্ধ্যা আর রাত্রির স্পর্শমুহূর্তে মেঘান্দ'র

জলে ভেসে আসবে বঙ্গদেশের সৌভাগ্যচিহ্ন। আসন্ন মহাবিদ্রোহের সময়ে সেই সৌভাগ্যচিহ্ন যেন তাঁদের সঙ্গে থাকে, আদিনাথের কঠোর নির্দেশ।

সন্ধ্যা শেষ হয় হয়। এমন সময় আচার্যের চোখে পড়ল কী যেন একটা ভেসে আসছে মেঘান্দের বুকে। মুহূর্তের মধ্যে জলে ঝাঁপ দিলেন মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ।

ক্রুদ্ধচোখে নগ্ন দেহটির দিকে তাকিয়েছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ আর শবর পুরুষ। দেহটি এক নারীর। কতই বা বয়েস হবে এর? পঞ্চদশী? ষোড়শী? দেহটির সর্বাঙ্গে হিংস্র দংশন। বোঝা যায় একাধিক পাশবিক ধর্ষণের শিকার হয়েছে এই কন্যা। হিংস্র নেকড়ের দল যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্রস্তা হরিণীর ওপর, সেভাবেই একে ভোগ করেছে কতিপয় নরাধম।

'এ কার কাজ হতে পারে আচার্য?'

শক্তমুখে উত্তর দিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'হরিকেলের শাসনভার এখন হরিদত্ত নামক এক কামুক রাক্ষসের হাতে। এই কাজ তার বা তার অনুগত নপুংসক রাক্ষসবাহিনী ছাড়া আর কারও হতে পারে না।'

নির্বিচার গণধর্ষণের পর নিঃসাড় দেহটি মৃতভ্রমে কাঠের পাটাতনে বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটিই চোখে পড়েছিল মৎস্যেন্দ্রনাথের। দেহটি তুলে আনার পর বোঝা যায় যে এখনও প্রাণ রয়ে গেছে কন্যাটির দেহে।

'আচার্য, কে হতে পারে এই কন্যা?'

'জানি না মিত্র, তবে অনুমান করতে পারি। ধর্ষকরা যেভাবে দেহটি ভাসিয়ে দিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে তারা চেয়েছিল দেহটির যেন সন্ধান না পাওয়া যায়। নইলে দেহটি তারা হরিকেলেই কোথাও ডুবিয়ে দিতে পারত, বা পুড়িয়ে দিতে পারত, অথবা মাটিতে পুঁতে দিতে পারত। তা যখন করেনি তার মানে কৃতকর্মের কোনও প্রমাণ রাখতে চায়নি দুষ্কৃতীর দল। অর্থাৎ তাদের মনে ভয় ছিল। এই কন্যা কোনও সাধারণ কন্যা নয় মিত্র। কোনও প্রভাবশালী রাজপুরুষের পরিবারের কেউ হবে।' এই বলে উঠে দাঁড়ালেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'হরিদত্ত'র মহামাত্য হচ্ছেন জয়নাথ। বিচক্ষণ, ক্ষমতাধর এবং প্রতিভাবান পুরুষ। তাঁর একটি প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয়ী ছিল। শুনেছিলাম তার বিবাহ সামনেই। আমি জানি না এই হতভাগিনী সে কী না। তবে আদিনাথ একেই নির্দিষ্ট করেছেন বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী বলে। এই ধর্ষিতা হতভাগিনী হয়ে উঠুক আমাদের সর্বোত্তম অস্ত্র। একে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম মিত্র শবরবজ্র। বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীকে আসন্ন মহাবিদ্রোহের পূর্বে রণলক্ষ্মী করে তুলুন। এই আমার অনুরোধ।'

দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কুটিরের সামনে। শবরবজ্র হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কালী, কালী রে।'

অন্য কুটির থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন এক রমণী।

প্রথম যেদিন এই রমণীকে দেখেন, অভিভূত হয়েছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই নারী অরণ্যসম্ভূতা, সিদ্ধাচার্য শবরবজ্রের পালিতা কন্যা। একই অঙ্গে এমন ভয়ঙ্করী অথচ মোহময়ী রূপ দেখেননি তিনি। এমন ঘনকৃষ্ণ বর্ণ সচরাচর দেখা যায় না। তার মেঘের মতো উন্মুক্ত কেশরাশি নেমে এসেছে কটিদেশ অবধি। সুডৌল স্তনদুখানি উন্মুক্ত। চোখ দুখানি স্থির এবং রক্তাভ। কটিদেশে বিভিন্ন প্রাণীর অস্থি দিয়ে তৈরি একটি বিচিত্র মেখলা।

এই নারীকে ভয় করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। শুধু ভয় নয়, অনেকটা সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধাও মিশে থাকে তার মধ্যে। এত ক্ষিপ্র, এত তীব্র, এত রণোন্মত্তা নারী দেখেননি মৎস্যেন্দ্রনাথ।

শুধু তাই নয়, সমগ্র অরণ্য শাসন করে এই নারী। কজঙ্গলের প্রতিটি প্রাণী এর অনুগত। এটা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতেন না মৎস্যেন্দ্রনাথ।

আর শ্মশান! শ্মশানের প্রতি কেন যে এত অদ্ভুত মোহ আছে এই নারীর, জানেন না মৎস্যেন্দ্রনাথ।

নারীটি এসে দাঁড়াল। তারপর তার চোখ পড়ল শায়িতা মৃতবৎ কন্যাটির ওপর।

এর পর যা ঘটল, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মৎস্যেন্দ্রনাথ। মনে হল অকস্মাৎ যেন শত কৃষ্ণগহ্বরের আলো বিস্ফারিত হল নারীটির শরীর জুড়ে। মুহূর্তের মধ্যে অব্যক্ত ক্রোধে দ্বিগুণ ফুলে উঠল তার শরীর। চোখদুটি রক্তাক্ত হয়ে উঠল! উন্মুক্ত কেশদাম উড়তে লাগল ভয়াল অশনির মতো।

চক্ষু তুলে পালক পিতার দিকে ক্ষণেক তাকাল সেই নারী। পিতাপুত্রীর মধ্যে চোখে চোখে কী কথা হয়ে গেল বুঝতে পারলেন না মৎস্যেন্দ্রনাথ। শুধু দেখলেন ধর্ষিতা কন্যাটির অচৈতন্য দেহখানি পরম মমতায় দু'হাতে তুলে নিজের কুটিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর সেই নারী।



আদিপর্ব

৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ। ইয়েদং উপত্যকা, দক্ষিণ তিব্বত।

প্রবল তুষারঝড় চলছিল ইয়েদং উপত্যকা জুড়ে। তারই মধ্যে একটি মোটা কাপড়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঢেকে বরফে ঢাকা পাহাড়ি পথ পেরোবার চেষ্টা করছিলেন এক বৌদ্ধ শ্রমণ। সামনেই শিগাৎসে গ্রাম, রাত হওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে তাঁদের। তাঁদের বলতে তিনি, কামরূপ থেকে আসা গুপ্তপুরুষটি, আর একান্ত অনুগত শিষ্য সাংতোই নংগুয়াল কাগয়ু—নামান্তরে ‘কমলবুদ্ধি।’

কমলবুদ্ধির ওপর অগাধ আস্থা বৌদ্ধ শ্রমণের। এই অঞ্চলে এমন ধীমান এবং অনুগত শিষ্য পাওয়া বড়ই কঠিন। তাঁর প্রিয়তম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম এই যুবক ইতিমধ্যেই নাগার্জুনের মূলমাধ্যমকারিকা থেকে শুরু করে শ্রুতমুচ্চয় অবধি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়ে এই তরুণ যুবকের আলোচনা শুনে সম্রাট মে অগছোম-এর রাজসভার অনেক চৈনিক পণ্ডিতের মুখ শুকিয়ে যেতে দেখেছেন তিনি। কিশোর রাজপুত্র ঠ্রিসং দেচেন সবার আড়ালে তাঁকে জানিয়েছেন—কমলবুদ্ধিকে নিয়ে অনেক আশা তাঁর।

চলতে চলতে ক্ষণিক থেমে গিয়ে পরম কারুণিক তথাগতের উদ্দেশে প্রণাম জানান তিনি। এই রুক্ষ পাহাড়ি দেশে আরও অনেক কমলবুদ্ধিকে চাই তাঁর। এদের মতো তথাগতপ্রাণ যুবকদের জন্যেই একদিন এই তিব্বতদেশে সদ্ধর্মের পতাকা উড়বেই উড়বে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই আচার্য শান্তরক্ষিত এই দেশে উপস্থিত হবেন, সেইরকমই কথা হয়ে আছে। একবার আসুন আচার্য, তারপর চীনাগত কুলাঙ্গার বৌদ্ধপণ্ডিতদের দেখে নেবেন! এই স্বপ্ন বুকে নিয়েই এই দেশে এসেছেন এই বৌদ্ধ শ্রমণ। মহাযানপন্থার জয় হোক। গৌড়বঙ্গের জয় হোক। তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ুক নালন্দার জ্ঞান, মেধা ও করুণার আনন্দরশ্মি।

গৌড়বঙ্গের কথা মনে পড়তেই তাঁর বক্ষের বামদিকটা সামান্য চিনচিন করে উঠল। তাঁর শৈশবের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ, কৈশোরের শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত বঙ্গভূমি, তাঁর প্রথম যৌবনের ফুল্লকুসুমিত স্বদেশ। আজও, পরবাসে এতগুলো বছর কাটাবার পরেও, সেই কয়েকশো ক্রোশ দূরের শ্যামলবরণী কন্যাটির জন্যে তাঁর বড় মন কেমন করে।

আবার হাঁটা শুরু করার আগে পিছন ফিরে দেখে নিলেন তিনি। ওরা কেউ পিছু নেয়নি তো? একবার যদি ধরা পড়ে যান, তাহলে সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শ্রমণ। ভালো নেই তাঁর দেশ। আচার্য শান্তরক্ষিতের আদেশে যখন চলে আসেন এই প্রবাসে, তখনই তিনি দেখে এসেছেন—তীব্র অরাজকতা আর অপশাসনের কালো ছায়া ঘিরে ধরেছে তাঁর জন্মভূমিকে। এক উন্মাদ কামুক রানির অপশাসনে ছারেখারে গেছে সোনার বঙ্গদেশ। সর্বত্র ছোট ছোট ভূস্বামীরা নিজেরাই রাজা হয়ে বসেছেন, ন্যায়বিচার বলে আর কিছুই নেই দেশে। যে অঞ্চলে যার প্রতাপ বেশি, সে-ই রাজা। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র, শ্রমণ থেকে গৃহী, কৃষক থেকে কুম্ভকার, তন্তুবায় থেকে জালিক, এই অরাজকতার করাল গ্রাস থেকে কেউ অব্যাহতি পায়নি। সামন্ত ও ভূস্বামীদের অত্যাচারে আর দরিদ্রের হাহাকারে আজ হিমালয়ের পাদদেশ থেকে পূর্ব-সমুদ্রের সুনীল জলধি অবধি প্রতিটি ভূমিকণা কম্পমান।

হায় শশাঙ্ক, মহাসামন্ত শশাঙ্ক! পথ চলতে চলতে থেমে গিয়ে নিজের অজান্তেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন শ্রমণ—যতদিন আপনি জীবিত ছিলেন—কোনও লুব্ধ কুলাঙ্গারের স্পর্ধা হয়নি এই সুরম্য স্বর্ণপ্রসূ দেশের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবার। আপনি শৈব ছিলেন সত্য, বৌদ্ধদের প্রতি রাজনৈতিক কারণে বিদ্বিষ্ট ছিলেন—সে-কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু দেশে সুখ ছিল, সমৃদ্ধি ছিল, ন্যায়বিচার ছিল। এইরকম সর্বগ্রাসী, সর্বভুক, সর্ববিধ্বংসী অনাচার আর অরাজক অন্যায় নেমে আসেনি কারও ওপরেই।

যেদিন মহাবল শশাঙ্ক ত্যাগ করলেন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস, সেইদিন থেকে গৌড়বঙ্গের পরিস্থিতি গভীর অরণ্যের মধ্যে বেপথুমতী অসহায়া কূলবধুর মতো। কখনও কনৌজপতি যশোবর্মা, কখনও কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য, কখনও কামরূপনরেশ ভাস্কর বর্মা—যে নৃশংসতার সঙ্গে এঁরা শোষণ ও লুণ্ঠন চালিয়ে গেছেন এই বঙ্গভূমে, তার কোনও তুলনাই হয় না।

চলতে চলতে ক্ষণেক তিনি তাকালেন সামনের দিকে। তুষারঝড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে, চতুর্দিকে দামাল হাওয়ার অবিরল মাতামাতি, শোঁ-শোঁ শব্দে কান পাতা দায়। এমন ঝড়ে এখানকার অধিবাসীরাও সচরাচর বাইরে বের হয় না। একদিক দিয়ে ভালোই, মনে মনে ভাবলেন তিনি। যে নিভৃত গোপন কাজে চলেছেন তিনি, তার জন্যে এইরকম ভীষণ প্রকৃতিই তাঁর চাই।

চলতে চলতে ভাবছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণটি। এখন এই দেশের রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে ঝঞ্ঝা চলছে, সেও কি এই তুষারঝড়ের মতোই তীব্র নয়? যে লড়াই আসলে ছিল রাজসিংহাসনের অধিকার নিয়ে দুই রাজমহিষীর মধ্যে পারিবারিক বিবাদ, ধীরে ধীরে রাজনীতির জটিল আবর্তে জড়িয়ে তাই-ই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে চৈনিক বৌদ্ধ বা 'তোনমুনপা' আর ভারতীয় বৌদ্ধ বা 'শেচেনমিনপা'-র মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। দু'পক্ষই শ্বাস বন্ধ করে, দাঁতে দাঁত চেপে দেখে যাচ্ছে—শেষ পর্যন্ত কে জেতে। শেষ পর্যন্ত কার স্বার্থ দেখবেন সম্রাট—মহাচীনের, নাকি লিচ্ছবী তথা ভারতভূমির?

সদ্ধর্মের আগমনের পূর্বে এই দেশের ধর্ম ছিল পোন ধর্ম। অবাধ যৌনাচার, নরবলি, অসভ্য ও কুৎসিত নাচগান—এই ছিল এদের ধর্মকৃত্য। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এদেশের সম্রাট মহামতি স্রোংচান গাম্পো সদ্ধর্মের সংস্পর্শে আসেন, বুদ্ধচরণে তাঁর মতি হয়। তাঁর দুই মহিষী, একজন মহাচীনের তাং রাজবংশের কন্যা রাজকুমারী ওয়েনচেং, আরেকজন লিচ্ছবী রাজদুহিতা রাজকন্যা ভ্রুকুটি। তাঁরাই বৌদ্ধধর্মকে ছড়িয়ে দেন এদেশের জনসাধারণের মধ্যে। তার কিছুদিন পর থেকেই দুই মহিষীর মধ্যে শুরু হয় অলক্ষ্য সংঘর্ষ। সেই সংঘাত একশো বছর পর এখন দুই পক্ষের মধ্যে প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছে।

এই ধর্মীয় বিরোধ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না শ্রমণ। তাঁর মেধা ও পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্রাট এবং যুবরাজ—দুজনেই যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। যুবরাজের সঙ্গেই তাঁর অধিকতর সখ্য যদিও, বোধহয় বয়সের ব্যবধান অনেকটা কম হওয়ার কারণেই। দিনের বেশ কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটান তাঁরা, আলোচনা হয় বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে। যুবরাজের ইচ্ছা—এই দেশে নালন্দার আদলে একটি বৌদ্ধবিহার গড়ে তুলবেন। সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির যথাযথ অনুবাদের এবং সেই নিয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনার সুব্যবস্থা থাকবে। তাঁরা দুজনে মিলে সেই পরিকল্পনার পথে অনেক এগিয়েও গিয়েছেন। যুবরাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা শত্রুপক্ষের

চোখ এড়িয়ে যাবে, এতটা ভাবার কোনও কারণই নেই। জাল ছড়াচ্ছে তারা, গোপন সূত্রে এ খবরও তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে। তবে তা নিয়ে বিশেষ ভাবেন না তিনি। তাঁর চিন্তা অন্য দিক থেকে।

কালই তাঁর কাছে খবর এসেছে যে, পোন ধর্মের মুখ্যপুরুষ প্রধানমন্ত্রী মাশাং—তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে পোন গুপ্তবাহিনীর গোপন গুহায় চুরি হওয়ার খবর। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। তাঁদের বেরোনোর কথা ছিল সন্ধের মুখে। কিন্তু এই খবর শোনামাত্র আর দেরি করেননি শ্রমণ, কমলবুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি।

সর্বপ্রকার কদর্য আর বীভৎস কাজে সিদ্ধহস্ত এই পোন ধর্মের পুরোহিতরা। নরবলি, প্রকাশ্যে অবাধ যৌনতা, মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান, এদের মুখ্য পূজার্চনা। শুধু তাই নয়, এদের আরাধ্য দেবদেবীদের মূর্তিও অতি ভয়ঙ্কর ও বীভৎস, পৃথিবীর যাবতীয় যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত এদের উপাস্য। যাদুবিদ্যা, অভিচার ক্রিয়া, প্রেত আরাধনা—এসব নিয়েই তৈরি এদের ধর্মাচরণ।

জাদুবিদ্যায় এদের পারদর্শী হওয়ার কারণও আছে। বহু বছর ধরে এই দেশের বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র আর ওষধির ভাণ্ডার বানিয়েছে তারা। সেসবের কার্যকলাপ দেখলে কোনও জাদুকরের রচিত ইন্দ্রজাল বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। হিমালয়ের গোপন গিরিকন্দর, গহীন অরণ্য আর অন্ধকার উপত্যকা থেকে তিলে তিলে তারা সংগ্রহ করেছে অতি আশ্চর্যজনক ও বিরলচরিত্রের বস্তু। লোকে বলে যে, এদের গোপন সংগ্রহে আছে গরলভৈরবের বীজ যা নাকি পৃথিবীর তীব্রতম বিষের থেকেও ভয়ঙ্কর, আছে নিষেকবজ্রের লতা, যা থেকে নাকি প্রস্তুত করা যায় অমৃততুল্য সঞ্জীবনী ঔষধ। আছে কৃষ্ণকন্টকের বাকল, যার অতি সামান্য অংশও মুখে রাখলে শীত বা গ্রীষ্মের বোধ লুপ্ত হয়। আর আছে এক অত্যাশ্চর্য মৃগনাভির সম্ভার, যার গন্ধে নিতান্ত মরণাপন্ন রোগীর দেহেও প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব।

আর আছে চণ্ডবজ্র। পোনপুরোহিতদের গোপনতম, ভয়ঙ্করতম, অব্যর্থতম অস্ত্র। সাক্ষাৎ মৃত্যু।

তাই-ই চাই শ্রমণের। যে মৃত্যুবিষ একদিন এই তিব্বত থেকে পাড়ি দিয়ে ছারখার করে দিয়েছে তাঁর জন্মভূমি, তারই প্রতিষেধক নিয়ে আজ দেশে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর মুখ চেয়ে অপেক্ষা করছেন আচার্য শান্তরক্ষিত, অপেক্ষা করছেন তাঁদের সঙ্গীরা, অপেক্ষা করছেন লোকেশ্বর স্বয়ং! দেশের খবর অতি গোপনে নিয়মিতই পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁর কাছে। পৌঁছে যায় আচার্যের আদেশও।

হাত দিয়ে একবার দেহের অংশটা দেখে নিলেন। নাহ, বটুয়াটি ঠিক জায়গাতেই আছে।

রাজকুমার ঠ্রিসং দেৎসেন তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্রও দিয়েছেন। বলেছেন এটি লোকেশ্বর ব্যতীত আর কারও হাতে না দিতে। অবশ্য এই সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুপ্তির ব্যাপারে সম্যক অবগত আছেন কমলশীল।

ফের হাঁটতে থাকেন দুজনে। চারিদিক প্রায় অদৃশ্য। অবিরল তুষারপাতে তাঁদের চারপাশে নেমে এসেছে সাদা পর্দার মতো এক পুরু আবরণ, তার বাইরে দৃষ্টি চলে না। প্রতিটি পদক্ষেপ অতি কষ্টে ফেলতে হচ্ছে। সূচীমুখ তুষারকণাগুলি এসে শরীরের অনাবৃত অংশে তীরের মতো বিঁধছে। হাত দুটি তুলে একবার দেখলেন তিনি, নীল হয়ে এসেছে আঙুলগুলি। ক্রমশই বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়াও কঠিন হয়ে উঠছে।

একবার থেমে গিয়ে পেছনে তাকান তিনি, ‘কমলবুদ্ধি, আর কতদূরে আছেন তোমার সেই গুপ্তপুরুষ?’

‘আর বেশি দূরে নয়, ভন্তে। সামনের গিরিখাতটি পেরিয়ে বামদিকে একটি বাঁক আছে। সেই পথে কিছুটা নীচে নামলেই একটি গোপন গুহা, সেখানেই তাঁর অপেক্ষা করার কথা।’

‘এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত তুমি? সংবাদ যা পেয়েছ সব ঠিকঠাক? কোথাও আমাদের কোনও ত্রুটি হচ্ছে না তো?’

‘না ভন্তে। আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাবধানতা নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী মাশাং এ ব্যাপারে একেবারেই কিছু জানেন না। স্বয়ং সম্রাট আমাদের সহায়, তিনিই গোপনে চর পাঠিয়েছিলেন নালন্দা আর কামরূপে। আপনি

তো জানেন, তিনিও যে-কোনও মূল্যে এই মন্ত্রী মাশাং আর পোন ধর্মের সামন্তদের দমন করতে চান।'

'তাঁর শাসন নিষ্কন্টক করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় কী কমলবুদ্ধি? আশা করি দ্রুত এ কাজে সফল হবেন তিনি। কিন্তু এই কাজে কারা কারা আছে, কোন কোন গুপ্তচরদের পাঠিয়েছি, সেসব গোপন করার ব্যবস্থা করেছ কি?'

অবশ্যই ভন্তে। আমি আর সম্রাট ছাড়া এঁদের পরিচয় আর কারও জানা নেই। আজকে যিনি এসেছেন আপনাকে নিরাপদে আপনার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তিনি অতি বিশ্বস্ত পুরুষ। আচার্য শান্তরক্ষিত স্বয়ং তাঁকে এই কাজটির দায়িত্ব দিয়েছেন।'

'কে ইনি? কিছু জানো তুমি কমলবুদ্ধি?'

'শুনেছি কামরূপের ওড্ডীয়ান নগরের যুবরাজ। আপনি ওড্ডীয়ানের নাম শুনেছেন ভন্তে?'

শুনেছেন বইকি। এখানকার উচ্চারণে ওড্ডীয়ান হলেও এই রাজ্যের আসল নাম উদীয়ান। উদীয়ান হচ্ছে কামরূপের শ্রেষ্ঠতম তন্ত্রবেত্তা ইন্দ্রভূতির রাজ্য। যোগাচারবিজ্ঞানের অতুল বৈভব ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে সেখানে। মাথা তুলছে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আরও একটি শাখা, মন্ত্রযান। রাজা ইন্দ্রভূতির সহোদরা লক্ষ্মীঙ্করা এবিষয়ে বিশেষ সিদ্ধি লাভ করেছেন বলে দেশে থাকতে থাকতেই সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি। আচার্য শান্তরক্ষিত নিজে এবং তাঁর প্রিয় শিষ্যরাও এই নতুন সাধনপদ্ধতি নিয়ে খুবই উৎসাহী।

নালন্দার সহপাঠীদের কথা মনে পড়তে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল শ্রমণের। হরিভদ্র, শাক্যভদ্র, জ্ঞানপ্রভ...আহা—না জানি কেমন আছে তাঁর সতীর্থরা?

কমলবুদ্ধি তার এই শিক্ষকের মানসিক অবস্থা বুঝে উঠতে পারল না। সে বলে চলল, 'শুনেছি ইনি নাকি অতুল যোগশক্তির অধিকারী। শিশুবয়স থেকেই অনেক আশ্চর্য কাহিনি ঘুরে বেড়ায় এঁকে নিয়ে। ইনি নাকি অযোনিজ স্বয়ম্ভূ পুরুষ, রাজা ইন্দ্রভূতির সামনে এক পদ্মের ওপর আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি ধনুর্বাণে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের সমকক্ষ, মল্লযুদ্ধে স্বয়ং বলরাম।'

'বলো কী হে?'

'আজ্ঞে ভন্তে। তেরো বছর বয়স থেকেই ইনি তাঁর পিতাকেও রাজকার্যে সহায়তা করছেন। রাজা ইন্দ্রভূতি কোনও বিষয়ে যুবরাজের পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। লোকে তো এমনকি এও বলে যে, ইনি একবারমাত্র শ্বাস নিয়ে তিনবার পুরো ওড্ডীয়ান ঘুরে আসতে পারেন, ভূমিতে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের ওপরে উঠতে পারেন। দর্শন, শব্দবিদ্যা, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র—সবই তাঁর অধিগত। এমনকী চিকিৎসাবিদ্যাতেও ইনি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!'

শুনে চমৎকৃত হলেন শ্রমণ। যাক, উপযুক্ত লোকই বেছে নিয়েছেন আচার্য। তবুও আবছা সন্দেহ থেকে যায়!

'ইনি যে অদ্ভুতকর্মা সে বুঝলাম। কিন্তু, ইনি বিশ্বস্ত তো? আমার দেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু আজকে আমাদের হাতেই কমলবুদ্ধি। এই বটুয়াটির মধ্যেই আমাদের গোপন অভ্যুত্থানের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে। আমার ফিরে যাওয়ার ওপরেই নির্ভর করছে তার সাফল্য।'

'হ্যাঁ ভন্তে। আপনি সর্বাংশে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি জানি সেই উন্মাদ কামুক রানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য...আঃ...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই শ্রমণের কানের কাছে যেন একটি ছোটখাটো বিস্ফোরণ হল আর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল কমলবুদ্ধি। সেই শুনে পিছনে তাকাতেই পিছনের অবিরাম তুষারপাতের মধ্যে কয়েকটা ছায়া দেখতে পেলেন সেই বৌদ্ধ শ্রমণ। আতঙ্কের একটা ভয়াল স্রোত তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল।

তিনি জানেন ওরা কারা। তিনি জানেন ওরা কেন এসেছে।

ওরা মাশাং-এর লোক!

৭০০ খ্রিস্টাব্দ। কর্মান্তবাসক, বঙ্গদেশ।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষ। শরতের নির্মেঘ আকাশে নিঃসঙ্গ পথিকের মতো চেয়ে আছে ধ্রুবতারা। নিজের ভদ্রাসনের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন এক মধ্যবয়সি পুরুষ। শীতল বাতাস বয়ে যাচ্ছে তাঁর সুঠাম শরীরটি ঘিরে। তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রখর দৃঢ়তার ছাপ।

চিন্তিত মুখে উত্তরদিকে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর ভাবনায় ধরা পড়ছিল আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। তিনি এও জানেন—উত্তরাকাশে যে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, যে-কোনওদিন সেই মেঘ সর্বধ্বংসী কালবৈশাখীর রূপ নিতে পারে। এই মহা-সর্বনাশের উৎস উত্তরের কামরূপ নয়, কাশ্মীর নয়, এই বিপদের উৎস আরও উত্তরে, তার কেন্দ্রবিন্দু আরেক মহাশক্তি।

তিব্বত।

খানিকক্ষণের জন্যে চক্ষু বন্ধ করলেন তিনি। সেই তীব্র ঝড় কী করে সামলাবে ছিন্ন, দীর্ণ এই বঙ্গভূমি?

সহসা ম্লান হাসি খেলে গেল তাঁর ওষ্ঠে। সত্যই কি ভালো আছে তাঁর স্বদেশ? মহাবলী শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকেই কি বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণে নির্জীব ও দুর্বল হয়ে পড়েনি বঙ্গভূমি?

তাঁর চোখদুটি জলে ভরে এল। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি সংবাদ পেয়েছেন, তাঁর আশৈশব বন্ধু এবং একান্ত অনুরাগী সুবুদ্ধি আত্মঘাতী হয়েছে। একা নয়, যুবতী স্ত্রী আর দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ সপরিবারে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে। তার দোষ নেই; সুবুদ্ধির গ্রামপ্রধানটি জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন তার চার কুল্যব্যাপ পরিমাণ ভূমি, সঙ্গে তার সমৎস্য দিঘিটি। তা দান করা হয়েছিল স্থানীয় বৌদ্ধবিহারটিতে, ভূস্বামীটির ধর্মানুগত্যের একনিষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল, সম্পন্ন কৃষক সহসা পরিণত হয়েছিল পথের ভিক্ষুকে।

সেই সদ্য দুধের দাঁত ওঠা শিশুদুটির অমলিন হাসির স্মৃতি যেন মধ্যবয়সি পুরুষটির বুকে জ্বলন্ত শূল গেঁথে দিল। আহা রে, ক্ষুধার্ত হওয়া ছাড়া আর কীই বা অপরাধ ছিল ওই নিষ্পাপ শিশুদুটির? হায় তথাগত, তুমি নাকি করুণানিধান? তুমি নাকি বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় প্রবর্তন করেছিলে সদ্ধর্ম চক্র? সত্য বলো প্রভু—এই অবোধ শিশুদুটি ছাড়া আর কোনও অর্ঘ্যই কি তোমার পূজার যোগ্য ছিল না?

আকাশের দিকে অশ্রুভরা চক্ষুদুটি তুলে যেন সেই উত্তরই খুঁজতে লাগলেন তিনি। বোঝাও প্রভু, এই শরণাগতকে বুঝিয়ে দাও—কাকে বলে ধর্ম? দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার থেকে বড় অধর্ম আর কী? নিঃসহায়, নিরাশ্রয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর থেকেও বড় পুণ্য আর কীসে হয় নাথ? দেশমাতৃকার থেকে বড় মা কে? দেশের মানুষের থেকে বড় ঈশ্বর কে?

সহসা তাঁর পিঠে নেমে এল একটি শীতল হাতের ছোঁয়া। তাঁর চমকে যাওয়ার কথা, অথচ চুপ করে রইলেন। কারণ এই হাতটি বড় চেনা। এ তাঁর গৃহিণী—ভদ্রকল্যাণীদেবীর স্পর্শ। এই স্পর্শ তাঁর কাছে দৈব ঔষধের কাজ করে। তাঁর স্নায়ুগুলি শান্ত হয়ে এল।

আজ কি আপনি কোনও কারণবশত বিশেষ উত্তেজিত, স্বামী?'

ম্লান হাসলেন পুরুষটি, 'হ্যাঁ, প্রিয়ে। আজ আমি মানসিকভাবে কিঞ্চিত বিপর্যস্ত। সান্ধ্যাহ্নিকের সময় তোমার প্রতি অকারণে কিছু রূঢ় বাক্য ব্যবহার করে ফেলেছি। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

শ্যামাঙ্গী নারীটি তাঁর কোমল মুখখানি স্থাপন করলেন স্বামীর প্রশস্ত পিঠে। তারপর সেখানে একটি সপ্রেম ও সস্নেহ চুম্বন এঁকে দিলেন। দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর একান্ত মানুষটির বুকখানি।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ ভদ্রকল্যাণী অনুভব করলেন, তাঁর হাতের ওপর ঝরে পড়ল কয়েকটি জলের ফোঁটা।

শুধু জল নয়। চোখের জল। অশ্রুবিন্দু!

খুবই আশ্চর্য হলেন ভদ্রকল্যাণী। স্বামীকে কঠিন ব্যক্তিত্বের মানুষ বলেই চেনেন তিনি। স্নেহশীল কিন্তু কঠোর নীতিবাদী মানুষটিকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন। তাঁর স্বামীর পাণ্ডিত্য তথা ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানের খ্যাতি বহুধাবিস্তৃত। শুধু সম্রাটই নন, রাজ্যের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর স্বামীর কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। সেই দৃঢ়চরিত্র মানুষটির চক্ষে আজ পর্যন্ত কখনও জল দেখেননি তিনি!

'স্বামী, আপনি কাঁদছেন? কী হয়েছে আপনার? আপনাকে তো এর আগে কখনও কাঁদতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এমন কী ঘটেছে, যা আপনার মতো মানুষকেও বিচলিত করেছে?'

'সুবুদ্ধিকে মনে পড়ে কল্যাণী? তার সেই শিশুকন্যাদুটি?' বলতে বলতে চোখের জল সামলাতে পারলেন না সেই প্রশস্তহৃদয় মানুষটি।

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল ভদ্রকল্যাণীর মুখখানি। সুবুদ্ধি তাঁর স্বামীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। স্বামীর থেকে বয়সে অনেকখানিই ছোট, প্রায় তাঁরই সমবয়সি এই মানুষটিকে তিনি নিজের দেবর জ্ঞান করতেন। সুবুদ্ধির স্ত্রী কাঞ্চনা তাঁর বোনের মতো ছিল, তাঁদের শিশুকন্যাদুটিকে ভদ্রকল্যাণী নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

সুবুদ্ধির সপরিবারে আত্মহত্যার সংবাদ গতকাল রাতেই এসে পৌঁছেছে। তাঁর স্বামী তাঁকে জানাননি, তিনি জেনেছেন অন্য সূত্রে। শিশুদুটির ক্ষুধার্ত মুখ মনে পড়লেই অসহ্য জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে তাঁর অন্তর।

কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তিনি জানেন—কেন এই মৃত্যু এতটা বিচলিত করেছে এই মানুষটিকে। তিনি জানেন যে, এই দেশের বুকে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে ঠিক কতটা উদ্বিগ্ন তাঁর স্বামী।

অনেক অশ্রু বয়ে যাওয়ার পর দুজনেই একটু স্থির হলেন। ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন ভদ্রকল্যাণী, 'শুনেছি স্বামী। আপনার নিষেধ সত্ত্বেও কেউই আমার কাছে গোপন করতে পারেনি। কাঞ্চনা তাদেরও বড় প্রিয়পাত্রী ছিল! আজ সারাদিন ধরে শুধু তাদের কথাই মনে পড়েছে। সেই হতভাগী তো একবার আমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারত। সুবুদ্ধি তো পারত আপনার কাছে আশ্রয় চাইতে।'

'না কল্যাণী, পারত না। সুবুদ্ধিকে আমি আজন্ম চিনি। তার আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। কারও কাছে সাহায্যভিক্ষা করার মতো মানুষই ছিল না সে। তার এই গভীর মর্যাদাবোধই আমাদের কাছাকাছি এনেছিল। নইলে কে কবে দেখেছে ব্রাহ্মণ আর কৃষকসন্তানের মধ্যে এমন গভীর বন্ধুত্ব?'

মুহূর্তে উদগত অশ্রু আবার ঝাঁপিয়ে এল ভদ্রকল্যাণীর গাল বেয়ে, 'আমাদের কি কিছুই করার ছিল না, নাথ?'

'চারিদিকে তাকিয়ে দেখো কল্যাণী! কত সহস্র সুবুদ্ধিকে বাঁচাবে তুমি? কত কাঞ্চনার মুখে তুলে দেবে করুণার অন্ন? গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে প্রতিদিন ঘটে চলেছে এই ঘোর অন্যায়। সর্বাণীদেবীর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার পথে দেখোনি কল্যাণী—কীভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে ভিক্ষুকের দল? ভেবে দেখেছ—এরা কারা?'

ভদ্রকল্যাণী কিছু বলতে পারলেন না, মাথা নাড়লেন।

'এরা সব বঙ্গদেশের ভূমিহীন কৃষক কল্যাণী, সব-খোয়ানো হতভাগ্যের দল। কঙ্কালসার দেহ একটুকরো ছেঁড়া কাপড়ে ঢেকে দু-চোখ ভরা খিদে নিয়ে কী অসহায় দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে তারা! একদিন যে শক্ত হাতে লাঙল ধরে তারা আমাদের জন্য ফসল ফলিয়েছে, দেখো—আজ সেই হাতই কত

লজ্জায় আমাদের সামনে পেতেছে তারা! অপেক্ষা করছে—কখন কোন পুণ্যার্থী সামান্য করুণা করবে তাদের। দুধের বাছাদের দেখেছি পথের ধারে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট থেকে খাবার খুঁটে খেতে। যে কৃষক-বউটি জীবনে শুধুমাত্র একটি ছোট সংসার ছাড়া আর কিছুই চায়নি, তাকে দেখেছি সামান্য কাপড়ে কোনওমতে লজ্জা ঢেকে ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্যে গৃহস্থের দরজায় দরজায় দু'মুঠো অন্ন ভিক্ষা করতে। আমার দুচোখ জ্বলে যায় কল্যাণী, এ যে আমি আর দেখতে পারি না! হা ঈশ্বর, আপনি আমাকে অন্ধ করে দেন না কেন?'

বাঁধভঙা অশ্রু ভিজিয়ে দিচ্ছিল ভদ্রকল্যাণীদেবীর বুক। স্খলিতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সম্রাট কিছু করেন না কেন স্বামী? এসব তো তাঁর অগোচরে থাকার কথা নয়।'

বড় কষ্টে ম্লান হাসলেন পুরুষটি, 'আমরা সম্মান দেখাতে সম্রাট বলি বটে, কিন্তু ভেবে বলো তো কল্যাণী, কত বড় এই রাজত্ব? কতটুকু প্রভাবশালী এই রাজবংশ? আসলে এঁরা একটি বৃহৎ ভূখণ্ডের ভূস্বামী ব্যতীত আর কিছু নন। এত বড় সামাজিক পরিবর্তন আনা কি ছোট ছোট রাজাদের কাজ!'

'তাহলে কে করবে, স্বামী?'

'এই কাজ একমাত্র একজন রাজচক্রবর্তী সম্রাটই পারেন। এমন সম্রাট, যিনি লৌহিত্যদেশ থেকে দণ্ডভুক্তি, অঙ্গ থেকে হরিকেল অবধি সসাগরা গৌড়বঙ্গের সার্বভৌম অধীশ্বর হবেন। শক্ত হাতে ন্যায়ের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। যিনি প্রভাবে আর প্রতিপত্তিতে দ্বিতীয় শশাঙ্ক হবেন। শশাঙ্কের পর দেশে আর সম্রাট কই? টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে আমাদের মাতৃভূমি। প্রতিটি ভূস্বামী নিজেরাই রাজা হয়ে বসেছেন। কে বাঁধবেন এঁদের ঐক্যসূত্রে? এমন প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষ কই?'

'কিন্তু স্বামী, ইনি তো এই বঙ্গভূমির সার্বভৌম সম্রাট। অন্ততপক্ষে তাঁর রাজ্যে তো...'

'সার্বভৌম বড় কঠিন শব্দ, কল্যাণী। রাজা রাজাসনে বসেন বটে, কিন্তু রাজ্য চলে অনন্তসামন্তচক্রের ওপর নির্ভর করে। সেই চন্দ্রগুপ্ত আর সমুদ্রগুপ্তের সময় আর নেই কল্যাণী। এখন যিনি যত বড় সম্রাটই হোন না কেন, তাঁকে এই সামন্তদের ওপর নির্ভর করেই রাজ্যশাসন করতে হয়। এই সামন্তচক্রের প্রতাপ বিপুল, এরা রাজস্ব দেয় বলে রাজত্ব চলে, এরাই সৈন্যের যোগান দেয় বলে রাজা যুদ্ধ করেন। আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিদ অনেক আছেন কল্যাণী, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনায়ক কই?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভদ্রকল্যাণী। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'স্বামী, কাল আমাদের নবীন সম্রাটের অভিষেক, এক পক্ষকাল পরে প্রথম অধিবেশন। আপনার কী মনে হয়, ইনি পারবেন এই যুক্তগৌড়বঙ্গের অধীশ্বর হতে?'

কিছু সময় নীরব রইলেন সেই পুরুষটি। তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় না, কল্যাণী। অসীমসাহসী কর্মের জন্যে প্রয়োজন উদ্যমী পুরুষসিংহের, মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে চাই মহত্তর হৃদয়। ধৈর্য, স্থৈর্য, বিনয়, ধী এবং করুণা—এই হল মহৎ ও বিক্রমশালী পুরুষের পাঁচটি লক্ষণ। নতুন সম্রাটকে তুমি আর আমি, দুজনেই শিশুবয়স থেকে চিনি। যত বয়স বাড়ছে, ততই ইনি হিংস্র, অহংকারী এবং উদ্ধত হয়ে উঠছেন। ওনার ব্যবহারও ইদানীং বড় অদ্ভুত লাগে আমার।'

'কেন স্বামী?'

'তোমাকে আজ অবধি বলিনি কল্যাণী। কিন্তু আজ বোধহয় বলার সময় এসেছে। আমাদের রাজপুত্রকে আজকাল ঠিক প্রকৃতিস্থ লাগে না, জানো? মাঝে মাঝেই ইনি উন্মাদের মতো অত্যন্ত অসংলগ্ন আচরণ করতে থাকেন। যাকে তাকে ইতরভাষায় অপমান করে বসেন। তখন তাঁর মুখের নীচ ও কুৎসিত ভাষা শুনলে আমার বমি পায় কল্যাণী। সম্রাট বড়ই দুশ্চিন্তায় ছিলেন রাজকুমারকে নিয়ে, সেই শোকেই বোধহয় বেশিদিন বেঁচে রইলেন না। আমার আশঙ্কা এই নতুন সম্রাট বঙ্গদেশে নিয়ে আসবেন আরও গভীর অরাজকতা। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীতে সেই লেখাই পড়ছিলাম কল্যাণী।'

‘কিন্তু কেন প্রভু?’ ব্যাকুল হলেন ভদ্রকল্যাণী, ‘ইনি তো সম্রাট রাজভটের সন্তান বটে। সম্রাট বঙ্গদেশের উন্নতির জন্য...’

‘ভুল করলে প্রিয়ে। এঁর পিতৃপরিচয়টুকুই দেখলে, মাতুলবংশ দেখলে না?’

‘তাতে কী অসুবিধা নাথ?’

ঘুরে দাঁড়ালেন সেই ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রশস্ত বুক ছুঁয়ে গেল কল্যাণীদেবীর কমনীয় মুখ। অপলক চোখে স্বামীর উজ্জ্বল চক্ষের দিকে তাকালেন কল্যাণী।

‘শোনো কল্যাণী। আজ তোমাকে এক গভীর আর গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জানাই। বহুদিন ধরে অতি গোপনে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর সংবাদ জোগাড় করেছি। জানতে পেরেছি এই রাজবংশের বিরুদ্ধে, এই দেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে কে বা কারা। আজ সেই ষড়যন্ত্রের কথা সবিস্তারে জানাব তোমাকে। প্রতিজ্ঞা করো, তুমি ষড়যন্ত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করবে?’

মাথা একপাশে হেলালেন ভদ্রকল্যাণী, বুকখানি দুরুদুরু করছিল তাঁর। অস্ফূটে বললেন, ‘হ্যাঁ স্বামী।’

‘তাহলে শোনো।’ এই বলে আরও ঘন হয়ে এলেন সেই বিশালদেহী ব্রাহ্মণ।

৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ। ইয়েদং উপত্যকা, দক্ষিণ তিব্বত।

হাড়-হিম-করা আতঙ্কে পটে আঁকা ছবিটির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন যুবক শ্রমণটি। সেই বিস্ফোরণের শব্দ তাঁর যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলোকে অসাড় করে দিয়েছিল। চারিদিকে তুষারঝড়ের দাপট বেড়ে উঠেছে আরও। তার মধ্যেই তিনি দেখলেন যে, তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে কমলবুদ্ধির নিথর দেহ।

বিস্ফারিত চক্ষে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন তিনি। কমলবুদ্ধির মাথা যেন অজানা কীসের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন একটুকরো সূঁচালো পাথর কমলবুদ্ধির মাথার একদিক দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেছে অন্যদিক দিয়ে। অথচ আশেপাশে সেই পাথরটির চিহ্নমাত্র নেই! কমলবুদ্ধির রক্তে আর মাথার খুলির ভাঙা অংশে ছেয়ে ছিল শ্রমণের পায়ের কাছের তুষারস্তূপ। আর তারই মধ্যে রক্তাক্ত গেরুয়া বস্ত্রটি সর্বাঙ্গে জড়িয়ে শুয়ে ছিল কমলবুদ্ধি, যেন সমস্তদিন কঠোর পরিশ্রমের পর এই মাত্র ঘুমিয়েছে সে।

জীবনে অনেক ভয় পেয়েছেন শ্রমণ, কিন্তু এমন তীব্র মৃত্যুভয় এই প্রথম। থরথর কাঁপতে থাকলেন তিনি।

‘বাহ বাহ, নির্জীব বাঙালি পণ্ডিতটা ভয়ে কেমন কাঁপছে দেখেছিস, জনছুব?’ প্রশ্ন করে প্রথম ছায়াটি।

‘তাই তো দেখছি প্রভু মাশাং। ব্যাটার মগজটাই বড়, গায়ে জোরটোর কিছু আছে বলে মনে হয় না। এটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেবী একজটার সামনে উৎসর্গ করলে হয় না প্রভু?’ বলে ওঠে দ্বিতীয় ছায়াটি।

‘তোর মনে হয় এই বাঙালি শেচনমিনপা’টাকে দেবী একজটা বলি হিসেবে স্বীকার করবেন?’ চিন্তিত স্বর শোনা যায় এক অস্বাভাবিক বিশালদেহী ছায়ার থেকে, ‘আপনি কী মনে করেন প্রভু মাশাং? তার থেকে এটিকে উলঙ্গ করে চোমোলাংমার চূড়ায় বেঁধে রেখে এলে হয় না?’

খলখল হাসি শোনা যায় প্রথম ছায়াটির কাছ থেকে। সেই হাসি শুনে বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল শ্রমণের। এরই মধ্যে বিরক্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায় দ্বিতীয় ছায়াটির, ‘তোর কবে বুদ্ধি হবে রে ছুলঠিম? এই মর্কটটার জন্যে অত কষ্ট কে করবে শুনি? তুই?’

দুজনের মধ্যে একটা ঝগড়া বেঁধে উঠতে যাচ্ছিল। থামিয়ে দিয়ে প্রথম ছায়াটি বলে ওঠে, ‘না রে জনছুব, এত সহজে এটাকে মরতে দিচ্ছি না আমি। এখন বাঁধ এটাকে, বেঁধে নিয়ে চল রাজদরবারে। বলব—আমাদের গুহ্যধ্যানচক্রের পুঁথি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল লোকটা। তোরা তো জানিস, একবার চোর বলে প্রমাণ করলে ওই মূর্খ সম্রাটের আর কিছুই করার থাকবে না।’

‘বাঃ বাঃ! বেশ বেশ। তারপর প্রভু?’ প্রশ্ন করে তৃতীয় ছায়াটি।

‘তারপর চোরের মার মারব এটাকে। এদিকে তোরা রটিয়ে দিস যে, গত সপ্তাহে রাজপ্রাসাদে যে আগুন লেগেছিল, আর রাজার সেরা ঘোড়াটা হঠাৎ করে মরে গেল, সেসব এর জন্যেই। কী রে, পারবি না?’

‘বিলক্ষণ পারব প্রভু।’ বাকিরা সোৎসাহে বলে ওঠে।

‘তারপর আর কী, আমি বলে দেব যে, আদিদেব নাংওয়া ওদেন ক্রুদ্ধ হবেন যদি একে চিরাগ নাগপোর সামনে বলি না-দেওয়া হয়। এইটুকুও যদি না পারি, তাহলে আর মন্ত্রী হলাম কেন, তোরাই বল।’

‘সে তো বটেই, সে তো বটেই!’ বোঝার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে ওরা।

‘শোন বোকারা, একটা জিনিস শেখাই তোদের। কাউকে এমনি এমনি মেরে দিলে সে হঠাৎ করে মস্ত বড় বীর হয়ে যায়, বুঝলি। লোকে চুকচুক করতে করতে বলে, ‘আহা রে, লোকটা কত ভালো ছিল।’

‘তাই নাকি প্রভু!’ অবাক কণ্ঠস্বর শোনা যায় একজনের, ‘তাহলে সেক্ষেত্রে কী করা উচিত?’

‘মারতে হলে আগে তার নামে অপবাদ দিতে হয় বুঝলি। জনসমক্ষে ভদ্রতার পোশাকটা খুলে নিতে হয়। নইলে আর খুন করে কীসের মজা বল দেখি? কোমরে দড়ি বেঁধে রাজপথ দিয়ে চুলের মুঠি ধরে উলঙ্গ করে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাব, লোকে হাততালি দেবে, থুতু দেবে, পাথর ছুঁড়বে—তাতে মজা বেশি না? গালি দেবে ওর নামে, ওর মা’কে বলবে বেশ্যা, ওর পিতাকে বলবে গর্ভস্রাব, তাতে তোরা বেশি আনন্দ পাবি না?’

হাত-পা অবশ হয়ে আসে বৌদ্ধ শ্রমণটির। কী ভয়ানক! প্রবল ভয়ে আর আতঙ্কে নিশ্চল হয়ে থাকেন তিনি।

‘হে হে হে, সে বেশ মজা হবে কিন্তু। আমি নিয়ে যাব প্রভু, আমি নিয়ে যাব এটাকে...’ আবদার করে একজন।

‘আঃ, চুপ কর জনছুব, গোল করিস না! একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে, তার মধ্যে...ইয়ে তারপর এটাকে নিয়ে কী করবেন প্রভু?’ অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে ছুলঠিম নামের সেই বিশালদেহী পর্বতনন্দন।

‘এটাকে সর্বসমক্ষে ছাং আর চমরী গাইয়ের মাংস খাওয়াব ভাবছি রে ছুলঠিম। খি খি খি, কেমন মজা হবে বলত তোরা?’

‘বেশ হবে প্রভু। অতি চমৎকার হবে। কিন্তু তারপর কী হবে প্রভু মাশাং?’ বাকিরা বেশ উৎসাহিত।

‘তারপর এটাকে এক যুবতী বেশ্যার সঙ্গে সর্বসমক্ষে যৌনসঙ্গম করতে বাধ্য করলে কেমন হয়?’ মতামত চাইলেন মাশাং। তিব্বত রাজদরবারের প্রধানমন্ত্রী, পোন ধর্মের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক মাশাং।

ঘৃণা আর বিবমিষায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন শ্রমণ। প্রাণপণে তিনি প্রার্থনা করছিলেন, তাঁর সঙ্গে এসব ঘটার আগেই যেন ধর্মপাল যম স্বয়ং মৃত্যু হিসেবে নেমে আসেন।

‘চিরাগ নাগপো’র সামনে উৎসর্গ করার সময় পাথর দিয়ে এক এক করে এই বাঙালিটার হাত পা ভাঙা হবে না, প্রভু মাশাং?’ উৎসাহিত হয়ে পড়ে চতুর্থ ছায়াটি।

‘হবে রে রিনছেন, হবে। এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন?’ বলতে বলতে তুষারকুহেলি সরিয়ে সেই শ্রমণের সামনে এসে দাঁড়ালেন চারজনেই। প্রত্যেকের পরনে পোন-পুরোহিতদের চিরপরিচিত নীল আর কালো রঙের পোশাক। তাদের চোখে ক্ষিপ্ত ক্ষুধার্ত দৃষ্টি, অধরে তাচ্ছিল্যের উগ্র হাসি।

পেছনের তিনজনের হাতে ধরা ছিল তিব্বতের ক্ষুরধার অসি দ’পদম, এক কোপে শত্রুর মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে যার বিশেষ খ্যাতি আছে। শুধু সামনের মানুষটির হাতে ধরা ছিল অন্য একটি অস্ত্র, যা দেখে দুঃসহ আতঙ্কের মধ্যেও ঘেমে উঠলেন শ্রমণ।

চণ্ডবজ্র। অব্যর্থ মৃত্যুর যমদূত। এই তাহলে কেড়ে নিয়েছে কমলবুদ্ধির প্রাণ!

‘কী রে বাঙালি, তুই আর এই চমরী গাইয়ের অণ্ডকোষ, তোরা ভেবেছিলিটা কী? দুজনে মিলে আমাদের গোপন গুহা থেকে চণ্ডবজ্র আর যমান্তকের লতাচূর্ণ চুরি করে নিয়ে যাবি, আর আমরা কিছু টের পাব না?’

বিকট সুরে হেসে উঠলেন সর্বাগ্রবর্তী পুরুষটি। বাকিরা তাতে যোগ্য সঙ্গত দিল।

‘আমি কিন্তু ওর হাত দুটো মুচড়ে মুচড়ে ভাঙতে চাই প্রভু, অনুমতি পাব আশা করি।’ সামান্য আদুরে স্বরে অনুরোধ করে জনছুব।

‘পাবি রে জনছুব পাবি।’

‘পা দু-টো ভাঙার দায়িত্ব তাহলে এই অধমকে দেওয়া হোক প্রভু মাশাং।’ কাতর স্বর শোনা যায় রিনছেনের।

‘আচ্ছা, পা-দুটোর দায়িত্ব তাহলে তুই-ই নিস।’ যেন নিজের সম্পত্তি বিলিয়ে দিচ্ছেন, এই ভঙ্গিতে বললেন মাশাং।

‘আমার জন্য তাহলে আর কী রইলটা কী? যা, সব তোরাই নিয়ে নে, যা।’ অভিমানী কণ্ঠ শোনা যায় ছুলঠিমের।

আতঙ্কে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল বৌদ্ধ শ্রমণটির। কিন্তু তিনি কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই...

‘তোমার জন্যে তো আমি রইলাম ছুলঠিম। দেখো তো পছন্দ হয় কী না।’ কোথা থেকে যেন ভেসে এল শান্ত এক কণ্ঠস্বর।

শ্রমণ দাঁড়িয়েছিলেন এক তুষারপ্রাচীরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। প্রাচীরটি উচ্চতায় তিন-চার মানুষের সমান। যেখানে প্রাচীর শেষ হচ্ছে, সেখান থেকে একটি সমতলভূমি শুরু। কথাটি ভেসে এল যেন সেখান থেকেই।

পাঁচ জোড়া চোখ চলে গেল উপরে।

সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। চারিদিকের শুভ্র তুষারপাতের মধ্যে আঁটোসাটো কালো রঙের পোশাকে তাঁকে দেখাচ্ছে স্থির বিদ্যুতের মতো। শুধুমাত্র চোখ আর ঠোঁট বাদ দিয়ে তাঁর পুরো মুখ ঢাকা। অনিন্দ্যসুন্দর সুঠাম দেহ।

ঘোর আতঙ্কের মধ্যেও বৌদ্ধ শ্রমণটির দেহে শিহরণ জাগল! উদীয়ানের যুবরাজ। আচার্য শান্তরক্ষিতের প্রেরিত অতি বিশ্বস্ত গুপ্তপুরুষ।

বামহাতে একটি অদ্ভুত দেখতে খর্বকায় ধনু ধরে আছেন সেই আগন্তুক। শিথিল জ্যা-তে একটি শর আরোপিত। পিঠে একটি তূণীর, এখান থেকে তার মাথাটি দেখা যাচ্ছে শুধু। সেই ধনুটি দেখামাত্র রোমাঞ্চিত হলেন শ্রমণ। আর কেউ না জানুক, তিনি জানেন ওই খর্বকায় অথচ মহাশক্তিশালী ধনুটির মাহাত্ম্য। তিনি এও জানেন—কোন তীব্র বিষে নিষিক্ত ওই ছোট ছোট তীরগুলি। কামরূপের পূর্বতম প্রান্তের অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্য অঞ্চলের নাম নাগাঞ্চিভূমি। সেখানকার দুর্ধর্ষ উপজাতীয় যোদ্ধারা ব্যবহার করে এই ধনু।

‘এই অদ্ভুতদর্শন জীবটা কে, প্রভু মাশাং?’ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে রিনছেন। মাশাং-এর অনুগামীদের মধ্যে সে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। মানুষটির আবির্ভাব তার ঠিক ভালো ঠেকছিল না।

‘বঙ্গভূমির এক নির্জীব বাঙালি বললে কি তোমাদের পোষাবে রিনছেন?’ সামান্য চিন্তিত শোনায় আগন্তুকের কণ্ঠস্বর, ‘নাকি আবার নামটাও বলতে হবে তার সঙ্গে? নাম না বললে তোমরা কি খুব অসন্তুষ্ট হবে ভাই?’

‘কে তুই?’ চিৎকার করে ওঠে জনছুব।

‘আমি কে? সে কথা এত সহজে কী করে বলি বলো তো ভাই জনছুব? সে কথা বলা ভারি পরিশ্রমের কাজ, বুঝলে হে! আমাদের শাস্ত্রে বলেছে ‘আত্মানং বিদ্ধি,’ মানে নিজেকে বিদ্ধ করলেই আত্মা ভারি খুশি হন, ঠিক বলেছি কি না? তুমি অবশ্য বুদ্ধিমান মানুষ জনছুব, তুমি বুঝবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।’

নির্বোধের মতো মাথা হেলায় জনছুব।

‘নাম বল শয়তান, একবার তোর নামটা বল শুধু। তারপর তোর মস্তিষ্কের ঘিলু দিয়ে মেখে মন্ত্রশোধিত অন্ন যদি গ্রহণ না করেছি...’ প্রবল ক্রোধে থরথর কেঁপে ওঠেন মহামন্ত্রী মাশাং।

‘নাম? নাম জানতে চাইছ তুমি? আমার নামধাম সবই তোমাকে বলতে হবে মাশাং? তবে তাই নাহয় বলছি তোমাকে। কিন্তু বলছিলাম যে, শুধু নিজের পরিচয় দিলেই হবে তো? নাকি আবার আমার পিতৃদেবের নাম, মাতুলবংশের কুলপঞ্জী—এসবও সবিস্তারে বলতে হবে? এসব না বললে কি খুবই অভিমান করবে ভাই মাশাং?’

‘শয়তান, তুই এখানে এলি কী করে?’ ছুলঠিম ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে।

‘আরে আর বলো না রে ভাই, সে অতি দীর্ঘ পথ। প্রথমে নালন্দা থেকে কজঙ্গল এলাম ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। সে আবার ভয়ানক বেতো ঘোড়া বুঝলে! তারপর সেখান থেকে কামরূপ অবধি এলাম একটি পণ্যবোঝাই নৌকায়। ঝড়জলের মধ্য দিয়ে সে অতি বিশ্রী যাত্রা। মধ্যবারেন্দ্রীতে তো একবার ঝড়ের মধ্যে পড়ে ডুবতেই চলেছিলাম প্রায়। তারপর কামরূপ থেকে একটি অশ্বতরের পিঠে চড়ে পাহাড়ি পথে এই এখানে। সেও পাক্কা তিনদিনের রাস্তা। ওওওহহ্! পিঠের হাড়গুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে হে ছুলঠিম। আচ্ছা, তোমাদের এখানে ভালো বৈদ্য আছে কেউ, অ্যাঁ?’

‘তুই...তুই...ঠাট্টা করছিস আমাদের সঙ্গে?’ জনছুব হিংস্র ভাবে হাতের দ’পদমটা আন্দোলিত করে।

‘ঠাট্টা? বলি এই পার্বত্যপথে এতখানি আসা কী ঠাট্টা মনে হল তোমাদের? ছিঃ ছিঃ, এটাকে পথ বলো তোমরা? বলি আমাদের কামরূপের অরণ্যপথও এর থেকে ঢের ভালো, বুঝলে?

‘তোর...তোর এত বড় সাহস...’ প্রচণ্ড ক্রোধে কথা হারিয়ে ফেলে রিনছেন।

‘আচ্ছা ভাই মাশাং একটা কথা বলো তো, তুমি কি মদ্যপান আর নারীসংসর্গে এত ব্যস্ত থাকো যে, দেশের পথঘাটের অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার কোনও সময়ই পাও না?

‘বেশ্যার বাচ্চা, তোর এত সাহস যে...’ উন্মত্ত ক্রোধে বক্তব্য শেষ করতে পারেন না মাশাং।

‘রাগ করলে নাকি মাশাং?’ প্রশ্ন করেন সেই অজানা আগন্তুক, তারপর বোধহয় সামান্য লজ্জা পেলেন তিনি। বললেন, ‘এখানে এসে তোমাদের বিরক্ত করলাম না তো? মনে তো হচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছাতেই তোমাদের কাজকর্মে কিছু বাধা দিয়ে ফেলেছি মাশাং। এ হে হে, কিছু ভুল করে ফেললাম নাকি?’

দাঁত কিড়মিড় করেন মহামন্ত্রী মাশাং, এই উৎপাত আশা করেননি তিনি। সজোরে চিৎকার করে উঠলেন, ‘জনছুব, ছুলঠিম, রিনছেন, হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কী? এই শয়তানটাকেও বন্দি করে নিয়ে আয়। এ অবশ্যই মায়াজাদুকর। নইলে এখানে এই সময়েই উপস্থিত হল কী করে?’

সেই অদ্ভুত দর্শনধারী মানুষটি এরপর যা করলেন তাকে ইন্দ্রজাল বললেও কম বলা হয়!

প্রায় তিন থেকে চার মানুষ-সমান উচ্চতা থেকেই লাফ দিলেন নীচের দিকে। না, দেহভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না তাঁর। দৃঢ় ও ঋজু ভাবে নেমে আসতে আসতেই শরসন্ধান করলেন তিনি, টানটান হল জ্যা’খানি আর অব্যর্থ মৃত্যুর ঠিকানা নিয়ে একটি শর উৎক্ষিপ্ত হল সামনের দিকে।

যতক্ষণে সেই মৃত্যুদূত খুঁজে নিয়েছে তার আশ্রয়, ততক্ষণে তিনি নেমে এলেন শ্রমণের ঠিক পাশে। নেমে এলেন এমন অনায়াসে, দেখে মনে হল যেন বাতাস কেটে মোনাল পাখির একটি পালক নেমে এল মাটিতে। তখন তাঁদের সামনে শায়িত দুটি দেহ।

একটি কমলবুদ্ধির।

আরেকটি বিশালদেহী ছুলঠিমের।

একটি খর্বকায় শর প্রায় পুরোপুরি গেঁথে আছে ছুলঠিমের বুকের বাঁদিকে। বোঝাই যায় যে প্রবল শক্তিতে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়েছে সেটি। ছুলঠিমের মুখে অবশ্য সামান্য বিস্ময়বোধ ছাড়া মৃত্যুর আর কোনও

চিহ্নই নেই। মহান মৃত্যুবিহঙ্গ খ্যুং গনপো যে এইভাবে হঠাৎ ডানা মেলে নেমে আসতে পারেন তার ওপর, সেটি বোধহয় সে স্বপ্নেও ভাবেনি!

বিস্ফারিত চোখে ছুলঠিমের দেহের দিকে তাকিয়েছিল তিনটি তিব্বতী, নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না তারা। উড়ন্ত অবস্থা থেকে এত ক্ষিপ্রতায় ও এমন নিপুণ নিশানায় তীর ছুঁড়তে আজ অবধি আর কাউকে দেখেনি এই তিন তিব্বতনন্দন।

তারপর যেভাবে বন্য নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর, ঠিক সেভাবেই উন্মুক্ত দ'পদম হাতে দৌড়ে এল ওরা।

উদীয়ানের রাজপুত্র তখন ফেলে দিয়েছেন তার ধনুটি। তাঁর হাতে উঠে এসেছে একটি অতি ভীষণদর্শন বিশালকায় খড়্গ, যার মাথার দিকটা চাঁদের মতো বাঁকানো।

এ অস্ত্রও চেনেন শ্রমণ। কজঙ্গলের শবর জনজাতির বড় প্রিয় এই খড়্গ। এই দিয়ে দেবী পর্ণশবরীর সামনে বন্য মহিষ উৎসর্গ করে তারা।

তাদের ভাষায় এর নাম দা' বা দাও!

৭০০ খ্রিস্টাব্দ। রাজপ্রাসাদ, কর্মান্তবাসক, বঙ্গদেশ।

সেই একই রাত্রি। নিদ্রাহীন রাত জাগছেন আরও তিনজন মানুষ।

স্পষ্ট ও উজ্জ্বল আকাশ জুড়ে অজস্র প্রশ্নের মতো নেমে আসছে তরল অন্ধকারের স্রোত। একটি কালপেঁচা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল উত্তরদিকে; তারপর চতুর্দিক জুড়ে ছায়ার মতো, রাতের কুয়াশার মতো নেমে এল অনন্ত নৈঃশব্দ্য। চারিদিকে জনপ্রাণীর শব্দমাত্র নেই। বাতাসে অল্প শীতের আভাস। বনে-বনান্তরে গাছের পাতায় ক্লান্ত মর্মরধ্বনি। দূরে দিগন্তে যেখানে ঘননীল আকাশ মিশেছে কৃষ্ণচরাচরে, সেইখানে একটি বড় হ্রদ। হ্রদের জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় ভেসে যাচ্ছে খণ্ড খণ্ড চন্দ্রজোছনা। তার একপাশে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আরেকপাশে একটি রাজপ্রাসাদ।

সেই রাজপ্রাসাদের দ্বিতলে তিনজন বসে আছেন পাথরের মূর্তির মতো। অন্ধকার প্রাসাদের একটি জানালা প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত। তারই মধ্যে তিনটি দীর্ঘ ছায়া থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

এঁদের মধ্যে যাঁর বয়স অপেক্ষাকৃত কম, তিনি বসে আছেন একটি রাজসিক আসনে। তাঁর প্রশস্ত বুকে শোভা পাচ্ছে বহুমূল্য রত্নহার, দুইহাতে মাণিক্যখচিত অঙ্গদ, দুই কানের কুণ্ডলে ঠিকরে উঠছে স্বর্ণদ্যুতির অহঙ্কার। দেহটি সুঠাম হলে কী হবে, এই অল্প বয়সেই সুদর্শন যুবকটির চোখের নীচে গাঢ় কালির চিহ্ন, অবয়ব জুড়ে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তির সাক্ষ্য স্পষ্ট।

বাকি দুজনও বসে আছেন তাঁর কাছেই। তাঁদের বসার ভঙ্গিতে বোঝা যায় যে তাঁরা এই নবীন যুবার বিশেষ আস্থার পাত্র। তাই তাঁদের আচরণে বিনয় আছে, ভয় নেই। শ্রদ্ধা আছে, আশঙ্কা নেই।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন খর্বনাসা গৌরবর্ণ পুরুষটি। তাঁর উচ্চারণে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই দেশের ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়, এই ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছেন।

'আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা কালই বাস্তব রূপ পাচ্ছে তো ভাগিনেয়? সব কিছু ঠিকঠাক তো?'

যুবক প্রথমেই উত্তর করলেন না। একবার তাকালেন বক্তার দিকে, তারপর অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'এখনও স্থির করতে করতে পারিনি মাতুল চারুদত্ত। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে এত তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।'

ভ্রু কুঞ্চিত করেই মুখে কৃত্রিম মিষ্টি হাসি ফিরিয়ে আনলেন সেই বিদেশি পুরুষ, 'আমার কথা যদি শোনো ভাগিনেয়, শাস্ত্রে বলে শুভস্য শীঘ্রম, অশুভস্য কাল হরণম্। ভালো কাজে দেরি হওয়া ঠিক নয়। আর

তাছাড়া আগামীকাল তোমার অভিষেক, এই বঙ্গভূমির সম্রাট হবে তুমি। এখন এত ভাবাভাবির মধ্যে গেলে তোমার চলবে?'

'কিন্তু মাতুল, অভিষেকের দিনেই এত বড় একটি সিদ্ধান্ত কী করে নিই? তাও অমাত্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে কিছুমাত্র আলোচনা না করে?'

'এ ব্যতীত তিব্বতরাজের নিঃশর্ত সমর্থন পাওয়ার আর কি কোনও উপায় তোমার জানা আছে ভাগিনেয়?' চারুদত্ত প্রতিপ্রশ্ন করেন।

'কিন্তু...কিন্তু মাতুল...এর ফলাফল হিসেবে রাজকোষের ওপর যে বিপুল চাপ পড়বে...'

'এ আলোচনা আমরা আগেই করিনি কি ভাগিনেয়?' সামান্য অধীরতাই বোধহয় প্রকাশ পায় বক্তার স্বরে, 'আমাদের তো কথাই হয়েছিল যে, তোমার রাজ্যপ্রাপ্তির পরেই তিব্বতরাজের সহায়তায় আমরা দিগ্বিজয়ে বার হব। আমাদের জয়ধ্বজা উড়বে গুর্জরদেশ থেকে যবদ্বীপ অবধি। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে সমগ্র উত্তরাবর্ত। বিজিত দেশগুলি থেকে লুণ্ঠন করে আনব বিপুল ধনসম্পদ। এ সব তো স্থির হয়েই আছে! আর এই বিপুল সাহায্যের প্রতিদানে যে সামান্য সুবিধা তিব্বত-নরেশ চেয়েছেন, তা খুব অযৌক্তিক নয়!'

ইতস্তত করেন নবীন যুবক। সেই দোলাচল প্রকাশ পায় তাঁর কণ্ঠস্বরেও, 'আমার আশঙ্কা অন্যখানে, মাতুল চারুদত্ত। আমার আশঙ্কা আমাদের এই পরিকল্পনা কতখানি বাস্তব সেই নিয়ে। আমাদের পরিকল্পনা কি একটু বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়? অঙ্গ, পুন্ড্রবর্ধন, মগধ, লিচ্ছবী, মালব, কান্যকুব্জ...এইসব বিচিত্র ভাষাভাষী, বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে একসূত্রে গেঁথে একটি স্বতন্ত্র, সার্বভৌম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা স্বপ্নমাত্র নয় তো?'

আলোছায়ার মধ্যেই চারুদত্তের মুখে অদ্ভুত মরিয়া এক আতঙ্কের ভাব খেলে গেল, যা বাকি দুজনের কেউই লক্ষ করলেন না।

তিব্বত থেকে গত মাসেই প্রধানমন্ত্রী গার তিরিলিং-এর গোপন আদেশ এসেছে চারুদত্তের কাছে, সে আদেশ সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। কাল রাজসভার অধিবেশন শেষ হওয়ার আগে যদি সেই আদেশের পালন না হয়, তাহলে পরের দিন ভোর হওয়ার আগেই চারুদত্তের একগাছি চুলও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেই থেকে চারুদত্তের চোখে ঘুম নেই, প্রাণে স্বস্তি নেই, মনে আনন্দ নেই।

মনের ভাব গোপন করে বললেন চারুদত্ত, 'এখন এই প্রশ্ন ওঠার কারণ কী ভাগিনেয়? তোমার মনে তো এমন ছোটখাটো সংশয় আসার কথা নয়! বীরত্বে তুমি গৌড়পতি শশাঙ্কের সমতুল্য, করুণায় স্বয়ং সম্রাট হর্ষ। আমি তো প্রায়ই বলি—প্রতাপে, মেধায়, করুণায় আমার ভাগিনেয় সাক্ষাৎ অমিতাভর অবতার।'

এই পর্যন্ত বলে সরু চোখে একবার ভাগিনেয়র দিকে তাকালেন তিনি। তারপর যোগ করলেন, 'তিব্বতাধিপতির সঙ্গে আমাদের এই চুক্তিই একদিন তোমার পুণ্য নিয়তি হয়ে দেখা দেবে ভাগিনেয়, আর একদিন এই নিয়তির নির্দেশে তুমি ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট হবে। তুমি কি নিজেকে সাধারণ পুরুষ ভাবো? রাজচক্রবর্তী সম্রাটের ভাগ্যলিখন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পরে তুমিই হবে ভারতভূমির শ্রেষ্ঠতম নৃপতি। আজ তোমার নিয়তি তোমাকে আহ্বান করছে ভাগিনেয়! ওঠো, জাগো...রাজলক্ষ্মীর বরমাল্য আজ তোমার কণ্ঠদেশে...'

তৃতীয় পুরুষটি যেখানে বসেছিলেন সেখানে আলোয় ছায়ায় আঁধারে তৈরি হয়েছিল এক অপার্থিব মায়াবিভ্রম। তাঁর মুখের নীচের অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল। সেই অন্ধকারের ছায়ায় ফুটে ছিল একটি দৃঢ় চিবুক এবং বাঁকা ঠোঁট। কালো কাপড়ে সমস্ত শরীর ঢেকে বসেছিলেন মানুষটি। তাঁর বসে থাকার ঋজু ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি উন্মুক্ত তরবারি নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে।

শান্ত চোখে এই নাটক দেখে যাচ্ছিলেন সেই অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষ। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন এক কুশলী ব্যাধ ফাঁদ পেতেছে নির্বোধ ছাগশিশু ধরবার জন্যে। সেই পুরোনো খেলা, শুধু কুশীলবেরা নতুন, এই যা।

তবে কি না এক্ষেত্রে এই নাটকের অধিকারী তিনিই। ছাগশিশুও তাঁর, ব্যাধও তাঁর, ফাঁদও তাঁরই। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পণ্ডিত। তারপর দুটি কাঁটাকেই কী করে ছুঁড়ে ফেলতে হয়, সেও তাঁর ভালোই জানা। তবে আজকের রাত অতি গুরুত্বপূর্ণ, আজই অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তদুটি এই মূর্খ অর্বাচীনটিকে দিয়ে অনুমোদিত করিয়ে নিতে হবে। এর থেকে ভালো সময় আর হয় না।

তিনি পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক থেকে সবকিছু শান্তভাবে দেখে যাচ্ছেন। মহাচীন থেকে কম অর্থ নিয়ে আসেননি তিনি। একবার শুধু রাজসভায় জায়গা পাওয়ার অপেক্ষা, ব্যস, তারপরেই রাজসিংহাসন তাঁর হাতের মুঠোয়। উৎকোচে বশীভূত হয় না এমন রাজপুরুষ হয় নাকি?

তবে একজন, শুধু একজনকেই তাঁর ভয়।

বাতায়নের বাইরে অন্ধকার রাত্রির দিকে চক্ষু মেলে দেখছিলেন সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ নবীন যুবক, অশান্ত ও দীর্ণ বঙ্গভূমির নতুন শাসক। শান্ত নীল আকাশ থেকে কি কোনও মহাজাগতিক সংকেতধ্বনি শুনতে চাইছিলেন ভাবী সম্রাট? পেতে চাইছিলেন কোনও অতিলৌকিক ইঙ্গিত?

দেশের অবস্থা এমনিতেই খুব একটা ভালো নয়। সম্রাট শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকেই ভারতবর্ষের পূর্বভাগ জুড়ে যে অরাজক বিশৃঙ্খলা চলছে, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও আশু লক্ষণ নেই। সম্রাট রাজভট অতি দৃঢ়ভাবে এতদিন রাজ্যশাসন করে এসেছেন। তাই অন্তত এখানে বহু চেষ্টাতেও কোনও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে মানুষের মধ্যে বিপুল অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে রাজ্যের আপামর জনসাধারণ।

কিন্তু তিনি নিজে?

এক আচ্ছন্ন ঔদাসীন্য যেন এই সবকিছু থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে রেখেছে তাঁকে। সেই নির্মোহ নিরাসক্তির আবরণ পেরিয়ে এত কথাবার্তা, আলোচনা, পরিকল্পনা, মন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র—এসব কিছুই তাঁর মনে আজকাল কোনও ছাপই ফেলে না। প্রতিটি সংবাদ যেন তাঁর চৈতন্যে একবার আঘাত করেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়, তার কোনও অবশেষই থেকে যায় না।

এমনকী আজকাল কোনও বিষয় নিয়ে বেশি ভাবতেও পারেন না তিনি। মাঝে মাঝেই মাথার ভিতরটা শূন্য হয়ে যায়। তারপরেই তীব্র যন্ত্রণায় উন্মাদপ্রায় হয়ে যান তিনি, এই অবস্থা চলে যতক্ষণ না মাতুল এসে সেই বিশেষ ওষুধটি তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন।

মাথার যন্ত্রণাটা আসবে আসবে করছিল। তবুও ভ্রূক্ষেপ করলেন না নতুন সম্রাট। মাতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞ অমাত্যদের পরামর্শ আমি উপেক্ষাও করতে পারি মাতুল। সে অধিকার আমার আছে। কিন্তু তাই বলে তাঁদের পরামর্শ না শোনার কথা বলি কী করে?'

প্রমাদ গুনলেন চারুদত্ত। হাতে সময় বড়ই কম, এই সময়ে হঠাৎ এই অপোগণ্ডটির বুদ্ধি গজিয়ে ওঠা বড়ই বিপদের কথা! লক্ষণ ভালো নয়!

'আমার মতে তাঁদের পরামর্শ শোনার কোনও প্রয়োজনই নেই ভাগিনেয়। রাজসভার ওই বৃদ্ধ পরগাছাগুলোর কাজই হচ্ছে সমস্ত শুভকর্মে বাধা দিয়ে সেইটি পণ্ড করা।'

উদ্ভ্রান্ত চোখ তুলে তাকালেন নবীন যুবক। দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে দেখলেন। তারপর স্খলিতস্বরে বললেন, 'আমি জানি না মাতুল—কী ঘটতে চলেছে; কিন্তু আমি এই প্রস্তাবে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি। আমার মন বলছে যে, এই বিষয়ে উচ্চপদস্থ অমাত্যদের মতামত নেওয়াও অত্যন্ত আবশ্যক। তাঁরা যে শুধু অভিজ্ঞই নন, রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষীও বটে। পিতাকেও দেখেছি অত্যন্ত ছোটখাটো বিষয় হলেও এঁদের মতামত নিতে। আর আজ এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁদের পরামর্শ ছাড়াই...'

‘তুমি বৃথাই চিন্তিত হচ্ছ, ভাগিনেয়। মহাবলশালী তিব্বত-নরেশ ঠিদু স্রোংচান স্বয়ং যখন তোমার সহায়, তখন এত চিন্তা আর উদ্বেগের তো কোন কারণই নেই। আমাদের এই মিত্র তো প্রধানমন্ত্রী তিরিলিং-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র নিয়েই এসেছেন।’ এই বলে সেই তৃতীয় পুরুষটির দিকে ইঙ্গিত করলেন চারুদত্ত। সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সেই রহস্যময় পুরুষ।

‘কিন্তু মাতুল, সে চুক্তিতে তো কোথাও সম্রাটের স্বাক্ষরচিহ্ন নেই।’

‘আহা, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে সম্মতি দিয়েছেন সেখানে আবার সম্রাটের আলাদা করে অনুমতি দেওয়ার কী প্রয়োজন? আর আমি ওখানকারই লোক, আমি এসব নিয়মটিয়ম খুব ভালো করে জানি ভাগিনেয়। তুমি এ বিষয়ে একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।’ ভাগিনেয়কে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন চারুদত্ত। এই বলে সেই রহস্যময় তৃতীয় পুরুষটির দিকে আড়চোখে তাকালেন তিনি, তারপর বললেন, ‘তার উপর তুমি নিজেও মহাশক্তিশালী যোদ্ধা। ছোটখাটো সামন্ত আর রাজাদের জন্য তো তুমি একাই যথেষ্ট। তোমার দরকার কি এইসব সামান্য বেতনভুক কর্মচারীদের পরামর্শ নেওয়ার?’ নবীন সম্রাটকে উত্তেজিত করার প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন চারুদত্ত।

এইবার মহাস্ত্র প্রয়োগের সময় এসেছে! নিজেই নিজেকে বললেন তিনি।

ঘরের কোনায় রাখা স্বর্ণকলসটির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, কুলুঙ্গি থেকে দুটি পানপাত্র নামিয়ে আনলেন নিজের হাতেই। তারপর জিগ্যেস করলেন, ‘আজ মনে হয় ভাগিনেয়র মস্তিষ্ক চঞ্চল হয়ে আছে, তাই না? নইলে এমন জলবত্তরলং বিষয় নিয়ে এত প্রশ্ন ওঠার কথাই না। তবে ভাগিনেয়র আর দোষ কী? কয়েকদিন ধরে তার ওপর যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে, দেখে তো আমারই শরীরটা কেমন যেন...’, বলতে বলতে দুটি পানপাত্র পূর্ণ করার উদ্যোগ নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, ‘আজ সম্রাটের কোন পানীয় সেবনের ইচ্ছা শুনি? উৎকৃষ্ট গৌড়ী আছে, মাধ্বী আছে, মৈরেয়ও আছে। এমনকী দণ্ডভুক্তি থেকে আনা উত্তম পৈষ্ঠীও আছে কিছু...’

লক্ষণ একটুও ভালো লাগছিল না চারুদত্তের। এই যুবকের বয়ঃসন্ধিকাল থেকে তাকে অল্প অল্প করে নিজের হাতের মুঠোয় এনেছেন তিনি। তার জন্যে বিপুল পরিশ্রম গেছে তাঁর। ভাগিনেয়কে নারী ও সুরায় আসক্ত করিয়েছেন যৌবনের শুরুর দিনগুলি থেকেই। দেশবিদেশ থেকে অতি গোপনে আনিয়েছেন বিচিত্র সব নেশাবস্তু। বিভিন্ন মদ্য থেকে শুরু করে প্রবরদেশের গঞ্জিকা, তিব্বতীয় নীলকৃষ্ণপুষ্প থেকে শুরু করে চের দেশের নারিকেলজাত ক্কাথ, প্রাণীজ থেকে উদ্ভিজ্জ, সমস্ত ধরনের নেশাদ্রব্য ব্যবহারে অভ্যস্ত তাঁর আদরের ভাগিনেয়।

তবে ইনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন যে বস্তুটি, সেটির জন্মস্থান সুদূর গান্ধারভূমিতে। অহিফেনকে বিশেষ উপায়ে পাতিত ও শোধিত করে প্রস্তুত করা হয় শুভ্রবর্ণ ভস্ম। শিকারকে আচ্ছন্নতায় বশীভূত করে ফেলতে এর জুড়ি নেই।

বুকের কাছে হাত দিলেন। বটুয়াটি সঙ্গে আছে তো?

আপাতত এই দিয়েই ভাগিনেয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন চারুদত্ত। এমনই তীব্র আকর্ষণ সেই শুভ্রবর্ণ ভস্মটির, যে প্রয়োজনের সময়ে সেটি হাতের কাছে না পেলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে যুবক।

আর পেলে? তখন তো অতি উত্তম। অসংলগ্ন আচরণ, উদ্ধত ও ইতরজনের মতো ব্যবহার, অনর্থক হিংস্রতা—সব মিলিয়ে এই মানুষটিকে তখন নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

রাজপরিবারে এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছে। কোনও বৈদ্যই এই রোগ নিরাময় করতে পারেননি। সন্তানের এই দুরারোগ্য অসুখ দেখে জীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় শয্যা নিয়েছেন চারুদত্তের ভগিনী, রানি চন্দ্রাবতী। জাগতিক কোনও ব্যাপারেই আর তাঁর আসক্তি নেই। সম্রাট রাজভট নিজেও শেষ জীবন বড় কষ্টে কাটাননি কি? শেষাবধি সেই যন্ত্রণা থেকে তাঁকে মুক্তি দিতেই তো চারুদত্তকে বাধ্য হয়েই সেই রাতে...

মুহূর্তের জন্যে তীব্র অনুশোচনা গ্রাস করতে চাইছিল চারুদত্তকে। কিন্তু আসন্ন কর্তব্যের কথা ভেবে নিজেকে ফের স্বাভাবিক করলেন। অর্থের সামনে কে কার ভগিনী, কে কার মাতুল? বিশেষত যাঁর মাথার ওপর উদ্যত হয়ে আছে মৃত্যুভয়ের মহাখড়্গ?

অভ্যস্ত হাতে একটি সুরাপাত্রে পরিমাণ মতো মাধ্বী ঢাললেন তিনি। তারপর ডান হাতটি ঢুকিয়ে দিলেন ঊর্ধ্বাঙ্গের অঙ্গবস্ত্রটির ভেতরে। সেখান থেকে অতি সন্তর্পণে বের করে আনলেন একটি ছোট চামড়ার বটুয়া। তার ভিতর থেকে অতি সন্তর্পণে তুলে আনলেন কিছু সাদা রঙের গুঁড়ো, মিশিয়ে দিলেন সেই পানীয়তে। তারপর অতি স্নেহের সঙ্গে সেটি তুলে দিলেন যুবকটির হাতে।

মাতুলের উত্তেজক ভাষণে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যুবক। এমনিতেই বেশি চিন্তাভাবনা সহ্য হয় না তাঁর। তার ওপর মাথার যন্ত্রণা ফিরে আসছিল। একমুহূর্তে পানীয় নিঃশেষ করলেন সেই নবীন যুবক।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভাগিনেয়র দিকে লক্ষ রাখছিলেন চারুদত্ত। এসব কাজের মূল্য কি শুধু অর্থ দিয়ে হয়? নিজের পানপাত্রে দীর্ঘ চুমুক দিতে দিতে নিজেকে বলছিলেন তিনি। এর জন্যে চাই ধৈর্য, সাহস আর বুদ্ধি। সাধে কী আর চারুদত্তকে অত চিন্তাভাবনার পর পাঠানো হয়েছিল এই দেশে?

'এখন কি কিঞ্চিৎ সুস্থির বোধ করছ ভাগিনেয়?'

এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলেন নবীন সম্রাট। এইবার চোখ খুললেন তিনি। ইতিমধ্যেই চক্ষু লাল হয়ে গেছে তাঁর। সামান্য বাঁকা সুরে বললেন, 'কী যেন বলছিলেন মাতুল? তাহলে চুক্তিতে প্রধানমন্ত্রী তিরিলিং এর অভিজ্ঞানই যথেষ্ট?'

'নিশ্চয়।' স্বস্তির শ্বাস ফেললেন চারুদত্ত। ভাগিনেয়র এই লক্ষণ খুবই ভালোভাবে চেনেন তিনি, তবুও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া উচিত হবে কি?

এই দেশের রক্তে অবাধ্যতা আর বিদ্রোহের বীজ খেলা করে বেড়ায়। সহজে কি এই রাত এসেছে তাঁর কাছে? সম্রাট রাজভট বেঁচে থাকলে কি আর এসব সম্ভব হতো?

অনেকদিন হয়ে গেল এই দেশে এসেছেন চারুদত্ত, এখনও এই দেশের মায়েদের দুধের জাদু বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। একটিমাত্র কৈবর্ত নারীর দুধের ঋণ যে তাঁর ইচ্ছাপূরণের পথে এত বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে, কেই বা ভেবেছিল?

খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠার পেছনে হাত ছিল তিব্বত-নরেশ স্রোংচান গাম্পোর। ভারতের পূর্বভাগ জয় করে দেশে ফিরে যাওয়ার আগে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে যান তিনি। এঁদের প্রথম তিন নৃপতি খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, এবং দেবখড়্গ—তিনজনেরই দেহে ছিল তিব্বতের রক্ত এবং তিনজনেই ছিলেন পরম বৌদ্ধ। এমনকী খড়্গোদ্যম এবং জাতখড়্গের দুই রাজ্ঞীও ছিলেন তিব্বতদেশীয়।

কিন্তু 'ক্ষিতিপতি' দেবখড়্গ তাঁদের পারিবারিক রীতি অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেন এক এদেশীয় নারীকে। মহারানি প্রভাবতী।

প্রভাবতী ছিলেন বরেন্দ্রীর মেয়ে, কৈবর্তরাজকন্যা। সম্রাট রাজভট তাঁরই গর্ভজাত সন্তান। নিজের মা'কে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন রাজভট, এই দেশকে তারও বেশি।

উদার হেসে বললেন চারুদত্ত, 'এই তো, ভাগিনেয়র মনটা এবার একটু প্রফুল্ল হয়েছে মনে হচ্ছে! বাহ বাহ, বেশ ভালো। তা ভাগিনেয়র মনে আছে নিশ্চয়ই, কী কী করতে হবে আমাদের?'

'আছে বইকি! সামান্য ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন নবনিযুক্ত সম্রাট। কণ্ঠস্বরে ঝলসে উঠছিল অপরিসীম ঔদ্ধত্য, 'একদিন এই বিশাল ভারতভূমি আমার পদানত হবে। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পর একমাত্র রাজচক্রবর্তী সম্রাট হব আমি। তাই না মাতুল?'

'বটেই তো ভাগিনেয়।' আরও উৎসাহ দেন চারুদত্ত।

‘কলিঙ্গ থেকে কাশ্মীর আমার পায়ের নীচে আসবে, কামরূপ নরেশ নিজে এসে আমার পা ধুইয়ে দেবেন’ চক্ষু দুটি আরও লাল হয়ে উঠছিল যুবকের, ‘গৌড়বঙ্গের এই অপোগণ্ড সামন্তগুলোকে নিয়ে কী করা যায় মাতুল?’

‘রাজপ্রাসাদ নিয়মিত পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দিলে কেমন হয় ভাগিনেয়?’

এতক্ষণ ঘরে উপস্থিত তৃতীয় পুরুষটি কোনও কথা বলেননি। এইবার তিনি একটু মৃদু শব্দ করলেন। ঈঙ্গিত বুঝতে দেরি হল না চারুদত্তের। বাজে কথা অনেক হয়েছে, এইবার আসল কাজ।

‘কিন্তু তুমি তো জানো ভাগিনেয়, সমস্ত ভালো কাজে বাধা দেওয়াই এদেশের মানুষের একমাত্র স্বভাব। তোমাকে কিন্তু সেই নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমার চিন্তা হচ্ছে ওরা আবার আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা পণ্ড না করে দেয়। কণ্ঠে আশঙ্কা ফুটিয়ে তুললেন চারুদত্ত।

‘তারা কারা? রাজার ইচ্ছেয় বাধা দেয়, কাদের এত স্পর্ধা?’

চাপা উল্লাসের ভাব খেলে গেল বাকি দুজনের মুখে। ওষুধ ধরেছে। এইবার, অতি ধীরে, খেলিয়ে তুলতে হবে।

‘কারা আবার? তোমার বৃদ্ধ অমাত্যরা।’ মুখ ভার করলেন চারুদত্ত, ‘প্রতিটি কাজে প্রশ্ন তোলাই যাদের কাজ—তারা! আমার কথা যদি শোনো ভাগিনেয়, এই বৃদ্ধদের অনুমতি নিয়ে চলতে গেলে তোমার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।’

‘এত স্পর্ধা ওদের হবেই না। কালই আপনার ইচ্ছাপূরণ হবে।’

যুদ্ধজয়ের হাসি ফুটে ওঠে তৃতীয় পুরুষটির মুখে। যাক, ভাগ্যের চাকা অবশেষে তাঁর পক্ষে ঘুরতে শুরু করেছে। একবার শুধু রাজসভায় স্থান পাওয়ার অপেক্ষা। তারপর তিনি জানেন কীভাবে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। কাজ হয়ে যাওয়ার পর এই দুজনকেই ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ফেলে দিতে তাঁর একমুহূর্ত সময় লাগবে না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন চারুদত্তও। এতদিন পর, অবশেষে। সেই বহু ঈপ্সিত ক্ষণটি আজ তাঁর হাতের মুঠোয়। চাপ ক্রমশই বাড়ছিল চারুদত্তের উপর। সেই চাপ আর নিতে পারছিলেন না তিনি।

তিব্বতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্ষমতার পাল্লা ক্রমেই ঝুঁকে পড়ছিল ভারতীয়দের দিকে। শক্তিশালী সামন্তদের বশ করতে গিয়ে তিব্বতসম্রাট ক্রমেই আরও বেশি আঁকড়ে ধরছিলেন বৌদ্ধধর্ম, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম। সামন্তদের বেশিরভাগই আবার তিব্বতের প্রাচীন পোন ধর্মের অনুসারী। এদের নেতৃত্বে আছেন মহা কূটবুদ্ধি মন্ত্রী, গার সামন্ত বংশের সন্তান তিরিলিং।

ওদিকে মহাশক্তিশালী তিব্বত ক্রমেই ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনকে। ফলে চীনের তাং রাজবংশও চাইছিল তিব্বত সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তাং রাজবংশের রাজপুরুষরা তখন চৈনিক বৌদ্ধদের সাহায্যে মদত দিতে থাকলেন তিব্বতের প্রভাবশালী সামন্তদের, উদ্দেশ্য তিব্বতসম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করা। মহামন্ত্রী তিরিলিং অতি সহজে যুক্ত হয়ে গেলেন তাদের দলে।

তিব্বতের সামন্তরা জানতেন যে, সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে ভারতীয় বৌদ্ধদের শাসনে রাখতে হবে। কারণ তাঁরাই ধর্মীয় এবং নৈতিক শক্তি যোগাচ্ছেন সম্রাটকে। তাঁদের জন্যেই আজ তিব্বতে পোন ধর্ম বিপদের মুখে। সামন্তদের ক্ষমতা প্রশ্নের সামনে। তাঁদেরই চরবৃত্তি নিয়ে এদেশে আসেন চারুদত্ত।

কিন্তু এতদিন ধরে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থই হয়েছে তাঁর। রাজসচিব তিনি, রাজসভায় যথেষ্ট উচ্চপদে আসীন। রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার পেয়েছেন, কিন্তু কোনও কাজের কাজ করাতে পারেননি সম্রাটকে দিয়ে।

‘তাহলে শেষ পর্যন্ত কী ঠিক হল?’ গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন তৃতীয় পুরুষটি। তাঁর স্বরের গাম্ভীর্যে বোঝা যায় যে তিনি কোনও সামান্য পুরুষ নন। নবীন যুবক চোখ মেলে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর নেশাগ্রস্ত

চোখে ধরা পড়ে পুরুষটির স্থির এবং শীতল দৃষ্টি। ইতিমধ্যেই চারুদত্তের দেওয়া চতুর্থ পাত্র শেষ করেছেন। এই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে সহসা শীত করে ওঠে সম্রাটের!

'তাহলে কি এই ঠিক হল যে, আমাদের এই বন্ধুটিকে কালকেই নিয়োগ করা হবে দ্বিতীয় রাজসচিব রূপে?' উদগ্র আগ্রহে ভাগিনেয়র দিকে তাকালেন চারুদত্ত।

অস্ফুটে বললেন নবীন সম্রাট, 'হ্যাঁ মাতুল, তাই হবে।'

'আর পূর্বসমুদ্রের বাণিজ্যপথে তিব্বতদেশের নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার?'

'সে অনুমতিও কালই দিচ্ছি।'

আনন্দে চারুদত্তের চোখে জল চলে আসছিল। তিব্বতের বহির্বাণিজ্যের রাশ এখনও মন্ত্রী তিরিলিং-এর হাতেই। পূর্বসমুদ্রপথে তিব্বতীয় বণিকদের জন্য নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার আদায় করা মানে তিব্বতের রাজসভায় মন্ত্রীমশাইয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে যাওয়া। আর প্রতিশ্রুতিমতো বাড়তি লভ্যাংশের এক দশমাংশ তো চারুদত্ত পাচ্ছেনই।

হে ঈশ্বর, এত সুখ লেখা ছিল চারুদত্তের কপালে? সে যে অনেক মুদ্রা!

'আর যদি অন্যান্য অমাত্যরা আপত্তি তোলেন?' অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষটির কণ্ঠস্বরে এমন মসৃণ শীতলতা আছে যে, এই স্বর শুনলেই শ্রোতার মনে অপার্থিব ভয় জেগে ওঠে।

'কে আপত্তি তুলবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা যে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলবে?' ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করেন নবীন সম্রাট।

'সাহস অনেকেরই আছে রাজন।' স্থির নিরাসক্ত কণ্ঠে জানান সেই অজ্ঞাত পুরুষটি।

নবীন সম্রাটকে দেখে মনে হল এখনই বিপুল আক্রোশে ফেটে পড়বেন। সজোরে নিজের আসনের হাতলে ঘুঁষি মারলেন তিনি। তারপরে উন্মত্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'কার এত বড় স্পর্ধা—আমি জানতে চাই মাতুল! আমি জানতে চাই—কার এত সাহস যে আমাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার কথা ভাবে?'

'অনেকেই আছেন রাজন, তবে ভয় একজনকেই।' এই বলে উঠে দাঁড়ান অজ্ঞাতনামা তৃতীয় পুরুষ। বাঘের মতো নিঃশব্দ দ্রুত পায়ে সম্রাটের কাছে চলে আসেন তিনি, কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'তাঁকে এই রাজসভা থেকে সরাতে পারলেই আমাদের কার্যসিদ্ধির পথে আর বাধা থাকে না, রাজন।'

নবীন যুবক রাজবংশের সন্তান। নিজেও কম শক্তি ধরেন না। তবু তিনিও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই মানুষটির দানবীয় শক্তিতে। এঁর ব্যাপারে আগেই অনেক কিছু শুনেছিলেন তিনি, এখন অনুভব করলেন যে ইনি সামান্য কেউ নন!

'কে সেই অমাত্য? আপনি চেনেন তাঁকে? মাতুল চারুদত্ত, আপনি জানেন কার কথা ইনি বলছেন?' সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন নবীন সম্রাট।

'জানি ভাগিনেয়।' ভাগিনেয়র হাতে পঞ্চম পাত্র তুলে দিতে দিতে অকম্পিত স্বরে বললেন চারুদত্ত।

'কে সেই বিশ্বাসঘাতক?'

'রাজপণ্ডিত দয়িতবিষ্ণু।'

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ। চম্পানগরী, মগধ।

বর্ষার শেষ। আকাশে শরতের প্রসন্ন রোদ। তার নীচে দিগন্ত অবধি ছেয়ে আছে সবুজ শালিধানের খেত। দুটি খেতের মধ্যবর্তী আলপথ ধরে তিনি হেঁটে আসছিলেন।

তাঁর দীর্ঘ নির্মেদ শরীর দেখে বরেন্দ্রীর সুপুষ্ট ইক্ষুর কথা মনে পড়ে। তেমনই পুষ্ট অথচ মেদবর্জিত সুঠাম ঋজু দেহ। তিনি বিশালদেহী নন, তবুও শরীরে বিপুল শক্তির আভাস স্পষ্ট। নবদুর্বাদলশ্যাম মানুষটির মুখে সবসময়ই এমন একটি প্রসন্ন হাসি, যা দেখলেই মানুষের মন ভালো হয়ে যায়। পদ্মের পাপড়ির মতো তাঁর চোখদুটি স্নেহে ও প্রেমে সিক্ত।

বরেন্দ্রীর আখের সঙ্গে নিজের দেহের তুলনা তিনি আগেও শুনেছেন। আগে শুনলে বিস্মিত হতেন, আজকাল কৌতুক অনুভব করেন। হতেও পারে, বরেন্দ্রভূমির মাটি দিয়ে গড়া তাঁর শরীর, বরেন্দ্রীর বায়ু তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে, তাঁর প্রতিটি রক্তের ফোঁটায় করতোয়ার জলের শব্দ। তিনি বরেন্দ্রীর ঘরের ছেলে, বারেন্দ্রীর মহাবলী কেবট্ট, অর্থাৎ কৈবর্ত সমাজের প্রধানপুরুষ, এ নিয়ে চাপা গর্ব আছে তাঁর!

কৈবর্ত? সত্যিই কি তিনি কৈবর্ত?

মৃদু হাসলেন তিনি। নাহ, কারও প্রতি তাঁর কোনও অভিযোগ নেই। শাস্ত্রে বলে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে। বিধাতাপুরুষের বিধান ভাগ্যে নিয়েই প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, এ কথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। না হলে তাঁর সঙ্গেই বা এমন কেন হবে?

জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ তিনি, মহাপণ্ডিতবংশে তাঁর জন্ম। পূজাপাঠ ও অধ্যাপনায় জীবন কাটানোর কথা তাঁর, অথচ ভাগ্যের কী ফের! গণ্ডযোগে জাত বলে ব্রাহ্মণ পিতামাতা জন্মাবার পরেই ত্যাগ করেন তাঁকে। তাঁর কেবট্টজাতীয় ধাইকে আদেশ দেন দুধের পুত্তলিটিকে করতোয়ার খরস্রোতে ফেলে আসার জন্যে। গণ্ডযোগ জ্যোতিষমতে ভারি অশুভ যোগ কিনা!

মনে মনেই তিনি নিজের কৈবর্তমায়ের চরণবন্দনা করেন। দুধের পুত্তলিটির ওপর সেই ধাইমায়ের করুণা না-জন্মালে আজ তিনি বেঁচে থাকতেন না। সেই স্নেহদুগ্ধের ঋণ তাঁকে যে মায়ার রশিতে বেঁধে রেখেছে, তার থেকে মুক্তির কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি সিদ্ধ, তিনি জ্ঞানী, তিনি মুক্তপুরুষ। কিন্তু তিনি এই নশ্বর পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শের মধ্যেই নিজের মোক্ষ খুঁজে ফেরেন, তিনি জানেন যে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পথ তাঁর নয়। এই দেশ, দেশের মাটি, দেশের মানুষ—এসবই বড় প্রিয় তাঁর। দেশকে আরও ভালোভাবে জানবেন বলেই এই বিশাল ভারতদেশ তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। রাজপদপোজীবি থেকে নাগরিক সমাজ, আজীবিক থেকে তীর্থিক, যুদ্ধব্যবসায়ী থেকে বৌদ্ধ শ্রমণ—সমস্ত মতের, সমস্ত স্তরের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তবে তাঁর প্রকৃত অনুরাগী হচ্ছে দেশের নিম্নশ্রেণীর ব্রাত্য, অন্ত্যজ, শূদ্রজনেরা। শবর, হাড়ি, ডোম, ব্যাধ, পুলিন্দ—এদের কাছে তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের অবতার। এরাই তাঁর প্রকৃত আত্মজন। তাঁর কথায় এরা পারে না হেন কাজ নেই। তাঁদের কাছে তিনি বহু বিচিত্র নামে পরিচিত; গৌড়ীশদেব, শ্রী পিম্বলীদেব, শ্রী ভৈরবানন্দ, শ্রী ইন্দ্রানন্দদেব, আরও কত কী! তবে যে নামে তিনি সর্বত্র পরিচিত সেটি হচ্ছে...

অকস্মাৎ দূর থেকে ভেসে-আসা অস্পষ্ট কোলাহলের শব্দ! মাথা তুলে দূরে তাকালেন তিনি। দেখলেন—ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশে। নির্ঘাৎ আগুন লেগেছে নিকটবর্তী গ্রামে।

মুহূর্তে আলপথ ভেঙে শালিধানের চারাগুলির মধ্যে নেমে গেলেন। সর্পিলগতিতে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকলেন হতভাগ্য গ্রামটির দিকে।

৭০০ খ্রিস্টাব্দ। রাজসভা, কর্মান্তবাসক, বঙ্গদেশ।

প্রকাশ্য রাজসভায় দাঁড়িয়ে ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে থরথর করে কাঁপছিলেন মধ্যবয়সি ব্রাহ্মণপণ্ডিত। দরদর ঘামে ভেসে যাচ্ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহটি, মুখখানি অপমানে টকটকে লাল হয়ে আছে।

শুধু বঙ্গদেশ কেন, হরিকেল থেকে বারেন্দ্রী অবধি তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর প্রজ্ঞা, শীল এবং বিনয়ে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট রাজভট নিজে তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন রাজপণ্ডিত হিসেবে। সেই থেকে ধীরে ধীরে নিজের জ্ঞানে ও গুণে সর্বজনশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ নিতে আসেন মহামাত্য থেকে শুরু করে মহাসান্ধিবিগ্রহিক, দণ্ডপাশিক থেকে শুরু করে মহামাণ্ডলিক, কে নয়? আচরণে, জ্ঞানে, গরিমায়, প্রভাবে তিনি সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ রাজপণ্ডিত দয়িতবিষ্ণু। তাঁকেই প্রকাশ্য সভায় অসতীভর্তা বলে অপমান করলেন সম্রাট?

রাজসভা স্তব্ধ। প্রধান সেনাপতি প্রৌঢ় আনন্দদত্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন এই উদ্ধত সম্রাটের দিকে। বৃদ্ধ মহামাত্য বুদ্ধদাসের দুই চোখ বন্ধ। দণ্ডনায়ক বিশালকীর্তি বয়সে নবীন, দয়িতবিষ্ণুর প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে একজন সে। স্থির চোখে সেও দেখে যাচ্ছে এই উদ্ধত রাজার অসভ্যতা।

সপ্তাহ তিনেক হয়েছে, বঙ্গাধিপতি খড়্গরাজ রাজভটের দেহাবসান হয়েছে, তুষিতস্বর্গে স্থান পেয়েছেন তিনি। এই ইন্দ্রপতনে প্রায় একপক্ষকাল ধরে শোকপালন হয়েছে এই রাজ্যে। শ্রাদ্ধাদি সংস্কারের পর আজই রাজসভার প্রথম অধিবেশন।

সিংহাসনে বসেছেন নতুন সম্রাট, রাজভটপুত্র বলভট। প্রয়াত সম্রাটের আত্মার মঙ্গলকামনাসূচক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। সামন্ত, অমাত্য ও রাজকর্মচারীরা সবে আসন গ্রহণ করেছেন, এমন সময় সম্রাট জানান যে তাঁর কিছু বলার আছে। তাতে কেউই আশ্চর্য হয়নি, কারণ এটাই প্রথা। এই সময় সম্রাট সদ্ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও ত্রিরত্নের প্রতি আনুগত্যের কথা উচ্চারণ করেন। প্রবীণ রাজসভাসদ ও কর্মচারীদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে সকলে উদগ্রীব হয়ে রইলেন সম্রাট কী বলেন তা শোনার জন্যে।

সম্রাট প্রথমেই প্রথানুযায়ী ভগবান তথাগতে অবিচল আস্থার কথা জানালেন। পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। সভাসদদের আহ্বান জানালেন তাঁকে রাজ্যশাসনে সহায়তা করার জন্যে। আর তারপরেই হল সেই বিস্ফোরক ঘোষণা।

‘আমার মনে হয় যে,’ গম্ভীরস্বরে বললেন তিনি, ‘বৈদেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে আমাদের আরও যোগাযোগ বাড়ানো দরকার। যা পরিস্থিতি, তাতে অবশ্যই আমাদের এমন শক্তিশালী মিত্র প্রয়োজন, যিনি আমাদের ওপর শত্রুর আক্রমণ হলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারেন।’ এই বলে তিনি উদগ্রীব মুখগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, ‘আপনারা সকলেই জানেন যে তিব্বতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক অনেক দিনের। আমার মনে হয় তিব্বতই আমাদের সেই মিত্রশক্তি হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উত্তম পক্ষ। তাই আমি স্থির করেছি যে তিব্বতের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করব, এবং তার পরিবর্তে আমি তিব্বতীয় বণিকদের পূর্ব সমুদ্রপথে নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার দেব।’

সভা মুহূর্ত হতবাক হয়ে পড়ল। নবীনসম্রাট এতবড় একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কোনও সামন্ত, অমাত্য, বিষয়পতি—কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই? আর এর ফলে রাজস্বের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হবে তার পূরণ হবে কী করে? ভূম্যধিকারীদের ওপর আরও করভার চাপিয়ে? রাজসভা গুঞ্জনে ভরে উঠল।

তবে গুঞ্জন অবশ্য উঠেই থেমে গেল! কারণ রাজা পুনরায় বলতে শুরু করেছেন, ‘আমি এও স্থির করেছি যে, তিব্বতের সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্যে আমি আমার এক অতি বিশ্বাসভাজন সামন্তকে দ্বিতীয় রাজসচিব হিসেবে নিয়োগ করব।’

সভায় প্রবল বিস্ময় ও উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল। মহামাত্য আছেন, মহাসান্ধিবিগ্রহিক আছেন, রাজপণ্ডিত আছেন। এঁদের অগ্রাহ্য করে, অন্যান্য সামন্তদের সঙ্গে আলোচনা না-করে রাজসচিব নিয়োগ পুরোপুরিভাবে প্রথাবিরুদ্ধ কাজ। রাজসচিব প্রায় রাজার কাছাকাছি মর্যাদা পেয়ে থাকেন। সেই পদে রাজবংশের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসভাজন কোনও রাজপুরুষকে নিয়োগ করাই প্রথা। নইলে রাজ্যের

বিভিন্ন গোপন সংবাদ শত্রুদের হাতে চলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আর এখন গৌড় বা বঙ্গভূমির যা অবস্থা, সেখানে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাউকে অধিষ্ঠিত করার আগে দু'বার ভাবতে হয় বইকি!

প্রয়াত সম্রাট রাজভটের রাজসচিব ছিলেন তাঁর শ্যালক। ইনি জীবনের অনেকটা সময় মহাচীনে কাটিয়েছেন। রাজপুরুষদের মধ্যে কানাঘুষো আছে যে, ইনি মহাচীনের তাং শাসকবংশের, তথা তিব্বতের রাজসভার শক্তিশালী সামন্তচক্রের বিশেষ আস্থাভাজন। রাজসভার অধিকাংশ অমাত্যই এই মানুষটিকে অবিশ্বাসের চোখে দেখেন। কথাটা সম্রাট রাজভটের কানে উঠতে দেরি হয়নি। রাজভট বিচক্ষণ রাজা ছিলেন, তাই শ্যালকমশাইটি রাজকার্যে অনেক অনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলেও সম্রাট রাজভট তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না।

আজ উলটে গেছে পাশার দান, পালটে গেছে ক্ষমতার সমীকরণ। নবীন সম্রাটের ডানদিকে, সগৌরবে বসে আছেন বর্তমান সম্রাটের বিদেশীয় মাতুল, সম্রাট রাজভট যাঁর এদেশীয় নাম দিয়েছিলেন চারুদত্ত।

'আমি স্থির করেছি,' গম্ভীরস্বরে বলছিলেন সম্রাট, 'মাতুল শ্রীচারুদত্তকে এই তিব্বত দেশ সম্পর্কিত কাজে সাহায্য করার জন্যে আমাদেরই এক সামন্তকে দ্বিতীয় রাজসচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হবে।'

সভার সবার মনের কথা অনুমান করে সেনাপতি আনন্দদত্ত উঠে দাঁড়াতেই, সেদিকে তাকালেন সম্রাট, 'সেনাপ্রধান কিছু বলবেন মনে হচ্ছে।'

'সম্রাট, আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্তদুটি গ্রহণ করার আগে আপনার একবার গুরুত্বপূর্ণ অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ সেটাই প্রথা, রাজন। আপনার পিতা, প্রয়াত সম্রাটও সভাসদদের পরামর্শ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত...'

'আপনি কী বলতে চাইছেন আনন্দদত্ত? রাজার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই? নিজের পছন্দের কাউকে কোনও রাজপদে নিয়োগ করার অধিকার নেই?'

কোনও সম্মানসূচক সম্বোধন ছাড়াই রাজার মুখে 'আনন্দদত্ত' শুনে একবার দাঁতে দাঁত ঘষলেন সেনাপতি। ছেলের বয়সি এই যুবরাজকে তিনি নিজে ছোটবেলা থেকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। নিজের হাতে ধনুর্বিদ্যা শিখিয়েছেন, শিখিয়েছেন তরবারি-চালনা, শিখিয়েছেন নারাচ ও ভল্লের ব্যবহার। এমনকি যুবরাজের প্রাথমিক রাজনীতির পাঠও তাঁরই হাতে। আজ সেই নবীন তরুণ প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করছে? রাজা হয়েই ধরাকে সরাজ্ঞান করে সে, এতদূর স্পর্ধা?

গোপনে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কে জানে, হয়তো তাঁরই শিক্ষাদানে কিছু ভুল রয়ে গিয়ে থাকবে। ধীরে ধীরে পিছু হঠে নিজের আসনে বসলেন আনন্দদত্ত।

উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ মহামাত্য বুদ্ধদাস। ইনি শুধু সম্রাট রাজভট নন, বর্তমান সম্রাটের পিতামহ দেবখড়্গের সময় থেকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন।

'রাজন, এই বৃদ্ধ অমাত্যের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনার বক্তব্য যথার্থ, রাজ্যের বিষয়ে রাজার ইচ্ছেই শেষ কথা। তবুও...' এইপর্যন্ত বলে একটুখানির জন্য চুপ রইলেন সেই অমাত্য।

'তবুও কী, মহামাত্য বুদ্ধদাস?' অসহিষ্ণুস্বরে প্রশ্ন করলেন সম্রাট।

'রাজন, আপনি বয়সে নবীন, আজই আপনার অভিষেক ঘটেছে। আশা করি পরম কারুণিক তথাগতের ইচ্ছায় আপনি নিশ্চয়ই একদিন রাজচক্রবর্তী হবেন, সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হবেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে সময় বড়ই বলবান। আমি অনুরোধ করব, উপযুক্ত সময় না-আসা অবধি সম্রাট তাঁর বৃদ্ধ অমাত্যদের বিপুল অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করবেন। প্রয়াত সম্রাটও কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা তথা আনুগত্যের...'

'আনুগত্য? হা হা হা, পথের কুকুরকে একের পর এক মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিতে থাকলে তারও আনুগত্য কিনে নেওয়া সম্ভব মহামাত্য। এতে আর আশ্চর্য কী? আনুগত্য দিয়ে কী প্রমাণ হয়?' অসংলগ্ন

স্বরে হেসে উঠলেন বলভট।

এই ইতর অপমানে নীল হয়ে গেলেন মহামাত্য বুদ্ধদাস। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সভায় ক্ষুব্ধ গুঞ্জন ঝড়ের মতো বেড়ে উঠল। প্রবীণ অমাত্যদের সঙ্গে এ কেমন ব্যবহার সম্রাটের? এঁরা তো ভুল কিছু বলেননি। সম্রাট কি উন্মাদ হয়ে গেছেন?

তবে আবারও তাড়াতাড়িই থেমে গেল সেই গুঞ্জন। কারণ উঠে দাঁড়িয়েছেন রাজপণ্ডিত দয়িতবিষ্ণু।

'রাজাজ্ঞা শিরোধার্য বটে।' গমগম করে উঠল সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু মহারাজ, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিকর। আমরা আপনার অন্নদাস বটে, ক্রীতদাস নই। আপনি আমাদের অনুরোধ বা পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু এইভাবে অপমান করতে পারেন না।' বলতে বলতে দয়িতবিষ্ণু লক্ষ করছিলেন যে সম্রাটের চোখ অস্বাভাবিক রকমের লাল, সামান্য টলছেন।'

'তাই নাকি রাজপণ্ডিত?' গরগর করে উঠলেন বলভট।

'আমি সম্রাটকে অনুরোধ করব, গুরুত্বপূর্ণ অমাত্যদের প্রকাশ্যে অপমান করার আগে তিনি যেন একবার রাষ্ট্রনীতি এবং কূটনীতির মূলমন্ত্রগুলি স্মরণ করেন। মহামতি চাণক্য বলেছেন যে মুখ্য রাজপুরুষদের অসন্তুষ্ট করে কোনও শাসকই...'

'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?' রাগে থমথম করছে সম্রাটের মুখ। দয়িতবিষ্ণুর সন্দেহ হয় যে ইনি প্রকৃতিস্থ নন।

'না রাজন। শুধুমাত্র রাজ্যশাসনের নীতিগুলি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। সম্রাট কী জানেন পূর্বসমুদ্রপথে তিব্বতীয় বা অন্য বিদেশীয় বণিকদের নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার দেওয়ার অর্থ কী?'

'তুমিই বলো হে দয়িতবিষ্ণু, আমরা শুনি।' খানিকটা উপহাসই ছুঁড়ে দিলেন চারুদত্ত।

চারুদত্তকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন দয়িতবিষ্ণু। সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে একবার শৌল্কিক তথা বিষয়পতিদের সঙ্গে আলাপ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন আপনি? এর ফলে দেশের রাজস্বসংগ্রহ কী বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে বিষয়ে কোনও ধারণা কি শ্রদ্ধেয় রাজসচিব চারুদত্ত আপনাকে দিয়েছেন?'

'দেখো পণ্ডিত, নিজেকে বেশি চালাক মনে করো না।' চারুদত্ত, তপ্তস্বরে বলে উঠলেন, 'তুমি যদি মনে করো যে বিদেশনীতি আর বাণিজ্যের তুমিই সব বোঝ...'

হাত তুলে চারুদত্তকে নিরস্ত করলেন দয়িতবিষ্ণু, 'সম্রাট কী লক্ষ করেছেন যে, গত বেশ কয়েক দশক ধরে রাজকোষে বাণিজ্যিক করের পরিমাণ কী ভাবে কমে এসেছে? নব্যাবকাশিকানগর, কোটিবর্ষ, একের পর এক জলবন্দর বন্ধ হয়ে গেছে নাব্যতার অভাবে। তাম্রলিপ্তর মতো বিখ্যাত বন্দর ধুঁকছে। তার ওপর সুদূর প্রতীচ্যে যেখানে আমাদের বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত, সেই সুবিশাল রোমক সাম্রাজ্যের আজ চিহ্নমাত্র নেই। কী হতে চলেছে ভবিষ্যত?' একটানে এতটা বলে হাঁপাচ্ছিলেন দয়িতবিষ্ণু।

'তাতে কী হয়েছে? আমাদের রাজস্বের পরিমাণ তো কমেনি,' বললেন সম্রাট বলভট।

মৃদু হাসলেন দয়িতবিষ্ণু, 'কেন কমেনি সে কথাটাও কি ভেবে দেখেছেন রাজন? আমাদের সদ্যপ্রয়াত সম্রাটও তো তিব্বতের প্রতি বিশেষ মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন, তবুও তিনি কেন তিব্বতীয় বণিকদের এই বিশেষ সুবিধা দান করেননি? কী তার কারণ?'

'বাজে কথা কম বলো হে পণ্ডিত! তুমি কী মনে করো, সম্রাটের থেকে তুমি বেশি বোঝ?' ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন চারুদত্ত।

চারুদত্তকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন দয়িতবিষ্ণু। তিনি বুঝতে পারছিলেন, কাল রাত্রেই যে গভীর ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলেন নিজের স্ত্রীকে, তা শিকড় ছড়াতে শুরু করেছে। এসব তারই লক্ষণ। তবে সে এত দ্রুত শুরু করবে, ভাবেননি তিনি।

এই যুদ্ধ আজ জিততে হবে তাঁকে, যে কোনও মূল্যে। নইলে দেশের সামনে সমূহ বিপদ। চোয়াল শক্ত করলেন দয়িতবিষ্ণু।

রাজন, আপনার প্রশ্নেরই উত্তর দিই আগে। বাণিজ্যিক করের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে কমে এলেও রাজস্বের পরিমাণ না কমার কারণ কি জানেন? কারণ এই ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে ভূমিজ রাজস্ব থেকে। ক্রমেই আমরা ভূমির ওপর করের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি। আর তার ফলে নাভিশ্বাস উঠছে দেশের কৃষক ও ভূমিদাসদের। ফলে দিকে দিকে বেড়ে উঠছে প্রবল অসন্তোষ...'

'তার সঙ্গে তিব্বতীয় বণিকদের পূর্ব সমুদ্রে নিঃশুল্ক বাণিজ্যের অধিকার দিতে তোমার আপত্তির কারণ কি জানতে পারি, অ্যাঁ?' তড়বড় করে উঠলেন চারুদত্ত, 'সম্রাট চাইছেন তিব্বতের সঙ্গে মিত্রতা বাড়াতে, ব্যস। রাজার ইচ্ছেই শেষ কথা! এখানে ওইসব ছোটলোক কৃষকদের কথা টেনে আনছ কেন?'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।' মুখে কৃত্রিম আক্ষেপের চুকচুক আওয়াজ করলেন দয়িতবিষ্ণু। 'তিব্বতের লোক আপনি, বঙ্গভূমির কৃষকদের জন্যে আপনার কীসের চিন্তা চারুদত্ত? হাজার হোক, এ তো আর আপনার নিজের দেশ তিব্বত নয়!'

'না না, কথাটা আমি ওভাবে বলতে চাইনি, হেঁ-হেঁ।' প্রগলভ হাসি দিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করছিলেন রাজসচিব।

'তা আমাকে একটা কথা বলুন তো চারুদত্ত! তিব্বতের সঙ্গে মিত্রতা বাড়াবার জন্যে তো আপনিই যথেষ্ঠ ছিলেন। একে আপনি ওই দেশের লোক, তার ওপর প্রয়াত সম্রাটের শ্যালক, বর্তমান সম্রাটের মাতুল। আপনি থাকতে হঠাৎ অন্য লোক কেন? তিব্বতের মহামন্ত্রী তিরিলিং কি আপনার ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না?'

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠলেন চারুদত্ত। তাঁকে দেখলে মনে হচ্ছিল রাজসভা না-হলে বোধহয় এখানেই দাঁত নখ বার করে দয়িতবিষ্ণুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। তাঁর হাত ধরে ফেললেন সম্রাট বলভট।

'তা এখন কি আমরা আপনার প্রস্তাবিত রাজসচিবের পরিচয় জানতে পারি রাজন?' সামান্য লঘুস্বরেই প্রশ্ন করলেন দয়িতবিষ্ণু।

'হ্যাঁ, অতি অবশ্যই পারেন। আমি চন্দ্রবংশের প্রকাশচন্দ্রকে এই পদে নিয়োগ করতে চাই।' যন্ত্রের মতো বললেন বলভট।

নামটি শোনামাত্র রাজসভায় আবার বিপুল গুঞ্জন উঠল। এবার তা দ্বিগুণ উচ্চকিত।

চন্দ্রবংশ হরিকেলের এক অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও প্রতাপশালী সামন্তবংশ। এমন দুর্দ্ধর্ষ সামন্তবংশকে বশে রাখতে সম্রাট রাজভটকেও যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। তাদেরই একজনকে, সভার বিনা অনুমোদনে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করছেন নবীন সম্রাট? এতে খড়্গবংশের সার্বভৌমত্বের ওপর কী কঠিন আঘাত আসতে পারে, সে বিষয়ে এই অনভিজ্ঞ সম্রাটের কোনও ধারণা আছে? তার ওপর প্রকাশচন্দ্র? যাঁর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার ব্যাপারে সত্যিমিথ্যে অনেক রটনা ভেসে বেড়ায় এই দেশের বাতাসে?

'প্রকাশচন্দ্র!' রাজপণ্ডিত দয়িতবিষ্ণুর স্বরে ফুটে ওঠে বিহ্বলতা। তিনি জানতেন যে অপরপক্ষ অতি যত্নে সাজাচ্ছে তাদের ঘুঁটি। অনুমান করেছিলেন যে এই পাশাখেলায় একটা অভাবনীয় দান আসতে চলেছে তাঁদের সামনে। কিন্তু শত্রুপক্ষ যে হঠাৎ করে এই চাল চালবে সেটা স্বপ্নেও ভাবেননি।

'আমাদের রাজপণ্ডিতের মনে হচ্ছে সামন্ত প্রকাশচন্দ্রকে নিয়ে কোনও আপত্তি আছে?' সম্রাটের সুরে ব্যঙ্গের ছাপ স্পষ্ট।

'হ্যাঁ সম্রাট, আছে।' বিহ্বল ভাব ঝেড়ে স্বাভাবিক হলেন দয়িতবিষ্ণু।

'আছে? বাঃ-বাঃ। রাজপণ্ডিত তাহলে কূটনীতিও বুঝছেন আজকাল?'

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলেন দয়িতবিষ্ণু। কতই বা বয়েস এই যুবকের? এই তো সেদিনও তাঁর কাছে বসে বিদ্যালাভ করেছে এই কুমার। তখনও কিন্তু তার ব্যবহারে এই উগ্রতা, এই অশালীন আচরণ এত প্রকট হয়ে ওঠেনি। তখন তো এই কিশোরকে নিয়ে অনেক আশাও পোষণ করতেন তিনি। ভাবতেন যে এই যুবক একদিন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শৌর্যে বিশালকীর্তি হবে। এমনকী এই গোপন আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনের মধ্যে ছিল যে, তাঁকে রাজপথে যেতে দেখে রাজ্যের বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে—ওই দেখো, ওই যে প্রৌঢ়কে দেখছ পায়ে হেঁটে সর্বাণীদেবীর মন্দিরে পুজো দিতে যেতে, তিনিই মহান সম্রাট বলভটের শিক্ষাগুরু আচার্য দয়িতবিষ্ণু!

কিন্তু সেই শিশুটি যতই বড় হতে থাকল, ততই যেন তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকল সে। ধীরে ধীরে দেখতে পেলেন দয়িতবিষ্ণু, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বদলে যাচ্ছে সেই বুদ্ধিমান, বিনয়ী কিশোরটি। সারাদিন সে ব্যস্ত থাকে অবিরাম মদ্যপানে। রাতদিন আমোদ-প্রমোদ ছাড়া মন ওঠে না তার। রাজনর্তকী আর নগরনটী ছাড়া দিনই কাটে না! তার সাম্প্রতিক অসুস্থতার কথাও জানেন তিনি। হাতে-গোনা যে কয়েকজনের কাছে সম্রাট রাজভট মনের দুঃখের কথা খুলে বলতেন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। সেই সময়ে এই চারুদত্তকে দেখেছেন রাজকুমারকে সবসময় আগলে আগলে রাখতে।

'সম্রাটের বেতনভুক কর্মচারী আমি, তাই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য। সবিনয়ে জানাই যে বর্তমান সম্রাটের ভূতপূর্ব এই শিক্ষক রাষ্ট্রনীতি তথা কূটনীতিতেও সামান্য কিছু জ্ঞানের অধিকারী। শুধু প্রয়াত সম্রাট কেন, রাজ্যের মহামাত্য, মহামাণ্ডলিক, দণ্ডনায়ক, এমনকী বিশিষ্ট ভুক্তিপতিরাও এই ব্রাহ্মণের মতামতে বিশেষ আস্থা রেখে থাকেন। তাই কূটনীতি বুঝি না বলাটা চরম ধৃষ্টতা হয়ে যাবে যে সম্রাট।'

'বটে? তা আপনার আপত্তির কারণগুলি জানাতে আপত্তি আছে নাকি?'

অসম্মানটা গায়ে মাখলেন না দয়িতবিষ্ণু। মুখে স্মিত হাসিটি টেনে বললেন, 'আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না সম্রাট! আপনাকে সঠিক পরামর্শ দেওয়াই তো আমাদের পবিত্র কর্তব্য...'

'আঃ, বড় বাজে বকছ হে ব্রাহ্মণ! কাজের কথাটা ঝটপট বলে ফেলো তো দেখি!' রাজসচিব চারুদত্ত বললেন।

অতি কষ্টে নিজের রাগ সামলালেন দয়িতবিষ্ণু। এককালে এই দ্বিপদ প্রাণীটিকে তিনি ও অন্যান্য অমাত্যরা উপেক্ষাই করতেন। আজ ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়েছে, আজ এর দাপট সইতেই হবে!

'তার কারণ সামন্ত প্রকাশচন্দ্রের এই দেশ তথা খড়্গবংশের প্রতি আনুগত্য নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে রাজন। ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ইনি এই রাজ্যে চন্দ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান। কথাগুলো গোপন সভাতেই আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু মহারাজ আমাকে বাধ্য করলেন প্রকাশ্য সভায় এই বক্তব্য রাখতে।'

ভ্রূকুঞ্চন করলেন সম্রাট বলভট, 'আপনার এই অযথা অভিযোগের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে?'

'আছে সম্রাট। আপনি কি জানেন প্রকাশচন্দ্র প্রথম জীবনে কোথায় ছিলেন? কী করছিলেন?'

'সে কাহিনি বোধহয় অনেকেই জানি পণ্ডিত। তোমাকে আবার ব্যাখ্যা করে বলতে হবে নাকি?'

ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল দয়িতবিষ্ণুর মুখে, 'বেশ বেশ। রাজসচিব যখন বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চাইছেন না তাহলে বর্তমানকালেই ফিরে আসা যাক। মহামান্য সম্রাট কি জানেন বিগত কয়েক বছর প্রকাশচন্দ্র কোথায় ছিলেন? আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে হরিকেলে ফিরে আসার ঠিক পূর্বে কোথায় ছিলেন তিনি?'

'কোনও এক মহাবিহারে ছিলেন বলে জানি, অধ্যাপনা অথবা...'—মনে করার চেষ্টা করতে থাকেন সম্রাট বলভট।

‘কোন মহাবিহার? নালন্দা নয়, রক্তমৃত্তিকা নয়, এমনকী ভাসু বিহারও নয়। কোন মহাবিহারে অধ্যাপনা করছিলেন প্রকাশচন্দ্র?’

সম্রাট চুপ করে থাকেন। চারুদত্তের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে থাকে।

দয়িতবিষ্ণুর কণ্ঠ আরও খর হয়ে ওঠে, ‘দীর্ঘদিন অদর্শনের পর প্রকাশচন্দ্র যে বিজাতীয় নারীটিকে নিয়ে ফিরেছেন তিনি কোন দেশের বা কোন জাতির, অথবা তাঁর বংশপরিচয় কী, এসব জানেন রাজন?’

‘অন্যের পরিবার নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা আমি রুচিবিকারের লক্ষণ বলে মনে করি।’ গম্ভীরস্বরে বললেন সম্রাট।

‘প্রকাশচন্দ্র সাধারণ কেউ হলে এই প্রশ্ন উঠত না রাজন। কিন্তু যিনি মহারাজসচিবের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হতে চলেছেন, তাঁর কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন, ইতিহাস, সবকিছুই পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখা উচিত। নইলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায় সম্রাট,’ বলতে থাকলেন দয়িতবিষ্ণু, ‘কে এই বিদেশীয় নারী? কী তার ইতিহাস? প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর উদ্বাহসংস্কারহীন কীসের সম্পর্ক?’

‘শুনেছি ইনি প্রকাশচন্দ্রের সাধনসঙ্গিনী!’ চারুদত্তর স্বরে স্পষ্টতই অস্বস্তি।

‘সাধনসঙ্গিনী!’ ব্যঙ্গের হাসি চওড়া হল দয়িতবিষ্ণুর মুখে, ‘কীসের সাধন রাজসচিব?’

ঘামতে থাকেন চারুদত্ত। হা ঈশ্বর, লভ্যাংশের এক দশমাংশ... এত কাছে এসেও অধরা থেকে যাবে?

‘রাজসচিবের নীরবতাই আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছে!’ বলতে থাকেন দয়িতবিষ্ণু, ‘আপাতত আমার মূল বক্তব্যে ফিরি। শুনুন রাজন, আমার কাছে নিশ্চিত প্রমাণ আছে যে ইনি সেই সময়ে তিব্বতে অবস্থান করছিলেন।’

‘তাতে কী প্রমাণ হয় পণ্ডিত? তিব্বতে যাওয়া বা থাকা পাপ? নাকি বঙ্গবাসীদের পক্ষে তিব্বতযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে?’

‘না রাজন। তিব্বতের সঙ্গে আমাদের এতদিনের সুসম্পর্ক, আমাদের মিত্ররাজ্য তিব্বত, সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ হবে কেন? তা এমন মিত্ররাজ্যে এঁকে এত গোপনে কেন যেতে হয়েছিল, সেই নিয়ে কিছু বলবেন নাকি মিত্র চারুদত্ত? তার ওপর সেক্ষেত্রে মহাবিহারে অধ্যয়ন করার মিথ্যা কাহিনিটিই বা প্রচার করতে হল কেন? প্রশ্ন আরও আছে সম্রাট। আপনি কি জানেন যে ইনি তিব্বতে কোথায় অবস্থান করছিলেন?’

‘তার সঙ্গে প্রকাশচন্দ্রের রাজসচিব হিসেবে নিয়োগের কী সম্পর্ক?’

‘অবশ্যই সম্পর্ক আছে রাজন! আমাদের কাছে নিশ্চিত সংবাদ আছে যে, ইনি গোপনে তিব্বতের মহামন্ত্রী তিরিলিং-এর বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন।’

‘তাতে আপত্তির কী আছে? বঙ্গদেশের অন্যতম প্রভাবশালী সামন্তকে তিব্বতের মহামন্ত্রী আতিথ্য দিয়েছেন, এ তো ভালো কথা।’ সতর্কস্বরে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করেন চারুদত্ত।

‘বটেই তো।’ শত্রুকে বাগে পেয়েছেন দয়িতবিষ্ণু, ‘তা অমন প্রভাবশালী সামন্তবংশের উত্তরাধিকারী তিব্বতে গেছেন, সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে অবস্থান করেছেন, অথচ সে ব্যাপারে তিব্বতনৃপতি ঠিদু স্রোংচান কিছু জানেন না কেন—সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন নাকি চারুদত্ত?’

‘আপনার কথা ক্রমশই অবোধ্য হয়ে উঠছে, পণ্ডিত। প্রকাশচন্দ্র কোথায় যাবেন আর যাবেন না, কোথায় থাকবেন আর থাকবেন না—সে ব্যাপারে আপনার এত কৌতূহল কেন?’ বিরক্তস্বরে প্রশ্ন করেন সম্রাট বলভট।

‘তিব্বতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কী চলছে, সে কথা আপনার জানা থাকলে আজ এই প্রশ্ন তুলতেন না সম্রাট।’ উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকেন দয়িতবিষ্ণু, ‘তিব্বতের মহামন্ত্রী তিরিলিং আসলে গার পরিবারের

মহাসামন্ত। এই গার পরিবার তিব্বতের রাজনীতিতে অতি ক্ষমতাশালী পরিবার, একসময়ে তাদের হাতেই ছিল তিব্বতের প্রকৃত শাসনক্ষমতা।'

'তাহলে তো সামন্ত প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে মন্ত্রী তিরিলিং-এর সুসম্পর্ক আমাদের জন্যে আরও সুখবর, পণ্ডিত!' বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করেন সম্রাট বলভট।

'আজ্ঞে না সম্রাট! ওই জন্যেই বলেছিলাম—তিব্বতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানলে আপনি এই মন্তব্য করতেন না। বুঝতে পারতেন, প্রকাশচন্দ্রকে রাজসচিব পদে নিয়োগ করার তাৎপর্য কী। এখন যিনি তিব্বতনরেশ, সেই ঠিদু স্রোংচান মহা শক্তিশালী পুরুষ, মহাচীন অবধি কাঁপছে তাঁর ভয়ে। তিনি চান তিব্বতের যাবতীয় কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিতে। তাঁর সঙ্গে তিব্বতের সামন্তশ্রেণী এবং তাদের অধিনায়ক মন্ত্রী তিরিলিং-এর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

'তাতে আমাদের অসুবিধা বা আপত্তির কারণ কী পণ্ডিত?' স্খলিতস্বরে প্রশ্ন করতে করতে চারুদত্তের বাড়িয়ে দেওয়া চামড়ার বটুয়ার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুই আঙুলে সাদা রঙের গুঁড়ো চিমটি-ভর তুলে নিজের মুখের মধ্যে ফেললেন সম্রাট বলভট।

সেই বটুয়াটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন দয়িতবিষ্ণু। এরই কথা রাজবৈদ্য চন্দ্রসার তাঁকে বলছিলেন বটে! তিনি একবার চারুদত্তকে দেখে ফেলেছিলেন অতি গোপনে এই বটুয়া রাজকুমারের হাতে তুলে দিতে। তারপরেই নাকি রাজকুমার হঠাৎ অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠেন। পরে চারুদত্তকে এই নিয়ে প্রশ্ন করাতে মহাক্রুদ্ধ হন চারুদত্ত।

কী আছে ওই বটুয়াতে? কীসের ভস্ম ওটা?

'তাতে আমাদের আপত্তির কারণ একটাই সম্রাট। সম্রাট ঠিদু স্রোংচান সদ্ধর্মের অনুগামী, আর মন্ত্রী তিরিলিং তিব্বতীয় পোন ধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। একে তিনি তীব্র বৌদ্ধবিদ্বেষী মানুষ, তার ওপর একই কারণে তিনি ভারতবিরোধীও বটে। এমন শত্রুপক্ষের বাড়িতে আমাদের নবনিযুক্ত রাজসচিব টানা এক বছরের জন্যে গোপনে আতিথ্য নিলে তা আমাদের পক্ষে চিন্তার কার বইকি!'

'সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ রাজপণ্ডিত দয়িতবিষ্ণু আমার ব্যাপারে এত সংবাদ রাখেন জেনে অত্যন্ত প্রীত বোধ করছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য!'

প্রত্যেকের দৃষ্টি চলে যায় রাজসভার প্রবেশপথের দিকে। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ।

প্রকাশচন্দ্র!

সভায় মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত টানটান পরিস্থিতি তৈরি হল। সভার প্রত্যেকে তাকিয়ে রইলেন এই বিশালদেহী ও বলশালী পুরুষটির দিকে। তাঁর উঁচু কপাল আর চওড়া কাঁধে ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। তবে মানুষটির আসল বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখ দুটিতে। সেই চোখ দুটির দিকে তাকালেই মনে হয়—এত স্থির, এত ক্রূর, এত হিমায়িত দৃষ্টি পার্থিব জগতে খুব কম দেখা যায়।

দ্রুত ও দীর্ঘ পদক্ষেপে সভার দরজা থেকে সিংহাসন অবধি পথটি অতিক্রম করলেন প্রকাশচন্দ্র। নত হয়ে অভিবাদন করলেন সম্রাট বলভটকে। সম্রাট বলভট তাঁকে নিজের পাশের আসনে বসতে ইঙ্গিত করলে আসন গ্রহণ করলেন প্রকাশচন্দ্র। তারপর স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন দয়িতবিষ্ণু, আমার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ উত্থাপিত করছিলেন যেন?'

এতক্ষণ অবধি এই দ্বৈরথসমরে জিতে যাওয়ার আশা করছিলেন দয়িতবিষ্ণু। কিন্তু নাহ, আর বোধহয় শেষরক্ষা হল না। এই প্রথম তিনি উপলব্ধি করলেন যে ভাগ্যের চাকা তাঁর বিপক্ষে গড়াতে শুরু করেছে। বিজয়লক্ষ্মী ছেড়ে যাচ্ছেন তাঁর পক্ষ।

দুচোখ বন্ধ করে মনে মনে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন তিনি, 'মঙ্গলম্ ভগবান বিষ্ণু, মঙ্গলম্ গড়ুরধ্বজ, মঙ্গলম্ পুণ্ডরীকাক্ষ, মঙ্গলায় তনো হরিঃ।'

সমস্ত স্নায়ু সংহত করে এবার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলেন তিনি।

'প্রকাশচন্দ্র, আপনি কি জানাবেন যে, তিব্বতে মন্ত্রী তিরিলিং-এর আতিথ্য উপভোগ করার সময় পোন ধর্মের ঠিক কোন কোন প্রেতসাধনা আর জাদুবিদ্যা শিখেছেন?' প্রথম আঘাত তিনিই শুরু করলেন। শাস্ত্রে বলে—আক্রমণই প্রতিরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায়।

মৃদু হাসলেন প্রকাশচন্দ্র, 'যদি করেই থাকি, তাতে আপনার উষ্মার কারণ কী দয়িতবিষ্ণু?'

'উষ্মার কারণ আছে প্রকাশচন্দ্র। কারণ আমাদের কাছে সংবাদ আছে যে পোন ধর্মের সমস্ত বিকৃত, ঘৃণ্য, অশ্লীল প্রথাগুলিকে আপনি সদ্ধর্মের মূল আচারগুলির সঙ্গে সুকৌশলে মিশ্রিত করে তন্ত্রের নামে এক কুৎসিত সাধনপদ্ধতির সৃষ্টি করছেন। আপনি আসার পর থেকে হরিকেলের বিপুল অঞ্চলে আজ অবাধে মদ্যপান, যৌথ যৌনসঙ্গম, নরবলির মতো অসভ্য ও নৃশংস আচার ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পোন পুরোহিতদের পূজ্য বন্য, অসভ্য এবং বীভৎস মূর্তিগুলি এনে আপনি...'

'চুপ করো পণ্ডিত, তোমার এতদূর সাহস যে আমাদের পোন ধর্মের দেবদেবীদের গালি দাও? তোমার ওই নোংরা জিভ একটানে ছিঁড়ে ফেলব আমি।' ক্রোধে কাঁপছিলেন চারুদত্ত।

ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি খেলে যায় দয়িতবিষ্ণুর, 'যাক, রাজসচিব চারুদত্ত শেষ পর্যন্ত তাহলে স্বীকার করলেন যে উনি বৌদ্ধ নন, উনি আসলে পোন ধর্মের অনুসারী! বাঃ বাঃ! এতদিন ধরে অনেক কষ্টে বৌদ্ধ হওয়ার অভিনয় করেছেন আপনি হে রাজসচিব। আপনার এই অবিশ্বাস্য অভিনয় প্রতিভা আমার সশ্রদ্ধ সম্মান দাবি করে!' এই বলে আভূমি প্রণত হওয়ার ভান করলেন দয়িতবিষ্ণু।

সমগ্র রাজসভা পটে আঁকা ছবিটির মতো স্থির হয়ে আছে। এতবছর ধরে এতবড় মিথ্যাচার করে এসেছেন রাজসচিব? তিনি বৌদ্ধ নন? এই অপরাধে তো শিরচ্ছেদ হওয়া উচিত।

কিন্তু সে দায়িত্ব নেবে কে? সম্রাট বলভটের চোখ আরও ঘোলাটে হয়ে আসছে, চারুদত্তের মুখে আতঙ্কের আর অপ্রস্তুত হওয়ার ছাপ স্পষ্ট। এই সময় হাল ধরলেন প্রকাশচন্দ্র।

'আপনি সনাতন ধর্মাবলম্বী, পণ্ডিত। আপনাদের সনাতন ধর্মে যেমন সৌর, গাণপত্য, শৈব ইত্যকার বিভেদ আছে, তেমন আমাদের সদ্ধর্মেও বিভিন্ন ধর্মমত আছে পণ্ডিত। মহাচার্য অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর যোগাচারবিজ্ঞান অনুযায়ী...'

'পাপ মুখে ও-দুটি নাম উচ্চারণ করবেন না প্রকাশচন্দ্র', ক্রুদ্ধ সিংহের মতো রুষে উঠলেন দয়িতবিষ্ণু, 'আপনি ও আপনার সাঙ্গোপাঙ্গদের প্রচারিত পাপাচারগুলোকে আপনারা যোগাচারবিজ্ঞান বলতে চান? বৌদ্ধ দর্শনের এই বিকৃতি ঘটাবেন বলেই তিব্বত থেকে প্রেতসাধনা শিখে এসেছেন আপনি? দশকুশলের পরিবর্তে অপরিমিত মদ্যপান? প্রজ্ঞা ও উপায়ের নামে অন্যের কুলবধূ নিয়ে উদ্দাম যৌনচক্র? নির্বাণের পরিবর্তে নরবলি?'

'আহ, পণ্ডিত, চুপ করো!' চারুদত্তের এগিয়ে দেওয়া বটুয়া থেকে আরও এক চিমটি সাদা গুঁড়ো মুখে ফেলে গর্জে ওঠেন সম্রাট। আপনি-টাপনি নয়, এবার সরাসরি তুমিতে নেমে এসেছেন।

সমস্ত রাজসভায় যেন একটি পালক পড়লেও শব্দ শোনা যাবে এমন স্তব্ধতা। এ কী অভিযোগ তুললেন দয়িতবিষ্ণু?

'ধর্মের কথা থাক পণ্ডিত, সে বিচার রাজা করবেন। আর আপনি তো ধর্মে বৈষ্ণব, সনাতনপন্থী। সদ্ধর্মের গতি নিয়ে আপনি এত চিন্তিত কেন?' চারুদত্ত প্রশ্ন করলেন। একটু, আর একটুখানি। জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করেছেন।

'কারণ ধর্মই শাসনক্ষমতা অধিকারের অন্যতম অস্ত্র। আমি মনে করি এই দেশে তন্ত্রের নামে পোন ধর্মের যাবতীয় পাপাচার আর বীভৎস দেবদেবীর মূর্তিপূজা প্রচলন করে প্রকাশচন্দ্র আসলে চান সদ্ধর্মের সর্বনাশ করতে, চান এই দেশের রাজসিংহাসন দখল করতে। তাঁকে সম্পূর্ণভাবে মদত দিচ্ছেন তিব্বতের

সামন্তপ্রভুরা আর চৈনিক বৌদ্ধরা। তাঁরা চান বঙ্গদেশ দুর্বল হোক, তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খর্ব হোক।'

'তাই নাকি পণ্ডিত? এটাই কারণ? নাকি এই দেশের রাজসিংহাসন আপনিই দখল করতে চান বলে এসব গালগল্প শোনাচ্ছেন আমাদের?' শান্ত ও শীতলস্বরে প্রশ্ন করেন প্রকাশচন্দ্র।

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে যান দয়িতবিষ্ণু। আকস্মিক এই অভিযোগের কারণ? এই আক্রমণের উৎস অনুমান করতে পারছিলেন। কিন্তু...কিন্তু সেসব তো এদের জানার কথা নয়!

'এর মানে কী প্রকাশচন্দ্র?'

'বটে? এর কারণ কী—সেটা বুঝতে পারছ না তুমি?' দাঁতে দাঁত ঘষলেন সম্রাট বলভট, 'ও হে অসতীভর্তা, তোমার নিজের পত্নী অন্যের অঙ্কশায়িনী হওয়ার সময়ে তুমি সেটা বুঝতে পারো তো?'

উজ্জ্বল রাজসভায় যেন হঠাৎই বিস্ফোরিত হল একরাশ গাঢ় অন্ধকার। এক ফেনিল অন্ধ আবর্তে, গহীন নিঃসীমতার মধ্যে, অনন্ত হাহাকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল সব। তার আদি নেই, অন্ত নেই, ঊর্ধ্ব নেই, অধঃ নেই।

'কী হে পণ্ডিত, চুপ করে আছ কেন? নাকি তোমার স্ত্রী তোমার অনুমতি নিয়েই আমার পিতার শয্যার শোভা বাড়াতে গেছিলেন?'

'রাজন, স্তব্ধ হন! এই কুবাক্য আপনার মুখে শোভা পায় না। মনে রাখবেন আপনি খড়্গবংশের মহান নৃপতি রাজভটের সন্তান। আমি শুধু রাজপণ্ডিতই নই, আপনার পিতার প্রিয় বয়স্যও বটে। আমার প্রতি এমন গর্হিত আচরণ...'

'থামো হে কুচক্রী ব্রাহ্মণ, নপুংসক বিট। নিজের স্ত্রীকে উপহার দিয়ে যে নিজের প্রভুর প্রিয় হতে চায়, তার সঙ্গে কার তুলনা চলে জানো? দেহোপজীবিনীর দ্বাররক্ষীর!' হিসহিস করে উঠল বলভটের বেপথু কণ্ঠস্বর।

মুহূর্তের জন্যে মাথা নীচু করলেন দয়িতবিষ্ণু। শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলেন তিনি, এই বিন্দু থেকে আর ফেরত যাওয়ার উপায় নেই। আপাতত নিয়তির হাতেই ছেড়ে দিতে হবে এই দেশের ভবিষ্যৎ। আরও কত মুহূর্ত যে এই মুহূর্তটির কাছে ঋণী হয়ে রইল, সে কথা একদিন ইতিহাস বলবে।

'এই অভিযোগের কারণ জানতে পারি সম্রাট?' নির্লিপ্ত অবসাদে আশ্চর্য শীতল ও ধারালো শোনাল সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজপণ্ডিতের কণ্ঠস্বর।

সম্রাটের হয়ে জবাব দিলেন প্রকাশচন্দ্র। মসৃণ স্বরে একইসঙ্গে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর বিপুল অপমান মিশিয়ে বললেন, 'রাজপণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ হলে কী হবে, কাণ্ডজ্ঞানের বড়ই অভাব দেখা যাচ্ছে। মনে হয় উনি বোধহয় ভাবেন যে, রাজ্যের লোকজন সব নির্বোধ, কেউই কিছু বোঝে না।'

'অনর্থক বাচালতা বন্ধ করুন প্রকাশচন্দ্র।' সেই একই স্বরে উত্তর দিলেন দয়িতবিষ্ণু, 'যা বলতে চান সরাসরি বলুন।'

ধ্বক করে জ্বলে উঠল প্রকাশচন্দ্রের চোখদুটি, যেমন রাজগোক্ষুরোর মাথায় জ্বলে ওঠে দুটি রক্তমাণিক। দুজনেই দুজনের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

'দয়া করে তাহলে কি রাজসভাকে জানাবেন পণ্ডিত দয়িতবিষ্ণু, আপনার পুত্রসন্তানটির প্রকৃত পিতা কে?' চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করলেন প্রকাশচন্দ্র, 'কেন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠছে সম্রাট রাজভটের ছাপ? কোন জাদুবিদ্যায় দশ বছর বয়সি ব্রাহ্মণসন্তান তরবারি চালনায়, অশ্বচালনায় আর ধনুর্বিদ্যায় রাজ্যের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সমকক্ষ হওয়ার শক্তি রাখে?' একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটাতে লাগলেন তিনি, 'উত্তর দিন পণ্ডিত। নিশ্চুপ থাকবেন না। আমাদের সন্দেহ যে, আপনি ও আপনার দুশ্চরিত্রা গৃহিণী মিলে

খড়্গরাজসিংহাসন হস্তগত করার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন। রাজরক্তের উত্তরাধিকারের দোহাই দিয়ে বর্তমান সম্রাটের এক প্রতিস্পর্ধী...'

সভার মধ্যে প্রচণ্ড হট্টগোল শুরু হল। বিস্ময়ে, ক্রোধে, ক্ষোভে উঠে দাঁড়ালেন সভাসদেরা। আনন্দদত্ত কোষমুক্ত করলেন তাঁর তরবারি, বিশালকীর্তি তাঁর হাত ধরে আটকালেন তাঁকে। স্থিরবুদ্ধি বুদ্ধদাস অবধি উত্তেজিত হয়ে তথাগত'র নামে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন প্রকাশচন্দ্রকে। মহাক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মহাসামন্ত লোকনাথ। সমতটের রাতবংশ মহাপ্রতাপশালী সামন্তবংশ, তাঁরা দয়িতবিষ্ণুকে রাজগুরুতুল্য সম্মান দেন। তাঁদের যুবরাজ বলধারণ রাত প্রবল রাগে চিৎকার করে গালিগালাজ করতে লাগলেন। মহামাণ্ডলিক আর অন্যান্য অমাত্য সামন্তরা হতবুদ্ধি হয় ইতিউতি চাইতে লাগলেন। মহাপ্রতীহার বজ্রপাণি অত্যন্ত সতর্ক পুরুষ, তাঁর ইঙ্গিতে কয়েকজন দেহরক্ষী খোলা তরবারি হাতে সম্রাটকে ঘিরে দাঁড়াল।

আর এইসবের মধ্যে দয়িতবিষ্ণু আর প্রকাশচন্দ্র দুই যুদ্ধরত সিংহের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চারপাশের এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশ তাঁদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না।

একবার হাত তুলে সভার কোলাহল শান্ত করলেন দয়িতবিষ্ণু, তারপর মৃদু হেসে সম্রাটকে বললেন, 'সম্রাট যখন আমার ও আমার পরিবারের নামে এত বড় অভিযোগ তুলেছেন, তখন এই রাজসভায় আমার আর না থাকাই উচিত। তাই এই মুহূর্তেই আমি আমার যাবতীয় দায়িত্বভার ত্যাগ করছি। আশা করি সম্রাট তার অনুমতি দিতে দ্বিধা করবেন না।'

'আচ্ছা। তাই হবে পণ্ডিত। তোমার ইচ্ছাই মেনে নিলাম। এই রাজ্য থেকে এখনই দূর হয়ে যাও।' জড়িতস্বরে বললেন সম্রাট বলভট।

'শিরোধার্য। কাল ভোর হওয়ার আগেই আমি সপরিবারে এই রাজ্য ছেড়ে আমার জন্মভূমি বরেন্দ্রীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করব। আশা করব খড়্গবংশের প্রতি আমার এতদিনের সেবা ও আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে সম্রাট আমাকে নিরুপদ্রবে ও নিঃশঙ্কচিত্তে দেশত্যাগের অনুমতি দেবেন। আমি এও অনুরোধ করব, অগ্রজতুল্য আনন্দদত্তকে যেন আমাকে সপরিবারে বঙ্গভূমির সীমানা অবধি ছেড়ে দিয়ে আসার আদেশ দেওয়া হয়।'

চারুদত্ত ও প্রকাশচন্দ্র আপত্তি করে ওঠার আগেই সম্রাট গম্ভীরমুখে বললেন, 'তথাস্তু।'

গোপনে অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বুদ্ধিমান পণ্ডিত সঠিক অনুমান করেছেন যে, যাত্রাপথেই গুপ্তঘাতকের হাতে সপরিবারে নিহত হতে পারেন তিনি। তাই আনন্দদত্তকে সঙ্গী হিসেবে চাইলেন। ওদিকে চারুদত্ত আর প্রকাশচন্দ্রের মুখে স্পষ্টই হতাশার ছায়া। লোকটাকে কারাগারে বদ্ধ করে গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা যে এইভাবে বানচাল হয়ে যাবে—তা ভাবতেও পারেননি তাঁরা। তাঁদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সামান্য হাসলেন আনন্দদত্ত। তিনি সঙ্গে থাকতে দয়িতবিষ্ণুর কেশাগ্র স্পর্শ করে—এমন সাহস এই রাজ্যে কারও নেই। তার পরেই একবার গভীর বেদনায় চোখ বুজলেন তিনি। অনুজপ্রতিম এই পণ্ডিতকে বড় ভালোবাসেন আনন্দদত্ত।

'আরও শুনুন সম্রাট। আপনি কথা দিয়েছেন যে, আমাকে বিনা উপদ্রবে সপরিবারে রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করতে দেবেন। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মতো গর্হিত কাজ যে সম্রাট রাজভটের পুত্র করবেন না—সে বিশ্বাস আমার আছে। তাই সেই বিশ্বাসে ভর হয়েই একটি সত্য আপনাদের জানিয়ে যাই।'

প্রত্যেকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলেন দয়িতবিষ্ণুর দিকে। ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন প্রকাশচন্দ্রও।

'পরম মিত্র প্রকাশচন্দ্র যা বলেছেন তা সত্য বটে...'

সমস্ত সভা মূক ও উদগ্রীব!

'কিন্তু অর্ধসত্য!'

সভাস্থ প্রতিটি সভ্যকে দেখে মনে হল যেন কৌতূহল আর বিস্ময়ের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা। প্রত্যেকের মুখে হতভম্ব অবিশ্বাসের ছাপ।

'আমার পুত্র আমার ঔরসজাত নয় এ কথা সত্য। এই বালকের দেহে বইছে প্রয়াত সম্রাট রাজভটের রক্ত, তাও সত্য।'

রাজসভা স্তব্ধ, হতবুদ্ধি। এ কী স্বীকারোক্তি করছেন রাজপণ্ডিত?

'কিন্তু সম্রাট,' একটু থেমে মৃদু হেসে বললেন দয়িতবিষ্ণু, 'এই বালক যেমন আমার ঔরসজাত নয়, তেমন আমার স্ত্রীর গর্ভজাতও নয়!'

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ। চম্পানগরী, মগধ।

বিশেষ কিছু শারীরিক ব্যায়াম আর শ্বাসবায়ুর নিয়ন্ত্রণ রোজই অভ্যাস করেন মানুষটি। এ সব তাঁর গুরুরই শিক্ষা। নিজ প্রতিভাবলে সেসব গূঢ় সাধনা আরও তীক্ষ্ণ, আরও গভীর, আরও অন্তর্গূঢ় করেছেন তিনি। এখন একান্ত নির্জনে যখন সাধনপীঠে বসেন, তখন কখনও কখনও নিজের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে এক অলৌকিক দ্যুতির চলাচল বুঝতে পারেন। লিঙ্গমূল হতে ব্রহ্মতালু অবধি সেই অপার্থিব দ্যুতি সাপের মতো খেলে বেড়ায়।

দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন বাতাসে সাঁতার কেটে প্রায় উড়ে যাচ্ছেন তিনি, এতই দ্রুত ছিল তাঁর হাঁটার বেগ। তাঁর উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছিল আকাশে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর আরও ঘন হয়ে ওঠা। তাঁর মন বলছিল, আবারও সর্বনাশ নেমে এসেছে বঙ্গদেশের কোনও অভাগা পল্লীর ওপরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই গ্রামটিতে পৌঁছে গেলেন তিনি। কান্না আর আর্তনাদের রোল তাঁর কানে আসতেই তিনি বুঝলেন যে, তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে।

গ্রামের শেষে একটি ভাঙা কুটিরের আড়ালে থেকে নির্নিমেষ এক নৃশংস নরমেধযজ্ঞ দেখে যেতে থাকলেন সেই মানুষটি।

একদল সশস্ত্র লোক তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেছে সেই গ্রামটিতে। আগুন লাগাচ্ছে একের পর এক কুটীরে, বাইরে ছুঁড়ে ফেলছে দরিদ্র গ্রামবাসীর সংসারের সর্বস্ব। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক পালাচ্ছে বাসিন্দারা; আর তাদের হাহাকার আর কান্নার শব্দে যেন আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে আগুনের লেলিহান শিখা।

দৈত্যাকার লোকগুলির ভাবলেশহীন মুখ আর হাতের অস্ত্র দেখে দেখেই বোঝা যায়—কোনও এক ভূস্বামীর পোষা সৈন্যদল তারা। গ্রামের মধ্যে একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সেই দক্ষযজ্ঞ পর্যবেক্ষণ করছেন এক বিশালাকার মানুষ। তাঁর পরনের দামি কাপড়ে আর অলঙ্কারে বোঝা যায় যে—ইনিই সেই ভূস্বামী।

পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন গ্রামের বৃদ্ধ মণ্ডলপতি; মুহূর্তে তাঁর চুলের মুঠি ধরে সামন্তপ্রভুটির সামনে উপস্থিত করলো এক সৈন্য।

'দয়া—প্রভু, দয়া করুন। আপনি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনি বিরূপ হলে আমরা কোথায় যাই? দয়া করুন প্রভু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের আশ্রয় এভাবে কেড়ে নেবেন না।' বলতে বলতে চোখের জলে ভেসে যায় সেই বৃদ্ধের রুক্ষশুষ্ক বুকখানি।

মুখ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করেন সেই অসুরাকৃতি পুরুষটি, 'আহারে, বড় কষ্ট হচ্ছে তোদের তাই না রে? আমারও যে দুঃখু হচ্ছে, সে তোদের কী করে বোঝাই? বড় দুঃখ রে বুড়ো, আমার প্রাণেও বড়ই

দুঃখ।’

‘প্রভু, আপনি অন্নদাতা, মাতা-পিতার সমান। দরিদ্রের এত বড় সর্বনাশ করবেন না প্রভু!’

সামান্য নীচু হয়ে নিজের মুখটা সেই বৃদ্ধের মুখের কাছে নিয়ে আসেন ভূস্বামীটি। তারপর বলেন ‘আমারও কি এসব করতে ইচ্ছা করে রে দ্বিজদাস? কিন্তু না করে উপায় কী বল? কোনও উপায় কি আর তোরা রেখেছিস রে? কত মাসের কর বাকি রেখেছিস—সে কথা খেয়াল আছে?’

‘প্রভু...প্রভু...’ কান্না থামতে চায় না বৃদ্ধের।

‘প্রভু প্রভু করে এত কান্নাকাটি করছিস তো বটে। কিন্তু তোরা এরকম করলে তোদের প্রভুরই বা কী করে চলবে—সেটা নিয়ে ভেবেছিস কিছু? আমার মেয়ের বিবাহদায় শিয়রে উপস্থিত, আবার ভুক্তিপতি আমার কাছে পত্র পাঠিয়েছেন বাকি থাকা সমস্ত কর দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে। আমি কোথায় যাই বল তো দেখি?’

‘প্রভু, দরিদ্রের সব কিছু কেড়ে নেবেন না, ঈশ্বরের দোহাই।’ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে বৃদ্ধের গলা, ‘পথের ভিখারী করে দেবেন না প্রভু। সবার ঘরেই ছোট ছোট শিশুরা আছে, তারাও আমাদের মতই আধপেটা খেয়ে আছে বহুদিন। আপনার ঘরেও তো একটি কন্যা আছে প্রভু, তার মুখের দিকে চেয়ে...’

দড়াম! বৃদ্ধের মুখে সজোরে একটি লাথি এসে পড়ল। ওঁক শব্দ তুলে সামান্য দূরে ছিটকে পড়লেন বৃদ্ধ। হিসহিস করে ওঠেন সেই ভূস্বামী, ‘শোন বুড়ো, তোরা আধপেটা খেয়ে থাকবি নাকি না-খেয়ে থাকবি—সেসব দেখার প্রয়োজন বোধ করি না। যদি সমস্ত বকেয়া কর মিটিয়ে দিস তো ভালো। নইলে তোদের সবকটা জোয়ান ছেলে আর মেয়েকে প্রকাশ্য রাস্তায় উলঙ্গ করে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নগরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেব। বকেয়া কর আমার চাই।’

ধীরে ধীরে উঠে বসেন সেই বৃদ্ধ। রক্তমাখা থুতু ফেলেন। তারপর মাথা তুলে তাকান ভূস্বামীটির দিকে। বলে ওঠেন, ‘ছিঃ প্রভু, আপনি আমাদের মানুষ বলে মনে করেন না?’

‘মানুষ? ওরে—মান আর হুঁশ থাকলে কি আর কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করতিস তোরা? সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে অপোগণ্ডের দল রাজকর দিতে অস্বীকার করে তাদের আমি পথের কুকুর মনে করি। তাদের আবার সম্মান অসম্মান কী?’

‘কুকুর?’ ধ্বক করে দুচোখ জ্বলে ওঠে সেই বৃদ্ধের, ‘আপনার জিভে ওকথা এল কী করে প্রভু? আমরা নিজেদের পরিশ্রমের অন্নে নিজেদের পেট ভরাই। আমাদের কুকুর বলার আগে আপনার বিবেকে একবারও বাধল না?’

‘বিবেক! বটে? মুখে খুব বুলি ফুটেছে দেখছি! বলি এতই যখন বিবেক-টিবেক আছে তোদের, তখন রাজকর বাকি রাখিস কোন বিবেকে?’

‘ইচ্ছে করে বাকি রাখিনি প্রভু! কোনওদিন কি জানতে চেয়েছেন—কেন কর দিতে পারছি না আমরা? একবারও ভেবে দেখেছেন প্রভু?’

‘ভেবে দেখব? বলিস কি রে! তোদের কথা আজকাল ভেবেও দেখতে হবে!’ চক্ষু বড় করে বলেন ভূস্বামী ভদ্রবাহু।

‘হ্যাঁ প্রভু, দেখতে হবে বইকি! প্রজারা কি কেবলমাত্র করদান করার যন্ত্র? তাদের ভালোমন্দ দেখার দায় নেই আপনার?’

‘দায়? তোর আস্পর্দা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।’

‘না প্রভু। যা সত্যি সেটাই বলছি। ভেবে দেখেছেন কি, বছরের পর বছর কীভাবে করের হার বাড়িয়ে চলেছেন আপনি? সামান্য যেটুকু ফসল ফলাই আমরা, আগে তার ছয়ভাগের একভাগ দিতে হতো, এখন তার তিনভাগের দুইভাগ আপনি দখল করেন। আপনার বাড়ির বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে পার্বণী আদায়

করেন। তারও ওপর যখন ইচ্ছে আমাদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে নেন। এর পরেও আমাদের কুকুর বলছেন? পরের শ্রমের অন্নে ভাগ বসাতে আপনার সংকোচ হয় না প্রভু?'

বিস্ময়ে আর ক্রোধে প্রথমে বাকস্ফূর্তি হয় না ভূস্বামীর। তারপর হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন তিনি, 'বটে? নীচুজাতের মুখে এত বড় কথা? এতবড় সাহস? প্রাণের ভয় নেই তোর?'

ধীরে উঠে বসেন সেই বৃদ্ধ; ঠোঁটের প্রান্ত থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্ত, চোখের প্রান্ত থেকে অশ্রু।

'ভয়? আজ আমাদের পেটে ভাত নেই, পরনের কাপড় নেই, ঘরের ছেলেমেয়েদের দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছেন। এর পরেও আর কীসের ভয় বাকি থাকে প্রভু ভদ্রবাহু?'

'বটে? তোর আর কোনও ভয় নেই বলছিস? তা বেশ,' শয়তানি হাসি খেলে যায় ভদ্রবাহুর মুখে, 'তোর মেয়ে শুনলাম কালই বাপের বাড়িতে এসেছে? আর তোর নাতনীটি নাকি বড়ই মনোলোভা হয়েছে? আহা রে, ভাবছি আজ একইসঙ্গে মা মেয়েকে দিয়ে আমার শয্যার শোভা বাড়াব। ওরে কে কোথায় আছিস? মেয়ে আর নাতনীর সঙ্গে এই বাচাল বুড়োকেও বেঁধে নিয়ে চল। আজ আমরা সবাই মিলে সারা রাত ধরে মা-মেয়ের শরীরের আনন্দ নেব ভাবছি। তোরা দেখিস—সেই সময় যেন এই বৃদ্ধ আমাদের চামর দুলিয়ে হাওয়া করতে ব্যস্ত থাকে', এই বলে অশ্লীল ও অসভ্য আনন্দে শরীর দুলিয়ে হাসতে থাকেন ভদ্রবাহু আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা।

কুটিরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা যোগীবরের সমস্ত শরীর তীব্র ক্রোধে দাউদাউ জ্বলতে থাকে। অতি কষ্টে নিজেকে স্থির রাখেন তিনি।

একদিন সময় আসবে। এই অসহ্য অত্যাচারের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কিন্তু আজ সেই সময় নয়। আজ সেই দিন নয়। নিজেকে বোঝান তিনি।

প্রবল ঘৃণায় আর রাগে বিকৃত হয়ে যায় দ্বিজদাসের মুখখানি। বলে ওঠেন তিনি, 'শোনো হে ভদ্রবাহু, শোনো হে অত্যাচারী ভূস্বামীদের দল, তোমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তোমাদের ওই কামলোলুপা রানি, আর তার ওই বেতালসিদ্ধ প্রকাশচন্দ্র, তারা কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।'

'তাই নাকি রে? কী করবি তুই, শুনি?'

'আমি? হা হা হা...' অপ্রকৃতিস্থ স্বরে হেসে ওঠেন দ্বিজদাস, 'আমি নয়, আমরা। শুনে রাখো ভদ্রবাহু, তিনি আসছেন, সবাইকে নিয়ে আসছেন।'

'কে আসছেন? কার কথা বলছিস তুই?'

'তিনি আমাদের ঈশ্বর। স্বয়ং আদিনাথের ত্রিশূল হাতে আসছেন তিনি। দিকে দিকে তাঁর ভৈরব বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে। তোমাদের অশুভ রক্তের একটি ফোঁটাও এই দেশের মাটিতে পড়তে দেব না হে, তোমাদের প্রতিটি অত্যাচারের ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেব।' এই বলে পাগলের মতো করে হেসে ওঠেন সেই বৃদ্ধ।

আর সহ্য হয় না ভদ্রবাহুর, পাশের সৈন্যটির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন ভল্ল! সজোরে গেঁথে দেন বৃদ্ধের বুকে।

একবার ঘোলাটে চোখ তুলে চারিদিকে তাকান সেই বৃদ্ধ। তারপর একবার তাকালেন আকাশের দিকে। যেন শেষবারের মতো দেখে নিতে চাইলেন বড় সাধের, বড় মায়ার, বড় ভালোবাসার এই মাটি, এই আকাশ।

তারপর ফের বিড়বিড় করলেন তিনি, 'আসছেন, তিনি আসছেন। ওঁরা আসছেন।'

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ । নালন্দা মহাবিহার, পাটলিপুত্র, মগধ।

শরৎকাল। সন্ধ্যা শেষ হয়েছে। অন্ধকারে অদূরের মহাবিহারটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন অশ্বারোহী পুরুষটি।

নালন্দা মহাবিহার।

গত দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে এই বিহার। ভারতবর্ষের অহঙ্কার শুধু তার রাজচক্রবর্তী সম্রাটদের বিজয়গাথার মধ্যে নয়, সেই অহঙ্কারের অনেকখানি মিশে আছে তার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক অবদানের মধ্যেও।

ভারতের এই সারস্বত ঐতিহ্যের মধ্যে গরিমায়, প্রভাবে ও উৎকর্ষে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এই নালন্দা। ভারতের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও বিদগ্ধ পুরুষেরা অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেছেন এই মহাবিহারে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ দার্শনিক ভিত্তিই তো এই মহাবিহারের মাটি দিয়ে তৈরি। আচার্য আর্যদেব, আচার্য দিঙনাগ, আচার্য ধর্মকীর্তি, আচার্য শান্তিদেব—ভারতভূমিকে একের পর এক মহান বৌদ্ধাচার্য উপহার দিয়েছে নালন্দা মহাবিহার।

তিব্বত থেকে মহাচীন, দ্বারাবতী থেকে সিংহলভূমি, গান্ধার থেকে বালিদ্বীপ, বিভিন্ন দেশ থেকে আসা শিক্ষার্থীরা আসেন এখানে। অধ্যয়ন করেন ষড়দর্শন, শব্দবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রও।

বাতাসে সামান্য শীতের আমেজ। বিহারের উত্তর দিকের দরজার প্রহরী দরজার এক কোণে গুটিসুটি মেরে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। গ্রাম থেকে তার সম্বন্ধী এসেছিল আজ। একে তো তার সঙ্গে বসে চমৎকার কাঞ্জিক মদ্যপান হয়েছে, তার ওপর রাত্রের খাবারটি আজ বড় মনমতো হয়েছ তার। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনও স্বপ্ন দেখে খিল খিল করে হাসছিল সে।

সহসা কাঁধে টোকা পড়তে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে রক্ষী। চোখ কচলে দেখে সামনে এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। তাঁর সমস্ত দেহ কালো কাপড়ে ঢাকা, বাঁহাতে একটি ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন। ঘোড়াটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

‘ক্কী ক্কী,...ক্কাকে চাই শুনি, অ্যাঁ?’ ধমকে উঠলেও প্রহরীটি, বোঝা যায় যে বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে।

‘একে বর্ষার রাত, তার ওপর মুখে ভুরভুর করে করছে মদের গন্ধ! না হে বাপু, ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে তোমাকে মোটেও দোষ দিতে পারলাম না।’ কৌতুকস্বর শোনা যায় আগন্তুকের।

‘এত রাতে, কী ব্যাপার? যা বলার চটপট বলে ফেলো।’ প্রহরী সামলে ওঠার চেষ্টা করে।

‘আমারই কী ইচ্ছে করে হে এই এত রাতে এখানে আসতে? তবে না এসে উপায় কী বলো? স্বয়ং আচার্য শান্তরক্ষিত যদি আমাকে ডেকে থাকেন, না এসে আমার উপায় আছে? অমন মস্ত পণ্ডিত লোক...’

‘আচার্য তোমাকে ডেকেছেন? আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি, অ্যাঁ? ঠাট্টা? বলি যাঁর নাম করলে তিনি কে জানো? মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র তিনি, চীন থেকে বাহ্লীকদেশ অবধি পণ্ডিতরা যাঁর নাম শুনলে মাথা নীচু করেন, সেই পণ্ডিতশিরোমণি শান্তরক্ষিত তোমাকে ডেকেছেন আলাপ করার জন্যে?’

‘ডাকেননি বলছ? আমার তাহলে ভুলই হল নাকি?’

‘আমাকে দেখে কী তোমার মূর্খ মনে হচ্ছে? শোনো হে আগন্তুক, আমার নাম মল্ল সিংহোদর, একটি চাপড়ে তোমার মাথাটি গুঁড়োগুঁড়ো করে দিতে আমার মুহূর্তের বেশি সময় লাগবে না।

‘সিংহোদর? তা সিংহোদর কবে থেকে এমন ভুঁড়ো শেয়াল হয়ে গেল বলো তো?’ বলতে বলতে সামান্য নত হয়ে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে সিংহোদরের পেটে একটি খোঁচা দেন সেই আগন্তুক।

মুহূর্তে প্রহরীর মনে হয় কে যেন একটি জ্বলন্ত লোহার শিক সজোরে তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। প্রবল শ্বাসকষ্টে হাঁপ টানতে টানতে ক্রমশ বেঁকে যেতে থাকে সে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে তার।

বাঁ-হাতের উলটো দিক দিয়ে সিংহোদরের পিঠে হালকা করে একটি চাপড় দেন সেই আগন্তুক, পরক্ষণেই প্রবল কাশির দমকে ফেটে পড়ে মল্লবীর সিংহোদর। শ্বাসকষ্ট কেটে গেছে তার। কাশি কিছুটা কমলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'আপনি কে প্রভু?'

'আহা, আমাকে আবার খামোখা আপনি টাপনি কেন? তুমিটাই তো দিব্যি শোনাচ্ছিল হে।' হাঁ-হাঁ করে ওঠেন আগন্তুক, 'আর ওসব মল্লযুদ্ধের ছোটখাট দু-একটা কৌশল হে, এমন কোনও বড় ব্যাপার নয়।'

'অধীনকে আর লজ্জা দেবেন না প্রভু। আপনার কী সেবা করতে পারি বলুন?'

'অতি সামান্য কাজ। চট করে আচার্যকে আমার আসার সংবাদটা দিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে তোমার ওই কাঞ্জিকের হাঁড়িটা দিয়ে যেও বাপু।'

কোনও কথা না বলে কাঞ্জিক মদের বিশাল জালাটি আগন্তুকের দিকে এগিয়ে দেয় সিংহোদর। হাতে পাওয়া মাত্র আগন্তুক আর দেরি করেন না, দুহাতে জালাটি তোলেন আর হাঁ করে মুখের মধ্যে ঢালতে থাকেন মাগধী সুরা।

সে দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে সিংহোদর। অমন বিশাল পানীয়ের জালা এত অবলীলায় দুহাতে তুলে সেখান থেকে সরাসরি পান করার লোক এই বিশ্বচরাচরে কেউ আছে বলে তার ধারণা ছিল না। তবে তখনও তার অবাক হওয়ার বাকি ছিল।

তার চোখের সামনে দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল সেই বিশাল মাটির জালা। শেষ বিন্দুটুকু অবধি গলায় ঢেলে জালাটি দূরে ছুঁড়ে দেন আগন্তুক।

তৃপ্তির ঢেকুর তুলে আগন্তুক বলেন, 'বাহ, বাহ, বড় ভালো জিনিস হে। যেমন স্বাদ তেমনই তীব্রতা। আমাদের ওদিকে বুঝলে কি না, কাঞ্জিকটা না ঠিক তেমন ভালো বানায় না। তবে হ্যাঁ, নারকেল ফুল পচিয়ে, বুঝলে কিনা, একধরনের আরক বানাই আমরা। সেও ভারি মধুর খেতে হে। আমার সঙ্গে আমাদের দেশে একবার যাবে নাকি ভাই চক্রধর?'

'চক্রধর না প্রভু, ইয়ে আমার নাম সিংহোদর। আচার্যকে সংবাদ দিই প্রভু?'

'দেবে? না-দিলেই নয়? আচ্ছা তবে তাই দাও হে। আর যাওয়ার আগে যদি আরেকটি কাঞ্জিকের হাঁড়ি দিয়ে যাও বৃষস্কন্ধ...'

'আজ্ঞে আমার নাম বৃষস্কন্ধও নয় প্রভু, আমার নাম চক্র...ইয়ে...সিংহোদর। অনুগ্রহ করে যদি আপনার নামটি বলতেন।'

'নাম?' এই বলে হাসি হাসি মুখে সিংহোদরের দিকে চোখ তুলে তাকান সেই আগন্তুক, সেই হাসিতে মিশে আছে কিছু নির্দোষ কৌতুক, 'নাম জিগ্যেস করছ চক্রসম্বর? বলি আমার নাম যদি সরোরুহবজ্র হয়, তাহলে কি চিনতে কিছু সুবিধা হবে? বা যদি বলি রাহুলভদ্র? চিনতে কি পারবেন আচার্য?'

শুনে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সিংহোদর। ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে সিংহোদরের হাত-পা। ইনিই তাহলে সেই রূপকথার রাজপুত্র? ইনিই তিনি?

খুঁজেপেতে নিজেই আরেকটি মদের জালা বের করেন আগন্তুক, তারপর সেটি দুহাতে তুলে গলায় ঢালার আগে একটু থামেন; বলেন, 'যাওয়ার আগে আমার ঘোড়াটিকে কিছু খেতে দিও তো সামন্তভদ্র, বেচারী অনেকক্ষণ ধরে কিছু খায়নি। আর হ্যাঁ, আমার আসল নামটাই আচার্যকে জানিও। তাঁকে বোলো যে রাজা ইন্দ্রভূতির সন্তান তাঁর আদেশ পালন করে তিব্বত থেকে ফিরে এসেছে।' এই বলে সামান্য থামেন তিনি, তারপর বলেন, 'বলো যে—রাজপুত্র পদ্মসম্ভব এসেছেন।'

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ। পার্বত্য কজঙ্গল।

গহীন অরণ্যের মধ্যে ছোট পাহাড়। তার চূড়ায় একটি বড় নিমগাছ। নিমগাছের নীচে মাটি আর পাথরের মন্দির, ঘন ছায়াবৃত।

মন্দিরের মধ্যে এক বৌদ্ধ শ্রমণ এবং আর এক শবর যুবক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন।

বৌদ্ধ শ্রমণ বয়সে তরুণ। অপার বিস্ময়ে তিনি দেখছিলেন মন্দিরের মূর্তিটি। নালন্দায় নিত্যপূজা হয় এমন মূর্তির সংখ্যা নেহাত অল্প নয়। শ্রমণ নিজেও নিয়মিত অবলোকিতেশ্বরের পূজা করেন। দীর্ঘ তিব্বতপ্রবাসেও বহু বিচিত্র মূর্তি কম দেখেননি। কিন্তু এমন মূর্তি আজ অবধি তাঁর চোখে পড়েনি।

প্রতিমাটি পাথরের। একটি বড় পাথর কুঁদে কুঁদে কোনও অখ্যাত শবরশিল্পী রূপদান করেছে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর। দেবী অতি ভীষণদর্শনা, অতিবিস্তারবদনা, লোলজিহ্ব। পীনোন্নতপয়োধরা দেবীর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গে গাছের পাতা ও বাকলের আচ্ছাদন। দ্বিভূজা দেবীর দক্ষিণহস্তটি বরাভয় ভঙ্গীতে ঊর্ধে উত্থিত, বামহস্তটি বরদমুদ্রায় অগ্রবর্তী।

'ইনি কোন দেবী, মিত্র শবর?' বিহ্বলস্বরে বললেন শ্রমণ।

'ইনি আমাদের একজন ভারি জাগ্রত দেবী।' ফিসফিস করে বললেন শবর যুবক। রোগ বালাই হলে আমরা এখানেই হত্যে দিই। আর বড় কোনও মড়ক লাগলে তো কথাই নেই, তখন মহা ধূমধাম করে এঁর পূজা হয়।' এই বলে থামলেন তিনি। তারপর বললেন, 'দেবী ঠাকুরানি আবার যেমন রাগী, তেমনই উঁচু নজর তাঁর! বুনো মোষের মাংস আর ভালো মহুয়ার মদ না পেলে ওঁর মন ওঠে না।'

কী আশ্চর্য রূপ মাতৃমূর্তির। কী ভয়ঙ্কর অথচ কী মানুষী, কী ক্রুদ্ধ অথচ কী স্নেহময়ী এই দেবী। যেন এক সামান্য শবরকন্যার সমস্ত লালিত্য, সমস্ত উগ্রতা, সমস্ত স্নেহ, সমস্ত ক্রোধ একত্রে রূপ নিয়েছে এই দেবীমূর্তিতে। তিব্বতে প্রবাসকালে পোন ধর্মের ভীষণদর্শন দেবদেবীদের মূর্তি কম দেখেননি শ্রমণ। সেসব মূর্তি দেখে ঘৃণায় বমি উঠে আসত তাঁর। কিন্তু, কই, এই করালবদনা দেবীমূর্তি দেখে তাঁর মনে ভয়ের পরিবর্তে ভক্তিভাব জেগে উঠছে কেন?

ভক্তি? শুধুই ভক্তি? তাহলে তরুণ সন্ন্যাসীর হঠাৎ করে কেন মনে পড়ে যাবে তাঁর গর্ভধারিণীর স্নেহঢলঢল মুখখানি?

দীর্ঘ প্রবাসের পর সবে দেশে ফিরেছেন শ্রমণ। আচার্য শান্তরক্ষিতের আদেশে একটি অতি গোপন কাজে তিব্বতে গিয়েছিলেন তিনি। বহু কষ্টে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেই জটিল কাজ শেষ করে সদ্য দেশে ফিরেছেন তিনি। দুটি গোপন বস্তু আর একটি পত্র চুরি করে এনেছেন, সঙ্গী রাজপুত্রটির হাত দিয়ে তা পাঠিয়ে দিয়েছেন আচার্যর কাছে। তিনি রয়ে গেছেন একটি বিশেষ কারণে।

তাঁর পূর্বাশ্রমের ঘরখানি, এখান থেকে কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে। ইচ্ছা আছে, নালন্দা যাওয়ার আগে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন শ্রমণ। আহা, কতদিন দেখেননি মাকে।

দু'চোখ বন্ধ করলেন তিনি। বহুদিন পূর্বে ছেড়ে আসা বাস্তুভিটার জন্যে, আম আর কাঁঠাল গাছে ছায়াময় গ্রামটির জন্যে, মাতৃদেবী ভগবতীর করুণ মুখখানির কথা মনে পড়ে সহসা তাঁর চক্ষু সজল হয়ে উঠল।

'তবে রাগী হলে কী হবে, দেবীকে কিন্তু আমরা বড় ভালোবাসি ভায়া,' উৎসাহিত হয়ে ওঠেন শবর যুবকটি। অসভ্য আরণ্যক আদিবাসীকূলে জন্মগ্রহণ করেও দৈববলে আশ্চর্য সাধনসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি। লোকে বলে, আর্য অবলোকিতেশ্বর স্বয়ং নাকি এক ব্যাধের রূপ ধরে এসে এঁকে দশকুশল দান করেন। লোকায়ত সহজ সাধনার যে নতুন সিদ্ধিমার্গ উন্মোচিত হয়েছে, তাতে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয় এঁর নাম। ময়ূরবসন, গিরিনাথ—নানান নামে এঁর পরিচিতি। সাধারণ মানুষ অবশ্য অন্য নামেই চেনে বেশি এঁকে, শবরবজ্র।

তিনি বলতে থাকেন, 'ঘরের মেয়ের মতই ভালোবাসি। নইলে কথায় কথায় এত রাগ কে-ই বা সহ্য করবে হে? নিজের মেয়ে বলেই না সহ্য করি এত! তবে মেয়ে আমাদের ভারি সোহাগীও বটে, তেমন

দয়াবতীও। বিপদে আপদে এই মেয়েই আমাদের রক্ষা করে। অবরে-সবরে মেয়ের সঙ্গে আমরা সুখদুঃখের দুটো কথাও বলি।'

'তাই নাকি? ইনি তাহলে দেবী নন? আপনাদের ঘরের মেয়ে, মিত্র?'

'বটেই তো।' বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন শবরবজ্র, 'মেয়ে তো বটেই! দেবীও বটে, আবার ঘরের মেয়েও বটে। নিত্যি পূজা তো আছেই, তার ওপর বর্ষার সময় শেষ হলে আকাশ যখন বেশ পরিষ্কার হয়ে আসে, তখন একদিন দিনক্ষণ দেখে আমরা এই দস্যি মেয়েটার মহাধূমধামে পূজা করি, বুঝলে ভায়া।'

'তাই নাকি?' মনের মেঘ কেটে যাচ্ছিল শ্রমণের।

'তখন তো হরিণ, মোষ, বুনো বরা আর অঢেল মহুয়া না পেলে শুধু এই বেটি কেন, আমাদের সমাজের লোকজনও ভারি রাগ করে ভাই। পাঁচদিন ধরে কজঙ্গল থেকে বিন্ধ্যাচল অবধি সে এক মোচ্ছব চলে হে। ও, তুমি তো আবার দুধ আর ফল ছাড়া কিছুই খাও না। তবে দেবীর সামনে আমাদের ছেলেমেয়েরা সুন্দর নাচ-গানের অনুষ্ঠান করে, দেখলে তোমার ভালো লাগবেই। গত কয়েক বছর ধরে আমরা বুদ্ধনাটকও শুরু করেছি, বুঝলে হে।'

ধীরে ধীরে মন প্রসন্ন হয়ে উঠছিল শ্রমণের। এই সহজ মানুষটিকে, এই সহজ ভূমিকে, এই জনজাতিকে, এই সহজ পূজোপচারকে ক্রমেই ভালোবেসে ফেলছিলেন। দেবীর মধ্যে নিজের মায়ের মুখখানি খুঁজে পাচ্ছিলেন।

'এই দেবীর নাম কী মিত্র?'

'নাম? কোনও নাম তো দিইনি ভাই!' উত্তর করেন সেই শবর যুবক, 'নাম দেওয়ার কথা মনেই আসেনি।'

'মিত্র, অনুমতি দিন,' গলা বুজে আসে শ্রমণের। সেই কোন শৈশবে সাধের ঘর ছেড়ে, ঘরের আঙিনা ছেড়ে, গ্রামের ছোট্ট শান্ত নদীটি ছেড়ে, বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে, মায়ের স্নেহের আঁচলটি ছেড়ে শ্রমণ হয়েছিলেন তিনি। তারপর পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে কত না জল। নালন্দা, কামরূপ, তিব্বত, ষড়যন্ত্রে দীর্ণ রাজপরিবার, অরাজকতায় ক্ষিপ্তক্ষিপ্ত বঙ্গভূমি, আর সেই বঙ্গভূমির উদ্ধারকল্পে আচার্য শান্তরক্ষিত আর লোকেশ্বরের মিলিত বিশাল পরিকল্পনা—এই বিপুল কর্মস্রোতে কবেই ভুলে গেছেন সেই স্নেহের ছায়া-সুনিবিড়, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলা শান্ত কুটিরটি।

মনে মনে দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন তিনি। সবকিছু ছেড়ে যে কাজে ব্রতী হয়েছেন তিনি, তা যেন জয়যুক্ত হয়। যেন এই দেশের ঘরে ঘরে প্রদীপের মঙ্গলশিখা আর শঙ্খধ্বনির কোমল শান্ত সন্ধ্যাটি ফিরে আসে। এছাড়া ইহজীবনে আর কিছুই চাই না তাঁর।

'অনুমতি দিন মিত্র,' গভীর আবেগে স্বর কাঁপতে থাকে সেই শ্রমণের, 'আমি শবরদেশের এই পর্ণ-বল্কল-পরিহিতা দেবীর নাম দিলাম দেবী পর্ণশবরী। এঁকে দেখে আমার গর্ভধারিণী ভগবতী দেবীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে মিত্র। অনুমতি দিন, আমি জনসাধারণ্যে দেবী সর্বশবরনাম ভগবতীর পূজা প্রচার করতে চাই।'

শোনামাত্র প্রথমে বাকরুদ্ধ হয়ে ছিলেন সেই সহজস্বভাব শবরটি, কয়েকমুহূর্ত পরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলন, 'বলো কী ভাই কমলশীল? আমাদের মেয়ে তোমাদের মতো ভদ্রজনের পূজাও পাবে? সে তো বড় আনন্দের কথা।'

'অবশ্যই মিত্র। ইনি সাক্ষাৎ শক্তি, দৈত্যদর্পনিসূদিনী দেবী চণ্ডী। আজ বঙ্গভূমির ভাগ্যে যে কালরাত্রি নেমে এসেছে, তা দূর করতে হলে এই বনভূমির, এই পার্বত্যদেশের, এই অরণ্যের আশীর্বাদ চাই।' আবেগাপ্লুত স্বরে বলছিলেন কমলশীল, আচার্য শান্তরক্ষিতের প্রিয়তম শিষ্য কমলশীল। 'সেইদিন আর বেশি দূরে নেই বন্ধু, যেদিন এই দেশের সাধারণ মানুষের বিদ্রোহে উৎখাত হবে এই অত্যাচারী, কামলোলুপা, উন্মাদবুদ্ধি রানির রাজত্ব। সেইদিন শবরদেশের এই করালবদনা শক্তিদায়িনী মেয়েটিকে আমাদের বড় প্রয়োজন হবে। আপনার অনুমতি আছে তো?'

কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন সিদ্ধাচার্য শবরবজ্র। তারপর কমলশীলকে ভীম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘শবর জনজাতি তোমাদের সঙ্গে আছে ভাই। প্রয়োজনে খবর দিও। এই দেশের নামে, আমাদের এই মেয়ের নামে আমাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু উৎসর্গ করলাম।’

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ। নালন্দা মহাবিহার, পাটলিপুত্র, মগধ।

পদ্মসম্ভব যখন সভায় প্রবেশ করলেন, সেই গভীর রাতেও অনেক লোক উপস্থিত। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের গেরুয়া পোশাক, মস্তক মুণ্ডিত। বোঝাই যায়—এঁরা নালন্দার ভন্তে বা অধ্যাপক।

বাকিদের দেখলে অবশ্য শ্রদ্ধা হওয়া মুশকিল। তাঁদের ময়লা পোশাক আর নোংরা দাড়িগোঁফ দেখলে বোঝা যায়, সমাজের নিম্নশ্রেণীতে এঁদের বাস। তাঁদের বসে থাকার ভঙ্গিতে কিন্তু কোনও হীনমন্যতা নেই। আশ্চর্য আর সহজ প্রশান্তি ছড়িয়ে আছে প্রত্যেকের শরীরে। উপস্থিত আছেন একজন নারীও। এই অঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মধ্যে প্রজ্ঞায় ও শীলে এই বিদুষী তরুণীটি অত্যন্ত সম্মানের পাত্রী।

তবে সকলের মধ্যে প্রথমেই দর্শকের মনোযোগ কেড়ে নেন যে দুজন, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঝলসে উঠছে শান্ত গাম্ভীর্য। তাঁদের একজন অপেক্ষাকৃত তরুণ, তিনি পরেছেন বৌদ্ধশ্রমণদের গেরুয়া পোশাক। মধ্য তিরিশের এই যুবকটির উজ্জ্বল চক্ষু দুটিতে গভীর প্রজ্ঞা ও অসামান্য মেধার চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে। অন্যজনকে দেখলেই বোঝা যায় ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। বয়সে প্রৌঢ় হলে কী হবে; বলিষ্ঠ শরীর, বিপুল পেশী এবং কঠিন দৃষ্টিতে সেটা পরিস্ফুট।

পদ্মসম্ভবকে সভায় ঢুকতে দেখে অনেকের মুখেই সসম্ভ্রম বিস্ময়ের ছায়া খেলে গেল। উদীয়ানের রাজকুমারের অবিশ্বাস্য কীর্তিকলাপের বিবরণ এখনই প্রায় অলৌকিক কাহিনির স্থান নিয়েছে। লোকে তো এমনও বলে যে, ইনি নাকি জন্মগতভাবেই গুহ্যজ্ঞানসিদ্ধ, অমিত ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অধিকারী। উদীয়ান ও লিচ্ছবীর জনসাধারণের কাছে ইনি স্বয়ং দ্বিতীয় অমিতাভ; কেউ কেউ এমনও বলে যে ইনি নিজেই অবলোকিতেশ্বর।

পদ্মসম্ভবের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে ছিলেন প্রৌঢ় ক্ষত্রিয়পুরুষটি। আহা, কী মনোহর রূপই না ঈশ্বর দিয়েছেন এই যুবককে। গাত্রবর্ণ ঘোর তাম্রাভ, টানাটানা চক্ষে যেন স্বয়ং ব্রজের বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ। ঘন কুঞ্চিত চুল, নাক সামান্য চাপা, দুই বাহু আজানুলম্বিত।

পদ্মসম্ভব ঢুকেই প্রণত হলেন শ্রমণের সামনে, শ্রদ্ধাভরে বললেন, ‘মাতা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, ভারতভূমির শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত আচার্য শান্তরক্ষিতকে আমার প্রণাম।’

আসন হতে দ্রুত উঠে এসে পদ্মসম্ভবকে গভীর আলিঙ্গনে বুকে টেনে নিলেন শান্তরক্ষিত। তিনি বড় স্নেহ করেন অমিত শক্তিধর এই রাজকুমারকে। শুধু স্নেহ নয়, অনেকখানি শ্রদ্ধাও তার সঙ্গে মিশে থাকে। সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, ‘সব কুশল তো রাজকুমার? যে কঠিন কাজের জন্য আপনাকে তিব্বতে পাঠানো হয়েছিল, তা সুসম্পন্ন হয়েছে? আমার প্রিয় শিষ্য কমলশীল সুস্থ দেহে ফিরে এসেছে?’

‘তা আর পুরোপুরি সম্পন্ন হল কই? যে বটুয়াটির জন্য যাওয়া, সেটি হাতে পেয়েছি বটে, সঙ্গে একটি পত্রও ছিল। কিন্তু রাস্তায় আবার তিন অপোগণ্ডের সঙ্গে দেখা। ঠাণ্ডা মাথায় তাদের দুটো ভালো কথা বলতে গেলাম, অসভ্যের মতো দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এল! কী সমস্যা বলুন দেখি।’

‘সে কী! তারা কারা?’

‘কীসব উদ্ভট নাম, মনে নেই। পালের গোদাটির নাম বোধহয় মাশাং।’

‘মাশাং? তিব্বতের মহামন্ত্রী মাশাং? আপনি ঠিক শুনেছেন রাজকুমার? তিনি নিজে এসেছিলেন আপনাদের বাধা দিতে?’ শিহরিত স্বরে প্রশ্ন করেন অন্যতম শিষ্য হরিভদ্র।

‘হ্যাঁ তিনিই।’ বলেন পদ্মসম্ভব, ‘লোকটা যেমন মর্কট, তেমনই শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত করে। মাথায় খুব আলতো করে সামান্য একটা চাঁটি মেরেছি কি মারিনি, হাঁউমাউ করে সে কী চিৎকার।’

‘তারপর?’ প্রশ্ন করেন সেই ক্ষত্রিয় পুরুষ। পদ্মসম্ভবের কথা শুনে বেশ আমোদ বোধ করছিলেন তিনি।

‘তারপর? হুমম...’ ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করেন পদ্মসম্ভব, ‘দুটোর মুণ্ডু ওড়ালাম, আর একটার সঙ্গে কী করেছি মনে নেই। তবে দুঃখের কথা, পালের গোদা হাত ছেড়ে পালিয়ে গেল।’

‘মাশাং-এর ব্যবস্থা পরে করা যাবে, আর্য। কিন্তু আমার শিষ্য কমলশীল কোথায়? কেমন আছে সে?’ আচার্য শান্তরক্ষিত দৃশ্যতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

‘তাঁকে আর এত অবধি আনা গেল না আচার্য। তিনি বড় কাহিল হয়ে পড়েছেন। তাঁকে কজঙ্গলে রেখে এসেছি, সিদ্ধাচার্য শবরবজ্রের কাছে।’

‘কেমন আছে কমলশীল? তার কোনও ক্ষতি হয়নি তো?’

‘না, না, তিনি শারীরিকভাবে ঠিকই আছেন, মানসিকভাবে একটু...আসলে মাশাং তাঁকে বিশেষভাবে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছিলেন কিনা, তার বিবরণ শুনেই তিনি মানসিকভাবে একটু, মানে ইয়ে আর কী...সামান্য আহত হয়েছেন। অথচ বিচলিত হওয়ার কোনও কারণই ছিল না আচার্য। আমি তো সেই আপ্যায়নের বিবরণ শুনে বেশ আনন্দিত হই। কিন্তু আপনার শিষ্যটি এতই দুর্বলচিত্তের যে...’

‘আপ্যায়নের বিবরণ শুনতে পারি কি?’ সভ্যদের মধ্যে একজন বলেন।

‘আরে সেসব শুনে তো আমারই ইচ্ছে করছিল ওদের হাতে বন্দি হতে, বুঝলেন মিত্র ঢেণ্ঢন। ছাং নামের তিব্বতী সুরা আর চমরী গাইয়ের মাংস দিয়ে আপ্যায়নের শুরু, বুঝলেন তো? অতঃপর এক সুন্দরী বারবণিতার সঙ্গে কিছু উত্তেজক মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ...’

শুনেই বৌদ্ধ শ্রমণেরা সমবেতভাবে শিহরিত হলেন, ছিছিক্কারের শব্দে ভরে গেল সেই সভা। তথাগতের নামে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলেন আচার্য শান্তরক্ষিত। মুচকি হাসলেন প্রৌঢ় ক্ষত্রিয়।

কলরব থেমে যাওয়ার পর সভায় উপস্থিত একমাত্র ভিক্ষুণীর শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘আর্য পদ্মসম্ভব দেখছি সুন্দরী বারবণিতার সঙ্গে উত্তেজক মুহূর্ত কাটানোর ব্যাপারে বড়োই ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন!’

পদ্মসম্ভব প্রথমে লক্ষ করেননি ভিক্ষুণীটিকে। এবারে খুবই লজ্জিত হলেন তিনি, জিভ কেটে বললেন, ‘প্রব্রাজিকা মন্দর্ভাও উপস্থিত দেখছি। এহে। আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী আর্যা। প্রগলভতা মার্জনা করবেন।’

মন্দর্ভার কমনীয় মুখখানি কিঞ্চিত রক্তবর্ণ হল। সেটা রাজকুমার পদ্মসম্ভবের সঙ্গে লক্ষ করলেন আরেকজনও।

আচার্য শান্তরক্ষিত। রক্তের সম্পর্কে ভিক্ষুণী মন্দর্ভার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিনি!

আজ থেকে বেশ কয়েকমাস আগে এই রাজকুমারকে প্রথমবারের জন্য দেখেছেন মন্দর্ভা। নালন্দা মহাবিহারের বাইরে, গভীর অরণ্যের মধ্যে এক গোপন কুটীরে আয়োজন করা হয়েছিল এক মন্ত্রণাসভার। সেই সভায় রাজকুমার পদ্মসম্ভব এবং আচার্য শান্তরক্ষিতের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তিনিও।

সেই সভাতেই আচার্য শান্তরক্ষিত জানান যে, পোন পুরোহিতদের গোপন ভাণ্ডার থেকে দুটি অমূল্য সম্পদ চুরি করে আনার জন্যেই কমলশীলকে তিব্বত পাঠিয়েছেন তিনি। কমলশীল জানিয়েছেন যে তিনি সফল হলেও, তিব্বত থেকে পালিয়ে আসাটা খুবই বিপজ্জনক। চুরি টের পাওয়া মাত্র মাশাং এবং তার অনুগামী সামন্তরা খ্যাপা নেকড়ের মতো খুঁজে বেড়াবে তাঁকে। এখনও অবধি তিব্বতের সর্বত্র সম্রাটের শাসন চলে না, রাজধানীর বাইরে বেশিরভাগ অঞ্চলই সামন্তদের অধীনে। তাদের অনেকেই আবার পোন ধর্মের

পুরোহিত, মাশাং-এর কাছের লোক। ফলে বাইরের সাহায্য ছাড়া এই জিনিস তিব্বতের বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ সে সাহায্য এত গোপনে হতে হবে যে, কেউ যেন এই অভিযোগ না তোলে—গৌড় বা বঙ্গের বৌদ্ধরা তিব্বতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে।

বিপদ বুঝে গোপনে পত্র পাঠিয়েছেন কমলশীল। জানিয়েছেন যে—সেই দৈবী অস্ত্রদুটি যদি তিব্বতের বাইরে বার করে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে অন্য কোনও কৌশল অবলম্বন করতে হবে আচার্য শান্তরক্ষিতকে। সঙ্গে এ-ও জানিয়েছেন যে দৈবগতিতে তাঁর হাতে একটি আশ্চর্য পত্র এসে পৌঁছেছে। আচার্য শান্তরক্ষিতের সেই পত্রটি পাঠ করা আশু প্রয়োজন।

সেই সভাতেই আচার্য শান্তরক্ষিত রাজকুমার পদ্মসম্ভবকে অনুরোধ করেন এই কাজের দায়িত্ব নিতে। প্রস্তাব শোনামাত্র সহর্ষে সম্মত হন পদ্মসম্ভব। সব রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাঁর বরাবরই প্রবল উৎসাহ।

সেইদিন থেকে এই যুবককে দেখে নিজের সদ্য কৈশোর পেরোনো দেহে ও মনে এক আশ্চর্য চাঞ্চল্য অনুভব করেছেন মন্দর্ভা। গোপন মন্ত্রণাসভাটির পর থেকেই তাঁর নিভৃত স্বপ্নে বারবার হানা দিয়েছে এই আশ্চর্যবুদ্ধি পরিহাসপ্রিয় রাজপুত্র। সেই কিশোরীসুলভ চাঞ্চল্যের লক্ষণগুলিকে চিনে নিতে ভুল হয়নি তাঁর।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিক্ষুণী তিনি। তাঁর কী এমন চাপল্য শোভা পায়?

তার পর থেকেই লজ্জায় ও পাপবোধে বেশ কিছুদিন আক্রান্ত ছিলেন মন্দর্ভা। নিজেকে বহুবার শাসন করেছেন তিনি, কঠোর সাধনায় ডুবিয়ে দিয়েছেন। নিজেকে বলেছেন তাঁর পক্ষে এমন জাগতিক বাসনায় অভিভূত হওয়া ঘোরতর পাপ।

কিন্তু তবুও, তবুও যাবতীয় ঔচিত্যের কঠিন বাঁধন ভেঙে এই অনিন্দ্যসুন্দর রাজকুমারকে দেখামাত্র তাঁর তরুণী হৃদয় প্রদীপের মতো পুড়তে শুরু করে কেন? কেনই বা এঁর মুখে অন্য রমণীর কথা শুনে তাঁর হৃদয় সহসা ঈর্ষাজর্জর হয়ে পড়ে?

নিজেকে সংযত করলেন।

ইতিমধ্যে আচার্য শান্তরক্ষিত পদ্মসম্ভবকে তাঁর পাশেই যত্ন করে বসিয়েছেন। তারপর আচার্য প্রৌঢ় ক্ষত্রিয়পুরুষটির সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছিলেন রাজপুত্র পদ্মসম্ভবকে।

এই সময় সহসা খুলে গেল সভাগৃহের দরজা। ঝড়ের মতো সেখানে এসে দাঁড়ালেন এক দীপ্যমান পুরুষ। নবদুর্বাদলশ্যাম সেই পুরুষটি তাঁর আজানুচুম্বিত বাহুতে আর মায়া-ঢলোঢলো আয়ত চক্ষু দুটিতে যেন মর্ত্যধামে দ্বিতীয় বিষ্ণু। তাঁকে দেখেই সশ্রদ্ধায় উঠে দাঁড়ালেন সভায় উপস্থিত সকল সভ্য। আচার্য শান্তরক্ষিত কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত অভিবাদন জানালেন তাঁকে। উপস্থিত প্রত্যেকে করজোড়ে, অনিমেষ নয়নে দেখতে থাকলেন এই ঈশ্বরোপম মানুষটিকে।

যদিও তিনি সেসব নিয়ে বিন্দুমাত্র ব্যগ্র ছিলেন না। সাগ্রহে প্রশ্ন করলে, 'ফিরেছে কমলশীল? পেরেছে সে? তিব্বত থেকে সেই অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্র দুটি নিয়ে আসতে পেরেছে? তাহলে কি চূড়ান্ত সংগ্রামের সময় এসে গেছে শান্তরক্ষিত?'

সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন আচার্য, 'হ্যাঁ লোকেশ্বর, আপনার আশীর্বাদে সবই নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন, প্রভু। আজকে আমাদের অভ্যুত্থানের শেষ পর্যায়টির পরিকল্পনার দিন। আমরা আজকের সভা সেই কারণেই আহ্বান করেছি।'

তারপর সভার দিকে ফিরে আচার্য শান্তরক্ষিত শান্তকণ্ঠে বললেন, 'যাঁর জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, অবশেষে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরই আদেশে, তাঁরই প্রদর্শিত পথে আমরা অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ব্রতী হয়েছি।' এই বলে তিনি ফিরে তাকালেন সেই মহাপুরুষটির দিকে, তারপর ভক্তিনম্রস্বরে বললেন, 'হে প্রভু মহাযোগী লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ! আমাদের মতো অভাজনদের আপনিই পথ দেখান।'

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ। নালন্দা মহাবিহার, পাটলিপুত্র, মগধ।

'এই ভাবে চলতে পারে না। আর কতদিন, আর কতদিন আমাদের এই অত্যাচার সহ্য করে যেতে হবে লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্র?' ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন মহাযোগী কাহ্ন।

কয়েকদিন আগে নিজের চোখে যে ধ্বংসলীলাটি দেখে এসেছেন, এইমাত্র সবার সামনে সে কাহিনি বলেছেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। সভার পরিবেশ এখন অগ্নিগর্ভ। ক্ষোভে ও ক্রোধে ফুঁসছেন প্রতিটি সভ্য। স্থির বসে আছেন আচার্য শান্তরক্ষিত। সচরাচর যিনি সামান্য লঘু মেজাজে থাকেন সেই পদ্মসম্ভবও চুপচাপ। প্রৌঢ় ক্ষত্রিয় মেরুদণ্ড সোজা করে বসে আছেন, যেন আদেশমাত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

উঠে দাঁড়ালেন ভিক্ষুণী মন্দর্ভা! উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে তাঁর, 'আচার্য, আপনি এখনও শান্ত হয়ে বসে আছেন? আপনি এখনও বলবেন অপেক্ষা করতে? এখনও বলবেন উপযুক্ত সময় আসেনি? এখনও বলবেন যে, হঠকারিতার ফল ভালো হয় না? অনুমতি দিন আচার্য, দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক মানুষজনের মধ্যে, দেশের প্রাকৃতজনের মধ্যে আমরা গোপনে যে সংগঠন গড়ে তুলেছি তাদের বলি অস্ত্রধারণ করতে। ভেসে যাক, পুড়ে যাক, জ্বলে ছাই হয়ে যাক এই মৃত্যুভূমি।' জোরে জোরে শ্বাস ফেলছিলেন।

উঠে দাঁড়ালেন অনেকেই, প্রত্যেকেই উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ। কোলাহলে কারও কথাই স্পষ্ট করে শোনা যাচ্ছিল না। এবার উঠে দাঁড়ালেন আচার্য শান্তরক্ষিত। দুহাত তুলে প্রত্যেককে শান্ত হতে বললেন।

'না, ভিক্ষুণী মন্দর্ভা!' সহোদরাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অপেক্ষার কাল শেষ হয়েছে, সেই জন্যেই এই সভা আহ্বান। যে উদ্দেশে আমি আমার প্রিয়শিষ্য কমলশীলকে সুদূর তিব্বতে পাঠিয়েছিলাম, তা সফল হয়েছে। চূড়ান্ত আঘাত হানবার এবার সময় এসেছে। আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

'আচার্য, কোন উদ্দেশে কমলশীলকে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন—জানতে পারি?' এই প্রথম কথা বললেন সেই ক্ষত্রিয়পুরুষ।

কিছুক্ষণ মৌন থাকলেন আচার্য শান্তরক্ষিত। তারপর মুখ তুলে বললেন, 'খুলেই বলি তাহলে।

'আপনারা জানেন যে, এই মুহূর্তে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আসীন এক উন্মাদ ও কামলোলুপা রানি। যদিও প্রকৃতপক্ষে আসল ক্ষমতা প্রকাশচন্দ্র নামের সেই ঐন্দ্রজালিকটির হাতে। নির্বোধ রানিকে হাতের পুতুল সাজিয়ে এই রাজত্ব তিনিই ভোগ করছেন।

এই প্রকাশচন্দ্র প্রেতসিদ্ধ পুরুষ। তিব্বতী পোন ধর্মের পুরোহিতদের কাছ থেকে জটিল সব পিশাচসাধনা শিখে এসেছেন তিনি।

শোনা যায় মহাচীনের কোনও এক মন্ত্রসিদ্ধা রাজ্ঞীর কাছে বহুবিধ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি। এছাড়াও তাঁর কিছু নিজস্ব জন্মলব্ধ অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাও আছে।

তিব্বতের রাজদরবারের সামন্তদের যে অংশটি তীব্রভাবে ভারত তথা বৌদ্ধ বিরোধী, তাদের সঙ্গে প্রকাশচন্দ্রের গোপন ষড় আছে। আজ থেকে নয়, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে।'

'পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে?' অত্যন্ত বিস্মিত হলেন সিদ্ধাচার্য ঢেণ্ঢন, 'তাহলে তাঁর বয়স কত? তাঁকে দেখলে তো বৃদ্ধ বলে মনে হয় না!'

'সেটাই তো আশ্চর্যের কথা মিত্র ঢেণ্ঢন! গণনা করে দেখলে আজ প্রকাশচন্দ্রের বয়স হওয়া উচিত একশোর কাছাকাছি। অথচ তাঁকে দেখলে তাঁর বয়স চল্লিশ বা পঞ্চাশ মনে হয়।'

'তোমরা যত সাধারণ ভাবছ, ইনি তত সাধারণ মানুষ নন।' গম্ভীরমুখে বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। 'শুধুমাত্র প্রেতসাধনায় এই ক্ষমতা জন্মায় না। অষ্ট-মহাসিদ্ধি ভিন্ন এই শক্তি অর্জনের ক্ষমতা কারও নেই। তার উপর

ইনি দশ উপসিদ্ধিতে মহারথী। কোনো এক অজানা পৈশাচী প্রকরণে ইনি নিজের আয়ুবন্ধন করে রেখেছেন। জৈবিক নিয়মে এঁর বয়সও বাড়বে না আর অপঘাত মৃত্যু ব্যতীত এঁর মৃত্যুও হবে না।'

সবাই চুপ করে রইলেন। পুনরায় বলতে শুরু করলেন মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'যে রানিকে প্রকাশচন্দ্র রাজাসনে বসিয়েছেন, ইনিও কোনও সামান্য নারী নন। বেতালসিদ্ধ প্রকাশচন্দ্রের ভৈরবী ইনি, তাঁর পিশাচসাধনার সঙ্গিনী। এঁরও সাধনলব্ধ ক্ষমতা কম নয়।

এই রানি যে শুধু অত্যন্ত কামলোলুপা তাই নয়। প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় এই পিশাচীর একটি করে নতুন যুবক চাই, চাই তার রাতের কামতৃষ্ণা মেটাতে। আর তারপর যা হওয়ার তাই হয়।'

'কী হয়?' প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব। ভ্রুকুটি করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন মন্দর্ভা।

ম্লান হাসলেন আচার্য, 'পরের দিন সকালে সেই হতভাগ্যের মৃতদেহ পাওয়া যায় রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে।'

কিন্তু—, প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব, 'কিন্তু সব জেনেশুনেও যুবকরা বারবার কেন যায়?'

'যায় রাজা হওয়ার লোভে।' তিক্তস্বরে বললেন ক্ষত্রিয় পুরুষটি, 'রাজ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, যে যুবক একটি পূর্ণ রাত্রি এই নারীকে রতিরমণে তৃপ্ত করে পরদিন প্রভাত অবধি জীবিত থাকবে, সেই হবে বঙ্গদেশের পরবর্তী সম্রাট। রানি আর রাজত্ব একসঙ্গে পাওয়ার লোভে কত শত যুবকের যে প্রাণ গেছে—তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

'এই প্রকাশচন্দ্র দুটি ভয়াবহ সর্বনাশ করেছেন দেশের। প্রথমটি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। দেশের এই অরাজক অবস্থাই তার প্রমাণ। ন্যায়ের শাসন বলে কোথাও আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশেষত দরিদ্র কৃষক এবং অন্ত্যজদের তো কথাই নেই। প্রায় না-খেয়ে বেঁচে আছে তারা। অপেক্ষাকৃত ধনী যারা, তাদের অবস্থাও সুবিধার নয়। গায়ের জোরই এখন ক্ষমতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে যখন পারছে অন্যের সম্পত্তি গ্রাস করে নিচ্ছে।' বলতে থাকেন শান্তরক্ষিত, 'আর দ্বিতীয়টি আরও সাঙ্ঘাতিক।

'পোন ধর্মের যাবতীয় ঘৃণ্য উপচার আর সাধনপদ্ধতি তিনি সদ্ধর্মের নামে, বিজ্ঞানবাদের নামে বৌদ্ধতন্ত্র বলে চালাচ্ছেন। এমন অদ্ভুত সব শাস্ত্র লিখেছেন যার বহিরঙ্গে মহাযানপন্থার কথা, অথচ আদতে সেগুলি পোন ধর্মের অশ্লীল সাধনপদ্ধতির আচারসংহিতা। এখন এমন হয়েছে যে, বঙ্গভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তন্ত্রসাধনার নামে অসভ্য আর ইতর কাজকর্মের বাড়বাড়ন্ত। আশ্চর্য ধূর্ততার সঙ্গে পোন ধর্মের মূল সূত্রগুলিকে এদেশের তান্ত্রিক আচার বলে চালিয়ে দিয়েছে প্রকাশচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা।'

'কিন্তু তাতে লাভ কী?' বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করেন ভন্তে প্রজ্ঞারশ্মি।

'সদ্ধর্মকে দুর্বল করা, আবার কী!' উত্তর দেন শান্তরক্ষিত।

'কিন্তু তাতেই বা প্রকাশচন্দ্রের সুবিধা কীসের?' সংশয় যায় না প্রজ্ঞারশ্মির।

'ভুলে যেও না প্রজ্ঞারশ্মি, প্রকাশচন্দ্রকে এই দেশের রাজত্ব পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কিন্তু তিব্বতের সামন্তচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গার বংশের তিরিলিং। গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরেই তিব্বতে সম্রাট আর সামন্তদের মধ্যে ক্ষমতাদখলের বিবাদ চলছে। যেহেতু সামন্তচক্রের বেশিরভাগই পোন ধর্মাবলম্বী, তাই তিব্বতের সম্রাটরা আঁকড়ে ধরেছেন বৌদ্ধধর্ম। আরও ভালো করে বলতে গেলে—ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম। এই সংগ্রাম যতটা ধর্মীয়, ততটাই রাজনৈতিকও বটে। এদেশের বৌদ্ধরা, বৌদ্ধপণ্ডিতরা চিরকালই তিব্বতের সম্রাটদের নৈতিক শক্তি যুগিয়ে এসেছেন। তাই বঙ্গভূমিতে সদ্ধর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করা না-গেলে তিব্বতে সম্রাটদের দুর্বল করা যাচ্ছিল না।' একটানে এত কথা বলে চুপ করলেন শান্তরক্ষিত।

'তবে এই অরাজক অবস্থা আর বেশিদিন নেই। আমাদের অভ্যুত্থান এবার শেষ পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত, বন্ধুরা। শুধুমাত্র দুটি জিনিসের অভাবে আমরা চূড়ান্ত সংগ্রামে নামতে পারছিলাম না, আদিনাথের অসীম অনুগ্রহে আজ সেই দুটিই আমাদের হাতে।' প্রসন্নস্বরে বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

‘সে দুটি কোন বস্তু, লোকনাথ?’ প্রশ্ন করলেন মন্দর্ভা।

‘তিব্বত থেকে যে দুটি বস্তু এত যত্ন করে নিয়ে এলাম তাদের কথাই বলছেন নিশ্চয়ই?’ বলতে বলতে পরনের অঙ্গবস্ত্রটির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি বড় চামড়ার বটুয়া বের করে এনে আচার্য শান্তরক্ষিতের হাতে দিলেন পদ্মসম্ভব। তারপর বললেন, ‘ভ্রাতা কমলশীল একটি পত্রও পাঠিয়েছেন আপনার উদ্দেশে। পত্রটি চৈনিক ভাষায় লিখিত। তবে তার তিব্বতীয় অনুবাদও আছে। রাজপুত্র ঠ্রিসং দেচেন স্বয়ং নিজের হাতে অনুবাদ করেছেন।’

ভ্রুকুঞ্চন করলেন শান্তরক্ষিত। এমন কী গোপনীয় পত্র যা কী না স্বয়ং রাজকুমারকে অনুবাদ করতে হয়, অন্য কাউকে দিয়ে করানো যায় না?

তিব্বতী লিপি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেন শান্তরক্ষিত। তিনি পত্রটি নিয়ে পোশাকের মধ্যে রাখলেন। তারপর বললেন, ‘হ্যাঁ, রাজকুমার। এই দুটি দৈবী অস্ত্র ছাড়া প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে সেই রানিকে হত্যা করা অসম্ভব। তাঁকে ঘিরে থাকে বেতালসিদ্ধ প্রকাশচন্দ্র আর তার ঘনিষ্ঠ বৃত্ত। রানি নিজেও বিষশাস্ত্রে মহাকুশল।’

‘বিষশাস্ত্রে মহাকুশল মানে? ইনি কি বিষ খাইয়ে মারেন নাকি?’ প্রশ্ন করেন পদ্মসম্ভব।

কিছুক্ষণ চুপ থাকেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, ‘হ্যাঁ রাজপুত্র, চুম্বনবিষ। সে বিষের কোনও প্রতিষেধক আমাদের জানা নেই। আর সেই বিষকন্যার হাতছানি এড়ায় এমন পুরুষ এ জগৎসংসারে নেই।’

সবাই চুপ করে গেল। ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব, ‘কেন প্রভু?’

‘কারণ তিনি মানুষ নন, আর্য। তিনি বেতালসিদ্ধ প্রকাশচন্দ্রের নিজের হাতে গড়া এক প্রেতিনীবিশেষ। অতি দুর্লভ বিষপিশাচ সাধনায় এই নাগিনীকে তিলে তিলে প্রস্তুত করেছেন প্রকাশচন্দ্র। চৌষট্টি কামকলায় মহাসিদ্ধা তিনি। অজগর যেমন অনায়াসে নির্বোধ ছাগশিশু উদরসাৎ করে, তেমন ভাবেই হতভাগ্য লোভী যুবকদের গ্রাস করেন এই রানি। রাত্রিভর নিরবচ্ছিন্ন কামকেলির পর হতভাগ্য যুবক যখন ভাবে—এই তো, আর তো কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, তারপরেই সে বঙ্গদেশের একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট। আর ঠিক তখনই সেই রানি আবার কণ্ঠলগ্না হন তাঁর, দয়িতকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেন...আর তারপর...’

‘তারপর কী, লোকেশ্বর?’ শ্বাস বন্ধ করে প্রশ্ন করেন পদ্মসম্ভব।

‘তারপর সেই নাগিনী চুম্বনের ছলে শরীরে জমে থাকা সমস্ত পাপ, সমস্ত হিংসা, সমস্ত ক্রোধ সেই হতভাগ্যের শরীরে ঢেলে দেন।’

নিস্তব্ধ সভা, সূঁচ পড়া নৈঃশব্দ্য।

‘কিন্তু এই প্রকাশচন্দ্র যখন রাজত্ব দখলে চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁকে আটকাবার চেষ্টা করেনি কেউ?’ প্রশ্ন করলেন একজন গৌরবর্ণ তরুণ।

‘হ্যাঁ মিত্র গোরক্ষ, করেছিলেন অনেকেই।’ গম্ভীরমুখে বললেন আচার্য শান্তরক্ষিত,’ তবে তাঁদের মধ্যে একজনই সোচ্চার প্রতিবাদের মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই সভার রাজপণ্ডিত এবং তৎকালীন বঙ্গসম্রাট রাজভটের ঘনিষ্ঠ বয়স্য। প্রখর জ্ঞানের অধিকারী সেই মানুষটি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এই সর্বনাশ আটকানোর। তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হননি।

তবে আমি মনে করি, যিনি এই বিষয়ে সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন তাঁকেই অনুরোধ করছি বিস্তারিতভাবে বলবার জন্য।’ এই পর্যন্ত বলে ক্ষত্রিয় পুরুষটির দিকে ফিরলেন আচার্য শান্তরক্ষিত, ‘আর্য বপ্যট, আপনিই এ ব্যাপারে যা বলার বলুন।’

নামটি শোনামাত্র সভায় উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে কৌতূহলের ঢেউ খেলে গেল। প্রতিটি মানুষ উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইলেন এই প্রৌঢ়ের দিকে।

উঠে দাঁড়ালেন সেই মহাবলশালী প্রৌঢ় ক্ষত্রিয়। নম্রসুরে বললেন, ‘আচার্য আমার থেকে বয়সে ছোট হলে কী হবে, জ্ঞানে বয়োবৃদ্ধ বটে। ফলে তাঁর আদেশ শিরোধার্য। তবে যে কাহিনির কথা তিনি বলতে চেয়েছেন

সে অনেকাল আগের কথা। আমি নিজে তখন দশ বছর বয়সি এক বালক মাত্র। তবে সেইদিন থেকে যে অপমানের বোঝা আমাকে সারা জীবন বয়ে চলতে হয়েছে তার তুলনা নেই।'

'আপনি কে?' সটান প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব।

এইবার ভিক্ষুণী মন্দর্ভার রাগত চক্ষু দেখে মনে হল যেন এই প্রগলভ রাজপুত্রকে এখনই চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে সুরধুনী গঙ্গায় বেশ ভালো করে চুবিয়ে আনতেন।

'আমি কে?' কৌতুকস্বরে প্রতিপ্রশ্ন করলেন সেই ক্ষত্রিয়টি, 'তাহলে শুনুন রাজকুমার, আমার নাম বপ্যট। আমি একজন যুদ্ধব্যবসায়ী। আমার পিতার নাম আচার্য দয়িতবিষ্ণু।'

সভাস্থল স্তব্ধ। যোগী ঢেণ্ঢন বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'দয়িতবিষ্ণু? মানে পণ্ডিতপ্রবর দয়িতবিষ্ণু? সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু? খড়্গসম্রাট রাজভটের সেই কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণপুরুষ?'

'হ্যাঁ মিত্র, তিনিই।' স্মিতহাস্যে উত্তর করলেন বপ্যট।

'কিন্তু তিনি...তিনি তো শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, আচার্য ছিলেন!' উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান গোরক্ষ নামের গৌরবর্ণ তরুণটি, 'তাঁর সন্তান কী করে ক্ষত্রিয় যুদ্ধব্যবসায়ী হয়?'

'সেই কাহিনিটি খুলে বলার জন্যেই তো আমাকে এখানে ডাকা হয়েছে, মিত্র গোরক্ষ।' বপ্যটের কণ্ঠ বড়ই শান্ত, 'আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সম্রাট বলভটের রাজসভায় যে রহস্যসূত্র আমার পিতৃদেব বিছিয়ে দিয়ে এসেছিলেন, আজ আমি সেই সুতোগুলি যথাযথভাবে গুটিয়ে রাখতে এসেছি।'

মহর্ষি মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রিয়তম শিষ্য গোরক্ষনাথ বিভ্রান্তমুখে নিজের আসনে বসে পড়লেন। উৎসুক হয়ে রইলেন বাকি সভ্যরা।

'সম্রাট বলভটের সেই সভায় কী হয়েছিল, তার প্রতিটি খুঁটিনাটি আপনারা প্রত্যেকে জানেন। সভার সেই কাহিনি পল্লবিত হতে হতে এখন প্রায় রূপকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারাও জানেন—কোন অপবাদের বোঝা মাথায় দিয়ে আমার পিতৃদেবকে সেই রাজসভা থেকে বিতাড়িত করা হয়।'

'শুধু পণ্ডিত দয়িতবিষ্ণু কেন? সেই সভার পরপরই বিতাড়িত হন মহামাত্য বুদ্ধকীর্তি, তাঁকে নির্বাসিত করা হয় বঙ্গদেশের একদম দক্ষিণে, এক অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে। পণ্ডিত দয়িতবিষ্ণুকে নিরাপদে বঙ্গদেশের সীমান্ত পার করে দিয়ে ফেরত আসার পথে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন সৈন্যাধ্যক্ষ আনন্দদত্ত। দণ্ডনায়ক বিশালকীর্তির প্রকাশ্যে মুণ্ডচ্ছেদ করা করা হয় দেশদ্রোহিতার অপরাধে।' বলতে বলতে কণ্ঠরোধ হয়ে গেল মহর্ষি মৎসেন্দ্রনাথের।

সমগ্র সভাস্থল প্রস্তরস্তব্ধ।

'আপনারা এ-ও জানেন যে সেই সভায় আমার মা, পুণ্যশ্লোকা ভদ্রকল্যাণীদেবীর নামে খুবই অশ্লীল অভিযোগ তোলা হয়। বলা হয় যে, তিনি নাকি আমার পিতৃদেবের প্ররোচনায় সম্রাট রাজভটের অঙ্কশায়িনী হন। আমি সেই অবৈধ মিলনের ফল।'

এ কথা বলার সময়েও কোনও অস্থিরতা প্রৌঢ় যোদ্ধাটির কণ্ঠে ফুটে ওঠে না। বোধহয় সারা জীবন ধরে প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে এইসব কথা শুনতে তাঁকে আজ আর গ্লানি স্পর্শ করে না।

'সে কাহিনিও তো আমাদের জানা, ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ বপ্যট। আমরা এও জানি, যে আর্যা ভদ্রকল্যাণী আপনার গর্ভধারিণী নন। ফলে অসতীত্বের পাপ তাঁর ওপর অর্শায় না। তবে কে আপনার মাতা, ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ বপ্যট? দয়া করে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করুন।' অনুরোধ আসে এক অত্যন্ত শান্ত ও ধীরস্বভাব সভ্যের কাছ হতে। হরিদ্রাভবর্ণ পুরুষটির নাম জালন্ধর।

'বলছি, মিত্র জালন্ধর। আজই এই রহস্যের উন্মোচনের হবে। অনেক লম্বা কাহিনি, আমি সংক্ষেপে বলছি।'

'আমার মা যখন গর্ভবতী হন, তার কিছুকাল আগে সম্রাট রাজভট বরেন্দ্রীতে আসেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে রাজমাতা প্রভাবতীদেবী কৈবর্ত-প্রধানের মেয়ে ছিলেন। যদিও বরেন্দ্রী সম্রাটের রাজ্যের মধ্যে পড়ত না, তবুও তিনি কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক কারণে এসেছিলেন। সেই কারণ এতদিন পর জানবার আর কোনও উপায়ই নেই।

'সেখানে এক কৈবর্তকন্যার সঙ্গে সম্রাটের প্রণয় হয়। প্রায় মাসখানেক ধরে সেই ঘোর প্রণয়পর্ব পার করে সম্রাট রাজভট তাঁর রাজ্যে ফিরে যান, প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান—শীঘ্রই তিনি ফিরে এসে সেই মেয়েটিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিয়ে যাবেন রাজ-অন্তঃপুরে।

'সম্রাট রাজভট তখনই বিবাহিত, অসামান্য সুন্দরী তিব্বতরাজকান্তা তাঁর ঘরণী। বিবাহের পর শ্যালক চারুদত্তকে তিনি রাজসচিব পদে নিয়োগ করেছেন। স্ত্রী ও শ্যালকের প্রবল চাপে সম্রাট রাজভট পিছিয়ে এলেন তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে। দূত পাঠিয়ে তিনি সেই অভাগা কৈবর্তকন্যাকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁকে বিবাহ করতে পারছেন না।'

সভার সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন বপ্যট, তারপর বলতে লাগলেন, 'সম্রাটের দূত যখন বরেন্দ্রী পৌঁছয়, তখন সেই কৈবর্তকন্যা গর্ভবতী। কৈবর্তসমাজে এ নিয়ে বিপুল ক্ষোভ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে সংবাদ সম্রাটের কাছে পৌঁছতে দেরি হয়নি। তখন ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান আমার পিতৃদেব। তাঁরই বুদ্ধিতে তখনকার মতো পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হয়।'

'কীভাবে?' উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেন ভন্তে সিংহহনু।

'আমার মা ভদ্রকল্যাণীদেবীর পিতৃগৃহ ছিল বঙ্গভূমি আর বরেন্দ্রীর সীমান্তে, কুমারহট্ট বলে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। প্রসবের সময় আমার মা সেখানেই ছিলেন। অতি গোপনে সেই কৈবর্তকন্যাকে বরেন্দ্রী থেকে আমার মামার বাড়িতে আনা হয় এবং সেখানেই তাঁর সেবাযত্ন হয়।

'দৈবী অনুগ্রহে আমার মা এবং সেই অনামা কৈবর্ত রমণী একই দিনে সন্তান প্রসব করেন। ভাগ্যদোষে আমার মায়ের একটি মৃতসন্তান জন্মায়। আর কৈবর্ত রমণীটি একটি অতি সুস্থ ও সবল পুত্রসন্তানের জন্ম দেন।'

'কে সেই পুত্রসন্তান?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলেন ভিক্ষুণী মন্দর্ভা।

'সে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর্যা।' ম্লান হেসে জানালেন বপ্যট, 'আমিই সেদিনের সেই বেঁচে থাকা শিশু। সম্রাট রাজভটের সন্তান আমি। তাঁরই ঔরসে, এই দেশের এক সাধারণ রমণীর গর্ভে আমার জন্ম।'

সমস্ত সভাগৃহে অস্বাভাবিক নীরবতা। একমাত্র মৎস্যেন্দ্রনাথ ছাড়া বাকিরা প্রত্যেকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাহিনিটি পরিপাক করার চেষ্টা করছেন।

'আর্য বপ্যট, আপনার কাহিনিটি শুনলাম,' অত্যন্ত গম্ভীরমুখে প্রশ্ন করেন পদ্মসম্ভব, যা একেবারেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, 'শুধু একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর দিন আমাকে। আপনি তো সম্রাট রাজভটের সন্তান। তবুও বার বার আপনি আচার্য দয়িতবিষ্ণু এবং আর্যা ভদ্রকল্যাণীকেই নিজের পিতামাতা বলে উল্লেখ করছেন কেন?'

'কারণ আমি মনে করি আমার আসল পিতা আচার্য দয়িতবিষ্ণু এবং মাতা আর্যা ভদ্রকল্যাণী, যাঁরা আমাকে অপার স্নেহ এবং ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করেছেন। সম্রাট রাজভট কোনওদিন আমাকে তাঁর সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি দেননি, আর আমার গর্ভধারিণীকে তো কোনওদিন চোখেই দেখলাম না। দয়িতবিষ্ণু বা ভদ্রকল্যাণী, কেউই কোনওদিন আমাকে অন্যের সন্তান বলে ভেদবিচার করেননি, নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছেন। তাঁদের আমার পিতামাতার সম্মান না দিলে যে মহাপাতকী হব!'

'আপনি ধন্য, আর্য বপ্যট,' সহর্ষে বলে উঠলেন পদ্মসম্ভব, 'সেই গর্ভ ধন্য—যা আপনাকে নয়টি দীর্ঘ মাস ধারণ করেছিল; সেই স্তন্যসুধা ধন্য—যা আপনাকে জীবনদান করেছে। একজন নয়, দুই-দুইজন বঙ্গমায়ের

কোল আলো করেছেন আপনি। আপনার মতো সৌভাগ্যবান আর কে আছেন, আর্য বপ্যট?'

'সেই কৈবর্তকন্যার কী হল? কোথায় গেলেন তিনি?' স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করেন মন্দর্ভা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বপ্যট, 'জানি নে ভদ্রে। তাঁকে আমি কোনওদিনও দেখিনি। আমার জন্ম দিয়ে তিনি নিঃশব্দে মিশে গেছিলেন তাঁর সমাজে, লোকলজ্জার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই নিশ্চয়ই। পিতা দয়িতবিষ্ণু যখন খড়্গ রাজসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে বরেন্দ্রীতে ফিরে আসেন, তখন গোপনে অনেক বার তাঁর খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু তখন তিনি মিলিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতলে। কেউই তাঁর সংবাদ দিতে পারেনি। শুধু এইটুকু জেনেছি যে, তাঁর নাম ছিল যশোধরা।'

'মিত্র বপ্যট, আপনার কি এখনও কৌতূহল আছে জানার জন্যে যে তিনি কোথায় আছেন? কী করছেন?' প্রশ্ন করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

'নেই বললে মিথ্যা বলা হবে প্রভু। এককালে ছিল না। কিন্তু এখন এই প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে মনে হচ্ছে—একবার যদি আমার গর্ভধারিণীর দেখা পেতাম, তাহলে বড় ভালো হতো। কৈশোরে বা যৌবনে ভারি অভিমান ছিল তাঁর ওপর। এখন আমার বয়স হয়েছে, আজ বুঝি, কোন পরিস্থিতিতে আমাকে ত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।'

'আজ আমি যদি আপনার গর্ভধারিণীর সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিই ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ বপ্যট, তাহলে বিনিময়ে কী পুরস্কার আশা করতে পারি?' সহাস্যে ও সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠলেন বপ্যট। তাঁর কঠোর চোখ দুটিতে আশ্চর্য ব্যাকুলতা। রুদ্ধ স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'কী বললেন লোকেশ্বর? অনুগ্রহ করে আবার বলুন! আপনি চেনেন আমার গর্ভধারিণীকে? তিনি বেঁচে আছেন? আপনি জানেন—তিনি কোথায় আছেন? কীভাবে আছেন?'

'জানি আর্য বপ্যট। আমার থেকে ভালোভাবে আর কেউ জানে না।' স্থিরোদাত্ত স্বরে উত্তর করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

'আপনারা তো জানেন আমার জন্মবৃত্তান্ত।' শান্তস্বরে বলতে শুরু করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'জন্মমুহূর্তেই পিতামাতা ত্যাগ করেন আমাকে। আমার কৈবর্ত ধাইমা'টি আমাকে লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসেন তাঁর নিজের গ্রামে। সেখানেই তিনি আমাকে সস্নেহে লালপালন করেন। আমার কাহিনিইও আপনার মতোই, মিত্র বপ্যট। আজ আমি যে শরীর নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সে শরীরের জন্ম দিয়েছেন একজন, কিন্তু মাতৃস্নেহধারায় পুষ্ট করেছেন অন্য কেউ। তাঁকে আমি আমার ঈশ্বরী জ্ঞান করি। শুনুন আর্য, আপনি যে হতভাগিনীর স্নেহচ্ছায়া থেকে জন্মাবধি বঞ্চিত, আদিনাথের অসীম অনুগ্রহে তিনিই আমার মাতা। আপনাকে হারিয়ে যে আক্ষেপ ছিল তাঁর, সেই দুঃখ ভুলতে আজীবন তাঁর বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও ভালোবাসা আমার ওপর ঢেলে দিয়েছেন তিনি। যে স্নেহসুধাধারা ন্যায্যত আপনার প্রাপ্য ছিল, আজীবন আমিই সেই ঝরনাধারায় স্নান করে এসেছি—হে ক্ষত্রপতি! আমরা একই মায়ের সন্তান!' ধীর স্বরে বলছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, আবেগে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠেছিল।

সভায় যেন একটা বিস্ময়, আনন্দ আর উল্লাসের বিস্ফোরণ ঘটে গেল। স্তম্ভিত ও বিহ্বলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন অনেকেই। দুহাতে মুখখানি চাপা দিলেন ভিক্ষুণী মন্দর্ভা, মুক্তাবিন্দুর মতো দুফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর আঁখিদুটি থেকে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নিজের মাথায় আঘাত করলেন পদ্মসম্ভব, আনন্দে, বিস্ময়ে জালন্ধরনাথের হাত চেপে ধরলেন ভন্তে সিংহরশ্মি। প্রায় উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলেন কাহ্ন, 'কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! এ আমি কী শুনলাম! হা ঈশ্বর! এ কী লীলা তোমার।' সিদ্ধাচার্য ঢেণ্ঢন দু'হাত মাথার ওপর তুলে আনন্দে নাচতে লাগলেন। বিস্ময়বিমূঢ় শাক্যভদ্র বললেন, 'ধন্য হল এই সঙ্ঘারাম, ধন্য হল এই মহাবিহারের পুণ্যমৃত্তিকা। ধন্য হলাম আমরা। এবার বুঝলাম যে তথাগত আমাদের সহায়, এই সংগ্রামে আমাদের জয় নিশ্চিত।'

কোলাহল সামান্য কমে এলে আবার বলতে শুরু করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'এখন অনেক বয়স হয়েছে আমার মায়ের। প্রবল অসুস্থ তিনি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আর খুব বেশিদিন তিনি বেঁচে থাকবেন না।' এই পর্যন্ত বলে থামলেন তিনি, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'কয়েকদিন আগেই আমার মা তাঁর কাছে ডাকেন আমাকে। তিনি জানান যে ডাক এসেছে তাঁর, আর হয়তো কয়েকটা মাত্র দিনের অপেক্ষা। জীবনে যা পেয়েছেন আর যা পাননি—তা নিয়ে তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ বা বেদনা নেই আর। নশ্বর জীবনের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়ার ওপারে চলে গেছেন তিনি।

'শুধু একটি মাত্র অপূর্ণ ইচ্ছা রয়ে গেছে তাঁর জীবনে। সেটি পূর্ণ হলেই শান্তিতে চোখ বুজতে পারেন তিনি।'

'কী সেই ইচ্ছা, প্রভু?' প্রশ্ন করলেন আচার্য শান্তরক্ষিত।

'সেই দিনই তিনি আমাকে জানান তাঁর প্রথম যৌবনের কাহিনি; জানান সম্রাট রাজভটের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের গল্প। আর্য বপ্যট, তিনি এখনও ভোলেননি তাঁর নাড়ীছেঁড়া রক্তপুত্তলিটিকে, তাঁর প্রথম সন্তানকে। তিনি এখনও মনে রেখেছেন আপনাকে। তিনি চান মৃত্যুর পূর্বে একবার তাঁর প্রথম সন্তানের মুখদর্শন করতে। এবার আপনি বলুন আর্য, আপনি কি সত্যই চান আপনার গর্ভধারিনীর সঙ্গে দেখা করতে?'

কোনও উত্তর করলেন না বপ্যট। তাঁর চক্ষু বেয়ে বন্যার মতো নেমে আসছিল চোখের জল। ভিজে যাচ্ছিল তাঁর কপাটবক্ষ।

'তাহলে কথা দিন আর্য, যে মহা-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা আমরা করেছি আপনি তার নেতৃত্বের দায়িত্ব নেবেন? আপনার শরীরে রয়েছে এই দেশের মাটি ও জলের ঘ্রাণ, রয়েছে এক মহান দেশপ্রেমিক রাজার জন্মবীজ। আপনার দেহ, মন, চৈতন্য পুষ্ট হয়েছে সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ পণ্ডিত দয়িতবিষ্ণুর ঘরে। আপনি নিজে স্বয়ং এই দেশের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, খণ্ডিতারাতি বপ্যট। হে বপ্যট, রাজভটবংশাদিপতিত সিংহবিক্রম বপ্যট, আমার অনুরোধ—এই অভিযানের নেতৃত্ব স্বীকার করুন। আপনিই বঙ্গভূমির যোগ্যতম সম্রাট।' বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

সমগ্র সভা উৎকর্ণ হয়ে রইল। স্পষ্ট হয়ে গেল, লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ কূটনীতির যে চালটি চেলেছেন—তার মার নেই। সেইজন্যেই বপ্যটকে এই সভায় ডেকে এনেছেন তিনি। অনেক যুদ্ধে সৈন্যদলের নেতৃত্ব করেছেন বপ্যট, এই দেশের সবচেয়ে কুশলী যুদ্ধব্যবসায়ী তিনি। তার ওপর তাঁর রক্তে সম্রাটের উত্তরাধিকার বইছে। এমন একজনকে প্রজারা পরবর্তী সম্রাট বলে যত সহজে মেনে নেবে, অন্য কাউকে তত সহজে মেনে নেবে না। বর্তমান শাসককে উৎখাত করা যত সহজ, ততটাই কঠিন এমন একজন পরবর্তী শাসককে নির্বাচিত করা, যিনি যোগ্য এবং যাঁর রাজসিংহাসনের ওপর নৈতিক অধিকার আছে।

চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন বপ্যট। অভিজ্ঞ যুদ্ধব্যবসায়ী তিনি, তিনিও বুঝলেন যে এই আহ্বান এড়াবার উপায় তাঁর নেই। তাঁর জননী আর জন্মভূমি, দুজনেই আজ একই সঙ্গে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। কী করবেন বপ্যট?

চোখ বুজলেন তিনি। পিতা দয়িতবিষ্ণু বলে গিয়েছিলেন এই দিনটির কথা; সেই ক্রান্তদর্শী মানুষটি জানতেন যে, এইদিন আসবে, আসবেই।

'সেদিন তুমি কী সিদ্ধান্ত নেবে পুত্র?' শেষশয্যায় শুয়ে যুবক পুত্রকে এই প্রশ্ন করেছিলেন তিনি, 'দেশের সেবায় সবকিছু উৎসর্গ করবে, নাকি সমস্ত বিপদ থেকে গা বাঁচিয়ে নিরাপদে কাটিয়ে দেবে তোমার জীবন?'

কীই বা আর নিরাপদ আছে এ দেশে? আর অন্য কোন বিকল্প পথই বা থেকে গেছে তাঁর সামনে?

চোখ খুললেন বপ্যট, ধীরস্বরে বললেন, 'লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করব—এমন সাহস আমার নেই। আমার এই সামান্য জীবন যদি দেশের মানুষের সেবায় লাগে, তবে তার থেকে আনন্দের আর কীই বা হতে পারে। আমি এই অভ্যুত্থানের সমস্ত পরিকল্পনা ও চূড়ান্ত আঘাতের প্রস্তুতি নিজের হাতে

সাজিয়ে দেব। রণাঙ্গনে সবার প্রথমে আমিই অধিষ্ঠিত থাকব। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ওই বেতালসিদ্ধ প্রকাশচন্দ্র আর কামুক রানিটিকে পরাস্ত করার মতো শারীরিক সামর্থ্য আমার শরীরে আর অবশিষ্ট নেই, হে নাথ। তবে তার জন্যে একজন উপযুক্ত অধিকারী প্রস্তুত আছে। বঙ্গদেশের সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি আমার থেকে কম কিছু নয়। আপনিও তাকে ভালোই চেনেন লোকেশ্বর।'

মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, 'বুঝতে পেরেছি বপ্যট, আপনি কার কথা বলছেন। তবে তাই হোক।'

'তিনি কে আর্য বপ্যট?' বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব।

'তিনি কে?' মৃদু হাসলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'আসুন রাজকুমার, আমার সঙ্গে আসুন। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।' এই বলে বাকিদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনারা এখানেই থাকুন। চূড়ান্ত সংগ্রামের রূপরেখা তৈরী হোক ভ্রাতঃ বপ্যটের নেতৃত্বে। রাজপুত্র, আপনি আমাকে অনুসরণ করুন।' এই বলে সভা থেকে অন্য পথে বেরিয়ে গেলেন দুজনে।

৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ। পাটলিপুত্রের নিকটবর্তী অরণ্য, মগধ।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি সংকীর্ণ বনপথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন দুজনে।

দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে পাণ্ডুর হয়ে এসেছে নবমীর চাঁদ। চারিদিকে ঝিঁঝি পোকার শব্দে কান পাতা দায়। থেকে থেকে রাতচরা পাখিদের তীক্ষ্ণ ডাক ভেসে আসছে। বাতাসের অনর্গল স্রোত গাছের গুঁড়িতে আর লতাপাতায় আটকে ঝিরিঝিরি আওয়াজ তুলছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে—এক আশ্চর্য মায়াবী নীলাভ আলো ঘিরে ধরেছে সারা আকাশ। আর আকাশ থেকে সেই আদিম নীলাভ অন্ধকার বুড়ো বুড়ো গাছেদের শরীর বেয়ে, পাতার ডগা থেকে টুপটুপ করে অবিরাম ঝরে পড়ছে ভিজে মাটিতে।

সামনের মানুষটির স্বচ্ছন্দ হাঁটাচলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, এই অরণ্যপথে যাতায়াতের অভ্যাস আছে তাঁর। চুপচাপ প্রায় নিঃশব্দে হাঁটছিলেন তিনি। পেছনের যুবকটির আবার বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার অভ্যেস নেই। তিনি ক্রমাগত উসখুস করছিলেন। শেষমেশ আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, 'প্রভু, ভন্তে কমলশীলের কাছ থেকে যে দুটি জিনিস আপনাদের এনে দিলাম—ওগুলো কী?'

'বিষ আছে হে, বিষ!' সকৌতুকে উত্তর দিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

'বিষ? আমি কি ঠিক শুনলাম? বিষ? বিষ আনতে এত কষ্ট করলাম আমরা? দেশে বিষাক্ত উদ্ভিদ-লতা কি কম পড়েছে? নাকি বিষাক্ত সাপেরা সব দেশ ছেড়ে পালিয়েছে?' বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব।

একটু ভাবলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তারপর যখন কথা বলতে শুরু করলেন, তখন পরিহাসের তরল চিহ্ন তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে উধাও।

'আজ আপনাকে একটি গূঢ় সংবাদ জানাই রাজকুমার। যে বিশাল পরিকল্পনা আমরা করেছি, আপনি তার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই এই তথ্য জানা আপনার সবিশেষ প্রয়োজন।

'এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই প্রকাশচন্দ্র এবং পিশাচী রানি—দুজনেই অমিত ক্ষমতার অধিকারী। শুধু এদেশের নয়, তিব্বত থেকে শুরু করে এদিকে যবদ্বীপ আর ওদিকে সুদূর মরুপ্রতীচ্য অবধি প্রচলিত যাবতীয় মারণতন্ত্রে এই দুজন মহাসিদ্ধিলাভ করেছেন। তা নাহলে এক বিশাল জনজাতিকে এভাবে এতদিন ধরে একইসঙ্গে ভীত, সন্ত্রস্ত আর মোহগ্রস্ত করে রাখা সম্ভব নয়। অতি প্রাচীন, অতি তীব্র, আমাদের অজানা কোনও এক মারীকৌশল এই দুজনের আয়ত্তাধীন। সে কৌশল এতই বিচিত্র আর এতই অদ্ভুত যে, তার স্বরূপ আমারও বিশেষভাবে জানা নেই। শুধু এই দুজনই নয়, এদের ঘিরে থাকে যে বিশেষ ছয় জন

মন্ত্রী, তারা প্রত্যেকেই কূটবুদ্ধিতে, যুদ্ধশাস্ত্রে আর পৈশাচীতন্ত্রে বিশেষ পারঙ্গম। এই ছয় জনকে সম্মুখসমরে পরাস্ত করা তাও সম্ভব রাজকুমার। কিন্তু প্রকাশচন্দ্র আর রানির জন্য প্রয়োজন এক বিশেষ দৈবী অস্ত্রের।'

'এতে কি তাই-ই আছে লোকেশ্বর?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব।

'হ্যাঁ আর্য। এতে দুটি বস্তু আছে। প্রথমটি এমন এক অব্যর্থ মারণাস্ত্র, যার কোনও রোধক বা বর্ম সমগ্র ভারতভূমিতে নেই। এর উৎস সেই সুদূর মহাচীনে। চীনদেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এই অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন তিব্বতের পোন পুরোহিতদের হাতে। এর তুল্য মহাস্ত্র মানুষের ইতিহাসে আজ অবধি নির্মিত হয়নি।'

চুপ করে রইলেন পদ্মসম্ভব।

আবার বলতে থাকলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'কিন্তু শুধু আক্রমণ নয়, প্রতি আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও একইরকম প্রয়োজনীয়। এই নারীর বিশেষত্ব বিষপ্রয়োগে। এই বিষয়ে স্বয়ং প্রকাশচন্দ্রও এঁর কাছে শিশু। ভারতের ইতিহাসে এমন বিষকন্যা আর কখনও আসেনি, আর কখনও আসবেও না। এঁর প্রতি নিঃশ্বাসে বিষ, এঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু কালকূটতুল্য মহাগরল। এমনকি এর স্পর্শমাত্রেই ক্ষুদ্র ইতর প্রাণীরা ইহলীলা সংবরণ করে, এত বিষ এই রানির শরীরে। একটি সবল পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে হত্যা করতে এঁর একটিমাত্র প্রেমপূর্ণ চুম্বনই যথেষ্ট।'

'সেই বিষের প্রতিষেধক কী আচার্য?'

'আছে আর্য, আছে।' ধীরে ধীরে বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। আশ্চর্য মায়াবী আলো তাঁর দুচোখে। 'এই তীব্র বিষের একটিমাত্র প্রতিষেধকই আছে এই মরজগতে।'

'সেটি কী, লোকেশ্বর?'

'নগাধিরাজ হিমালয়ের যে সর্বোচ্চ চূড়া, যাকে তিব্বতীয়রা সসাগরা ধরিত্রীর পর্বতমাতা বলে পূজা করে, তার কাছাকাছি এক অতি গোপন গুহা আছে। সাধারণের অতি অগম্য সেই স্থান, কেবলমাত্র একটি তিব্বতী পরিবারই বংশপরম্পরায় সেখানে পৌঁছবার পথ জানে। সেই গুহার মধ্যে আর কিছু নেই, শুধুমাত্র একটি অতিক্ষুদ্র তুষারস্তূপ আছে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর বৈশাখী পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে সেই স্তূপ থেকে একটিমাত্র লোহিতবর্ণ পুষ্পশোভিত লতা জন্মায়। এই লতার আশ্চর্য গুণ এই যে, পৃথিবীর যাবতীয় দৈবী বা ভৌতিক বিষ প্রতিরোধ করার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তার।' এই বলে চুপ করেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তারপর ধীরস্বরে বলেন, 'তবে সেই লতা আহরণ করার অসুবিধা একটিই।'

চুপ করে চেয়ে আছেন পদ্মসম্ভব।

'যদি সেই অবস্থাতেই, মানে লতাটি সেই স্তূপে জায়মান থাকতে থাকতেই রাত্রি প্রভাত হয়, তবে লতাটির বিষনাশক ক্ষমতার লয় ঘটে। তবে যদি রাত্রের মধ্যেই লতাটিকে উৎপাটিত করে যথাবিহিত ভাবে সংরক্ষণ করা যায় তবে তার তুল্য বিষহর ক্ষমতা আর কোনও পার্থিব বস্তুর নেই।'

'আমার আনা দ্বিতীয় বস্তুটি কি সেই বিষহর লতা?' প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব।

উত্তর দিলেন না মৎস্যেন্দ্রনাথ, শুধু মৃদু হাসলেন। চুপ করে গেলেন পদ্মসম্ভব।

সময় বহে যায়...। তারপর আবার প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব, 'আরও একটি কথা ছিল প্রভু।'

'বলুন রাজকুমার।'

'আপনি তো শৈব, আদিনাথ মহাদেবের শিষ্য, কুলাগম শাস্ত্রের উদগাতা। আপনার শিষ্য এবং অনুগামীরাও হঠযোগসিদ্ধ, আগমপন্থী। এই বৌদ্ধ বজ্রযানী আচার্যদের সঙ্গে আপনাদের মতবিরোধ নেই?'

হেসে ফেললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, তারপর বললেন, 'গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন রাজকুমার? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।" যে ব্যক্তি ঈশ্বরের যেভাবে উপাসনা করে, সে তাঁকে সেইভাবেই পায়। আমি কৌলমার্গ অনুসরণ করি, ওঁরা শূন্যতা ও উপায়ের উপাসক। মার্গ বহুতর হতে পারে, উপাস্য তো

একই, রাজকুমার? তাছাড়া দেশের এই দুঃসময়ে এখন কী উপাসনাপদ্ধতি, ধর্মকৃত্য—এসব নিয়ে বাদানুবাদ করার সময়?'

'তাই যদি হয়,' প্রশ্ন শেষ হয় না পদ্মসম্ভবের, 'আপনারা তো সাধক, যাবতীয় সাংসারিক মোহমায়ার ওপরে কেবলমাত্র ঈশ্বরচিন্তায় দিন কাটানোর কথা আপনাদের। তবে এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব—এইসব কাজে নামার কী প্রয়োজন নাথ?'

দপ করে জ্বলে ওঠে মৎস্যেন্দ্রনাথের চোখদুটি, 'কী বলছেন কী রাজকুমার! দেশ ছাড়া, দেশের মানুষের কল্যাণ ছাড়া ধর্ম বলে কিছু হয় নাকি? মানুষের চেয়ে বড় ঈশ্বর কে? দেশের থেকে বড় মন্দির কী? মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার থেকে বড় পুণ্য আর কীসে হয়?'

চুপ করে রইলেন পদ্মসম্ভব। তাঁর চৈতন্যের ওপর থেকে ধীরে ধীরে একটি পর্দা উঠে যাচ্ছিল। উপলব্ধির এক নতুন স্তরে উপনীত হচ্ছিলেন তিনি।

বলতেই থাকলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'ধর্ম কী, রাজকুমার? যা ধারণ করে, স্থিতি আনে—তাই ধর্ম। এই দেশে যখনই সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হয়েছে, তখনই ধর্ম স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন তাদের উদ্ধার করতে। আমার চারপাশের মানুষ অভুক্ত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত, আর আমি পর্বতের গুহায় বসে খেচরীমুদ্রায় দিনাতিপাত করব? উষ্ণীষকমল প্রাপ্তির সাধনা করব? যে পারমার্থিক মোক্ষ একটি ক্ষুধার্ত শিশুরও পেট ভরাতে অক্ষম, সেই মোক্ষ নিয়ে আমি কী করব রাজকুমার? শুনুন রাজকুমার, আজ আপনাকে ধর্মের সারসত্য বলে দিই। জেনে রাখুন, দেশ ব্যতীত ধর্ম নেই, দেশের মাটি ব্যতীত মন্দির নেই, দেশের মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নেই।'

অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন পদ্মসম্ভব, ধর্ম আর স্বদেশ নিয়ে এভাবে কোনওদিনও ভাবেননি তিনি। শুধু জানেন যে, এই মানুষটি একজন শিবকল্প মহাযোগী, ত্রিকাণ্ড কুলাগমের প্রণেতা। ঈশ্বরকোটির এই মানুষটি দেশে বিদেশে অখণ্ড শ্রদ্ধার অধিকারী। তিনিও দেশের নিপীড়িত, দলিত মানুষদের নিয়ে এত ভাবেন? বুকের ভেতরটা তাঁর আর্দ্র হয়ে আসছিল।

'আপনি কখনও ঈশ্বরকে দেখেছেন, লোকেশ্বর?' আচ্ছন্নস্বরে বললেন পদ্মসম্ভব।

অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। স্থির চোখে চেয়ে রইলেন পদ্মসম্ভবের দিকে। থমকে গেলেন পদ্মসম্ভবও!

সেই গাঢ় আরণ্যক অন্ধকারে, সেই নীলজোছনার আলোয়, আকাশ থেকে গাছের পাতা বেয়ে নেমে আসা নক্ষত্রআলোকে, ঐশীস্বরে বলে উঠলেন মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'হ্যাঁ রাজপুত্র, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। যেমন এই মুহূর্তে আপনাকে দেখছি, তেমনই। আপনি দেখতে চান?'

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল পদ্মসম্ভবের, মুখে কথা জোগাল না তাঁর।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। আবার তাঁকে অনুসরণ করতে থাকলেন পদ্মসম্ভব। কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আর কতদূর, প্রভু?'

'এই তো এসে গেছি।' বনপথের শেষে একটুকরো পরিষ্কার জায়গায় এসে বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

চারিদিকে তাকালেন পদ্মসম্ভব। বোঝাই যাচ্ছিল যে, অনেক চেষ্টায় অরণ্যের মধ্যে এই অংশটির সংস্কার করা হয়েছে। চতুর্দিকে গহীন বনাঞ্চল, আকাশে নবমীর চাঁদ। নির্মল আকাশ জুড়ে নেমে আসছে নীল জোছনা। সেই জায়গাটির একদম শেষে একটি মাটি ও পাথরের মন্দির। দূর হতেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সেই মন্দিরে প্রদীপের আলোয় আর গুগ্গুলের ধোঁয়ায় আরতি চলছে। বেশ কয়েকজনের ছায়ার নড়াচড়াও লক্ষ করলেন পদ্মসম্ভব। লম্বা লম্বা পা ফেলে সেদিকেই যেতে থাকলেন মৎস্যেন্দ্র। দেখাদেখি তাঁকে অনুসরণ করলেন পদ্মসম্ভবও।

কাছে গিয়ে পদ্মসম্ভব দেখলেন, মন্দিরের বাইরে গেরুয়া কাপড় পরিহিত এক সৌম্যমূর্তি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে, আর তাঁর পাশে একজন অতি বিশাল শরীরের পুরুষ। দেখামাত্র দুজনকে চিনলেন তিনি, একজন ভন্তে কমলশীল, আরেকজন পদ্মসম্ভবের অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু, কজঙ্গলের শবরজাতির অধিনায়ক—সিদ্ধ শবরবজ্র।

লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথকে দেখামাত্র শবরবজ্র এবং কমলশীল দুজনেই হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করার পর শবরবজ্র এগিয়ে এসে সজোরে আলিঙ্গন করলেন পদ্মসম্ভবকে, 'সেই যে গেলে, তারপর থেকে তো তোমার দেখাই নেই হে! বলি আছ কেমন ভায়া?'

এই মানুষটিকে অত্যন্ত ভালোবাসেন পদ্মসম্ভব। সহজ মানুষ এবং সহজপথ তাঁর কাছে চিরকালই অতি প্রিয়। তিনিও গভীর শ্বাস নিয়ে কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় সেই মন্দিরটির ভেতরের দিকে চোখ গেল পদ্মসম্ভবের। আবিষ্টের মতো সেদিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

মন্দিরের ভেতরে কয়েকটি বিশাল আকারের মাটির প্রদীপ জ্বলছে, তাতেই সমস্ত মন্দির আলোকিত। অগুরু, গুগ্গল ও চন্দনের গন্ধে ভরে আছে পুরো মন্দির। সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে এক বিশাল যজ্ঞকুণ্ডের আগুন।

মন্দিরের ভেতরে এক দেবীমূর্তি। তার সামনে কুশাসনে বসে রয়েছেন কয়েকজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। তাঁরা যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছেন, আর সেই যজ্ঞকুণ্ডের সামনে, দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে, তাঁদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছেন এক তরুণ।

পদ্মসম্ভবের চোখ গেল সেই তরুণটির দিকে। তাঁর সরু কোমর, চওড়া কাঁধ এবং সুগঠিত পেশীর অহঙ্কারে স্পষ্ট যে, ইনি এক সিংহবিক্রম যোদ্ধৃপুরুষ। তাঁর ঘন ও কোঁকড়ানো চুলের ভার নেমে এসেছে কাঁধ অবধি। প্রদীপ ও যজ্ঞের আগুনের আলো ঠিকরে যাচ্ছিল তাঁর সুগঠিত দেহখানি থেকে। সুললিত এবং সুগম্ভীর স্বরে স্তব আবৃত্তি করছিলেন তিনি।

পদ্মসম্ভবের দৃষ্টি গেল দেবীমূর্তির প্রতি। মুহূর্তে বিস্মিত হলেন। 'প্রভু, ইনি কোন দেবী?' তিনি প্রশ্ন করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথকে, 'এই দেবীর মূর্তি তো এই অঞ্চলে কখনও দেখিনি।'

'রাজপুত্র, ইনি দেবী চুন্দা। আমি ডাকি চণ্ডী নামে, দেবী গৌড়চণ্ডী। ইনি আদিশক্তি, সকল জগতের বীজধাত্রী, সকল লোকের ঈশ্বরী।'

পদ্মসম্ভব কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সেই মহাবল তরুণটির গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত স্তবগান ভেসে আসে, 'মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ...'

তারই মধ্যে আবিষ্টস্বরে বলতে থাকলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'হে রাজকুমার, উত্তর গান্ধারের পার্বত্য অঞ্চলে পূজিতা এই দেবীকে আমি এই দেশে নিয়ে এসেছি। ইনি অতি রণদুর্মদ, ভীষণদর্শনা। কুমার, দেশের এই ক্রান্তিকালে এই দেবীর আশীর্বাদ আমাদের প্রয়োজন, ভীষণ প্রয়োজন।'

আবার ভেসে এল সেই উদাত্ত প্রার্থনা,

'ধূম্রনেত্রবধে দেবী সর্বকামার্থদায়িনী...'

সেই স্বরে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না মৎস্যেন্দ্রনাথ। তদগত চিত্তে তিনি বলে যেতে থাকলেন, 'ইনি একাদশ রুদ্রকে ধারণ করেছেন, ধারণ করেছেন অষ্টবসু ও দ্বাদশ আদিত্যকে। ইনি স্বয়ং রুদ্রের ধনুতে জ্যা আরোপিত করেন...'

'নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ...'

‘ইনি দেবতাদের শত্রুনাশ করেন। যজ্ঞের সকল হবি এঁর উদ্দেশেই অর্পিত হয়। ইনি সকল লোকের ঈশ্বরী, ধনদা, সুখদা, বরাভয়প্রদায়িনী।’

‘স্তবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্বং ত্বং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনী...’

‘এই দেবীর শক্তিতেই জগৎসংসারের সকল প্রাণী দর্শন, শ্রবণ ও জীবনধারণ করে থাকে। অনুগত ভক্তকে ইনি ব্রহ্মজ্ঞান অর্পণ করেন।’

‘চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে, জয়ন্তি পাপনাশিনী...’

‘হে রাজপুত্র, আশ্রিতদের রক্ষা করার জন্যে ইনি সদাসর্বদা সংগ্রাম করেন। স্বর্গে ও মর্ত্যে ইনিই অন্তর্যামিনীরূপে পরিব্যাপ্তা...’

‘দেবী প্রচণ্ডদোর্দণ্ড দৈত্যদর্পনিসূদিনী...’

‘কিন্তু লোকনাথ, দেবীর বাহন এই পশু কেন? এই ভীষণ প্রাণীটিকে তো এই অঞ্চলে দেখা যায় না!’ বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব।’

‘কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবী শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে...’

‘কারণ ইনি পার্বত্য দেবী, পর্বতদুহিতা। উত্তর হিমালয়ের সিংহবিক্রম পার্বত্য জনজাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইনি। তাই দেবীর বাহন এই পশুরাজ।’

এক অদ্ভুত ভক্তিভাবে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল পদ্মসম্ভবের। আশ্চর্য ঐশ্বরিক শক্তিতে বলীয়ান তিনি। তবু তাঁর মাথা নত হয়ে আসছে এই বহুভুজা দেবীটির সামনে। দেবীর বিশাল দুই আয়তনয়ান দেখে তাঁর হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা মিশিয়ে এক আশ্চর্য ভাবের উদয় হল। রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি, ‘কে প্রভু, কে এই দেবী?’

দুই হাত জড়ো করে দেবীর উদ্দেশে তখন প্রণাম করছিলেন সেই বলশালী যুবকটি। পুজা শেষ হয়ে আসছিল তাঁর, ‘তারিণি দুর্গসংসার সাগরস্যাচলোদ্ভবে/ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি...’

‘আর্য পদ্মসম্ভব,’ উচ্চকিত আবেগে কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল লোকেশ্বরের, ‘আমি মৎস্যেন্দ্রনাথ, আদিনাথ মহাদেবের পদাম্বুজ নিজবক্ষে ধারণ করে ঘোষণা করছি যে, আজ হতে ইনি গৌড়বঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দেবী একদিন বঙ্গভূমির ঘরে ঘরে পূজিতা হবেন, এই দেশের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত দুর্গতি নাশ করবেন ইনি। আজ আমি এই সিংহবাহিনী দেবীর নাম দিলাম...’

‘ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ,
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাপ্নোতি দুর্লভং॥’

‘দেবী দুর্গা!’

পূজা শেষ করে সেই যুবকটি তাঁদের দিকে ফিরলেন। তারপর মৎস্যেন্দ্রনাথকে দেখে দ্রুত নেমে এলেন তাঁদের কাছে, প্রণত হয়ে বিনীতভাবে বললেন ‘প্রণাম লোকনাথ।’

'আসুন রাজকুমার পদ্মসম্ভব' উদাত্তস্বরে বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'আপনাকে বঙ্গভূমির ভাবী সম্রাটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, 'এই বলে থামলেন তিনি। তারপর গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন, 'ইনিই সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, খণ্ডিতারাতি বপ্যটের পুত্র, রাজভটবংশাদিপতিত মহাবীর গোপালদেব।'

পূর্বদিগন্তে লালের ফোঁটা স্পষ্ট হচ্ছিল। কিছুপরেই সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ল মন্দিরের চৌকাঠে। হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পুরোহিতের দল! পূজা সমাপ্ত হয়েছে তাঁদের। প্রধান পুরোহিত নেমে এলেন, যজ্ঞভস্ম আর রক্তচন্দনের টীকা পরিয়ে দিলেন প্রত্যেককে।

যুক্তকরে প্রশ্ন করলেন গোপালদেব, 'অধীনের প্রতি এখন কী আদেশ, প্রভু?'

নবোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। সূর্যের আলো তাঁর কপালের মধ্যভাগে জ্বলজ্বল করছিল রাজটীকার মতো। সেইদিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন তিনি, অস্ফুটে কিছু শুভ মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। তারপর ধীরে ফিরলেন গোপালদেবের দিকে।

'বৎস, চূড়ান্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত। আজ, এই মুহূর্ত থেকে আমাদের যুদ্ধ শুরু হল। তুমি পূর্বদিকে যাত্রা করো। আজ হতে একপক্ষকাল পর তুমি কর্মান্তবাসকের উপকণ্ঠে পৌঁছবে। সেখানে কান্তিপ্রভ নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আতিথ্য নিও। তিনি আমাদের গুপ্ত সহযোগী, এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। পরবর্তী আদেশ সেখানেই পাবে। ইতোমধ্যে আমরাও পৌঁছে যাব সেখানে। পরবর্তী কর্মপন্থা সেখানেই জানানো হবে তোমাকে।'

আভূমি প্রণত হতে যাচ্ছিলেন গোপালদেব, তাঁকে আটকালেন লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ। জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সাবধানে যাবে গোপালদেব। আর আমরা সবাই তাকিয়ে আছি তোমার দিকে। সদা সতর্ক থাকবে, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো। যে কঠিন কর্মভার তোমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তার তুল্য গুরুদায়িত্ব খুব কম লোকই বহন করতে পারে। এককালে এই কঠিন কর্তব্য পালন করেছিলেন মহাবল শশাঙ্ক। তাঁর শাসনদণ্ডের নীচে বঙ্গভূমি প্রথমবারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আজ এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাঞ্ছিত নিপীড়িত অহল্যাভূমি আবার একজন শশাঙ্কতুল্য মহাপরাক্রমশালী রাজার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আজ বঙ্গদেশের রাজলক্ষ্মী সেই শাসনদণ্ড তোমার হাতে তুলে দিতে চান। দেশের আপামর জনসাধারণ তোমার সঙ্গে আছে গোপালদেব। মনে রেখো—তুমিই আমাদের শেষ এবং একমাত্র ভরসা।'

কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম জানিয়ে মন্দিরের অন্যপ্রান্তে রাখা গোরুর গাড়িটির দিকে এগিয়ে গেলেন গোপালদেব। এখান থেকে কর্মান্তবাসক দীর্ঘ দুই সপ্তাহের যাত্রা। ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ চালে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল গাড়িটি। সেদিকে তাকিয়ে রইলেন বাকিরা। তাঁদের শক্ত হয়ে আসা চোয়ালে, মুষ্টিবদ্ধ হাতে আর দু'চোখের তারায় ঝলসে উঠছিল মুক্তির আশা আর স্বাধীনতার সংকল্প।

এবার সময় শুরু প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।



মধ্যপর্ব

আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্চিত হল প্রহরীর। আসার কথা তো ঘনরাম আর তার ছোট ভাইয়ের। এই কুটিরটি তারাই পরিষ্কার করে দিয়ে যায় প্রতি সপ্তাহে একবার। তাদের বদলে এরা কারা? এদের তো কখনও দেখা যায়নি।

হরিকেলের এই নিরালা অরণ্যের মধ্যে মানুষের চলাচল এমনিতেই কম। একদিকে পূর্বসমুদ্র, আরেকদিকে ঘন তালতমাল-বনরাজিনীলা। অরণ্যের এই অংশে সাধারণ মানুষের চলাচলের ওপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা আছে। কমন্তিবাসকের বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া এখানে কারও আসা নিষিদ্ধ।

তার কারণ এখানে একটি পর্ণকুটিরে কঠিন প্রহরায় থাকেন বঙ্গদেশের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বন্দি।

আজ থেকে নয়, প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে থেকে।

অরণ্য শেষ হলে বালুরাশি। তারপরে সমুদ্র। পূর্বসমুদ্রের লবণাক্ত বাতাস সদা সর্বদাই বয়ে যায় অরণ্যের মধ্য দিয়ে। স্থানটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। শীতকাল ছাড়া স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। গ্রীষ্মকালে তো সাক্ষাৎ নরক। রোগব্যাধি লেগেই আছে।

এই অঞ্চলেই রয়েছে এক প্রশস্ত পর্ণকুটির। সেখানে থাকেন একজন নবতিপর বৃদ্ধ। শীর্ণ, শুষ্ক, এবং লোলঅস্থিচর্মসার এই মানুষটিকে দেখে বোঝা অসম্ভব যে আজ থেকে প্রায় অর্ধশতক পূর্বে এঁর অঙ্গুলিহেলনেই বঙ্গদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতো।

রক্ষীটি গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করে, ‘কে তোমরা?’

আগন্তুক দুজনের কটিদেশে ছিন্ন অধোবাস, উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। ধূলিধূসরিত অঙ্গে, পিঙ্গল জটাজূটকেশে ক্লিষ্ট মুখায়বে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। প্রথমে যে দাঁড়িয়ে আছে তার শরীরখানি সবল এবং ঋজু। দ্বিতীয়জন অপেক্ষাকৃত খর্ব এবং দুর্বল। তার হাতে একটি বড় মাটির কলস।

প্রথমজন সঙ্কুচিত হয়ে বলল, ‘ক্ষমা করবেন আজ্ঞে, আজ আমাদের ঘর পরিষ্কার করার দিন কি না তাই এসেছি। ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিন প্রভু।’

রক্ষীটি একবার সতর্ক চোখে চারিদিক দেখে নিল। সমুদ্রের দিকে প্রহরা কিঞ্চিৎ শিথিল। স্বাভাবিক। গত অর্ধশতক ধরে ওই পথে কেউ এসে নামেনি এই হতভাগ্য বৃদ্ধকে উদ্ধার করার জন্য। সেইদিকের প্রহরীরা

বালুতটে বিশ্রাম নিচ্ছে। অন্যদিকেও দূরে দূরে প্রহরারত বাকি প্রহরীরা মাটিতে বসে সামান্য ঝিমিয়ে নিচ্ছে। এতদিনের অনভ্যাস সবার আচরণেই শৈথিল্য এনে দিয়েছে।

'সে তো ঘনরাম আর তার ভাই এসে করে দিয়ে যায়। তোরা কে?'

'আজ্ঞে আমার নাম ঠগন, আর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কাহ্ন।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু তোদের তো আসার কথা নয়।'

দুজনের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, সে কম্পিতহস্তে বলল, 'আমরা ঘনরামের আত্মীয় আজ্ঞে। ওদের মা মরে গেল তো দুদিন আগে। তাই ঘনরাম বলল, 'ওরে কাহ্ন, দেশের বাড়ি যেতে হবে। এই কাজটা করে দিস বাপধন।'

রক্ষীটি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'রসিকতা হচ্ছে আমার সঙ্গে? এ কী সাধারণ ভদ্রাসন যে অমুকের পরিবর্তে তমুক কাজ করে দিয়ে যাবে? কোথায় এসেছিস জানিস তোরা?'

আগন্তুক দুজনে হতভম্বের মতো একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

'তোদের এতদূর আসতে দিল কে? অরণ্যের বাইরে তো প্রহরীদল রয়েছে। তারা আটকায়নি তোদের?'

'আটকেছিল প্রভু। তবে আদেশপত্র দেখে ছেড়ে দিল।'

'আদেশপত্র দেখা।'

বয়স্কব্যক্তিটি নোংরা ধূলিধূসরিত অধোবাসের ভিতর থেকে একটি আদেশনামা বার করে দিল। রক্ষীটি সেটি পড়তে শুরু করলেন।

যতক্ষণ রক্ষীটি সেই আদেশনামা পড়ছিলেন, ততক্ষণ যদি কেউ দুই আগন্তুকের মুখের ভাব লক্ষ করত তাহলে দেখতে পেত অন্য চিত্র।

রক্ষীটি অত্যন্ত সতর্কচোখে আদেশপত্রটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করছিল। তাদের ওপর আদেশ এসেছে প্রহরা আরও কঠিন করার জন্য। সারা দেশে নাকি রাজদ্রোহের প্রচেষ্টা চলছে। কাণাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে এর পেছনে নাকি প্রশাসনের কয়েকজন পাকা মাথার লোক আছে।

আদেশপত্রটি ভালো করে পরীক্ষা করার পর নিশ্চিত হল রক্ষী। উচ্চৈঃস্বরে ডাকল, 'কেতকদাস, এদের ভেতরে নিয়ে যাও।'

এক রক্ষী বাইরে বেরিয়ে এল। নিদ্রাতুর স্বরে বলল, 'এরা আবার কারা?'

'এরা কুটির পরিষ্কার করতে এসেছে।

'সে তো ঘনরাম আর তার ভাই আসে। এরা কারা?'

প্রথম রক্ষীটি বিরক্তস্বরে বলল, 'এরা ঘনরাম আর তার ভাইয়ের পরিবর্তে এসেছে। সঙ্গে প্রতীহারের স্বাক্ষরিত আদেশপত্রও এনেছে। অনর্থক প্রশ্ন না করে এদের ভেতরে নিয়ে যাও।'

কেতকদাস বিরস বদনে বলল, 'চল রে, তোদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই। নাম কী তোদের?'

খর্বকায় আগন্তুক জড়োসড়ো হয়ে বলল, 'আজ্ঞে আমার নাম ঠগন, আর ওর নাম কাহ্ন।'

এমন অদ্ভুত নাম শুনে কেতকদাস হো হো করে হেসে উঠল। ব্যঙ্গ করে বলল, 'পিতামাতা নাম রেখেছিলেন বটে একখানা। তা ঠগন মহাশয়, হাতের ওই কলসটা নামিয়ে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ান তো। আপনাদের শারীরিক পরীক্ষাটুকু হয়ে যাক।'

দুজনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দিয়ে যখন লুকোনো অস্ত্র বা আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না তখন কেতকদাসের নজর গেল কলসটার দিকে।

'কী আছে ওতে?'

'আজ্ঞে কিঞ্চিৎ মৈরেয় আছে। ঘর পরিষ্কার অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ কি না। তাই ভাবছিলাম কাজ শেষ হলে দুই ভাই মিলে একটু মৈরেয় পান করব। এই আর কি?'

রক্ষীদুজনের চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। কেতকদাস গম্ভীরস্বরে বলল, 'তোরা জানিস, এখানে সুরা নিয়ে আসা কত গর্হিত অপরাধ?'

'না তো প্রভু।'

অন্য রক্ষীটি বলল, 'জানিস, এর জন্য তোদের কারাবাস হতে পারে?'

'অথবা সপরিবারে নির্বাসন।'

'এমনকী প্রাণদণ্ড হওয়াও বিচিত্র নয়!'

আগন্তুক দুজনের চোখেমুখে বিচিত্র ছায়া খেলে গেল। কাহ্ন বলল, 'ভুল হয়ে গেছে প্রভু। অপরাধ মার্জনা করে দিন।'

'ভুল?' দুই রক্ষী একত্রে গর্জে ওঠে, 'এই গর্হিত অপরাধের মার্জনা? ওসব ভুলে যা পামর। বরং মুণ্ডচ্ছেদ বা শূলারোহন, কোনটা তোদের পছন্দ সেটা বেছে নে।'

হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে ঠগন, 'হায়-হায়, না জেনে কী ভুল করে ফেললাম। ক্ষমা করুন প্রভু, ক্ষমা। এই কলস আমি এই মুহূর্তেই ভেঙে ফেলছি।'

প্রথম রক্ষী হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'আরে না না, একদম না। ওসব ভেঙে ফেলার চিন্তা মাথাতেও যেন না আসে। ব্যাপারটা বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে দেখার জন্য ওটা আমাদের নিয়ে নিতে হবে যে। নইলে তোদের অপরাধ প্রমাণ করব কী করে?

'দয়া করুন প্রভু। কিছু একটা উপায় বার করুন। যাতে গরিবের প্রাণ রক্ষা হয়।'

'আহ, গোল করিসনি। ব্যাপারটা ভেবে দেখতে দে। ভায়া কেতকদাস, দুখানি পাত্র জোগাড় করে আনো দেখি। আমার কেমন যেন মনে পড়ছে, সুরার স্বাদ তেমন উৎকৃষ্ট হলে অল্প শাস্তির ওপর দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটা উপায় বোধহয় আছে।'

ইতস্তত করে কাহ্ন নামের লোকটি, 'আপনারা কি এখন এই মদিরা পান করবেন প্রভু?'

'আহা, ওকে পান করা বলে না। বলে পর্যালোচনা। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি প্রভু।'

'কী বুঝলি?'

'আজ্ঞে...'

'পর্যালোচনা। এই তো ঠিক ঠিক বুঝে ফেলেছিস।'

'তা, বলছিলাম কি প্রভু, এই পর্যালোচনা না কী একটা বললেন, তারপর কি কিছু আশা থাকলেও থাকতে পারে?'

'সেটা অবশ্য নির্ভর করছে সুরার উৎকৃষ্টতার উপর।'

'মানে দেশের বিধান বাঁচিয়ে...'

'আহা, বিধান থাকলে তার প্র, পরা, অপ, সম, উপ, এসবও তো আছে। মেলা গোল করিসনি, ব্যাপারটা আমাদের ভেবে দেখতে দে।'

ঠগন ভয়ে ভয়ে বলল, 'আরও একটি কলসি সঙ্গে রয়েছে প্রভু। কিছু দূরে রেখে এসেছি। আপনারা অনুমতি করলে বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য সেটাও নিয়ে আসতে পারি।'

প্রথম রক্ষী চাপা উল্লাসের সঙ্গে বলল, 'বটে? নিয়ে আয় দেখি। এক কলসির বদলে দু'কলসি উৎকৃষ্ট সুরায় অপরাধ অর্ধেক হয়ে যায় বলেই তো মনে হচ্ছে?'

কেতকদাস বলল, 'সে তো বটেই।'

ঠগন ভয়ে ভয়ে বলল, 'আর আরও চার কলসি সুরায়?'

রক্ষী দুইজন স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

কাহ্ন ইতস্তত করে বলল, 'অরণ্যের বাইরে আমাদের গরুর গাড়িটি রেখে এসেছি প্রভু। ভেবেছিলাম কাজ শেষ হলে বস্তিতে ফিরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে একটু, ওই আর কি...পর্যালোচনা।'

প্রথম রক্ষী গম্ভীরস্বরে বলল, 'ভাই কেতকদাস।'

'বলো ভাই।'

'আরও চার কলসি সুরায়?'

'অপরাধ সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল হয়।'

'তাহলে আপাতত কিংকর্তব্যম?'

কেতকদাস তার হাতের ভল্ল দিয়ে ঠগনের পেটে একটি খোঁচা মেরে বলল, 'গাড়িটা আমরাই এখানে নিয়ে আসছি, বুঝলি। আর তুই আপাতত আমাদের এই সুরা পর্যালোচনার কাজে একটু সাহায্য কর। এই কাহ্ন না কে, সেই বরং ঘর পরিষ্কারের পুরো কাজটা করুক। আমরা বাকি রক্ষীদের ডেকে আনি। পর্যালোচনা কি আর যেমন তেমন ব্যাপার রে?'

দুজনেই শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বাকিদের ডেকে আনার জন্য। চারিদিক ফাঁকা দেখে সিদ্ধ ঠগনপা নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'লোকেশ্বর মিথ্যা আদেশপত্রটি কোথা থেকে পেলেন? আশ্চর্য কাণ্ড? এমন চমৎকার নকল তো আমিও করতে পারি না।'

আচার্য কাহ্নপা চাপাস্বরে বললেন, 'মিথ্যা কেন হবে ভাই? এই আদেশনামা সর্বাংশে সত্য।'

ঠগনপা সপ্রশ্নচোখে তাকালেন। কাহ্নপা একচোখ টিপে বললেন, 'হরিকেলের মহামাত্য জয়নাথ আমাদের সহায়, আগেও একবার বলেছি তোমাকে। তোমার বোধহয় স্মরণে নেই।'

'কিন্তু এই বৃদ্ধ'র কাছে এত ঝুঁকি নিয়ে আসার কারণ কী ভ্রাতা?'

'আছে আছে। কাজ শেষ হোক। যেতে যেতে বলব। জানো তো চূড়ান্ত আঘাতের আগে শত্রুর গোপন, দুর্বলতম স্থানগুলির ব্যাপারে সব তথ্য একত্র করতে হয়।'

'কিন্তু ইনি তো...'

'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু, এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখো তো ভায়া! আরও জেনে রাখো, যদি ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, পাপের ভাগীদার, শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার মতো ক্ষতি আর কেউ করতে পারে না।'

'কিন্তু ইনি যে আমাদের সহায়তা করবেন তার নিশ্চয়তা কী?'

'নেই। কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেই জন্যেই তো লোকেশ্বর তোমাকে আমাকে পাঠিয়েছেন এই কাজে। আমাদের সাফল্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে ভাই। দেখো যেন কোনও ভুলচুক না হয়।'

ততক্ষণে উৎসাহী রক্ষীদের একাংশ এগিয়ে এসেছে। তাদের দুজন ঠগনপা'কে নিয়ে বেরিয়ে গেল মৈরেয়কলসপূর্ণ গরুর গাড়ির সন্ধানে। কেতকদাস কাহ্নকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

অন্ধকার ঘর। ঘরের ঠিক মধ্যস্থানে একটি ত্রিপদী। তার ওপর একটি দীপ জ্বলছে। দীপটিকে ঘিরে বেশ কয়েকজন পুরুষ বসে আছেন। তাদের কারও মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও পোশাকে, অলঙ্কারে এবং ব্যক্তিত্বে বোঝা যায় যে এঁরা কেউ সাধারণ নন।

স্থানটি জাহোরের এক পরিত্যক্ত প্রাসাদ। এককালে এখানে এক সম্পন্ন ভূস্বামী বাস করতেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমতটের মহাপ্রতাপশালী সামন্ত অনন্তঘোষের আক্রমণে তাঁর রাজত্ব ছারেখারে যায়। ভূস্বামীটি সপুত্র নিহত হন। তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রবধূ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। প্রাসাদটি অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা হয়।

সেই পরিত্যক্ত, ভগ্নস্তূপ প্রাসাদে বহুদিন পরে আবার দীপালোক জ্বলে উঠেছে। তবে সেই দীপালোক গৃহস্থালীর আনন্দের নয়, বরং গুপ্ত ষড়যন্ত্রের।

ঘরটির গবাক্ষ অস্থায়ী বস্ত্রে ঢাকা। প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে সতর্ক প্রহরা। অচেনা কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই পাখির শিসের শব্দে জানান দেওয়া হবে।

প্রথমে কথা বললেন এক প্রৌঢ় পুরুষ, ‘মহর্ষি, উপস্থিত অভ্যাগতদের আজকের এই সভার আহ্বানের উদ্দেশ্য জানানো হোক।’

উঠে দাঁড়ালেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, ‘উপস্থিত মহামান্য সামন্তবর্গ এবং গৌড়নরেশ জয়ন্তকে ধন্যবাদ জানাই এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। আপনারা প্রত্যেকেই শক্তিশালী, প্রভাবশালী এবং কৃতবিদ্যপুরুষ। প্রত্যেকেই স্বরাজ্যে সম্রাট। আপনাদের মধ্যে যে কেউ এই সভার আহ্বায়ক হতে পারতেন। তা সত্বেও এই পরিত্যক্ত প্রাসাদে এই সভা আহ্বান করার পেছনে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, আমরা যে মহতী ধর্মযুদ্ধে ব্রতী হতে চলেছি, নিরপেক্ষতা তার প্রধান স্তম্ভ। এই যুদ্ধ কোনও একক ভূস্বামীর, কোনও একক সামন্তের যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজ্যলিপ্সা নয়, পরস্বাপহরণ নয়, পররাজ্যগ্রাস নয়। আমাদের মাতৃভূমি আজ যে কুৎসিত অপশাসনের করালগ্রাসে পতিত হয়েছে তার থেকে উদ্ধার পাওয়াই এই ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য। এ কারও একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের সম্মিলিত অংশগ্রহণ। তাই এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটি নির্বাচিত করা হয়েছে, যা এখানে উপস্থিত সামন্ত ভূস্বামীদের কারও একক অধীনস্থ নয়।

দ্বিতীয়ত, গোপনীয়তা। ব্যক্তিগতভাবে আমরা সবাই প্রকাশচন্দ্র এবং তাঁর ছয় সহযোগীর বিচিত্র সব কূটকৌশলের ব্যাপারে সম্যকরূপে জানি। আপনাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়েই এখানে আপনাদের আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু আপনাদের প্রাসাদের বা সভার কারা কারা যে চন্দ্রবংশের গুপ্তচর সে বোঝা অসাধ্য। তাই আপনাদের কোনও পূর্বাভাস না দিয়ে এখানে আহ্বান করেছি। জানবেন, এই মুহূর্তে আপনাদের প্রাসাদের প্রতিটি প্রাচীরও কর্ণময়।

তৃতীয়ত, এই পরিত্যক্ত প্রাসাদ প্রতিমুহূর্তে আমাদের মনে করিয়ে দেবে সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে এই শতবৎসরব্যাপী মাৎস্যন্যায় কী অবিশ্বাস্য অরাজকতার জন্ম দিয়েছে। মনে রাখবেন, আজ যদি আমরা একত্র হয়ে এই অত্যাচারী রানির শাসন উৎখাত না করি, কাল এই অবস্থা আপনাদেরও হতে পারে।’

মৎস্যেন্দ্রনাথ চুপ করলেন। অন্য এক সামন্ত প্রশ্ন করলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য এক বটে। তবে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।’

‘বলুন মহাসামন্ত ধর্মসেন।’

‘মহর্ষি, আপনাকে আমরা একজন ধর্মপুরুষ বলে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে আপনি এলেন কেন?’

‘কারণ ধর্মই জাতির মেরুদণ্ড, তাই। আর জাতির স্বার্থদর্শনের নামই তো রাজনীতি। তাই আজ যখন বাঙালি জাতি এই কুশাসনের সম্মুখীন হয়ে বিলুপ্তপ্রায়, তখন অধিকারভেদে আমাদের প্রত্যেককে একত্রিত হতেই হবে। যদি দেশই না থাকে, জাতিই না থাকে, তাহলে ধর্ম নিয়ে করব কী?’

‘আপনি কী বলতে চাইছেন লোকেশ্বর? এই সময়ে আমাদের ধর্মাশ্রয়ী হওয়া উচিত? যখন প্রকাশচন্দ্র আরও একটি বহুল জনপ্রিয় ধর্মের অবতারণা করেছেন এই বঙ্গে, তার জনপ্রিয়তা ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। আপনি কি ধর্মে ধর্মে বিভেদ চাইছেন?’

অন্ধকারের মধ্যেও মৎস্যেন্দ্রনাথের চক্ষুদুটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলে উঠল। ‘ধর্মে ধর্মে বিভেদ বলবেন না মহামাত্য জয়নাথ। বিভেদ ধর্মে ধর্মে হয় না, ধর্মে অধর্মে হয়। ধর্মের নামে অনিয়ন্ত্রিত মদ্যপান, উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ যৌনসম্ভোগ, পরনারীহরণ, বলাৎকার, এ কী ধর্ম?’

‘আপনি কি ধর্মের সঙ্গে নীতিবোধকে যুক্ত করতে চাইছেন লোকেশ্বর?’

‘অবশ্যই! নীতিবোধ বাদ দিয়ে সমাজ সংস্থিতির থাকে কী সামন্ত সীতাপতি? আর সমাজ সংস্থিতি বাদ দিলে ধর্মেরই বা কী থাকে?’

'কিন্তু আপনার ধর্মবোধ কি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার বিপক্ষে নয়?' প্রশ্ন করলেন একজন প্রৌঢ়।

'হাসালেন আচার্য!' ব্যঙ্গস্বরে বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে যারা সমাজ সংস্থিতি বিনষ্ট করতে চায়, জানবেন তারাই মানুষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু। আপনিও তো একজন শ্রদ্ধেয় ধর্মবেত্তা। আপনিই বলুন না, বঙ্গদেশে অবাধ নীতিবোধহীন উচ্ছৃঙ্খলতার যে প্রাপ্ত স্বাধীনতা আছে, প্রকাশচন্দ্র আর রানির অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনার সেই স্বাধীনতা আছে তো?'

বৃদ্ধ আচার্য চুপ করে গেলেন। বর্তমানে বঙ্গদেশে শাসকের বিরুদ্ধে সমালোচনার শাস্তি বড় ভয়ানক।

'কিন্তু আচার্য, আপনার কথামতো যদি মেনেও নিই যে প্রকাশচন্দ্রের প্রবর্তিত ধর্ম ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট, তার বিপরীতে আপনার ধর্ম যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ কী?'

'হা ঈশ্বর, এতদিন যে দেশের জলবায়ুতে আপনার দেহ মন পুষ্ট হল, তার নিজস্ব, ভূমিজ ধর্মকে আপনি এখনও চিনতে পারেননি সামন্ত অধিরথ?' উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'একটি সম্পূর্ণ বিজাতীয়, বিদেশীয় অসভ্য অনৈতিক মতবাদকে এদেশের ধর্ম বলে মেনে নিতে আপনাদের লজ্জাবোধ হয় না? নীতিবোধের বিচ্যুতিগুলিকেও ধর্ম বলে মেনে নিতে আপনার গ্লানিবোধ হয় না? নাকি তার জন্যেও প্রকাশচন্দ্রের অধ্যাদেশ প্রয়োজন?'

সহসা নীরবতা নেমে এল সবার মধ্যে। মৎস্যেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন উত্তেজিত হয়ে কিছু কঠোর কটূক্তি করে ফেলেছেন। কিঞ্চিৎ নরম সুরে বললেন, 'উত্তেজনা ক্ষমা করবেন আর্য। কিন্তু আমি মনে করি এই কুশাসনের অন্যতম স্তম্ভ যে অশ্লীল ধর্ম, তার উৎপাটন আশু প্রয়োজনীয়।'

'কিন্তু আচার্য,' এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন গৌড়েশ্বর জয়ন্ত, 'আপনি নাহয় মহাযোগী। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কিন্তু, সাধারণ নরনারীর জীবনে সঙ্গম তো জাগতিক প্রয়োজন। আপনি কি কামপ্রবৃত্তিকে গর্হিত বলে মনে করেন?'

'না গৌড়েশ্বর। কাম সৃষ্টির মূলবিন্দু। বিশ্বসংসারে পুরুষ-প্রকৃতির প্রেরণায় সৃষ্টির বিকাশ হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন, আর সেই বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অনন্তলীলা নিত্য বহমান। এই বিন্দুতে লীলাময়ী মহামায়া সৃষ্টি ঘটিয়ে থাকেন বলেই তো তিনি বিন্দুবিলাসিনী।

সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশে অথবা প্রেমাস্পদের সঙ্গে সঙ্গমবাসনায় কৃতসঙ্কল্প নর-নারীর মিলনকে তো নিন্দা করি না। আমিও নিজেও তো সেই সৃষ্টিসঙ্গমেরই ফল। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্বেচ্ছাচারী অবাধ যৌনকর্ম, অন্ত্যজ জাতিদের কুলস্ত্রী এবং রজস্বলা কন্যাদের বলপ্রয়োগে সেই যৌনকর্মে অংশগ্রহণে বাধ্য করা, এও কি ধর্মের অনুষঙ্গ গৌড়েশ্বর? শাস্ত্রে বলে স্ত্রীয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু, নারীশক্তি হতেই জগতের উৎপত্তি। ধর্মের দোহাই দিয়ে সেই নারীশক্তির এহেন অবমাননা কি সহনীয়?

'আর অবাধ মদ্যপান? তাকিয়ে দেখুন, বঙ্গদেশের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি নগরে, প্রতিটি পল্লীতে, প্রতিটি পণ্যবিথীতে কত না শৌণ্ডিকালয়। কর্মহীন, অর্থহীন এই জাতিকে মদিরার মৌতাতে ডুবিয়ে নির্বীর্য করে রাখার কী সযত্ন প্রয়াস! অন্নসংস্থানের উপায় নেই, কর্মোদ্যোগের পরিকল্পনা নেই, রয়েছে শুধু ধর্মের নামে অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপানের বিধান।

'মদ্যপান দোষের নয় গৌড়েশ্বর। পরিমিত কিছুই দোষের নয়। কিন্তু কোনও বিষয়ের আতিশয্যই গর্হিত বা অহিতকর। যেমন অতিভোজন দোষের। তেমন অতিকামুকতাও দোষের। তখন তাকে লাম্পট্য বলে। আর সেই লাম্পট্যে যখন দেশের শাসকগোষ্ঠী সবিস্তারে উৎসাহ দেয়, তখন বুঝতে হবে যে দেশের বড়ই দুর্দিন।'

'কিন্তু আচার্য, 'একজন বলে ওঠেন, 'আপনি তো নিজেও তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়ে একজন পণ্ডিত। পঞ্চ ম'কারের বিধান তো এই শাস্ত্রেই রয়েছে।'

'আছে সামন্ত অধিরথ। সেখানেই তো সুচতুর চালটি চেলেছেন প্রকাশচন্দ্র। বৌদ্ধতন্ত্রের যাবতীয় গূঢ়বিদ্যাকে নামিয়ে এনেছেন হট্টমেলার মধ্যে। যে শাস্ত্রকে বলা হয়েছে স্বীয় মাতার চরিত্রস্খলনের মতো গোপন রাখতে, তাকে সাধারণ্যে উন্মুক্ত করেন দেওয়া হয়েছে অধিকারী অনধিকারী ভেদ না রেখে। তার

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তিব্বতীয় পোন ধর্মের যাবতীয় অশ্লীল অসভ্য উপচার। বিজাতীয় ইতর ধর্মকৃত্যকে কেবলমাত্র অর্থান্তরিত করে ভারতীয় তন্ত্রধর্মের মধ্যে সুচতুর কৌশলে প্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আপনার বক্তব্যটি প্রণিধান হল লোকেশ্বর। যদিও সামন্ত অধিরথের পঞ্চ ম'কারের প্রশ্নটি...'

সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। 'আজ এই নিয়ে কূট আলোচনার দিন নয় মহাসামন্ত ধর্মসেন। একদিন নাহয় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আজ বরং যেজন্য একত্রিত হয়েছি সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাক।'

নবতিপর বৃদ্ধ মানুষটি বাতায়নের পাশে বসে স্থির অচঞ্চল চোখে সাগরদর্শন করছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন কত শত সহস্র বৎসর ধরে উনি ঠিক ওইভাবেই ওখানে বসে আছেন। যেন এই অকূল জলরাশির চঞ্চললীলা দর্শনে তিনি কখনও ক্লান্ত হন না।

কাহ্ন একবার ঘরে ঢুকে অস্পষ্ট শব্দ করলেন। বৃদ্ধ এদিকে তাকালেন না। শুধু অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এসেছ ঘনরাম?'

কাহ্ন উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধ আপনমনে বলতে লাগলেন, 'জানো ঘনরাম, শৈশবে বড় শখ ছিল সমুদ্র দেখার। পার্বত্য দেশের মানুষ আমি, পাহাড়ি ঝরনা আর নদী ছাড়া কিছুই দেখিনি। তাও সেই শীর্ণকায়া নদীর সঙ্গে এই দেশের বিশালকায়া বেগবতী নদীদের কোনও মিলই নেই। এদেশে এসে মেঘান্দ আর লৌহিত্যের বিপুল তরঙ্গ দেখে আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ। জলরাশি এত বিপুল, বিশাল, প্রচণ্ড হয়? এত উন্মত্ত, এত প্রলয়ঙ্কর হয়?

'সেইদিন শুনেছিলাম পূর্বসমুদ্রের জলরাশি নাকি এর চেয়েও প্রকাণ্ড। বিরাট। বিশাল। সেই থেকে বড় বাসনা ছিল, পূর্বসমুদ্র দেখব।

আজ দেখো, নিয়তির কী আশ্চর্য বিধান। গত অর্ধশতক ধরে শুধু এই জলরাশিই দেখে যাচ্ছি। তার আর বিরাম নেই।'

কাহ্ন শান্তস্বরে বললেন, 'আপনি তো অনেক আগেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন আর্য। এখনও জলরাশি দেখতে পান?'

বৃদ্ধ থমকে গেলেন। ধীরে, অতি ধীরে এদিকে ঘুরে বললেন, 'কে তুমি? এ তো ঘনরামের স্বর নয়।'

কাহ্ন দ্রুত এসে বৃদ্ধের হাত ধরলেন, 'আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আর্য চারুদত্ত।'

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ কাহ্ন'র হাতদুটি ধরে রইলেন। তারপর অকস্মাৎ ডানহাতে কাহ্ন'র গলা টিপে ধরলেন।

কাহ্ন বলশালী পুরুষ। তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধের দৃঢ়মুষ্ঠি থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। তারপর বললেন, 'আমি আপনার শত্রু নই আর্য।'

বৃদ্ধ খলখল স্বরে হেসে উঠলেন, 'মিত্র? এই শত্রুপুরীতে কোন মিত্র এলি রে? কেন এসেছিস? আমাকে সর্বনাশের পথে আরেকটু এগিয়ে দিতে?'

কাহ্ন বললেন, 'আমি সত্যিই আপনার মিত্র আর্য চারুদত্ত। আপনার অনেক দিনের গোপন বাসনা পূরণ করতে এসেছি।'

বৃদ্ধ আরও উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন, 'গোপন বাসনা? বাহ বাহ। তা কী এনেছিস আমার জন্য? উত্তম সুরা? সুপক্ক মৃগমাংস? সুন্দরী নারী?'

কাহ্ন শান্তস্বরে বললেন, 'না আর্য, আমি এসব কিছুই আনিনি। আপনার হৃদয়ে প্রতিশোধের যে আগুন অর্ধশতাব্দী ধরে প্রজ্জ্বলিত, তাকে নির্বাপিত করতে এসেছি।'

বৃদ্ধ আবার হেসে উঠলেন। বললেন, ‘বাহ বাহ! এটা কি প্রকাশচন্দ্র’র নতুন চাল? আমাকে পরীক্ষা করে দেখা কোনও ষড়যন্ত্রে আমি জড়িত কি না? শোন রে চন্দ্রবংশের ক্রীতদাস, তোর ওই বিশ্বাসঘাতক প্রভুকে গিয়ে বলে দিস, উপায় থাকলে আমি তার দুই চোখ উপড়ে সেখানে জ্বলন্ত অঙ্গার ঢেলে দিতাম। আমার সে উপায় নেই, আজ আমি চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধ। কিন্তু আমার অভিশাপ সর্বদা তার পিছু পিছু ফিরবে। তাকে এক মুহূর্ত শান্তি দেবে না। ওর সর্বনাশ হবে, মহাসর্বনাশ হবে...’

কাহ্ন দ্রুত হাত চেপে ধরলেন বৃদ্ধের, ‘সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসা, আর্য চারুদত্ত। আপনার অতৃপ্ত প্রতিশোধের বাসনা পূরণ করতে এসেছি আমি। প্রকাশচন্দ্রের মহা সর্বনাশ হবে, চন্দ্রবংশ ধ্বংস হবে। সেই মহাযজ্ঞে আপনার অর্ঘ্য চাই আর্য চারুদত্ত।’

চারুদত্ত ঘড়ঘড়ে স্বরে বললেন, ‘কে তুই? আমাকে মিথ্যে আশা দিচ্ছিস কেন?’

‘আমার নাম কাহ্ন, আর্য চারুদত্ত। চন্দ্রবংশের কুশাসন থেকে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করার জন্য যে মহাযজ্ঞ চলছে, তার এক সামান্য সেনানী।’

চারুদত্ত ঘোলাটে, প্রায় অন্ধ চোখদুটি দিয়ে চেয়ে রইলেন কাহ্নপা’র দিকে।

চারুদত্ত’র কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কাহ্নপা বললেন, ‘গত সপ্তাহে ঘনরাম আপনাকে কিছু বলে গেছিল?’

চারুদত্ত অস্ফূটে বললেন, ‘হ্যাঁ। সে বলেছিল পরের সপ্তাহে তার বদলে অন্য কেউ আসবে। সে নাকি আমার জন্য কিছু উপহার আনবে।’

‘আর কিছু?’

চারুদত্ত ফিসফিস করে বললেন, ‘আর বলেছিল তাকে একটি সংকেতবাক্য’র অর্ধাংশ বলতে। সে যদি বাকি অর্ধাংশ না বলতে পারে, তাহলে আমি যেন তাকে বিশ্বাস না করি।’

কাহ্নপা চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। চারুদত্ত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন, ‘সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।’

কাহ্ন বললেন, ‘অণাহা দাণ্ডী বাকি কিঅ অবধূতী।’

চারুদত্ত কাহ্নপার হাত চেপে ধরলেন।

‘কিন্তু মহর্ষি, আপনি যা করতে বলছেন সে তো প্রায় অসম্ভব। সর্বস্তরে স্থানীয় সমিতির জাল বিছিয়ে রেখেছেন প্রকাশচন্দ্র আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। তারা প্রতিনিয়ত রাজ্যের কোথায় কী হচ্ছে তার সংবাদ পৌঁছে দেয় কর্মান্তবাসকে। সর্বত্র কঠিন প্রহরা। তার ওপর চন্দ্রবংশের সুশিক্ষিত সৈন্যদল। সর্বোপরি প্রকাশচন্দ্রের নিজস্ব ভৈরববাহিনী আছে, রাজসেবকদল। তাদের পরাস্ত করে আপনি কর্মান্তবাসক অধিকার করার স্বপ্ন দেখছেন? বাতুলের প্রলাপ নয় কি?’

‘আপনার কথা সত্য জয়নাগ। কিন্তু আমরা একা নই। আমাদের সঙ্গে গৌড়বঙ্গের কয়েকজন কৃতবিদ্য পুরুষ আছেন। আপনারা আছেন।’

‘আমরা কয়েকজন সামন্ত আপনাদের সঙ্গে আছি বটে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না সামন্তদের অধিকাংশই প্রকাশচন্দ্রের পক্ষে।’

‘যুদ্ধ কখনও সংখ্যাধিক্যের জোরে জেতা যায় না মহাসামন্ত ধর্মসেন। যুদ্ধ জেতা হয় রণকৌশল, বুদ্ধিমত্তা আর সাহসের জোরে। নইলে মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সেনা কৌরবদের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারত না।’

‘কিন্তু লোকেশ্বর, এ কথা ভুললে চলবে না যে পাণ্ডবদের সঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন।’

'শ্রীকৃষ্ণ নন আচার্য, বলুন ধর্ম। স্বয়ং ধর্ম পাণ্ডবদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। ন্যায়, সত্য, আর ধর্ম, এই তিনটি যার পক্ষে তার বিজয় অনিবার্য।'

সভায় নীরবতা নেমে এল। ইত্যবসরে মুখ খুললেন সামন্ত বলভদ্র। এতক্ষণ চুপ করেছিলেন তিনি। নীরবতা ভেঙে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'মহর্ষি, ধরে নিলাম এই সংগ্রামে আমাদের জয় অনিবার্য। কিন্তু তারপর? প্রকাশচন্দ্র'র পর কে হবেন বঙ্গভূমির সম্রাট? তিনি কি আমাদের মধ্যেই কেউ? তাহলে কে তিনি?'

সবাই জানতেন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। এবং এই প্রশ্নটির নিষ্পত্তির ওপরেই নির্ভর করছে আজকের সভার সাফল্য।

থেমে থেমে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'এই প্রশ্নটি উত্থাপন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ সামন্ত বলভদ্র। স্পষ্ট জানাচ্ছি যে এখানে উপস্থিত সামন্তদের কাউকেই সেই পদের জন্য আমি মনোনীত করিনি।'

'কেন লোকেশ্বর? আমরা কি অযোগ্য?'

'প্রশ্নটি যোগ্যতার নয় সামন্ত বলভদ্র, প্রশ্নটি কূটনীতির।'

মহাসামন্ত ধর্মসেন স্থির এবং শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'যদি আমাদের কিছু প্রাপ্তির আশাই না থাকে, তাহলে আমরা এখানে ঠিক কী জন্য এসেছি সেটা কি আমাদের জানাবেন লোকেশ্বর?'

মৎস্যেন্দ্রনাথ ধীরস্থিরস্বরে বললেন, 'প্রাপ্তি কি কিছুই নেই মহাসামন্ত ধর্মসেন? আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য তো এই অরাজক মাৎসন্যায় থেকে উদ্ধার পাওয়া। আজ আপনি আপনার স্বক্ষেত্রে সম্রাট, মহাসামন্ত। কিন্তু কাল যে অন্য কোনও অধিকতর ক্ষমতাশালী ভূস্বামী আপনার ভুক্তিটি অপহরণ করবেন না তার নিশ্চয়তা কী? এই রাক্ষসশাসন, সর্বক্ষণের অনিশ্চয়তা, ধনে প্রাণে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আতঙ্ক, তার থেকে মুক্তি পাওয়াও কি একটি প্রাপ্তি নয়?'

'আপনার কথা সত্য লোকেশ্বর। কিন্তু আমরা যোদ্ধৃবর্গ। প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে পারি। শত্রুপাত করতে পারি। শত্রু প্রবল হলে বীরগতিও প্রাপ্ত হতে পারি। কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের মতো শত্রুর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধঘোষণার জন্য তো কিছু না কিছু কারণ প্রয়োজন।'

'আপনার বক্তব্য বুঝলাম না সামন্ত বলভদ্র। ঘরে আগুন লাগলে তবেই কি কুয়ো খোঁড়ার উদ্যোগ নেবেন? বিশেষ করে সেই আগুন যখন পাশের পল্লীটি লেলিহান শিখায় দগ্ধ করছে? আমি কি তখনও এই ভেবে ঘুমিয়ে রইব যে যেখানে যাই হোক না কেন, আমার ঘরটি তো নিরাপদ! শত্রু দুয়ারে উপস্থিত, প্রতিবেশীর ঘর জ্বলছে, তার ধনসম্পদ লুণ্ঠিত, তার নারী ও কন্যারা অপহৃতা-ধর্ষিতা, তখনও আপনি অপেক্ষা করে থাকবেন কবে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আপনার ঘরের দুয়ার স্পর্শ করবে?'

সভাস্থলের বিভিন্ন দিক থেকে কিছু অস্বস্তিকর শব্দ ভেসে এল।

'আজ আর সেই সময় নেই মহামান্য সামন্তবর্গ। আজ সর্বনাশের আগুন আমাদের দরজায় উপস্থিত। আমাদের মান-সম্মান-ধন-সম্পদ-নারীদের সতীত্ব সবই এখন শত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্য। এই চন্দ্রবংশীয় বর্বরের দল আজ আমাদের জাতিসত্বা-ধর্ম-সমাজ-আদর্শ-অস্তিত্ব সবকিছুর সমূল বিনাশের উদ্দেশে খড়্গহস্ত। আজ যদি আমরা এই নৃশংস বর্বরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উত্তর দিতে পারব না। আজ থেকে শতবর্ষ পর যখন আকাশপ্রদীপের আলোরেখা ধরে নেমে আসব, তখন তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব না।'

সভাস্থলে অখণ্ড নৈঃশব্দ্য।

কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধ মানুষ প্রশ্ন করলেন, 'আমার মনে হয় আপনার বক্তব্য আমাদের সবার কাছেই গৃহীত হয়েছে মহর্ষি। এবার আপনি বলুন এই বিপ্লবোত্তর কালে কাকে আপনি বঙ্গদেশের শাসকরূপে দেখতে চাইছেন?'

আধো অন্ধকারের মধ্যেই সবার দিকে একবার চক্ষু ঘুরিয়ে নিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তারপর শান্তস্বরে বললেন, 'আচার্য দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, খণ্ডিতারাতি বপ্যটের পুত্র, রাজভটবংশাদিপতিত মহাবীর শ্রীগোপালদেব।'

'পাপ মিত্র, পাপ। বিশ্বাসঘাতকতার পাপ, স্বজনহত্যার পাপ, স্বার্থের বশে বহুতর নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করানোর পাপ। সেই পাপে আজ আমার এই অবস্থা।'

'দুঃখ করবেন না আর্য চারুদত্ত। ঈশ্বর আজ সেই পাপস্খালনের সুযোগ এনে দিয়েছেন আপনার সামনে।'

'সব পাপের কি স্খালন হয় কাহ্ন? জ্যেষ্ঠার সঙ্গে যখন এই দেশে আসি, তখন কতই বা বয়স আমার। ষোড়শবর্ষীয় কিশোর আমি। সম্রাট রাজভট এই নবীন কিশোরকে শ্যালক নয়, নিজের সহোদরজ্ঞানে স্নেহ করতেন। কী পাইনি তাঁর কাছ থেকে? অপরিমিত স্নেহ, অবাধ প্রশ্রয়, যথেচ্ছ স্বাধীনতা, যখন যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। ধীরে ধীরে তাঁর স্নেহাস্পদ বয়স্য হয়ে উঠছিলাম। জ্যেষ্ঠার অনুরোধে সচিব পদমর্যাদা পেলাম। কিন্তু সেই তাঁকেই...'

'তাঁকেই কী, আর্য চারুদত্ত?'

প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া চক্ষুদুটি মেলে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন চারুদত্ত। সমুদ্রের লবণাক্ত আর্দ্র বাতাস ধেয়ে আসছিল ঘরের মধ্যে। তার প্রবল গর্জনে কান পাতা দায়। যদিও একটু মনোযোগ দিলে বাইরে সৈন্যদের মত্ত আলোচনার স্বরও কানে আসে।

'তাকেই হত্যা করলাম মিত্র কাহ্ন। আমি বিশ্বাসঘাতক চারুদত্ত, কৃতঘ্ন চারুদত্ত, এক অন্ধকার রাত্রে আমি আমার স্নেহশীল অগ্রজাভর্তা, প্রতিপালক প্রভু, বঙ্গদেশের সম্রাট রাজভটকে তিব্বতীয় মহাকূটবিষপ্রয়োগে হত্যা করলাম।'

কাহ্ন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই সংবাদ মৎস্যেন্দ্রনাথ জানতেন, বলা ভালো অনুমান করেছিলেন। আজ সেটা মিলে গেল।

'কিন্তু কেন?'

ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকালেন চারুদত্ত।

'আপনি নিয়তি মানেন মিত্র কাহ্ন?'

'মানি আর্য চারুদত্ত।'

'সেই নিয়তিই এর কারণ। নিজের উপরই বিতৃষ্ণা হয় কাহ্ন। বিধাতাপুরুষ বোধহয় আমার জন্মলগ্নেই কপালে পাপনিয়তি বলে লিখে দিয়েছিলেন। নইলে এত স্নেহচ্ছায়ায় পালিত হওয়ার পরেও আমার মনে বিদ্বেষবিষ প্রবেশ করবে কেন?

'সচিব হওয়ার পর ধীরে ধীরে লক্ষ করলাম যে অন্যান্য সভাসদরা প্রকাশ্যে সচিবের উপযুক্ত সম্মান দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁদের আচার আচরণে প্রকাশ পেতে থাকে যে আমার পদটি সর্বার্থেই আলঙ্কারিক। রাজার শ্যালক বলে ওই আসনে বসার অধিকার পেয়েছি মাত্র। শাসনব্যবস্থায় মতামতদানের কোনও ক্ষমতাই আমার নেই।

'ধীরে ধীরে এই ভাবনা আমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয়ে বসল। এই চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটের সময় দেখতাম যে সম্রাট তাঁর প্রধানতম মন্ত্রণাদাতাদের নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। কে কে আছেন সেই সভায়? পণ্ডিত দয়িতবিষ্ণু, মহামাত্য বুদ্ধদাস, এবং সেনাপ্রধান আনন্দদত্ত। আর আমি চারুদত্ত, রাজসচিব চারুদত্ত, যার কিনা প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের প্রতিভূ হওয়ার কথা, সেই আলোচনায় তার কোনও প্রবেশাধিকারই নেই।

'ঈর্ষার তীব্র বিষ ক্রমেই আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তুলছিল। আর সেই অন্ধ ঈর্ষাবিদ্বেষ প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলছিল আমার মনে।

'সেই সময়ে কিছু দৌত্যের কাজ নিয়ে একবার আমার মাতৃভূমি দর্শনে যাই। সম্রাটই পাঠিয়েছিলেন। সেইখানেই এক সন্ধ্যায় কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মদ্যপানের আসরে আমি বলে ফেলি এই ক্ষোভের কথা, অপমানের কথা।

'জানি না কী করে এই কথা পৌঁছে গেল তিব্বতের মহাসামন্ত, তথা মহামাত্য গার তিরিলিং-এর কানে। সেইদিনই বিধাতাপুরুষ সর্বনাশের পথটি আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন।

'পরদিনই মহামাত্য'র প্রাসাদে এক গুপ্তসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ পেলাম। সেখানে তিনি ছাড়াও তিব্বতী রাজসভার কয়েকজন প্রভাবশালী সামন্ত উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন কয়েকজন চৈনিক রাজপুরুষ। তাঁরা তাং বংশের প্রেরিত গুপ্তচর।

'সেইদিনই রূপরেখা রচিত হয় এক মহাষড়যন্ত্রের। বঙ্গভূমির সমূহ সর্বনাশের, সমূলে উৎপাটনের ষড়যন্ত্র। মূল ষড়যন্ত্রকর্তা তাং বংশের মহাপ্রতাপশালী সম্রাট তাইজং আর তাঁর প্রিয়তমা রক্ষিতা যু জেতিয়ান। আর তার রূপায়ণে তিব্বতের পোন ধর্মাবলম্বী সামন্তগোষ্ঠী, আমারই স্বধর্মী স্বজাতি।

'সেই রাতেই এক পোন ধর্মচক্রের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সেখানে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক সুঠামদেহী বঙ্গদেশীয় যুবাপুরুষ আর এক সুন্দরী নারীর সঙ্গে।'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন চারুদত্ত। কাহ্ন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাকি ঘটনা আমরা জানি আর্য চারুদত্ত। কার্যসিদ্ধির পর কীভাবে আপনাকে গজভুক্তকপিত্থের মতো পরিত্যাগ করা হয়, এই অস্বাস্থ্যকর প্রদেশে নির্বাসন দেওয়া হয় তাও জানি।'

কপালে করাঘাত করলেন চারুদত্ত, 'পাপ কাহ্ন পাপ। মহাপাপে পাপী আমি। স্বার্থে অন্ধ হয়ে একজন প্রজাপালক রাজাকে হত্যা করেছি। এক ক্রূরমতি পাপকর্মা পুরুষ আর এক কামুক নাগিনীকে দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছি। এই বিস্তীর্ণ ভূমিকে রাহুর করালগ্রাসে পতিত করেছি। আমার উদ্ধার নেই, মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই।'

বৃদ্ধের হাত থরথর করে কাঁপছিল। কাহ্নপা দ্রুতহাতে হাতদুটি ধরে বললেন, 'কে বলল মুক্তি নেই? গত অর্ধশতাব্দী ধরে এই যে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করছেন, তাতে কি পাপের ক্ষয় হয়নি?'

'হয়েছে কাহ্ন?' সাগ্রহে কাহ্নপা'র হাত দুখানি ধরে প্রশ্ন করলেন চারুদত্ত।

'হয়েছে আর্য, অবশ্যই হয়েছে। আর আপনার নির্বাসনের কালও শেষ হয়ে এসেছে আর্য চারুদত্ত। আজ চন্দ্রবংশের কুশাসনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। মহাবিদ্রোহ আজ সমাগতপ্রায়। আর সেই মহাযজ্ঞের আগুনে কিছু সমিধ আহরণের জন্যই আজ আমরা আপনার কাছে এসেছি। ঘনরাম আপনাকে পুরস্কারের কথা বলেছিল না? এই সেই পুরস্কার।'

কথাগুলি বোধহয় চারুদত্ত'র হৃদয়ঙ্গম হতে কিছু সময় নিল। তারপরেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'হবে কাহ্ন, সত্যি বলো হবে? এই পাপাচারী নারকী রানির রাজত্ব ধ্বংস হবে? ওই ঐন্দ্রজালিক কাপালিকটার হাত থেকে মুক্তি পাব আমরা?'

কাহ্ন দ্রুত চারুদত্ত'র মুখে হাত চাপা দিলেন। কেউ শুনে ফেললেই সর্বনাশ। ইঙ্গিতে চুপ করতে বললেন চারুদত্তকে। তারপর লঘু পদক্ষেপে দেখতে গেলেন, বাইরে প্রহরীরা কী অবস্থায় আছে।

সভাস্থলে একটি বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল। গৌড়েশ্বর জয়ন্ত সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কে এই গোপালদেব? কী পরিচয় এঁর? আর এঁকে রাজভটবংশাদিপতিতই বা বলছেন কেন?'

মৎস্যেন্দ্রনাথের পাশ থেকে এক বিশালদেহী পুরুষ উঠে দাঁড়ালেন। উপস্থিত প্রত্যেককে প্রণাম করে বললেন, 'উপস্থিত অভ্যাগতদের সাদর প্রণাম। অধমের নাম বপ্যট।'

উপস্থিত সামন্ত'রা বপ্যটকে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। যুদ্ধব্যবসায়ী বপ্যটের বলবীর্যের খ্যাতি গৌড়বঙ্গের সর্বত্র পরিব্যপ্ত। তবে অনেকেই তাঁকে ইতিপূর্বে চাক্ষুষ দেখেননি।

বপ্যট চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আমি একজন যুদ্ধব্যবসায়ী। অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সামন্তবর্গের অধীনে যুদ্ধ করাই আমার পেশা। তবে আমার আরও একটি পরিচয় আছে,' বলে একটু থামলেন বপ্যট। তারপর অত্যন্ত নিস্পৃহস্বরে যোগ করলেন, 'আমি সম্রাট রাজভটের ঔরসজাত পুত্র।'

সভার মধ্যে যেন বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটে গেল। উপস্থিত অভ্যাগতবর্গ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

প্রথম কথা বললেন সামন্ত অধিরথ। তিনি চাপা উত্তেজিতস্বরে বললেন, 'আপনি জানেন কী বলছেন?'

মহাসামন্ত ধর্মসেন আশ্চর্যান্বিত স্বরে বলে উঠলেন, 'সম্রাট রাজভটের তো একটিই সন্তান ছিল বলে জানতাম, বলভট। আপনার উল্লেখ তো কখনও কোথাও পাইনি!'

উপস্থিত বৃদ্ধ আচার্যটি স্থিরস্বরে বললেন, 'বলভট ব্যতিরেকে সম্রাট রাজভটের যে একটি অন্য পুত্র ছিল তার উল্লেখ আমি অত্যন্ত গোপনসূত্রে আগেও পেয়েছি। তবে ইনিই যে সেই পুত্র তার সত্যতা নিরূপণ করে নেওয়াই শ্রেয়।'

'পিতৃপরিচিতি নিয়ে কেউ মিথ্যে কথা বলে না আচার্য। আমি সত্য কথাই বলছি। এবং সেই সূত্রে আরও জানাই যে শ্রীগোপালদেব আমার পুত্র। তার শরীরে সম্রাট রাজভটের রক্তের উত্তরাধিকার বইছে। সেই জন্যেই লোকেশ্বর তাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছেন। আমার মনে হয় এই বিষয়ে বরং উনিই বিশদে বলতে পারবেন।'

মৎস্যেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। আর তারপর সমবেত সামন্তদের সামনে এক অজানা ইতিহাসের অধ্যায় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে লাগল।

কাহ্নপা দেখলেন কুটিরের দ্বারে মহোৎসব চলছে। ছয়টি মদ্যকলস ঘিরে অন্তত বিশজন প্রহরী বৃত্তাকারে বসে আছে। বেচারি ঠগন তাদের আদেশ পালন করার জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো ইতিউতি ধাবমান। কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বা একটি শূন্য কলসীকে জড়িয়ে প্রেমপূর্বক চুম্বনে মত্ত। কেতকদাসকে দেখা গেল অধোবাসের প্রান্তটি অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গে জড়িয়ে, সেটি লাজুক ভাবে দাঁতে কেটে ললিতলবঙ্গলতারূপে বাকি রক্ষীদের মনোরঞ্জন করছে। দু-একজন রক্ষী চিৎকার করে অশ্রাব্যগীতি গাইছে। জনাচারেক রক্ষী নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন। প্রথম রক্ষীটি রাজাসনে বসে দু-চারজন মনোযোগী শ্রোতাকে তার বিভিন্ন বীরত্বের গাথা শোনাতে ব্যস্ত।

সন্তর্পণে ভেতরে ফিরে এলেন কাহ্নপা। ছয়টি কলসীতেই মদিরার সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণে ধুতুরাবীজ মেশানো ছিল। যাতে এরা আবেশে উন্মত্ত হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণহানি না ঘটে।

কাহ্নপা ফিরে এসে দেখলেন চারুদত্ত স্থির হয়ে বসে আছেন। পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন, 'বলো কাহ্ন, কী জানতে চাও?'

কাহ্ন প্রশ্ন করলেন, 'প্রকাশচন্দ্র আর এই রানিকে হত্যার উপায় জানতে চাই। চাই আরও কিছু তথ্য, যা আপনি মনে করেন আমাদের জানা উচিত।'

চারুদত্ত কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'এই নারী কে সে আশা করি এতদিনে আপনারা জানেন। কিন্তু যা জানেন না সে অত্যন্ত গভীর এবং গোপন সংবাদ। আমি আর প্রকাশচন্দ্র ছাড়া আর কেউ জানেন না।'

কাহ্নপা'র শরীর শক্ত হয়ে এল। পদ্মসম্ভবের তিব্বত থেকে আনা গোপন পত্রটি পাঠ করেছেন আচার্য শান্তরক্ষিত। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর মাত্র দুজন, মৎস্যেন্দ্রনাথ আর তিনি নিজে। তিনি বুঝতে পারলেন কোন গূঢ় সংবাদের দিকে ইঙ্গিত করছেন চারুদত্ত। মনের ভাব মনেই চেপে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী সেই সংবাদ, আর্য?'

'এই নারী চৈনিক হলে কী হবে, এঁর দেহে বইছে ভারতীয় রক্ত। আপনাদেরই ভূমির বহু প্রাচীন পাপ আজ নাগরূপ ধারণ করে আপনাদেরই দংশন করতে উদ্যত।

আপনাদের পুরাণে অষ্টনাগের উল্লেখ আছে। সাধারণ লোক নাগ বলতে সাপ বোঝে। কিন্তু নাগ একটি বিশিষ্ট জনজাতি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এঁদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

অষ্টনাগ প্রকৃতপক্ষে নাগ জনজাতির আটটি মুখ্য প্রবর বা গোত্র। তার একটি হচ্ছে কর্কটনাগ। এঁরা প্রকৃতপক্ষে পূর্বভারতের ভূমিজ সন্তান ছিলেন।

কৃষ্ণার্জুন যখন খাণ্ডব বন ধ্বংস করেন, তখন সেখানে কর্কটনাগ জাতির একটি শাখার বসতি ছিল। সেই মারণযজ্ঞ থেকে নিষ্কৃতি পেতে তাঁরা পালিয়ে যান প্রথমে ত্রিগর্ত, তারপর সেখান থেকে কেকয় হয়ে গান্ধার।

পৈশাচী বিষবিদ্যায় কর্কটনাগ গোষ্ঠীর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁরা গান্ধারের রাজধানী পুষ্কলাবতীতে বিষবৈদ্য হিসেবে জীবিকা নির্বাহ শুরু করেন। ধীরে ধীরে নাগরিক সমাজে তো বটেই, পুষ্কলাবতীর রাজসভাতেও তাঁরা বিশেষ স্থান অধিকার করে নেন। তার কতটা ভয়ে আর কতটা সম্মানে সে বলা অসম্ভব।

এই কর্কটনাগ গোষ্ঠীর মুখ্য পুরুষ ছিলেন দিব্যনাগ। তাঁর একটি সর্বসুলক্ষণা কন্যা ছিলেন, নাম পদ্মাবতী। ইনি বিষবিদ্যায় আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। লোকে বলত স্বয়ং নাগমাতা অদিতি দিব্যনাগের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর উত্তর-পশ্চিম ভারত ধীরে ধীরে মহান নাগরাজ তক্ষকের অধিকারে যায়। তিনি রাজধানী স্থাপন করেন তাঁরই নামাঙ্কিত নগরীতে, তক্ষশীলায়।

খাণ্ডব দাহনের পর থেকেই নাগজাতির সঙ্গে কুরুবংশের বিরোধ চলছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর সেই বিরোধ চরমে ওঠে। এরই চূড়ান্ত পর্যায়ে নাগরাজ তক্ষকের প্রেরিত কশ্যপ নামের এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন কুরুরাজ পরীক্ষিত।

পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয় সিংহাসনে আসীন হয়েই নাগজাতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তক্ষশীলা অবরোধ করা হয়। নাগসৈন্য প্রবল বিক্রমের সঙ্গে সংগ্রাম করতে থাকে।

অবশেষে এক শ্রাবণী অমাবস্যার রাতে কুরুসেনা ধর্মযুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করে তক্ষশীলায় প্রবেশ করে। নগরীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রতিটি পুরুষ, নারী, বৃদ্ধ ও শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ করা শুরু হয়। জন্মেজয় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নাম দেন সর্পযজ্ঞ।

জন্মেজয় হয়তো সমগ্র নগরীটিই ধ্বংস করতেন। কিন্তু বাধ সাধলেন পদ্মাবতীপুত্র আস্তিক।

তক্ষশীলা তখন থেকেই অধ্যয়নকেন্দ্র হিসেবে সুনাম করতে শুরু করেছে। সেখানে ছোটবড় মিলিয়ে বেশ কিছু গুরুকুল ছিল, নাগরাজ তাদের ভরণপোষণ করতেন। পদ্মাবতীপুত্র আস্তিক সেখানে কোনও একটি গুরুকুলে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন তাঁর পিতাও।

ন্যায় এবং স্মৃতিতে আস্তিকের বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সেই হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পাঁচদিন পর কোনও কৌশলে কুরুরাজ জন্মেজয়ের রাজস্কন্ধাবারে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি নিজের ওজস্বী ভাষণ ও বাকচাতুর্যে জন্মেজয়কে এই সর্পযজ্ঞ থেকে নিবৃত্ত করেন। তক্ষশীলা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেল। নাগজাতি সমূলে উৎপাটিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল।

কিন্তু দিব্যনাগ জানতেন এই শান্তি সাময়িক। কুরুবংশের প্রতিশোধের আগুন আবার জ্বলে উঠবে একদিন, ছারখার করে দেবে নাগজাতিকে।

তাই একদিন তিনি কন্যা পদ্মাবতী আর পৌত্র আস্তিককে নিয়ে অনির্দেশের পথে যাত্রা করেন। আস্তিক যে গুরুকুলের শিক্ষার্থী ছিলেন, সেখানে তাঁর এক চৈনিকদেশাগত সতীর্থ ছিলেন। তিনিই তাঁদের নিজের দেশে আমন্ত্রণ জানান।

বড় দুঃখে, বড় শোকে পদ্মাবতী আর আস্তিক এই ভারতভূমি ত্যাগ করেন। তার একটি কারণ যদি হয় দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া, তবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে আস্তিকের পিতা, তথা পদ্মাবতীর স্বামী জরুৎকারু সেই জন্মেজয়'র সর্পযজ্ঞে নিহত হন।

পদ্মাবতী অভিশাপ দিয়ে যান, তাঁর বংশের কোনও এক নারী একদিন নাগকন্যা হয়ে এই দেশে ফিরে আসবে। ফিরে আসবে মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে, সর্বগ্রাসী ধ্বংস হয়ে।'

'কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির কী সম্পর্ক, আর্য চারুদত্ত?'

'সম্পর্ক আছে মিত্র কাহ্ন!' দন্তহীন মুখে হাসলেন চারুদত্ত। তারপর সামান্য কৌতুক আর অনেকখানি রহস্য মিশিয়ে বললেন, 'বঙ্গদেশের বর্তমান রানি হচ্ছেন সেই কর্কটনাগকন্যা পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী।'

মৎস্যেন্দ্রনাথের কথা শেষ হলে প্রত্যেক নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। মহাসামন্ত ধর্মসেন অভিভূতস্বরে বললেন, 'এ যে আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। সম্রাট রাজভটের বৈধ উত্তরাধিকারী আবার তাঁর প্রাপ্য সিংহাসন ফিরে পাবেন, এই দীর্ণ ভূমিতে শান্তি এবং সুশাসন ফিরে আসবে, এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে?'

সামন্ত অধিরথ বলে উঠলেন, 'কিছু মুহূর্ত পূর্বাবধি আমার মনে সংশয় ছিল বটে। স্বীকার করতে বাধা নেই, এখন আমি সম্পূর্ণ নিঃসংশয়।'

উপস্থিত অন্যান্য সামন্তরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। পরিত্যক্ত প্রাসাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যেন নতুন করে আশার উজ্জ্বল জ্যোতি জেগে উঠল।

গৌড়েশ্বর জয়ন্ত প্রৌঢ় হয়েছেন। তবুও তিনি যখন পরের প্রশ্নটি করলেন, তাঁর স্বরের মধ্যে নবযৌবনের উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল, 'তাহলে, এবার আমাদের কী কর্তব্য লোকেশ্বর?'

মৎস্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই বঙ্গদেশের রাজপদোপজীবিদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে স্বপক্ষে আনতে পেরেছি। তাঁরা নিয়মিত আমাদের সংবাদ দিয়ে চলেছেন। প্রকাশচন্দ্র এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ভালোই বুঝেছেন যে মহাবিদ্রোহ আসন্নপ্রায়। কর্মান্তবাসকের সর্বত্র নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে চতুর্গুণ। সৈন্যবাহিনীকে সদাপ্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। রাজসেবক বাহিনীকে বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি গ্রাম, পল্লী, পণ্যবিথী এবং মন্দিরে সতর্ক থাকার জন্য।

'আমরা সরাসরি আক্রমণ করে কর্মান্তবাসক পদানত করতে পারব না। সংখ্যায় এবং রণকুশলতায় শত্রুপক্ষ আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। আমাদের পথ হবে অন্তর্ঘাতের পথ। ক্ষণিক এবং ঝটিকা আক্রমণের পথ। শত্রুকে স্তম্ভিত করে দিতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সমস্ত উপায়ে শাসনব্যবস্থাকে উত্যক্ত করে যেতে হবে।'

'যেমন?'

'আপনারা কর দেওয়া বন্ধ করে দিন। বা বিলম্বিত করুন। বলুন, প্রজারা অবাধ্য হয়েছে, তারা কর দিতে চাইছে না।'

'এই যুক্তি প্রকাশচন্দ্রের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যোগীবর। তিনি প্রশ্ন করবেন সামন্তসৈন্যরা আছে কী করতে? তাদের প্রয়োগ করুন।'

'সঠিক বলেছেন সামন্ত অধিরথ। সেই নির্দেশ এলে আপনাদের অধীনস্থ সৈন্যপ্রধানদের বলুন বিদ্রোহের নাটক করতে। তারা যেন আপনাদের রাজসভার কোনও মুখ্য রাজকর্মকর্তাকে বন্দি করে। তিনি মহামাত্য হতে পারেন, মহাপ্রতীহার হতে পারেন, অথবা আবস্থিক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, ঔদ্রঙ্গিক, বাহনায়ক, বিষয়পতি যে কেউ হতে পারেন।'

'বিষয়টি কি এতই সরল?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করেন একজন।

'অবশ্যই নয় সামন্ত,' গম্ভীরস্বরে বললেন বপ্যট, 'আপনাদের সম্মতি পেলে সমগ্র পরিকল্পনাটি বিশদে বলতে পারি।'

'বলুন আর্য বপ্যট।'

'শাস্ত্রে বলে নৃপঃ কর্ণেন পশ্যতি। চন্দ্রবংশের দ্বারা নিযুক্ত হলেও, মহারানির তৎপাদপরিগৃহীত হলেও আপনারা বহুলাংশে স্বাধীন নরপতি। অবশ্যই আপনাদের প্রত্যেকের নিজস্ব গুপ্তচরবাহিনী আছে।'

উপস্থিত সামন্তরা স্মিত হাসলেন। কিছু বললেন না।

'আপাতত আপনারা আপনাদের গুপ্তচরবাহিনীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করে রেখেছেন। তাই তো?'

মুহূর্তে সামন্তরাজারা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'আমার অনুরোধ, অনতিবিলম্বে আপনাদের গুপ্তচরবাহিনীকে রাজ্যের মধ্যে ফিরিয়ে আনুন। তারপর আপনার একান্ত অনুগত এবং বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের নিযুক্ত করুন আপনার রাজসভার সদস্যদের জন্য। তাঁরা কী করেন, কোথায় যান, কার সঙ্গে দেখা করেন, কাদের ওপর নির্ভর করেন, তাঁদের অভ্যাস কী, দুর্বলতা কোথায়, সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করুন। এই মুহূর্তে আপনার অমাত্যদের মধ্যে কারা কারা চন্দ্রবংশের একান্ত অনুগত তার সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।'

'তারপর?' প্রশ্ন করলেন গৌড়েশ্বর জয়ন্ত।

'হ্যাঁ, পরের অংশটিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ,' আলোচনার রাশ নিজের হাতে তুলে নিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে সৈন্যপ্রধান, মহাপ্রতীহার এবং বিষয়পতি, এই তিন পদাধিকারী সম্পূর্ণভাবে আপনার বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। সৈন্য এবং অর্থ, এই হচ্ছে রাজ্যশাসনের অস্থি এবং মজ্জা। এই দুটি বিষয় যেন নিঃসংশয়ে আপনাদের করতলগত হয়।

'প্রথমেই এই তিনটি অধিকরণে নিজের অধিকার স্থাপন করুন। তারপর অনুগত সৈন্যপ্রধানের দ্বারা মিথ্যা সেনাবিদ্রোহের আয়োজন করুন। বিদ্রোহী সেনারা যেন সেইসব রাজকর্মচারীদেরই বন্দি করে যারা গোপনে চন্দ্রবংশের প্রতি অনুগত।'

এতক্ষণে বিষয়টি বুঝলেন রাজারা। নড়েচড়ে বসলেন।

'বন্দি রাজকর্মচারীদের কাছে কৌশলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন যেন তাঁরা সৈন্যবিদ্রোহ এবং নিজেদের বন্দি হওয়ার সংবাদ নিজস্ব সূত্রে কর্মান্তবাসকে পাঠাতে পারেন। শান্তঘোষ এবং আনন্দগুপ্ত কিছুতেই যেন বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদ উপেক্ষা করতে না পারেন।'

মাথা নাড়লেন উপস্থিত সামন্তরা। গৌড়েশ্বর বললেন, 'এতদ্দ্বারা বোঝানো যাবে যে বঙ্গদেশের বিভিন্নস্থানে সেনাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাই তো?'

'ঠিক তাই। আপনারা মহারানির কাছে আবেদন জানাবেন যেন কর্মান্তবাসক থেকে সৈন্য পাঠানো হয়। আপনাদের সাহায্যের আশু প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে যেন অন্যান্য সামন্তদের অনুরোধ করা হয় সৈন্য পাঠিয়ে আপনাদের সাহায্য করার জন্য।'

'কিন্তু অন্যান্য সামন্তরা এই প্রস্তাবে আপত্তি জানাবেন না?'

'না, জানাবেন না।' বললেন গৌড়েশ্বর জয়ন্ত, 'তাঁরা বরং চাইবেন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে এখন ঘোর মাৎস্যন্যায়। আপনার পার্শ্ববর্তী সামন্ত মহোদয় আপনার শাসনভূমিটি হস্তগত করার

এমন সুবর্ণসুযোগ কোনওমতেই ছাড়বেন না। তিনি প্রবল উৎসাহে নিজের সৈন্য পাঠাবেন। এমনকী কর্মান্তবাসক থেকে আদেশ আসার আগেই যদি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেন তাহলে আশ্চর্য হব না। এই সুযোগে তিনি আপনার ভূম্যধিকার, সম্পদ, নারী সব কিছু উদরসাৎ করবেন। আর এই অনাচারের পরিবর্তে না হয় কিছু মূল্য ধরে দেবেন। অর্থাৎ কিছু অতিরিক্ত কর উপঢৌকন পাঠিয়ে দেবেন কর্মান্তবাসকে। তাহলেই সব শান্তিকল্যাণ।'

সভাস্থলে উপস্থিত সামন্তরা মৌন রইলেন। এই বক্তব্যের রূঢ় সত্যতা তাঁদের থেকে বেশি আর কে জানে!

বপ্যট বলতে শুরু করলেন, 'এই পরিস্থিতিতেই চতুরঙ্গ ক্রীড়ার মোক্ষম চাল আমাদের দিতে হবে। যেই মুহূর্তে কর্মান্তবাসক বা অন্যান্য সামন্তবর্গের সৈন্যদল আপনাদের ভূম্যধিকারে প্রবেশ করবে, তখন থেকে আপনাদের অনুগত কর্মচারী সাহায্য করার নাম করে তাদের বিভ্রান্ত করবে। তাদের কর্তব্য সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে। আপনার গুপ্তবাহিনীর সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে তাদের গুপ্ত আক্রমণ করবে, উত্যক্ত করবে।'

'কিন্তু এমন করে কী সুবিধা হবে? মানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কী?' হরিকেলের জয়নাথের প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল যে পরিকল্পনাটি এখনও সবার সম্যকরূপে প্রণিধান হয়নি।

'আগামী কার্তিকী অমাবস্যার দিন কর্মান্তবাসকে দেবী বজ্রযোগিনীর মহাপূজা। তার আগেই আমাদের মধ্যে যাঁরা এই বিদ্রোহের মূল উদ্যোক্তা, তাঁরা পৌঁছে যাবেন কর্মান্তবাসকে। ওই দিন প্রকাশচন্দ্র এবং অন্য ছয় মুখ্য রাজন্যদের সঙ্গে রাজ্ঞী স্বয়ং মন্দিরে আসেন পূজার্চনার জন্য। আমাদের প্রথম আঘাত হানা হবে সেইদিন। সেইদিন যা আলোড়ন সৃষ্টি হবে তার অভিঘাত আপনারা চিন্তাও করতে পারছেন না। শাসকের বুকে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যা যথেষ্ট।

তারপর থেকেই নিশ্চিতভাবে সমগ্র কর্মান্তবাসকে বিদ্রোহীদের সন্ধান চলবে। আমরা এমন কূটকৌশল করেছি যেন আমাদের গুপ্তগৃহের সন্ধান আনন্দগুপ্ত'র কাছে পৌঁছয়। সেটিও প্রকৃতপক্ষে একটি ফাঁদ। শত্রুর প্রথম আঘাতের ক্ষত নিরাময় হওয়ার আগেই সেটি হবে আমাদের দ্বিতীয় আঘাত। তারপরেই আমরা হানব আমাদের চূড়ান্ত আক্রমণ।

আপনাদের যে পরিকল্পনার কথা বলা হল তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের আক্রমণের সময় চন্দ্রবংশের এবং তাদের অনুগত সামন্তসৈন্যদের একটি বৃহৎ অংশকে ব্যতিব্যস্ত রাখা, অবরুদ্ধ করে রাখা। অন্তত একমাস, ন্যূনপক্ষে একপক্ষকাল আপনাদের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সময়ে বিভিন্ন সূত্রে ক্রমাগত কর্মান্তবাসকে সংবাদ পাঠাতে হবে যে আপনারা প্রত্যেকে বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে মরণাপন্ন যুদ্ধে রত।'

উপস্থিত সামন্তরা নিজেদের মধ্যে নিভৃত আলোচনায় রত হলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ, বপ্যট আর গৌড়েশ্বর জয়ন্ত চুপ রইলেন। তিনজনের মনেই প্রবল উৎকণ্ঠা। তাঁরাই এই পরিকল্পনার প্রধান রূপকার। এই সভার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে এই মহাবিদ্রোহের ভবিষ্যত।

কিছুক্ষণ পর গুঞ্জন বন্ধ হল। সামন্তবর্গকে দেখে দেখে মনে হল পরিকল্পনাটি তাঁদের মনঃপূত হয়েছে। মহাসামন্ত ধর্মসেন বললেন, 'আমরা আপনাদের সঙ্গে সহমত হলাম যোগীবর। আমাদের ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তার যথাযথ পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রইলাম। কিন্তু ওই রাজ্ঞী আর প্রকাশচন্দ্রকে হত্যা না করতে পারলে এই বিদ্রোহে জয়লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। আর দুজনেই বিভিন্ন ঐশী শক্তির অধিকারী বলে প্রকাশ। সে বিষয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কী?'

প্রদীপের শিখাটি যেন অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল। সবার দৃষ্টি ন্যস্ত হল মৎস্যেন্দ্রনাথের ওপর। তিনি প্রথমে স্মিত হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ক্ষমা করবেন আর্য। সে বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা এতই গোপন যে প্রকাশ্যে বলা সমীচীন মনে করছি না।

'তার মানে এই নয় যে আপনাদের অবিশ্বাস করছি। এইটুকু আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে এই দুজনের মৃত্যুবাণ আমাদের হাতে। কিন্তু চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বে আমাদের কিছু নির্দিষ্ট সংবাদ প্রয়োজন। প্রাসাদে প্রবেশ করার জন্য কিছু কূটকৌশল প্রয়োজন। আমাদের সহযোগীরা এই মুহূর্তে সেইসব কর্মে ব্যাপৃত। তবে আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখুন, আদিনাথের কৃপায়, জগদীশ্বরী মহামায়ার কৃপায় আমরা অবশ্যই জয়যুক্ত হব।'

গৌড়েশ্বর জয়ন্ত সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'আমার জন্য কোনও আদেশ লোকেশ্বর?'

মৎস্যেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'আপনার জামাতাকে আমাদের সহায়তা করতে বলে ইতিমধ্যেই আপনার কর্ম সম্পাদন করেছেন মহারাজ। আপনার জন্য আর একটিই কর্ম নির্দিষ্ট আছে। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম শবরবজ্র তাঁর কিছু সঙ্গীসাথী নিয়ে কজঙ্গল থেকে কর্মান্তবাসকের দিক যাত্রা করেছেন। তাঁদের জন্য কিছু দ্রুতগামী বাহন, আর কয়েকদিনের পাথেয়'র ব্যবস্থা করে দিলে বাধিত হই।'

গৌড়েশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে বললেন, 'যথা আজ্ঞা।'

'এই নারী বিষবিদ্যায় মহাকুশল, সে নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নয়। তাই এঁকে হত্যা করার আগে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সর্বাংশে নিশ্চিত হতে হবে।'

'তার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর্য চারুদত্ত।'

'আর প্রকাশচন্দ্রের ঐশী শক্তির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রয়োজন তন্ত্রবিদ্যায় সমান শক্তিশালী একজন কোনও সাধকের।'

মৃদু হাসলেন কাহ্নপা, 'সে ব্যবস্থাও রয়েছে আর্য চারুদত্ত। যোগীশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং যাদের সহায়, তাদের আবার ভয় কী?'

'কিন্তু, আর একটি তথ্য আপনাদের জানতে হবে কাহ্ন। এই নারীকে হত্যার জন্য সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেটি কী সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে।'

'কিছু আলোকপাত করতে পারবেন?'

'শুনেছি এই নারীকে হত্যার একটি বিশেষ উপায় আছে। ব্যস, এই পর্যন্ত জানি। কী সেই উপায় বলতে পারব না।'

'কে বলতে পারবেন আপনার কোনও ধারণা?'

চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলেন চারুদত্ত। সেই অজস্র বলিরেখাঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কাহ্নপা। কে বলবে, এই মানুষটি এককালে বঙ্গদেশের শাসনক্ষমতার অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। নিজের হাতে সম্রাট রাজভটকে হত্যা করেছেন, বলভটকে পুত্তলিকা বানিয়ে শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করেছেন, প্রকাশচন্দ্রকে সেই পাপের ভাগীদার করেছেন। অবশেষে ধূর্ত প্রকাশচন্দ্র শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই এঁকে বন্দি করেছেন। আজ ইনি দীনহীন সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এই অস্বাস্থ্যকর দেশে এসে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত।

এঁর সংবাদ দিয়েছিলেন জয়নাথ, ইনি হরিকেলের সামন্ত হরিদত্ত'র অমাত্য। হরিদত্ত প্রকাশচন্দ্রের আত্মীয়, বিশেষ অনুগৃহীতও বটে। ক্রূরতায়, ধূর্ততায়, নৃশংসতায় ইনি দ্বিতীয় প্রকাশচন্দ্র।

তবে হরিদত্তর একটি বিশেষ দুর্বলতা আছে। হরিদত্ত অত্যন্ত নারীলোলুপ। নিয়মিত গণিকাসম্ভোগ তো বটেই, পরস্ত্রী হরণেও ইনি বিশেষ সিদ্ধিলাভ করেছেন। এঁর একটি বিশিষ্ট বাহিনী আছে, সুন্দরী যুবতী কন্যা বা স্ত্রী হরণ করাই যাদের একমাত্র কাজ।

আর সেই রন্ধ্রপথেই এঁর সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত হয়।

অমাত্য জয়নাথের একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী ভাগিনেয়ী ছিল। অপুত্রক জয়নাথ তাকে নিজের কন্যার মতো স্নেহ করতেন। তার জন্য উপযুক্ত পাত্রও দেখেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

বিবাহের রাত্রে হরিদত্ত'র ভৈরববাহিনী বিবাহমণ্ডল থেকে মেয়েটিকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গিয়ে জয়নাথের রক্ষীরা এবং পাত্রটি নিহত হয়। মেয়েটির আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ঘটনার সময় জয়নাথ অকুস্থলে ছিলেন না। সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটতে ছুটতে এসে দেখেন সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই রাতেই তিনি উন্মাদের মতো ছুটে যান হরিদত্ত'র প্রাসাদে, যদি প্রাণপ্রিয় ভাগিনেয়ীকে উদ্ধার করা যায়।

কিন্তু হরিদত্ত তাঁর প্রাসাদে মেয়েটির থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এমনকী অস্বীকার করেন এই দুষ্কর্মে তাঁর বাহিনীর কারও লিপ্ত থাকার কথাও। তবে আশ্বাস দেন যে এই ব্যাপারে তিনি একটি তথ্যানুসন্ধানী সমিতি গঠন করবেন। তারা কন্যাটিকে উদ্ধার করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহায়তা করবে।

আর সেই সমিতির সর্বময় কর্মকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হল? হরিদত্ত'র ভৈরববাহিনীর প্রধান গিরিকিশোরকে!

বলা বাহুল্য মেয়েটির আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনেক পরে জয়নাথ অত্যন্ত গোপনসূত্রে জেনেছিলেন সেই রাতে কর্মান্তবাসকের গূঢ়পুরুষপ্রধান আনন্দদত্ত হরিকেলনরেশের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। মেয়েটিকে এনে তাঁকে উপঢৌকন দেওয়া হয়। সেই হতভাগিনীকে একাধিকবার ভোগ করার পর তার অচৈতন্য দেহটি গোপনে মেঘনার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

সেই থেকে জয়নাথ পুরোপুরি চুপ হয়ে যান। পদত্যাগ করার উপায় তাঁর ছিল না। সেক্ষেত্রে হরিদত্ত কিছুতেই এমন প্রভাবশালী শত্রুকে বেঁচে থাকতে দিতেন না। তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন প্রতিশোধ নেওয়ার।

আর সেই প্রতিশোধের সুবর্ণ সুযোগ এখন জয়নাথের সামনে এসেছে।

'একজন আছেন যিনি বলতে পারেন।' স্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠলেন চারুদত্ত, 'কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছনো অসম্ভব।'

'কে তিনি?'

'সম্রাট বলভটের মৃত্যুর পর কে বঙ্গদেশের সম্রাট হন মনে আছে?'

'মহারাজ ধর্মচন্দ্র।'

'মহারাজ ধর্মচন্দ্রের কীভাবে মৃত্যু হয় জানেন?'

'শুনেছি। বাকিটা অনুমান করতে পারি।'

'মহারাজ ধর্মচন্দ্রের প্রথমা মহিষীর নাম কাঞ্চনাদেবী। তিনি স্বচক্ষে মহারাজের হত্যা দেখে ফেলেছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তিনি পাগলিনী হয়ে যান।'

'তাঁর তো কোনও সন্ধান নেই জানি। তিনি জীবিত না মৃত...'

'তিনি বেঁচে আছেন কাহ্ন,' সাগ্রহে এগিয়ে এলেন চারুদত্ত, 'প্রকাশচন্দ্রের গুপ্ত কারাগারের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি আর্য। সে নাকি নরকবিশেষ।'

'সম্পূর্ণ নির্ভুল শুনেছ। কাঞ্চনাদেবী সেই কারাগারে বন্দি আছেন বহুকাল। বাইরে কেতকদাস নামের যে রক্ষীটিকে দেখলে, এখানে আসার পূর্বে সেইই ছিল ওই কারাগারের রক্ষী। তার মুখে শুনেছি। এখনও বেঁচে আছেন সেই হতভাগিনী নারী। একবার যদি তাঁর কাছে পৌঁছতে পার, তবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত, একমাত্র তিনিই অব্যর্থভাবে সন্ধান দিতে পারেন রাজ্ঞী এবং প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যু উপায়ের।'

নিমেষে কাহ্নপা শিহরিত, 'আপনি ঠিক বলছেন আর্য?'

'অবশ্যই। মহারাজ ধর্মচন্দ্র'র মৃত্যুর পর উন্মাদবৎ কাঞ্চনাদেবীকে প্রথমে তাঁর কক্ষে অবরুদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু সেখানে তিনি রাতদিন বিচিত্র এবং অসংলগ্ন কথা বলতেন। তার কিছু কিছু খুব কৌতূহলপ্রদ। যেমন,

'আমি জানি ওই রাক্ষসী মরবে কী করে।' অথবা, 'নিজের ভাইকে মেরে পার পাবেন না প্রকাশচন্দ্র, আপনার মৃত্যুবাণ কোথায় রাখা আছে জানি।'

কাহ্নপা স্থিরনেত্রে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধের দিকে।

'এইভাবে চলতে চলতে একদিন কাঞ্চনাদেবী কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রকাশচন্দ্র আর রাজ্ঞীর উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে গালমন্দ করতে থাকেন। সেইদিনই কাঞ্চনাদেবীকে কারাগারে বন্দি করা হয়। তবে জানি না তিনি এখনও জীবিত আছেন কি না।'

'হুম। সেই কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা কঠিন হবে না। আমাদের মধ্যে কেউ স্বেচ্ছায় ধরা দিলেই তাকে মহাসমাদরে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসা...'

'কেউ আছে তোমাদের মধ্যে যিনি পারবেন এই কাজ? যিনি ওই নরকের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন? কাঞ্চনাদেবীর কাছে পৌঁছতে পারবেন? যদি পৌঁছতে পারেন, তাহলে সেখান থেকে পালানোর উপায় আমি বলে দেব।'

বিস্মিত হলেন কাহ্ন, 'কীরকম?'

'ওই কারাগারের মধ্যে একটি অত্যন্ত গোপন সুড়ঙ্গ আছে, যার সন্ধান কেউ জানে না। কারণ যারা এই সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল, তাদের কাউকেই আর বাঁচিয়ে রাখা হয়নি।'

উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছিলেন কাহ্নপা। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু সেই সুড়ঙ্গের সংবাদ আপনি জানলেন কী করে?

একটা কৌতুকের হাসি ছড়িয়ে পড়ল নবতিপর বৃদ্ধের মুখে, 'কারণ ওই কারাগার সম্পূর্ণভাবে আমারই পরিকল্পনায় তৈরি।'

কমলাঙ্ক। কর্মান্তবাসকের পূর্ব উপকণ্ঠ।

ব্রাহ্মণবটুটি উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রামের সীমানায়। সীমানা বলতে ধানের খেত এবং গ্রামের প্রান্তবর্তী অরণ্যটির মধ্যবর্তী একটি সরু আল। অরণ্য বিশেষ সুবিধার নয়। বুনো মোষ ও শুকর তো আছেই, তার সঙ্গে আছে শিয়াল আর জংলী কুকুর। মাঝে মাঝে বাঘেরও দেখা পাওয়া যায়। প্রায়শই খাদ্যের সন্ধানে তারা হানা দেয় গ্রামের মধ্যে। দরিদ্র গ্রামবাসীর গোয়াল থেকে টেনে নিয়ে যায় গবাদি পশু। গ্রামের শেষে বাস করে দুর্ধর্ষ কিরাতজাতি। তারা ছাড়া এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সাহস কারও নেই। গ্রামবাসীরা সভয়ে এবং সযত্নে এড়িয়ে চলে এই বনভূমিকে।

অথচ তাঁকে এই মুহূর্তে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। কারণ লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ চরমুখে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, তিনি আসছেন এই পথেই।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। গোধূলির স্বর্ণাভ আভায় পশ্চিমদিগন্ত রক্তমলিন। নীড়ে ফেরা পাখিদের কলকাকলিতে চারিদিক মুখরিত। এখন শরৎকাল। বাতাসে হিমের ভাব। ইতিমধ্যেই চারিদিকে নেমে এসেছে কুয়াশার আচ্ছাদন। ব্রাহ্মণ যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার থেকে বেশ কিছু দূরে অরণ্যের অন্যধারে অস্পৃশ্য কিরাতজাতির বাস। তারা বোধহয় আগুন জ্বালিয়ে আজকের শিকারলব্ধ পশুটির সৎকারে ব্যস্ত। সেই ধোঁয়ার রাশি বাতাসে ভর করে এদিকে ভেসে এসে কুহেলিজাল আরও ঘন করে তুলেছে। ইতিমধ্যেই গুল্মলতারাজির মধ্যে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে জুনিপোকার দল। ঝিল্লীরবের সমবেত ঐকতান শুরু হতে চলেছে।

একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন ব্রাহ্মণ। কেউ যদি দেখে ফেলে, এই সময়ে তিনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন—তাহলে সর্বনাশ। সময় ভালো না। প্রকাশচন্দ্রের চরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। চারিদিকে অবিশ্বাসের বাতাবরণ।

কে কখন কার নাম স্থানীয় মাণ্ডলিক বা ভুক্তিপতির কানে তুলে দেবে, বলা দুষ্কর। প্রবাদে বলে ‘নৃপ কর্ণেন পশ্যতি,’—রাজা কান দিয়ে দেখেন। এখন বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রতিটি ভূম্যধিকারী স্বক্ষেত্রে রাজা হয়ে বসেছেন। এবং তাঁরা আর কোনও রাজসুলভ গুণ আয়ত্ত করুন না করুন, এই ‘কানে দেখা’-র অভ্যাসটি সযত্নে আত্মীকৃত করেছেন। তাঁরা কিছু তলিয়ে ভাবেন না, অভিযোগের সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা বিচার করেন না, সংবাদ শোনামাত্র ‘দোষী’র শাস্তিবিধান করেন।

ব্রাহ্মণটি তার উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে একটি শিমূলবৃক্ষের তলায় অন্ধকারে মিশে গেলেন।

সারা দেশে এখন ভয় এবং আতঙ্কের পরিস্থিতি। ঘরে ঘরে ধূমায়িত হচ্ছে তীব্র অসন্তোষ। দারিদ্র্যের জালে, করভারে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ মাঝে মধ্যেই বিদ্রোহ এবং বিক্ষোভের পথ বেছে নিচ্ছেন। মাঝেমধ্যেই এখান ওখান থেকে রাজদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায়। প্রকাশচন্দ্রের সৈন্যসামন্তের দল সেগুলি নির্মমভাব দমন করে। যদি দণ্ডনায়কের কানে আসে, কোনও গ্রামে রাজদ্রোহের স্ফুলিঙ্গমাত্র দেখা দিয়েছে—তাহলে আর রক্ষা নেই। প্রকাশচন্দ্রের ঘাতকের দল ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই গ্রামের নিরন্ন, অর্ধমৃত মানুষের উপর।

ইতিমধ্যেই সংবাদ এসেছে সমতটের তিনখানি গ্রাম, বজ্রিণীসার, মঠবাড়ি এবং জম্বুসর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত। হরিকেলের ধীবররা একবার বিদ্রোহী হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকটি পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে। নারী ও শিশুদের দাসী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বিদেশী বণিকদের কাছে। হরিকেলের সমুদ্রোপকূলে এখন শ্মশানের স্তব্ধতা।

তবে এত করেও কি সব ক্ষোভ আর বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পেরেছেন প্রকাশচন্দ্র? রাজক্ষমতার অপ্রতিহত প্রতাপ কি তাঁর শাসনকে নিরঙ্কুশ করতে পেরেছে? পারেনি।

বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জগতে এক নিঃশব্দ পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। মহাযানপন্থার দিন বহুদিন আগেই গত। এখন সর্বত্র বজ্রযানের জয়জয়কার। নিরাকার বুদ্ধোপাসনার স্থান নিয়েছে আদিবুদ্ধ তথা পঞ্চস্কন্ধাধিপতি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তিপূজা। ভিক্ষুর বদলে এখন গৃহী বৌদ্ধরা দলে ভারী।

তাদের বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠে রুচি নেই, তার বদলে ধারণী ও মন্ত্রোচ্চারণে মুক্তির উপায় খোঁজে। শূন্যতা ও উপায়ের মিলনে নির্বাণ বোঝে না, মৈথুনক্রিয়ায় রত হয়ে যৌনসুখানুভূতিকেই নির্বাণসুখ বলে মনে করে। বিহারের বজ্রযানী অধ্যক্ষরা এখন গুরুর পদ অলঙ্কৃত করেছেন। গুরুর আদেশই এখন বৌদ্ধদের কাছে ধর্ম। তত্ত্বালোচনা নয়, দশকুশল নয়, পারমিতা নয়, শীল ও বিনয় পালন নয়; তাঁদের ধর্মাচরণের মূল সাধনা এখন হঠযোগ।

অধুনা বজ্রযানের বদলে বঙ্গদেশের বুকে মাথা তুলছে এক নবীন ধর্মমত। সহজযান। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই মতের যাঁরা সিদ্ধপুরুষ বা আচার্য, তাঁরা কেউ কোনও বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী নন। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। কেউ কেউ আবার স্বেচ্ছায় রাজগৃহ বা উচ্চবিত্ত জীবন ছেড়ে মুক্তির খোঁজে নেমে এসেছেন পথের ধুলায়। এঁদের মধ্যে কেউ কৈবর্ত জালিক, কেউ বা ব্যাধ, কেউ আবার বারবণিতাগৃহের দ্বারপাল। এঁদের মধ্যে ভিক্ষুক আছেন, আছেন রজক, কৃষিজীবী, তন্তুবায়-কুবিন্দক, অথবা চর্মকার। এমনকি একজন ঠগও আছেন, সিদ্ধিলাভ করার আগে মানুষকে প্রবঞ্চনা করাই ছিল যাঁর পেশা!

অথচ এই সিদ্ধদের জনপ্রিয়তা অতি দ্রুত ক্রমবর্ধমান। এঁদের আচার-আচরণ অন্ত্যজ শ্রেণীর সমাজবিধির অনুকূল। মদ্য-মাংস-মৈথুন—কিছুতেই এঁদের বিরাগ নেই। ভদ্রসমাজের বাইরে ছায়ার মতো এঁদের গতিবিধি। এঁদের হদিশ পাওয়া দুষ্কর। মাছ যেমন জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দ থাকে, এঁরাও সেভাবে মিশে থাকেন জনসাধারণের মধ্যে। প্রকাশচন্দ্রের চরেরা সংবাদ এনেছে—এঁরাই গোপনে গোপনে জনসাধারণকে উত্তেজিত

করছেন, মন্ত্রণা দিচ্ছেন, সংগঠিত করছেন। আর তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন শৈবযোগী। লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ।

বিশ্বস্ত ঘাতকদের দিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী নির্মাণ করেছেন প্রকাশচন্দ্র। এই বাহিনীর নাম 'রাজসেবক।' এদের একমাত্র কাজ হচ্ছে রাজদ্রোহীদের সন্ধান করে বেড়ানো। এদের অসাধ্য কিছু নেই। গুপ্তহত্যা থেকে শুরু করে অপহরণ, বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখা, বন্দিদের ওপর অকথ্য, অবর্ণনীয় অত্যাচার করা, রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করা—এসবই এদের কাছে অতি-সাধারণ ব্যাপার। রাজসেবকবাহিনীর নাম শুনলেই সাধারণ বঙ্গবাসী ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকে।

এত করেও নিশ্চিন্তে বসে নেই প্রকাশচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। সম্পূর্ণ কর্মান্তবাসক মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র আবরণে। নগরের সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে কড়া প্রহরা। মন্দির থেকে শৌণ্ডিকালয়, বন্দর থেকে বারবধূগৃহ, সর্বত্র।

শিমূল গাছটির গায়ে হাত বোলালেন ব্রাহ্মণ। এই গাছটি তাঁর প্রায় সমবয়সি। এবার ধীরে ধীরে পরপারে যাওয়ার সময় এসেছে। মৃত্যুকে তিনি ভয় পান না। কিন্তু অসতর্কতার জন্য ধরা পড়ে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হওয়াতে তাঁর আপত্তি আছে। পরমব্রহ্মে লীন হওয়ার আগে তাঁর কিছু কর্মের ঋণ রয়ে গেছে। সেটি শেষ না করে তিনি শান্তিতে মরতেও পারবেন না।

অরণ্য প্রান্ত থেকে কিছু ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। ব্রাহ্মণ সতর্কচোখে চারিদিক একবার দেখে নিয়ে দ্রুত এগোলেন শব্দের উৎসের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অরণ্যের ভেতর থেকে দুজন মানুষের অবয়ব স্পষ্ট হল। একজন মানুষ অন্য আরেকজনের ওপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে হেঁটে আসছেন। প্রথম মানুষটি আহত, বিব্রতও বটে। তিনি বারবার ক্ষমা চাইছেন তাঁকে বয়ে-আনা দ্বিতীয় মানুষটির কাছে। কাতরস্বরে বলছেন, 'আমি অত্যন্ত লজ্জিত, ভদ্র গোপালদেব। যদি না দেখতাম লক্ষ্মী অরণ্যের গভীরে পালিয়ে যাচ্ছে, তাহলে হয়তো আমি এইভাবে আহত হতাম না। এই অঞ্চল আমার মাতৃভূমি। আমার ডানহাতের রেখার মতই চেনা। সারাজীবন আমি এই অঞ্চলে গোরুর গাড়ি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছি। লোকেশ্বর সেই জন্যই আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন এই কাজের জন্য। অথচ আমি এতই অপদার্থ যে এই সামান্য কাজটুকুও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারলাম না...'

দ্বিতীয় পুরুষটি এসব প্রলাপে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছিলেন না। দৃঢ় পদক্ষেপে বয়ে আনছিলেন প্রথমজনকে। আরও কাছাকাছি আসার পর দুজনকে ভালোভাবে দেখতে পেলেন ব্রাহ্মণ। আহত মানুষটি কিঞ্চিৎ স্থূলবপু। পরনে একটি হ্রস্ব অধোবাস, মালকোঁচাটি আঁটো করে কোমরে জড়ানো। অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে কয়েকটি গভীর ক্ষত। সেখান থেকে নেমে এসেছে দরদর রক্তের ধারা। থরথর করে কাঁপছেন মানুষটি। কোনওমতে টেনে আনছেন তাঁর ডান পা'টি। সেটি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতবিক্ষত। বোঝাই যাচ্ছে যে, কোনও এক বন্য জন্তুর আক্রমণে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি।

তবে ব্রাহ্মণের মনোযোগ অন্য মানুষটি।

ইনি উচ্চতায় প্রথমজনের তুলনায় অনেকখানি দীঘল। টানটান নির্মেদ শরীর। বক্ষটি বটবৃক্ষের মতো প্রশস্ত ও সবল। দুই বাহুতে অমিত বলের আভাস। কুঞ্চিত কেশদাম নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত। শান্ত ও গভীর চক্ষু। তিনি শান্তস্বরে প্রবোধ দিচ্ছিলেন আহত সঙ্গীকে, 'আপনার বিব্রত হওয়ার কোনও কারণ নেই ভাই সুদাস। আমরা তো জেনেশুনেই এই শ্বাপদসঙ্কুল অরন্যের পথ বেছে নিয়েছিলাম, যাতে শত্রুপক্ষের চোখ এড়ানো যায়। আমরা তো এও জানতাম যে এ পথে হিংস্র বন্যজন্তুদের আক্রমণের আশঙ্কা আছে। আপনি নিজেকে দোষী ভাবছেন কেন?'

আহত মানুষটি কাতরে উঠলেন, ‘আপনার যদি কিছু হয়ে যেত আর্য? আমি লোকেশ্বরকে মুখ দেখাতাম কী করে?’

‘কিছু হলে হতো। আমরা যেদিন এই পথ বেছে নিয়েছি, সেদিনই তো আমাদের ভাগ্য স্থির হয়ে গেছে সুদাস। আমরা তো জানি যে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা নিয়েই আমাদের চলতে হবে। আপনি এত বিচলিত হবেন না। যেটুকু দুর্ভোগ ভাগ্যে লেখা ছিল, তাই হয়েছে। আমরা তো দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদে জীবিত রয়েছি। আমরা তো শেষ পর্যন্ত সক্ষম হয়েছি এই অরণ্য অতিক্রম করতে।’

‘আমার গাই দুটি...ও হো হো হো...তাদের আমি নিজের সন্তানের মতো দেখতাম যে আর্য। ওরে ধবলী, ওরে লক্ষ্মী...’ চাপাস্বরে ডুকরে উঠলেন আহত মানুষটি। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি এখনও অপ্রকৃতিস্থ।

এইবার ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে তাঁদের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। প্রথম পুরুষটি থমকালেন মুহূর্তের জন্য। তারপরেই কোন এক অলৌকিক উপায়ে তাঁর হাতে উঠে এল একটি মস্ত খড়গ। হিসহিসে স্বরে প্রশ্ন করলেন সেই বলশালী পুরুষ, ‘কে আপনি? পরিচয় দিন।’

ব্রাহ্মণ শান্তস্বরে বললেন, ‘অধমের নাম কান্তিপ্রভ।’

প্রথম পুরুষটি বললেন, ‘সূত্র উচ্চারণ করুন।’

ব্রাহ্মণ উচ্চারণ করলেন, ‘কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।’

পুরুষটি প্রত্যুত্তর করলেন, ‘চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।’ বলে খড়্গটি নামিয়ে রাখলেন। তাঁর পথশ্রমে ক্লান্ত মুখখানিতে জ্বলে উঠল আনন্দের আলো। হাসিমুখে বললেন, ‘প্রণাম ব্রাহ্মণদেব। আমি ব্যপটপুত্র গোপাল। অস্ত্রচালনার জন্য মার্জনা করবেন।’

কান্তিপ্রভ স্মিতহাস্যে বললেন, ‘মার্জনাভিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই সামান্য সতর্কতাটুকু না নিলে তো লোকেশ্বর-প্রেরিত নায়কের বোধ বিবেচনার প্রতি আমার বিশ্বাস টলে যেত মশাই।’

‘লোকেশ্বরের প্রেরিত নায়কের ওপর বিপুল আস্থা রেখেছেন দেখছি।’

‘তিনি মহাযোগী। স্বয়ং আদিদেব শিবের অবতার। নায়ক নির্বাচনে তাঁর ভুল হতে পারে না।’

‘লোকেশ্বরও কিন্তু আপনার ওপর অনেক ভরসা করেন, আর্য। আপনার ব্যাপারে তিনি অনেক কিছুই বলেছেন আমাকে।’

কান্তিপ্রভ সহাস্যে বললেন, ‘আশা করি কটু কিছু বলেননি।’

হাসলেন গোপাল, ‘কটু বলে কটু? সেসব ভয়ানক বাক্য শুনলে যে লজ্জায় আপনার কর্ণমূল রক্তবর্ণ ধারণ করবে।’

‘বুঝেছি!’—ছদ্মদুঃখে মুখখানি করুণ করলেন কান্তিপ্রভ,’ লোকমুখে এও শুনেছি তিনি আমাকে শ্যালক বলে সম্বোধন করেন। দুঃখের বিষয় মহাযোগীর কোনও গৃহিনীও নেই যে নিজেকে সেই মহিয়সীর সহোদর কল্পনা করে আহ্লাদিত বোধ করব।’

হাসতে লাগলেন গোপাল, ‘পিতা এবং লোকেশ্বর আপনার পরিহাসপ্রিয়তার কথা বলেছিলেন বটে। আপনার সঙ্গে আলাপিত হয়ে সুখী বোধ করছি আর্য কান্তিপ্রভ।’

‘সে তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার সঙ্গীটি কে? ইনি এমন ভয়ানক আহত হলেন কী করে?’

আহত ব্যক্তিটি কোনওমতে হাত দুখানি জড়ো করে অভিবাদন করলেন। ক্লিষ্টস্বরে বললেন, ‘অধমের নাম সুদাস, জাতিতে গোয়ালা। পেশা গরুর গাড়ি চালানো।’

ভ্রুকুঞ্চিত করলেন কান্তিপ্রভ, ‘কোন গ্রাম?’

‘আজ্ঞে অধমের নিবাস তারাপুকুর গ্রামে।’

‘বুঝলাম। এই অবস্থা হল কী করে?’

সুদাস এবং গোপাল দুজনেই তাঁদের যাত্রার কাহিনি বিবৃত করলেন।

লোকেশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী আসন্ন অভ্যুত্থানের নায়কেরা বিভিন্ন দিক থেকে কর্মান্তবাসকে প্রবেশ করা শুরু করেছেন। শাক্যপ্রভ, হরিপ্রভ এবং ঢেণ্ঢনপা প্রবেশ করবেন হরিকেলের প্রান্ত থেকে। বঙ্গভূমির মতো হরিকেলও এখন চন্দ্রবংশের পদানত। সেখানকার সামন্ত নৃশংস, লম্পট হরিদত্ত। হরিদত্তর মহামাত্য জয়নাথ গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনিই স্বীকৃত হয়েছেন এই গোপনকর্মে সহায়তা করতে। কম্বলপা এবং জলন্ধরনাথ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে প্রবেশ করবেন কর্মান্তবাসকে। পদ্মসম্ভব এবং ভিক্ষুণী মন্দর্ভা সর্বাণীমন্দিরের তীর্থিক সেজে প্রবেশ করবেন উত্তর দিক থেকে, সুবর্ণগ্রাম হয়ে বিক্রমপুরের পথে। আর পূর্বদিক থেকে প্রবেশ করবেন গোপালদেব। অভ্যুত্থানের প্রধান দুই কুশীলব, আচার্য মৎস্যেন্দ্রনাথ আর বপ্যট কোথা থেকে কীভাবে কর্মান্তবাসকে আসবেন সে তথ্য কারো কাছে নেই। সমগ্র পরিকল্পনা গোপনীয়তার আবরণে গুপ্ত। কেউ জানেন না অন্য দল কী করবে। শুধুমাত্র মৎস্যেন্দ্রনাথ জানেন কখন কোথায় কীভাবে কী হবে। তাঁর গোপন চরেরা সংবাদ পৌঁছে দেয় এখান থেকে ওখানে।

কর্ণসুবর্ণ অবধি পৌঁছতে তাঁদের বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। সেখান থেকে তাঁরা বণিকের বেশে ত্রিবেণী হয়ে আসেন জাহোরের অরণ্য অবধি। এরপর থেকেই চন্দ্রবংশের শাসন শুরু। এই অরণ্য অতিক্রম করা তাঁদের পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল। তার কারণ দুটি। প্রথম কারণ যদি হয় প্রকাশচন্দ্রের সৈন্যদের দৃষ্টি এড়ানো, তবে দ্বিতীয় কারণ এই যে, অরণ্যের মধ্যবর্তী পথটি অন্য পথের তুলনায় দুর্গম হলেও সংক্ষিপ্ত। সুদাস একদা এই অঞ্চলের সবচাইতে দক্ষ গোশকট-চালক ছিল। সেইজন্যই তাকে নির্বাচন করা।

দেড়দিনের যাত্রাপথের প্রথমদিন নির্বিঘ্নেই কেটে যায়। বিপদ হয় দ্বিতীয় দিনে এসে। দুজনে যখন কমলাঙ্ক থেকে কয়েক যোজন দূরে, তখন অতর্কিতে তাঁদের ওপর আক্রমণ করে একটি বাঘ। সমুদ্রতীরবর্তী উপবঙ্গের বনাঞ্চল এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সেখান থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাঘেদের উপদ্রব আছেই। কিন্তু সচরাচর তারা মানুষ এড়িয়ে চলে। এই শার্দূল মহাশয় বোধহয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাই দুটি নধর গাভী এবং মনুষ্যসন্তান দেখে লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

কান্তিপ্রভ শিহরিত হলেন, 'হা ঈশ্বর! তারপর? তারপর কী হল?'

চুপ করে রইলেন গোপাল। সুদাস যুক্তকর মাথায় ঠেকালেন। 'দীর্ঘদিন ধরে কমলাঙ্ক গ্রামের দণ্ডনায়ক দিবোদাসের গোয়ালে কাজ করেছি। বীর কিছু কম দেখিনি। কিন্তু বপ্যটপুত্র গোপালদেবের মতো বীর আর কাউকে দেখিনি আজ অবধি।

বাঘটি ধবলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আমরা গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যাই। উঠতে আমাদের একটু সময় লাগে। উঠে দেখি তার মধ্যেই ধবলীর ঘাড় ভেঙে তাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বিশালদেহী জন্তুটা। তার মস্ত হাঁড়ির মতো মুখ, বন কাঁপানো হুঙ্কার আর উৎকট গন্ধে আমি প্রায় মূর্ছা যাই আর কি। কিন্তু গোপালদেব তার মধ্যেই কোমর থেকে একটি আধ হাত লম্বা ছুরি বার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সেই বুড়ো বাঘটির ওপর।'

মুখখানি হাঁ হয়ে গেল কান্তিপ্রভর। শুধু ছুরি হাতে ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে এইভাবে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব?

'তখন আমিও সাহস করে উঠে একটি কুড়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জন্তুটার ওপর। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীও মুক্ত হয়েছে তার বাঁধন থেকে। ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেল অরণ্যের আরও গভীরে। আমি সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেই বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। প্রথমেই থাবা বসাল আমার ডান পায়ের ওপর। আমি কিন্তু তখনও লড়ে যাচ্ছি। গোপালদেব বাঘটার পিঠের ওপর বসে একের পর এক ছুরিকাঘাত করে যাচ্ছেন তার গলায় এবং মুখে। শেষে একটি মোক্ষম আঘাতে ছুরিটি ঢুকে যায় বাঘটির চোখে। তারপরেই সে ভীষণ আর্তনাদে আমাকে ছেড়ে অরণ্যের মধ্যে ছুটে পালায়।'

'গোপালদেবই আমাকে উদ্ধার করেন। তখনও একটু দূর থেকে বাঘের মরণ-আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে আমি সামান্য সুস্থ হলে দুজনে গিয়ে দেখি—একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে সেই বুড়ো বাঘের

মৃতদেহ পড়ে আছে।'

স্খলিতস্বরে কান্তিপ্রভ বললেন, 'অবিশ্বাস্য! সামান্য ছুরি হাতে বাঘ শিকার?'

সুদাস ওই অবস্থাতেই বিচলিত এবং গদগদসুরে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বীর গোপালদেব কেবলমাত্র একটি ছুরি হাতে পূর্ণবয়স্ক বাঘকে শিকার করেছেন, এই অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় বীরগাথা আমি ভুলব না।'

অভিভূত হলেন কান্তিপ্রভ। প্রশ্ন করলেন, 'আর্য গোপালদেব, একটি কথা বলুন। আপনি তো জানতেন যে আপনি একটি মহৎ কর্মের জন্য উদ্দিষ্ট। যদি দুটি গাভী আর একটি মানুষকে হিংস্র বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি মৃত্যুবরণ করতেন? তাহলে কী হতো?'

গোপালদেবের শান্ত চক্ষুদুখানি ধ্বক জ্বলে উঠল। বললেন, 'এর উত্তর আমার সাধ্যের বাইরে আর্য কান্তিপ্রভ। আপনি বরং এই প্রশ্নের উত্তর দিন, বাহিনীর সেরা নায়ক কি শুধুমাত্র চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্যই নির্দিষ্ট? এ কী চতুরঙ্গ ক্রীড়া যে রাজা ও রানিকে সবচেয়ে সুরক্ষিত রাখা হবে শেষ যুদ্ধকৌশলের জন্য? রাজা কি নায়কের ভূমিকা পালন করেন শুধুমাত্র রাজাসনে বসার জন্য? যে নায়ক সামান্য বন্য জন্তুর থেকে তাঁর অনুগত প্রজাদের রক্ষা করতে পারেন না, তিনি কীসের রাজা? তিনি কীসের নায়ক? যে রাজা তাঁর দরিদ্রতম, নির্বলতম, অসহায়তম প্রজার জীবনরক্ষার্থে নিজের জীবন বাজি রাখতে পারেন না, তিনি কীসের প্রজাপালক? আমি মরলে মরব, এক গোপালের বদলে সহস্র গোপাল আসবে। মৎস্যেন্দ্রনাথ আমার মতো সহস্র গোপালদেব সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু আজ আমি যদি প্রাণভয়ে কর্তব্যপালনে বিমুখ হই, তাহলে বলতে হয়—মহর্ষি মৎস্যেন্দ্রনাথ ভুল মানুষে আস্থা রেখেছেন। তাঁর সামনে দাঁড়াব কোন মুখে?'

কান্তিপ্রভ এর উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই কিরাত জনবসতি থেকে মহা হট্টগোলের শব্দ ভেসে এলো। সকলে সচকিতে হয়ে সেদিকে তাকালেন। ইতিমধ্যেই সেদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশ ছেয়ে ফেলেছে আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধোঁয়া। ভেসে আসছে মানুষের আর্তনাদ।

কান্তিপ্রভ দাঁতে দাঁত ঘষলেন, 'গর্ভস্রাবের দল কি এই হতদরিদ্র কিরাতদেরও রেহাই দেবে না?'

শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মুখে অশ্লীল কুবাক্য শুনে সামান্য থমকে গেলেন গোপালদেব। উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে আর্য?'

কান্তিপ্রভ চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'খুব সম্ভবত প্রকাশচন্দ্রের অনুগত রাজসেবকবাহিনী এসেছে। এই আর্তনাদ তাদেরই জয়নির্ঘোষ, গোপাল।'

'সে কী? হঠাৎ অসহায় বনচারী কিরাতদের ওপর আক্রমণের কারণ? এদের তো না আছে ধনসম্পদ, না আছে কর্ষণযোগ্য ভূমি।'

'আর কিছু না থাক, নারীসম্পদ তো আছে।'

'নারী? কিরাত-নারী লুণ্ঠনের উদ্দেশে এই অভিযান? কিন্তু কেন?'

'আহুতির জন্য আর্য গোপাল। প্রকাশচন্দ্রের প্রবর্তিত নতুন ধর্মটির জন্য প্রয়োজন নিত্য আহুতি। এই আর্তনাদ সেই যজ্ঞের আহুতি।'

'নতুন ধর্ম? যজ্ঞ? আহুতি? এসব কী বলছেন আর্য কান্তিপ্রভ?' বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করলেন গোপালদেব।

তীব্র ঘৃণা মিশিয়ে উচ্চারণ করলেন কান্তিপ্রভ, 'তিব্বতীয় পোন ধর্মের কড়াইতে আদিম লৌকিক ধর্ম আর নবোত্থিত বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম মিশ্রিত করে এক অপূর্ব ধর্ম প্রস্তুত করেছেন প্রকাশচন্দ্র। তার নাম নাকি নব্য তন্ত্রধর্ম। অধুনা আবিষ্কৃত ক্রিয়াটির তারা নাম রেখেছে স্বয়ং মহামায়া'র নামে, ভৈরবীচক্র। এই চক্রে বহু নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে মদ্য মাংস মৎস্য আহার করে, তারপর বিচিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একটি ভয়ঙ্কর কর্মে লিপ্ত হয়।'

'কী সেটি?'

'যৌথযৌনসঙ্গম।'

স্তম্ভিত হলেন গোপালদেব, ‘বলেন কী আর্য কান্তিপ্রভ!’

‘হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, চক্রপ্রবর্তকদের মতে, বলতেও ঘৃণাবোধ হয়, এই চক্রে নাকি মাতা বা ভগিনীর সঙ্গে যৌনসঙ্গমও স্বীকৃত!’

অসহ্য! সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল গোপালদেবের।

‘শুধু তাই? চক্রমধ্যে পুরুষ মাত্রেই নাকি স্বয়ং দেবাদিদেব শিবশম্ভু, নারীমাত্রেই নাকি স্বয়ং ভগবতী। তাই এই চক্রে জাতিবিচার নেই। এই যৌথযৌনচক্রে সবাই ব্রাহ্মণজাতি। এই পাপকর্মে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রকাশচন্দ্র বহুবিধ বিট নিয়োগ করেছেন। তাদের কাজই হচ্ছে কুমারী কন্যা বা কূলবধূদের এই পথে টেনে আনা।’

‘কিন্তু কুমারী কন্যা বা কূলবধূরা এই অশ্লীল প্রস্তাবে সম্মত হয় বা কেন?’

ক্লান্ত হাসি খেলে গেল কান্তিপ্রভর মুখে, ‘কারণ স্বয়ং রাজা যে প্রথাকে আচরণীয় ধর্ম বলে ঘোষণা করেন, প্রজারাও সেই ধর্মেরই অনুশাসন মেনে চলে। প্রকাশচন্দ্র ঘোষণা করেছেন—মদ্যমাংস আহারই শীল। মৈথুনেই মোক্ষ। লাম্পট্যই পরমার্থ। এই নবোদিত তন্ত্রধর্মে ক্রিয়াকর্মে নিজের গৃহলক্ষ্মীদের উৎসর্গ করা নাকি মহাপুণ্যকর্ম। কুমারী কন্যা হলে তো কথাই নেই।’

আশ্চর্য হলেন গোপালদেব, ‘রাজা ভ্রান্ত হতে পারেন, ধর্মনীতি ভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু মানুষের নীতিবোধ? সাধারণের ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধও কি বিলুপ্ত?’

‘নীতি? অনুশাসন? শৃঙ্খলা? ঔচিত্যবোধ? সেসব অনেকদিন আগেই বঙ্গভূমি ত্যাগ করেছে আর্য গোপালদেব।’

তবুও সংশয় যায় না গোপালদেবের, ‘কিন্তু বঙ্গদেশের মায়েরা, বধূরা এই অনাচার সহ্য করছেন?’

‘অন্ন আর্য, অন্ন। অন্নচিন্তা চমৎকারা। অন্নই সেই মহতী আকর্ষণ, যার জন্য সদ্বংশের রমণীরাও আজ এই পাপপথে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্নাভাবে ক্লিষ্ট বঙ্গজনকে দেখুন। মা হয়ে এক নারী কীভাবে চোখের সামনে নিজের সন্তানকে অনাহারে মরতে দিতে পারে? কীভাবে পারে তার পিতা, তার মাতা, তার সহোদরকে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে দেখতে? আর যাঁরা এখনও সে পাপকর্মে লিপ্ত হননি, তাঁদের জন্য রয়েছে ওই ওরা, চন্দ্ররাজের পালিত সারমেয় শাবকদের দল।’

গোপাল একবার স্থিরচোখে তাকালেন কান্তিপ্রভ’র দিকে, আরেকবার কিরাতপল্লীর দিকে। তারপর সুদাসকে সেই শিমূলবৃক্ষতলে সযত্নে স্থাপন করে বললেন, ‘সুদাস, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিন। মনে হচ্ছে সারমেয় বিতাড়নে না নামলেই নয়।’

রাজপ্রাসাদের পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত জুড়ে অবস্থিত এই ঘরটি রানির শয়নকক্ষ। আকারে এবং সাজসজ্জায় এটিই রাজপ্রাসাদের উৎকৃষ্টতম ঘর। কক্ষের দেওয়াল জুড়ে কয়েকটি বড় বড় বাতায়ন। সেই পথে ভেসে-আসা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে উজ্জ্বল রঙের দুর্মূল্য চীনাংশুকের পর্দা।

ঘরের চারকোণে চারটি কাঠের ত্রিপদী। তাদের উপর কাঁসার জলাধার। সেই জলে ভাসছে কিছু আধফোটা পদ্মকুঁড়ি। জলাধারের জলে মিশ্রিত কর্পূর ও চন্দনের সুগন্ধ ঘরটিকে মোহময় আবেশে পূর্ণ করে রেখেছে।

ঘরের ভূমিটি মৃগচর্মের চিত্রকম্বলে আবৃত। তার ওপর পা ফেলামাত্র গোড়ালি অবধি ডুবে যায়, এমনই নরম। দেওয়ালগুলি বিভিন্ন লতাপাতা, ফুল, পশুপ্রাণী এবং মানুষ মানুষীর চিত্রে সজ্জিত। চিত্রগুলি ভালো করে দেখলে বোঝা যায়, তার অধিকাংশই কামকলা বিষয়ক।

ঘরের মধ্যে আলোর উৎস হচ্ছে ঘরের চার কোণে রাখা চারটি বড় দীপদান। তার ওপর সোনার প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ঘিয়ের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা আছে কিছু শুষ্ক গুল্মলতা। মিষ্ট ও স্নিগ্ধ আঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে

ঘরটির বাতাসে।

উত্তর পশ্চিম কোণে একটি অলিন্দ। তার ছাদ থেকে ঝুলছে একটি সোনার খাঁচা। খাঁচাটি আপাতত শূন্য। মৃদুমন্দ হাওয়ায় সেটি দুলছে। সেই শূন্য সোনার খাঁচাটি ঘিরে, অলিন্দটি ঘিরে, ঘরের সুমিষ্ট বাতাস মথিত করে স্তব্ধ চরাচর ভেসে যাচ্ছে আজ রাত্রের এই অবারিত পূর্ণিমা জোৎস্নায়।

সময় রাত্রির তৃতীয় প্রহর। ঘরটির ঠিক মধ্যস্থানে অতি মহার্ঘ চন্দনপালঙ্ক পাতা। তার উপরে আরামপ্রদ সুখশয্যা। সেই সুখশয্যার উপর দুখানি নগ্ন শরীর পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। তাদের তীব্র আশ্লেষবন্ধনে বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। চুম্বন ও শীৎকারের শব্দে ঘরের বাতাস মদমত্ত। পালঙ্কের দুপাশে দুজন কিঙ্করী বিশাল চামর হাতে ব্যজনে ব্যাপৃত।

যিনি নারী, তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব অতুলনীয়। গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য। গ্রীবাদেশ অতি মনোহর। স্তন পীনোন্নত। ঝরনার মতো কেশদাম তাঁর ক্ষীণকটি অবধি বিস্তৃত। সামান্য তির্যক চক্ষু দুখানি বড়ই চঞ্চল, কটাক্ষমাত্রে শিকারের প্রতি কামশর নিক্ষিপ্ত হয়। নাসিকাটি ইষৎ খর্ব। পত্রল ওষ্ঠ দুটি রক্তরাগরঞ্জিত। বাম অধরোষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র তিল।

পুরুষটির গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণ। পেশিবহুল দেহ। চোখদুটি স্থূল এবং কামাতুর। পুরুষটি তাঁর স্থূল ওষ্ঠ দিয়ে নারীটির কোমল গ্রীবাদেশ চুম্বনরত। তাঁর বলিষ্ঠ বাহুদুটি নারীটির দেবভোগ্য দেহখানি সবলে আলিঙ্গন করে আছে।

রানি ঈষৎ স্খলিতস্বরে বললেন, 'অতি উত্তম। আশা করি আপনিই আমাকে যথাযথ তৃপ্তি দিতে পারবেন। কী বলেন, নাগর?'

পুরুষটি অপরিমিত পৈষ্টীপানে কিঞ্চিৎ বেপথু ছিলেন। তিনি তাঁর বামহাত দিয়ে নারীটির গণ্ডদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণ করে বললেন, 'পারব বইকি, রানি! আপনাকে তৃপ্ত করা কি যে সে পুরুষের কর্ম? আমি পৌণ্ড্রের বণিজপ্রধান বিমানবিহারীর পুত্র অনঙ্গমিত্র। আমি পারব না তো কে পারবে?'

নারীটির তির্যক চক্ষুদুটি সামান্য বক্র হল। পুরুষটি সেটি লক্ষ করলেন না। তিনি একজন দাসীকে ইঙ্গিত করলেন ঘরের এককোণে রাখা সুগন্ধী তাম্বুলকলঞ্জটি এনে দিতে। তারপর তাম্বুলকলঞ্জ হাতে পরম সুখাবেশে শয্যায় লম্বমান হলেন। সুগন্ধী তাম্বুলে ঘরের বাতাস আর্দ্র হয়ে উঠল। আরেক দাসী পানীয়ের পাত্র রানির হাতে এনে দিল।

রানি পানীয় এক গণ্ডূষে নিঃশেষ করে কিছুক্ষণ মুখখানি বিকৃত করে রইলেন। কিছু পরে অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর চক্ষুদুটি জ্বলে উঠল। সামান্য মদানসস্বরে বললেন, 'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু মহাশয়ের পৌরুষ এখনও এত শিথিল কেন?'

দাসীদুটি যান্ত্রিকস্বরে হেসে উঠল। সেই হাসি শুনে পুরুষটির অভিমান আহত হল। তিনি নারীর কেশ আকর্ষণ করে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নিজের ওষ্ঠপ্রান্তে নিয়ে এলেন। তারপর রানির ওষ্ঠচুম্বন করতে করতে কামতাড়িত স্বরে বললেন,' 'চুম্বন করতে থাক রে বহুগামী রণ্ডা। চুম্বনস্পর্শ ব্যতীত কি পৌরুষ জাগে রে? আজ ভালো আমায় তৃপ্ত কর। কাল প্রত্যুষে আমি বঙ্গদেশের সম্রাট হব। তুই হবি আমার সাম্রাজ্ঞী, বঙ্গবিজেতা অনঙ্গমিত্রর প্রধানা মহিষী।'

মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল নারীটির চোখ। তবে সে মুহূর্তের জন্যই। অনঙ্গ খেয়াল করলেন না।

চুম্বনের সময় পুরুষটির সামান্য অস্বস্তি হতে লাগল। তবে তার কারণটি তিনি ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না। একবার তাঁর মনে হল—একটি নয়, দুই জিহ্বা তাঁর ওষ্ঠ লেহন করছে। তিনি নেশাতুরস্বরে বললেন, 'জানি তুই অনেক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছিস। কিন্তু আজ থেকে সেসব বন্ধ করতে হবে। আর হ্যাঁ, অভিষেকের সময় আমার পিতা-পিতৃব্যরা উপস্থিত থাকবেন।'

রানি সর্পিল গতিতে উঠে এলেন পুরুষটির ওপর। তারপর নিজের মধ্যে অনঙ্গের পৌরুষ প্রোথিত করে স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'অবশ্যই আর্য। আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার দাসী। এই নারী, এই রাজপ্রাসাদ, অগণিত দাসদাসী, এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশ আপনার ভোগ্য। আসুন প্রভু, আমাকে গ্রহণ করুন।'

নারীটি কয়েকবার নিতম্ব চালনা করতেই পুরুষটির কামাগ্নি আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরিত হল।

পরম আবেশে কিছুক্ষণ তীব্র অনঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন অনঙ্গ। আঃ, এই তো পরম সুখ।

নাহ্, এইবার আসন পরিবর্তন করা উচিত। মহর্ষি বাৎস্যায়ন তো অনেক আসনেরই সন্ধান দিয়ে গেছেন।

অনঙ্গমিত্র দুই হাত দিয়ে রানির নিতম্ব নিষ্পেষণ করতে গেলেন। কিন্তু তার আগেই নারীর পদ্মের ডাঁটার মতো বাম হাতটি তাঁর দুই বলিষ্ঠ বাহু ধরে ফেলল।

নিজের দুই হাত মুক্ত করতে গিয়ে অনঙ্গমিত্র আশ্চর্যের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন যে, তিনি হাত নাড়াতে পারছেন না। আবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না।

আশ্চর্য হলেন অনঙ্গমিত্র। তিনি কম বলশালী নন। নিয়মিত দৈহিক অনুশীলন করে থাকেন। সন্তরণে, নৌচালনায়, মল্লযুদ্ধে সত্যব্রতর সমকক্ষ যুবক পুণ্ড্রবর্ধনে কমই আছেন। তবুও এই মদালসা রমণী একটিমাত্র হাতে তাঁর দুটি বলশালী বাহু এমন ভাবে ধরে রেখেছে যে, তিনি তাঁর হাত দুটি মুক্ত করতে পারছেন না? এত শক্তি ধরে এই নারী?

সহসা তিনি এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে উঠে বসতে গেলেন। কিন্তু সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে তিনি তাও পারছেন না। তাঁর দেহের নিম্নাংশ এখন সেই লৌহকঠিন উরুস্তম্ভের মধ্যে বদ্ধ! তাহলে কি বিশাখসেনের কথাই সত্য? এ কি ইন্দ্রজাল? না মায়া?

বিমানবিহারীর বয়স হয়েছে অনেক। তাঁর বাণিজ্যের অধিকাংশ দায়িত্ব এখন জ্যেষ্ঠপুত্র অনঙ্গমিত্রর উপর ন্যস্ত। সেই সূত্রেই তিনি এসেছিলেন কর্মান্তবাসকে। অধিকাংশ শ্রেষ্ঠীদের মতো এই দেশের শৌল্কিক, গৌল্মিক, মহামাণ্ডলিক, ভুক্তিপতি আদি সমস্ত প্রধান রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতি সুমধুর। কর্মান্তবাসকের বর্তমান ভুক্তিপতি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট। কর্মান্তবাসকে চিরকাল প্রধানমন্ত্রীই পদাধিকার বলে রাজধানীর ভুক্তিপতি হয়ে এসেছেন। ইনি স্বভাবে নাট্যমোদী এবং কাব্যপ্রেমী। অনঙ্গমিত্রকে সেইজন্য অশ্বঘোষ, কালিদাস, বাণভট্ট, ভাস, ভারবী থেকে শুরু করে বিশাখদত্তর কাব্য অবধি কণ্ঠস্থ করতে হয়েছে। কী আর করা যাবে, যে পূজার যা উপচার! বঙ্গীয় রাজপদোপজীবিদের অধিকাংশই সরাসরি উৎকোচ গ্রহণ করেন, মুদ্রায় অথবা দ্রব্যে। তবে অমিতাভট্টর মতো কিছু রাজন্যকে সংস্কৃতিশাস্ত্রে পূজা করতে হয়। তবেই তাঁরা প্রসন্ন হন।

অমিতাভভট্টর হিরণ্যসামুদায়িক হচ্ছেন বিশাখসেন। ইনি একাধারে কর্মান্তবাসকের বাণিজ্য এবং কৃষিকর সংগ্রাহক। মদ্যপ্রেমী এবং নারীসংসর্গলোলুপ এই মানুষটি অনঙ্গমিত্রর সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবও। তাঁর মুখেই এই আশ্চর্য কথা শুনেছিলেন অনঙ্গমিত্র।

বঙ্গদেশের রানি নাকি এক অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা করেছেন। যে যুবা তাঁকে কোনও এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যার রাতে রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারবে, তাকেই তিনি বিবাহ করবেন। সেই যুবক হবেন দেশের সার্বভৌম সম্রাট।

শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অনঙ্গমিত্র। কাম্বোজ থেকে বৎস, উত্তরকুরু থেকে চেরদেশ, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাণিজ্যসংসাধনে গতায়াত আছে পুণ্ড্রবর্ধনের উদীয়মান শ্রেষ্ঠীসম্রাট অনঙ্গমিত্রর। কার্যব্যপদেশে ভিন্নরাজ্যে অবস্থিতিকালে সেখানকার নারীরত্নদের সঙ্গসুখ উপভোগ না-করাকে পাপকর্ম বলে বিবেচনা করেন তিনি।

তাই এই প্রতিজ্ঞা শোনা মাত্র তিনি বিশাখসেনকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন—যাতে অন্তত একবার তাঁকে ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

শুনে ইতস্তত করছিলেন বিশাখসেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁর বিলক্ষণ আপত্তি আছে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখে আশ্চর্য হচ্ছিলেন অনঙ্গমিত্র। এমন দ্বিধার কারণ কী?

কর্মান্তবাসকের শ্রেষ্ঠ শৌণ্ডিকালয়টির অধিকারী হচ্ছেন জনৈক ভাঁড়ুদত্ত। ভাঁড়ুদত্ত নিজে তো বটেই, তাঁর শৌণ্ডিকালয়টিও কম প্রাচীন নয়। নিয়মিত এখানে আসেন, এমন রাজকর্মচারীদের সংখ্যাও কম নয়। লোকে জানে এবং স্বীকার করে বঙ্গদেশের রাজনীতিস্রোতে মাঝে মাঝেই যেসব কূটঘূর্ণি দেখা যায়, তার অধিকাংশই ভাঁড়ুদত্তের বারুণীবক্ষে সৃষ্ট । দুই বন্ধুতে এই আলোচনাটিও সেখানেই ঘটছিল।

অনঙ্গমিত্র এক নিঃশ্বাসে একপাত্র অত্যুৎকৃষ্ট মদ্য শেষ করে পানপাত্র সশব্দে নামিয়ে রেখেছিলেন। তারপর উন্মত্ত আরক্তচক্ষে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘তুমি কি আমার পৌরুষের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছ, মিত্র?’

অরিষ্টর ষষ্ঠ পাত্র নিঃশেষ করে বিশাখসেন বললেন, ‘কর্মটি বড় সহজ নয় হে মিত্র। তোমার কি মনে হয়, বঙ্গদেশে পুরুষের অভাব আছে? বিষয়টি এত সহজ হলে কি আর এই দেশের পুরুষকূল নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকত?’

এক কথায় বিশাখসেনের বক্তব্যটি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন অনঙ্গমিত্র, ‘কিছু মনে করো না ভ্রাত, সবাই জানে যে তোমাদের বঙ্গদেশের যুবাদের পৌরুষ ক্ষমতা পুণ্ড্রবর্ধনের যুবকদের তুলনায় অতি ক্ষীণ। একবার সুযোগ দিয়েই দেখো না। যদি এই দেশের আধিপত্য একবার আমার হাতে আসে মিত্র, তবে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তোমার থেকে যোগ্য আর কাউকে দেখি না।’

এত বড় আশ্বাসেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি বিশাখসেন। চাপাস্বরে বলেছিলেন, ‘কথা তা নয় মিত্র। আমি ভীত অন্য কারণে।’

‘কী?’

‘এই প্রকল্পটি চলছে কম দিন নয়। যে-কোনও সমর্থ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষের কাছে কতটা আকর্ষণীয়—বুঝতেই পারছ। আজ অবধি অন্তত শতাধিক পুরুষ এই কর্মে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু...’

‘কিন্তু?’

কণ্ঠস্বর একেবারে উদারায় নামিয়ে বলেছিলেন বিশাখসেন, ‘আজ অবধি কেউ সফলকাম হয়নি। কালরাত্রি প্রভাত হলে দেখা যায়—প্রাসাদের প্রধান দ্বারের সামনে তার মৃতদেহখানি পড়ে আছে।’

‘বটে?’ ভ্রুকুঞ্চন করেছিলেন অনঙ্গমিত্র।

‘শুধু তাই নয় বন্ধু। সেই শরীর বিষের প্রভাবে এমনই কৃষ্ণনীল হয়ে থাকে যে দেখলে ভয় করে। মনে হয় যেন বজ্রপাতে নিহত হয়েছে মানুষটি।’

অনঙ্গমিত্র হা-হা করে হেসে উঠে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি নিয়মিত গঞ্জিকাসেবনের অভ্যাস করছ আজকাল?’

‘বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা বন্ধু। ‘কিন্তু, স্বচক্ষে দেখা এ ঘটনা কী করে অস্বীকার করি বন্ধু?’

পুনরায় সশব্দে হেসে উঠেছিলেন অনঙ্গমিত্র, ‘আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না মিত্র। শুধু রানির শয়নকক্ষ অবধি আমাকে এগিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য একটি ভালো দেখে রেশমবস্ত্র পছন্দ করে রেখো।’

মদ্যাসক্তি বোধহয় মানুষের বোধশক্তিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করে দেয়। বিশাখসেন কথা বাড়াননি। বন্ধুর অনুরোধ রেখেছিলেন।

কথাগুলি মনে পড়তেই ঘামতে শুরু করছেন অনঙ্গমিত্র। তিনি বুঝতে পারলেন—ইতিমধ্যেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরের সব প্রদীপ। আলো বলতে জানালা দিয়ে আসা জোৎস্না। অপার্থিব জ্যোৎস্নায় অনঙ্গমিত্র দেখলেন, দাসীদুটি অন্তর্হিত। এই অন্ধকারে শুধুমাত্র তিনি আর রানি।

নারী স্থির হলেন। শীতল স্বরে বললেন, ‘কী নাগর, ভোগ করবে না আমাকে? তৃপ্ত করবে না আমার বাসনা। এসো পুরুষ, আমাকে তৃপ্ত করো, আমাকে মুক্ত করো, আমাকে পূর্ণ করো...’

বহুকষ্টে চক্ষু উন্মীলিত করলেন অনঙ্গমিত্র। উদভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। দেখলেন উলঙ্গিনী নারীর কুঞ্চিত কেশদাম বাতাসে উড়ছে সর্পিণীদলের মতো। স্তনদুটি অস্বাভাবিক স্ফীত। আর পদ্মের পাপড়ির মতো আঁখি দুটি...

পদ্মের পাপড়ি? নাকি নরকের অঙ্গার? ওই জ্বলন্ত অক্ষিদুখানি কার? ওই শীতল, ক্রুর, উদগ্র, হিংস্র দৃষ্টি কার? ও কি পাতালের গহীন অন্ধকার থেকে উঠে আসা মূর্তিমতী অভিশাপ?

এই অপার্থিব দৃশ্য দেখে অন্তরাত্মা অবধি কেঁপে উঠছে অনঙ্গমিত্রর। জীবনে এত তীব্র ভয় তিনি পাননি। আর্তনাদ করে উঠতে চাইলে, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে স্বর ফুটল না।

নারীটি ঝুঁকে এলেন অনঙ্গমিত্রর উপর। হিসহিস করে বললেন, ‘কী নাগর? তৃপ্ত করবে না আমাকে? রাজা হবে না তুমি? রাজা হবে না এই দেশের? উঁ?’

অনঙ্গমিত্রর সর্বাঙ্গ থরথর কাঁপছিল, স্বেদস্রোত বইছিল জলের মতো। বললেন, ‘আমাকে ছেড়ে দিন।...অধমের অপরাধ ..ক্ষমা করুন।’

‘ক্ষমা! আপনি!’ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন সেই নারী, ‘এ কী কথা গো নাগর? তুমি না পুরুষ? এই না কিছু পূর্বেই আমাকে রণ্ডা, বারবণিতা বলে সম্বোধন করছিলে? আর এই কয়েকমুহূর্তেই ‘আপনি?’ এ তো ভারি মজার কথা।’

‘ক্ষমা রানি...ক্ষমা।’

উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন সেই নারী। অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, জোৎস্নাময় অলিন্দে, উতল বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে সেই হাসি। অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল নিস্তব্ধ রাত্রি। হাসি থামলে রানি বললে, ‘ছিঃ স্বামী, ওকথা বলতে হয়? আপনি না আমার আমার প্রভু? আসুন স্বামী, আপনাকে ভালোবাসায় সোহাগে ভরিয়ে দিই।’

অনঙ্গমিত্র কিছু বলার আগেই রানি ঝুঁকে এলেন তাঁর মুখের ওপর। চুম্বনের ভঙ্গিতে অধর সামান্য উন্মুক্ত হল। তখনই অনঙ্গমিত্র দেখলেন যে নারীটির শ্বদন্তদুটি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে আরও বক্র, আরও তীক্ষ্ণ।

আর জিহ্বা? সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে অনঙ্গমিত্র দেখলেন এই রমণীর জিহ্বা মধ্য হতে দুইভাগে বিভক্ত। ঠিক যেমন সাপের হয়!

পরমুহূর্তে দুখানি তীক্ষ্ম, উগ্র বিষদন্ত নেমে এল অনঙ্গর গণ্ডদেশে।

কর্মান্তবাসকের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র নগরের প্রাণস্বরূপ। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বণিকদল এবং ক্রেতাদের সমাগমে প্রতিদিনই লোকারণ্য হয়ে থাকে। পশ্চিমের বজ্রভূমি থেকে হীরকব্যবসায়ীরা আসেন। কজঙ্গলের খনিতে এক বিশেষ ধরণের খনিজ রৌপ্য পাওয়া যায়, তার রং অগুরুপুষ্পের মতো, নাম গৌড়িক। তার সম্ভার নিয়ে আসেন রাঢ়ের বণিকদল। কামরূপ এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের বণিকেরা নিয়ে আসেন কাঞ্চনবর্ণের দুকূল এবং কাষায় বস্ত্র। কাশী এবং মধুরা থেকে আসে অতি উত্তম কার্পাসবস্ত্র, যদিও তার সূক্ষ্মতা বঙ্গদেশের কার্পাস বা রেশমবস্ত্রের তুলনায় নিকৃষ্ট।

এছাড়াও ভোটদেশ থেকে আসে অত্যুত্তম পিপ্পলী। এই পিপ্পলীর বড় সুনাম, বঙ্গ হতে সেই পিপ্পলী যায় সুদূর পূর্বে—রোমক দেশ অবধি। দণ্ডভুক্তি এবং অঙ্গদেশ থেকে আসে বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত দ্বিমুখী তরবারি। গত বেশ কয়েকবছর ধরে আরবদেশে এই তরবারির চাহিদা ঊর্ধ্বমুখী। হরিকেলের সমুদ্র বন্দর

থেকে আসে মালয় দেশের উত্তম মুক্তা এবং সামুদ্রিক লবণ। আর সমুদ্র বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে গুবাক এবং অগুরু। হরিকেল এবং তাম্রলিপ্তির ব্যবসায়ীদের সমুদ্রবাণিজ্যে বিশেষ খ্যাতি আছে। যদিও অতীতের সেই গৌরব এখন অনেক অস্তমিত, তবুও নেই নেই করেও যা আছে, তা কম নয়।

এই সদাব্যস্ত এবং অতিবৃহৎ পণ্যকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে এক বৃহৎ মন্দিরকে ঘিরে। মন্দিরের উপাস্য দেবী বজ্রযোগিনী। তিনি দেব হেরুকের সঙ্গে যুগনদ্ধ মূর্তিতে অধিষ্ঠিতা।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত। সাধনায় ও শীলে তাঁর তুল্য বৌদ্ধাচার্য্য সমগ্র কর্মান্তবাসকে বিরল।

কর্মান্তবাসকের উপান্তে লালিম্বিবন পাহাড়। পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চা কেন্দ্র শালিবন বিহার। সমগ্র বঙ্গদেশে বজ্রযানশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে শালিবনবিহারের বড়ই সুনাম। বুদ্ধগুপ্ত এই শালিবনবিহারের উপাধিবারিক।

বজ্রযোগিনীপূজায় ও মন্দিরের অপরাপর কর্মকাণ্ডে আচার্য বুদ্ধগুপ্তকে সাহায্য করেন আরও চারজন শ্রমণ। এঁরা প্রত্যেকেই যুবক, শালিবনবিহারের ছাত্র এবং বুদ্ধগুপ্ত'র শিষ্যও বটে। তবে ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত গৈরিক কাষায় ধারণ করেন, এঁরা পরেন শুভ্রবস্ত্র।

আজ কার্তিকী চতুর্দশী, মহাপুণ্য দিন। কাল কার্তিকী অমাবস্যা, দেবী বজ্রযোগিনীর উপাসনার প্রকৃষ্টতম তিথি। এই তিথিতেই নাকি দেবী বজ্রযোগিনী নিজহস্তে নিজের মস্তক ছেদন করে দেবী ছিন্নমুণ্ডা হয়েছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে এই বিস্তীর্ণ গৌড়বঙ্গের শতসহস্র বজ্রযোগীরা উপস্থিত হয়েছেন কর্মান্তবাসকে। তাঁদের উলঙ্গ ও ভস্মাচ্ছাদিত দেহের বাহারে, 'জয়জ্জয়বজ্রযোগিনী' হুঙ্কারে, খর্পর ও খট্বাঙ্গের আস্ফালনে, কণ্ঠে প্রলম্বিত নরকরোটিমালার বীভৎস প্রদর্শনে সমগ্র কর্মান্তবাসক উচ্চকিত।

প্রথা অনুসারে কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে মেঘান্দনদীতে মহাস্নান হবে। তখন এই খর্পরখট্বাঙ্গধারী মহাবজ্রযোগীদের সঙ্গে অগণিত পুণ্যার্থীও নদীতে অবগাহন করে নিজের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করবেন। তারপর দিনভর নগরীতে উৎসব। ভোর হতে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ভক্তের দল কাঁসা অথবা রূপোর থালায় নানা অর্ঘ্য-উপাচার সাজিয়ে আসবেন দেবী বজ্রযোগিনীর মন্দিরে। কামনা করবেন অবিরল ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষসুখের। এই পূজার্চনা চলবে দ্বিপ্রহর অবধি। অতঃপর স্বয়ং রানি এবং প্রকাশচন্দ্র মন্দিরে আসবেন সপারিষদ। তাঁদের উপস্থিতিতে মন্দিরসম্মুখে একশো আটখানি মহিষ বলি হবে। দেবী বজ্রযোগিনী সেই বলির রক্তে তৃপ্ত হয়ে অক্ষয় রাজশৌর্যের টীকা পরিয়ে দেবেন এই বঙ্গদেশের রানি এবং তাঁর একান্ত সহায়ক প্রকাশচন্দ্রের ললাটে।

এখন অপরাহ্নবেলা। বাণিজ্যকেন্দ্র আপাতত কিঞ্চিৎ জনহীন। ভিনদেশীয় বণিকেরা তাঁদের পান্থশালায় বিশ্রাম নিতে ফিরে গেছেন। দেশীয় বাণিজ্যরথীরা সুখীগৃহকোণে ফিরে এসেছেন। বিপণিগুলি শূন্য পড়ে রয়েছে।

একজন মলিনবেশ যুবক অতি দীনহীন ভাবে মন্দিরের মধ্যে এককোণে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল।

দেবী বজ্রযোগিনীর সমগ্র মন্দিরটি এখন ধৌত এবং পরিষ্কৃত। মন্দিরের প্রাচীর ঘিরে সারিবদ্ধ সুসজ্জিত বংশদণ্ড। বংশদণ্ডগুলির মাথায় রঙিন বস্ত্রের দিকমালা ও কিঙ্কিণীমালা; তারা মৃদুমন্দ হাওয়ায় উড়ন্ত। কিঙ্কিণীমালায় ছোট ছোট ঘুঙুর লাগানো। বাতাস বইলেই সেখান হতে টুংটাং শব্দ আসছে। এছাড়াও মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহ ঘিরে বিভিন্ন রঙিন কাপাসবস্ত্রের ধ্বজপতাকা উড়ছে। সেগুলি বেশ বাহারি, চারিপাশে ঝালর দেওয়া, মধ্যভাগে রেশমি সুতোর কারুকাজ।

মন্দিরপ্রাঙ্গণের ঠিক মধ্যস্থানে, গর্ভগৃহের সামনে একটি মাটির তৈরি ধর্মস্তূপ। তার উপর একটি বৃহৎ চন্দ্রাতপছত্র। ছত্রটির সারা গায়ে অভ্রের অপরূপ কারুকার্য, স্তূপ ঘিরে মাটিতে প্রচুর ছোট ছোট কাঠের মূর্তি

রাখা। সেসব মূর্তির কিছু বিভিন্ন পশুপাখির, কিছু বিভিন্ন যাত্রীশকটের, কিছু বিভিন্ন আকার ও প্রকারের নৌকার। বঙ্গজন বড়ই নদী, নৌকা এবং নৌবাণিজ্যপ্রিয় জাতি। এ সব তারই চিহ্ন।

মন্দিরের প্রধান দ্বারের দুপাশে দু'খানি তাম্রকলস রাখা। কলসের ওপর আম্রশাখ, তার ওপর ডাব। কলসে, আম্রপত্রে এবং ডাবে চন্দন এবং কাঁচা হলুদ দিয়ে মঙ্গলচিহ্ন অঙ্কিত। কলসে ধর্ম, আম্রপল্লবে সঙ্ঘ এবং ডাবে বুদ্ধ চিহ্নিত হন।

মঙ্গলকলসের সামনে দুখানি মস্তবড় দীপবৃক্ষ। পিত্তলের প্রতি দীপবৃক্ষে একশো আটটি করে দীপদান, প্রতিটি দীপদান সর্ষের তেলে পরিপূর্ণ, তার মধ্যে কাপাসের শিখা। আজ সন্ধ্যা হতে দু'দিন ব্যাপী এই দীপবৃক্ষের প্রতিটি প্রদীপ জ্বালানো থাকবে। কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে দেবী বজ্রযোগিনীর মন্দিরে উৎসব। সমগ্র প্রাঙ্গণ দীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

যুবকটি যে কতক্ষণ ধরে এই অপরূপ মন্দিরসজ্জা নিরীক্ষণ করত, সে বলা কঠিন। সূর্য অস্তাচলগামী। সেই আলোয় মন্দির যেন ব্রীড়াবনতা নববধূর মতো লজ্জারুণ। যুবকটি তদগতচিত্তে এই সৌন্দর্যসুধা পান করছিল।

পিঠে একটি স্পর্শ পেয়ে ত্বরিতে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখল, একজন ভন্তে। তাঁর হাতে একটি ছোট থালা, তাতে কিছু ফল সাজানো। সামান্য নীচুস্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে, পথিক?'

পথিক বিনম্রস্বরে বলল, 'আমি এক অতি দরিদ্র সামান্য গৌড়বাসী, ভন্তে।'

'এখানে কী চাই?'

পথিক আবৃত্তি করল, 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী। রূপা থোই নাহিক ঠাবী।'

বৌদ্ধ আচার্য উঠে দাঁড়ালেন। ইশারায় সেই যুবককে বললেন তাঁকে অনুসরণ করতে।

গ্রামরক্ষীদলের প্রধান যখন থরথর কম্পিত দেহে রাজসভায় উপস্থিত হল, তখন সবে প্রভাত হয়েছে। রাজসভায় দুইখানি সিংহাসনই শূন্য। সভাসদেরা এখনও সবাই এসে উপস্থিত হননি। কেবল মহাসন্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্র এবং গুপ্তচরবাহিনীর প্রধান আনন্দগুপ্ত উপস্থিত।

অগ্নিমিত্র এবং আনন্দগুপ্ত দুজনের মুখমণ্ডল গম্ভীর। তাঁরা মহারানিকে অনুরোধ করে আজ বিশেষ কয়েকজন সভাসদ ছাড়া বাকিদের রাজসভায় উপস্থিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছেন। সংবাদ অতি গুরুতর, এবং এর ফল যে সুদূরপ্রসারী—সে বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ। এত সতর্কতা সেইজন্যেই।

এই রাজসভাটি প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবর্তিত জয়স্কন্ধাবার। খড়্গবংশের নৃপতিদের প্রথমে কোনও স্থায়ী রাজপ্রাসাদ বা রাজসভা ছিল না। ভ্রাম্যমাণ জয়স্কন্ধাবার থেকে তাঁরা রাজ্যশাসন করতেন। খুব সম্ভবত তিব্বতের যে রাজবংশ এই খড়্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা, সেই যাযাবর উপজাতীয় রাজাদের অনুকরণে এই প্রথার সূচনা।

এই প্রথার অবসান ঘটান সম্রাট দেবখড়্গ। এই প্রাসাদ এবং সভার নির্মাণকার্যের সূচনা তাঁর হাতেই, আর শেষ হয় সম্রাট রাজভটের সময়। পূর্বসূরিদের ভ্রাম্যমাণ রাজসভার অনুসরণে এই জয়স্কন্ধাবারটিকে স্থায়ী সভাগৃহের রূপ দেওয়া হয়।

রক্ষীপ্রধানের মুখে স্পষ্টতই ভয় এবং আতঙ্কের ভাব। তার পিছনে তিনজন ভল্লধারী রাজসেবকসৈন্য ভাবলেশহীন মুখে দণ্ডায়মান।

কিছু পরেই সভায় উপস্থিত হলেন মহাদণ্ডনায়ক জিতসেন এবং মহাপ্রতিহার শান্তঘোষ। দুজনে সংবাদ পাওয়ামাত্র উপস্থিত হয়েছেন, আলঙ্করিক বেশভূষা পরিধানের সময় পাননি। জিতসেন এসেই উদ্বিগ্নস্বরে বললেন, 'কী হয়েছে আনন্দগুপ্ত? কেন হঠাৎ এই আহ্বান? আবার কি বহির্শত্রুর আক্রমণের সংবাদ? নাকি কোনও সামন্তরাজা বিদ্রোহী?'

উত্তর দিলেন অগ্নিমিত্র। শীতল এবং সামান্য সানুনাসিক স্বরে বললেন, 'তার থেকেও ভয়াবহ কিছু ঘটতে চলেছে ভ্রাতা জিতসেন। মহারানি আর রাজসচিব আসুন। সব বিস্তারিত বলছি।'

শান্তঘোষ সার্থকনামা। তাঁকে কেউ বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হতে দেখেনি। তিনি বললেন, 'আচার্যদেব কোথায়? আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী?'

বলতে-বলতেই রাজপরিবারের কুলগুরু আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি এবং প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট প্রবেশ করলেন সভামধ্যে। উপস্থিত চারজন আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন কুলগুরুকে। তারপর সামান্য মাথা নত করে প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানালেন। বিশুদ্ধকীর্তি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করে বললেন, 'কী হয়েছে অগ্নিমিত্র? এই অতর্কিত ঝটিকাসভা আহ্বানের কারণ? আর এই কাপুরুষ গ্রামরক্ষকটিকেই বা এখানে আনা হয়েছে কী করতে?'

ছয় জন মহাপ্রতাপশালী রাজন্য নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। রক্ষীবাহিনীর প্রধানটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল।

আনন্দগুপ্ত বলতে লাগলেন, 'আপনারা জানেন যে আজকের রাত্রি শেষে কাল থেকে কর্মান্তবাসকে বাৎসরিক মহোৎসব শুরু। সেই মহোৎসবে অংশ নিতে নানা দেশ থেকে অনেক পুণ্যার্থীরা এসেছেন। এসেছেন অনেকানেক পূজ্যপাদ বজ্রযোগীরা। কাল মহাস্নানের অব্যবহিত পরে দেবী বজ্রযোগিনীর মহাপূজা শুরু।

'প্রতিবারের মতো এইবারেও আমরা কাল রাত্রে মেঘান্দ নদীতীরের মহাশ্মশানে ভৈরবীচক্রের আয়োজন করেছি। আমরা ছয় জন এবং মহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্র সেই ভৈরবীচক্রে উপস্থিত থাকবেন। চক্রানুষ্ঠানের জন্য যা যা প্রয়োজন সেসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মদ্যের মধ্যে উত্তম গৌড়ী, পৈষ্টী এবং মাধ্বী থাকছে। থাকছে ভর্জিত শাল, পাঠীন এবং রোহিত মৎস্যের স্তূপ। তার সঙ্গে যাতে বরাহ, শল্যক, মৃগ ইত্যাদি পশুমাংসের অভাব না-হয়, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

'প্রতিবারের ন্যায় হিরণ্যসামুদায়িক বিশাখসেন এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছেন। এইবারের ভৈরবীচক্র আয়োজিত হবে দেবী কুরুকুল্লার অর্চনার অঙ্গ হিসেবে। ইনি বড় জাগ্রত দেবী। দেবীমূর্তি সন্ধ্যার মধ্যে প্রস্তুত করে, রাত্রিতে পূজাপাঠ সমাপন করে পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বে বিসর্জন দিতে হয়।'

আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি মাথা নাড়লেন। এই বৎসরের ভৈরবীচক্রে কুরুকুল্লা আরাধনার পরিকল্পনা তাঁরই। এত অনুপুঙ্খ বর্ণনাও মুখ্যত তাঁকে অবগত করার জন্যই।

'এই ভৈরবীচক্র, আপনারা জানেনেই, সাধনসঙ্গিনী বিনা অসম্ভব। প্রতি বৎসরই আমরা শাস্ত্রের নির্দেশে অন্ত্যজ জাতি থেকে সাধনসঙ্গিনী নির্বাচিত করে থাকি। বিশেষ করে ডোম্বিনী, রজকিনী, চণ্ডালিনী, শবরী—এই অন্ত্যজ নারীদের যদি চক্রে সাধনসঙ্গিনী রূপে বরণ করা যায়, তাহলে ফল শুভ হয়।'

সভাস্থ সবার মনেই গত ভৈরবীচক্রের স্মৃতি ভেসে উঠলো। জিতসেনের ভাগ্যে একটি উদ্ভিন্নযৌবনা ডোম্বিনী জুটেছিল। তার সেই কৃষ্ণশঙ্খসদৃশ স্তনদ্বয়, আয়ত মৃগলোচন, সেই অনাঘ্রাত যৌবন, সেই উদগ্র যৌনপ্রহার, সেই শীৎকার...

জিতসেনের পৌরুষ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। কোলের ওপর একটি উপাধান টেনে নিলেন তিনি।

বিশুদ্ধকীর্তির শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত ওষ্ঠে একটি স্মিত হাসি খেলে যায়। গত ভৈরবীচক্রের মালিনীটি আপাতত তাঁর উদ্যানের শোভাবর্ধনের কার্যে নিযুক্ত। সেই থেকে ভন্তে বিশুদ্ধকীর্তির প্রতিটি রাত্রিই চক্ররাত্রি। মালিনীর বাস ছিল বারবণিতা পল্লির ভাঙা পর্ণকুটিরে। এখন তার মাটির বাড়ি, বাঁশের ছাউনি, মনোহারি সাজসজ্জা। তার কানে রূপার ঝুমকো দোলে, পায়ে নতুন মল উঠেছে। বিশুদ্ধকীর্তি তাঁর একটি আদুরে নাম দিয়েছেন, নন্দিনী।

অমিতাভভট্ট রাজনীতিজ্ঞ হলে কী হবে, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন নাট্যকার ও কবি। সেই কারণে তিনি সংস্কৃতিমোদী মানুষের কাছে জনপ্রিয়ও বটে। কাব্য ও নাটিকা গৌড়বঙ্গের আপামর জনসাধারণের প্রাণের আরাম। বঙ্গজনবাসীর উদরে খাদ্য জুটুক না জুটুক, হৃদয়টি কাব্যরসে টইটম্বুর হওয়া চাইই চাই। অমিতাভভট্ট তার সার্থক প্রতিভূ। গত ভৈরবীচক্রে তাঁর ভাগ্যে একটি মধ্যবয়সি চণ্ডালীর প্রাপ্তিযোগ হয়েছিল। চৌষট্টি কামকলায় সেই চণ্ডালীর সিদ্ধি মহারথীতুল্য। ভাস ও ভারবি থেকে শুরু করে মহাকবি কালিদাসের নাট্যরসাস্বাদনে তার অধিকার যে কোনও ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যচঞ্চুর তুলনায় কম কিছু নয়।

গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অমিতাভভট্ট। তাঁর অকলঙ্কিত শুভ্রপট্টবাসে এই অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য চারিত্রিক স্খলন দগদগে ক্ষতর মতো চিহ্নিত। তিনি কিছুতেই সেই স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেন না।

শুধুমাত্র শান্তঘোষের মুখমণ্ডল অবিকৃত থাকে। বাকিরা শান্তঘোষের অশান্ত কামোন্মত্ততার ব্যাপারে সম্যক অবগত। প্রতিটি ভৈরবীচক্রে শান্তঘোষের একটি করে অনাঘ্রাতা এবং সদ্য রজঃস্বলা কুমারীকন্যা প্রয়োজন হয়। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি বলেছেন যে, বজ্রসাধনায় কুমারী-রজ-রক্ততুল্য মহাপবিত্র বস্তু আর কিছু নেই। তবে শান্তঘোষ ভৈরবীচক্র চলাকালীন কুমারী রজরক্ত ও কুমারীরক্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করেন না।

আনন্দগুপ্ত পুনরায় বলতে শুরু করলেন, 'আপনারা এও জানেন যে গত কয়েক বছর ধরে কর্মান্তবাসক তথা বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ধর্মচেতনার প্রভাব ক্রমেই কমে আসছে। আজকাল ভৈরবীচক্র সহ বিভিন্ন গুহ্যসাধনার জন্য প্রাপ্তব্য শক্তির সংখ্যা ক্রমেই অপ্রতুল হয়ে উঠছে। পূর্বে বঙ্গজ গৃহস্থরা যতটা সোৎসাহে বজ্রসাধনার জন্য পরিবারস্থ নারীদের উৎসর্গ করতেন, অধুনা তার অধোগতি লক্ষনীয়। আজকাল বলপ্রয়োগ ছাড়া সাধনসঙ্গিনী জোগাড় করা অসাধ্য হয়ে উঠেছে।'

'বলপ্রয়োগের ব্যাপারে কিছু সংবাদ আমার কর্ণগোচর হয়েছে আনন্দগুপ্ত।' বলে উঠলেন বিশুদ্ধকীর্তি, 'তার সবই যে প্রীতিবর্ধক, তা নয়।'

'রাজগুরু নিশ্চয়ই ভালোভাবেই জানেন যে, এই দেশের জনগণ বড়ই অবোধ এবং অর্বাচীন। কোন পথে যে তাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, কীসে যে তাদের বোধিচিত্তের সম্যক উদ্বোধন ঘটবে, সেই বিষয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। নিজেদের শ্রেয় সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণাই নেই।

'কিন্তু রোগী যদি তার নিজের রোগের উপশম না চায়, তাহলে তাকে বলপূর্বক তিক্ত ঔষধ সেবনে বাধ্য করার নিদান শাস্ত্রেই রয়েছে। তাই নেহাত নিরূপায় হয়েই আমাদের কিছু আপাত-অপ্রীতিকর পন্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। শাস্ত্রের নিদান অনুসারে আমরা, বঙ্গজাতির এই সপ্ত-অভিভাবক, চক্রসাধনার জন্য শক্তিসংগ্রহ প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ বাধ্যতামূলক করেছি।'

এই পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ নির্বাক রইলেন আনন্দগুপ্ত। তারপর পুনরায় বলতে শুরু করলেন। 'গতকাল সেই মহতী উদ্দেশেই কমলাঙ্ক গ্রামের সন্নিহিত অরণ্যে আমাদের সৈন্যবাহিনী সদস্যরা অভিযান চালিয়েছিল। জঙ্গলটি অতি ভয়াবহ। দুর্ধর্ষ কিরাতজাতির বাস। আপনারা তো জানেনই যে চক্রসাধনায়...'

'অন্ত্যজ কিরাতরমণীদের স্থান বিশেষ শীর্ষে, তাই তো?'

সকলে সচকিত হয়ে দেখলেন, সভাস্থলে প্রবেশ করেছেন মহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্র এবং বঙ্গদেশের একচ্ছত্রাধিপ রানি—সম্রাজ্ঞী স্বয়ং।

মধ্যবয়সি ভন্তে এবং সেই ভবঘুরে যুবকটি যখন মন্দিরচত্বর ছাড়িয়ে নগরের পশ্চিমপ্রান্তে প্রবেশ করলেন, তখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা হয় হয়। অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তাভ স্বর্ণকিরণে ধুইয়ে দিচ্ছে কর্মান্তবাসকের আকাশ, মাটি ও দিগন্ত।

এখন বেশভূষা দেখে অবশ্য এই দুজনকে সন্ন্যাসী এবং ভবঘুরে বলে চেনা দুষ্কর। বৌদ্ধ আচার্যের পরনে এখন রাজকীয় পরিধান। তাঁকে দেখে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলে মনে হয়। তাঁর মুণ্ডিতমস্তকে একটি বহুমূল্য রেশমী উষ্ণীষ। ভবঘুরে যুবকটির সুগৌর ঊর্ধ্বাঙ্গ সূক্ষ্ম কাপাস বস্ত্রে আবৃত। নিম্নাঙ্গে একটি কচ্ছযুক্ত কাষায় অধোবদন। তার যৌবনপ্রফুল্ল মুখ হতে শ্মশ্রুগুম্ফ অন্তর্হিত। সদ্যস্নাত তৈলসিক্ত চুল থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জলবিন্দু। আপাতনিরীহ যুবকটির চোখের মধ্যে তীক্ষ্ম ঔজ্জ্বল্য আছে।

দুজনে ক্রমে মেঘান্দ নদীতীরের একটি বিশেষ অঞ্চলে এসে উপস্থিত হলেন। সাধারণ কর্মান্তকবাসীদের এখানে বিশেষ দেখা যায় না বটে, কিন্তু বহির্দেশাগত বণিক, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং অন্যান্য ধনীব্যক্তিদের মধ্যে স্থানটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এখানে শৌণ্ডিকালয়, বারবণিতাগৃহ-সহ নানাবিধ মনোরঞ্জনের বিবিধ উত্তেজক উপকরণ উপলব্ধ। এই অঞ্চলে ধনবান পুরুষেরা আমোদকাতর হয়ে অকাতরে ব্যয় করে থাকেন। সেই সূত্রে বঙ্গদেশের কিঞ্চিৎ বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা আয় হয়।

বর্তমানে বঙ্গীয় রাজকোষে স্বর্ণের অভাব হিরণ্যসামুদায়িকদের অশেষ শিরঃপীড়ার কারণ। বস্তুতপক্ষে মহাবল শশাঙ্কের সময় হতেই বঙ্গীয় মুদ্রায় স্বর্ণের পরিমাণ ক্ষীণ হতে হতে এখন সম্পূর্ণ বিলীন। এর কারণ সমুদ্রবাণিজ্যর সর্বগ্রাসী অবক্ষয়। পূর্বে সমুদ্রবাণিজ্যপথে বঙ্গদেশে যে পরিমাণ স্বর্ণদিনার এবং রৌপ্যদ্রন্মের আগমন ঘটত, এখন তার এক-দশমাংশও আয় হয় না। সরস্বতী তথা অন্যান্য সমুদ্রাভিমুখী নদীগুলির নাব্যতাহ্রাসের কারণে বঙ্গের বহু বন্দরনগরী এখন পরিত্যক্ত। স্বর্ণাভাবে এখন বঙ্গদেশে মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত হয়েছে কড়ি এবং কপর্দক। কর্মান্তবাসকের রাজকোষে স্বর্ণমুদ্রার আয়ের জন্য তাই এই ব্যবস্থা।

দুজনে একটি মাটির তৈরি দ্বিতল শৌণ্ডিকালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তার সামনের উদ্যান বড়ই মনোহর। সেখানে নানা দেশ থেকে আনা ফুলের সমাহার। উদ্যানের সীমানা জুড়ে নিয়মিত ব্যবধানে তাল ও তমাল প্রোথিত। সামান্য দূরে মেঘান্দ নদীর ফেনিল স্রোত বহমান। মৃদুমন্দ পবন সঞ্চালনে, উদ্যানের শেফালি ও রজনীগন্ধার সুগন্ধে অপরাহ্নটি বড় মধুর হয়ে উঠেছে।

শৌণ্ডিকালয়টির সামনে এখনই মধুলোভী রসিকজন একে একে সমবেত হতে শুরু করেছেন। এক বিপুলোদর ব্যক্তি সহাস্যমুখে সমবেত ভদ্রজনদের অভ্যর্থনাকর্মে ব্যস্ত। বিশিষ্ট অভিজাতবর্গ ব্যতীত এই পানশালায় বিশেষ কেউ আসেন না। তাই শৌণ্ডিকালয়ের অধিকর্তা প্রত্যহ স্বয়ং উপস্থিত থাকেন অতিথিসম্ভাষণের জন্য। সুডৌল বক্ষিনী, শঙ্খিনী সুন্দরীরা অতিথিদের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, এই জনারণ্যেও এমন দু-চারজন আছে—যারা ঠিক মধুলোভী সাধারণ মানুষ নয়। তাদের শ্যেনদৃষ্টি চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলিষ্ঠ দেহ এবং কটিদেশে কোষবদ্ধ তরবারি অন্যকিছুর ইঙ্গিত দেয়।

যুবকটি নীচু স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এই কি সেই ভাঁড়ুদত্তের প্রসিদ্ধ মধুশালা?'

আচার্য মাথা নাড়লেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ আর্য, এই-ই সেই ভাঁড়ুদত্তের প্রসিদ্ধ আসবালয়; চিরবসন্তের আসক্তিনিকেতন। ওই যে স্থূলকায় বৃদ্ধ মহিষটিকে দেখছ, তিনিই স্বয়ং ভাঁড়ুদত্ত। ভালো কথা, নগরে প্রবেশকালে দ্বারপাল যে অভিজ্ঞানটি দিয়েছেন, সেটি সঙ্গে আছে তো?'

যুবকটি কটিদেশ থেকে একটি নামাঙ্কিত চতুষ্কী বার করে আচার্যর হাতে দিলেন। আচার্য সেটি নিয়ে ভাঁড়ুদত্তের দিকে অগ্রসর হতেই ভাঁড়ুদত্তের দৃষ্টি এল এইদিকে।

তিনি অভ্যস্ত সম্ভাষণ করে বললেন, 'আসুন আর্য, ভাঁড়ুদত্তের মদিরালয়ে আপনাদের স্বাগত।'

আচার্য ভাঁড়ুদত্তের কানে কানে কিছু বলামাত্র ভাঁড়ুদত্তের চোখমুখের ভাব বদলে গেল। আচার্যকে দ্রুত অন্যদিকে টেনে নিয়ে চারিদিক একবার দেখে নিলেন। তারপর রুদ্ধস্বরে বললেন, 'এ কী ভন্তে, আপনি এখানে? এরকম অসময়ে? আপনি কি জানেন না এখন কী চলছে? জানেন না, রাজার আদেশে চারিদিকে গুপ্তচর এবং গুপ্তরক্ষীদল ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

আচার্য নীচুস্বরে বললেন, 'জানি। আজ এক বিশেষ অতিথি এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কিছু একান্ত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে মিত্র। তাই এখানে আসা।'

'কিন্তু আচার্য, সে আলোচনা তো শালিবনবিহারে আপনার প্রকোষ্ঠেও হতে পারত!'

'না, মিত্র ভাঁড়ুদত্ত। এখন অচেনা অজানা কাউকে নিয়ে বিহারের আবাসে প্রবেশ করা যায় না। ভন্তে বিশুদ্ধকীর্তির নিষেধাজ্ঞা আছে। তাছাড়া এই মুহূর্তে বিহারের কে যে শত্রুপক্ষে, আর কে যে মিত্রপক্ষে—সে বোঝা দুষ্কর। বঙ্গদেশে এখন মদিরালয়ই একমাত্র স্থান, যেখানে যে কাউকে নিয়ে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করা যায়।'

দূরে দাঁড়ানো যুবকটির দিকে ইঙ্গিত করলেন ভাঁড়ুদত্ত, 'ইনি কে আচার্য?'

চতুষ্কীটি ভাঁড়ুদত্তের হাতে তুলে দিয়ে চাপাস্বরে কিছু বললেন আচার্য বুদ্ধগুপ্ত। শোনামাত্র ভাঁড়ুদত্তের চোখদুটি বড় বড় হয়ে উঠল। তিনি ব্যগ্রভাবে বললেন, 'আসমুদ্রহিমাচলজয়ী কাশ্মীরনরেশ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র, গৌড়নরেশ জয়ন্তর জামাতা, বীর শ্রীবিনয়াদিত্য জয়াপীড়কে অধমের পর্ণকুটিরে স্বাগত।' তারপর একটি সুতন্বী কিঙ্কিণীকে ডেকে বললেন, 'মায়া, এঁরা আমার বিশেষ অতিথি, এঁদের উত্তর-পূর্বের কক্ষটিতে নিয়ে যাও।'

মদিরালয়ের উত্তর-পূর্বের ঘরটি অন্য ঘরগুলির থেকে একটু আলাদা। ঘরের ঠিক মধ্যস্থানে উপাধানযুক্ত আরামপ্রদ আসনের ব্যবস্থা। আসনের সামনে একটি কাঠের নীচু চতুর্পদী। তার ওপর তামার জলপাত্র। কক্ষটির চারটি দেওয়াল বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্যরত নরনারী মূর্তিতে শোভিত। ছাদ থেকে চারখানি দীপদান নেমে এসেছে অনেকখানি। সেখান হতে উত্থিত অগুরু এবং কর্পূরের উগ্র গন্ধে কক্ষটি পরিপূর্ণ।

যুবক এবং আচার্য সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন, কক্ষটিতে একটিও জানালা নেই। শুধু তাই নয়, ঘরের তিনপাশে আর অন্য কোনও ঘর নেই। আসনটিও এমনভাবে অবস্থিত যে, যিনি তাতে বসবেন তাঁর মুখ সবসময়ই দরজার দিকেই থাকবে।

মায়া নামক কিঙ্করী সামান্য ঝুঁকে বললেন, 'দ্বার বন্ধ করে দিই আর্য? আপনাদের এই কক্ষে কেউ বিব্রত করবে না।'

আচার্য নিরাসক্তসুরে বললেন, 'তার প্রয়োজন নেই কন্যা। দ্বার উন্মুক্তই থাকুক। কেউ যেন আপাতত আমাদের বিরক্ত না করে, সেইটি দেখবেন।'

গমনোদ্যত কিঙ্করীর নিতম্বের দিকে তাকিয়ে যুবকটি বললেন, 'কিঙ্করীর অঙ্গসৌষ্ঠব কিন্তু বড়ই উত্তেজক, ভন্তে। লক্ষ করেছেন কি?'

বিরক্ত হলেন আচার্য, 'না হে ভ্রাত জয়াপীড়। আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাল্যেই ত্যাগ করেছি।'

মৃদু হেসে জয়াপীড় বললেন, 'কাঞ্চনে অবশ্য আমারও তেমন আসক্তি নেই আচার্য। নইলে বিশ্বাসঘাতক জজ্জ যেদিন কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করলেন, তারপর থেকে তো বলতে গেলে কপর্দকহীন সন্ন্যাসীই হয়ে গেছিলাম একপ্রকার। কিন্তু কামিনী? না আচার্য, ওই আসক্তিটি বোধহয় ইহজীবনে ছাড়তে পারব না। দেখুন না, বহুকষ্টে গৌড়ে এসে পৌঁছলাম; ভাবলাম—বাকি জীবনটা সন্ন্যাসীর মতো নিরাসক্তভাবে কাটিয়ে দেব। অথচ বিধাতা বিমুখ হলেন। এখন আমার অবস্থা দেখুন, একদিকে নর্তকী কমলা, আরেকদিকে রাজকন্যা কল্যাণী।'

কঠিনস্বরে আচার্য বুদ্ধগুপ্ত প্রশ্ন করলেন, 'সেই জন্যেই কি নারী দেখলেই অসভ্যের মতো তার অঙ্গসৌষ্ঠব অবলোকন করে থাকেন আপনি?'

জয়াপীড়ের ওষ্ঠে সামান্য হাসি ফুটে উঠল, 'কিছু মনে করবেন না আচার্য। আপনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারেন, কিন্তু আমি একজন গৃহী যুবক। জীবনের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ ইত্যাদির প্রতি আমার আসক্তি

বড়ই তীব্র। তার মধ্যে উত্তম সুরা এবং উত্তম নারী, দুটি আমার প্রধান দুর্বলতা। তাছাড়া কে না জানে—শৌণ্ডিকালয়ের কিঙ্করী মাত্রেই সহজলভ্যা ও উন্মুক্তা।'

আচার্যর কণ্ঠ কঠিন হল, 'ভ্রাত জয়াপীড়! নারী বিষয়ক কথা ত্যাগ করে কি আমরা আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি?'

'আহা, তা নয়! আমি বলতে চাইছিলাম যে কিঙ্করীটি যেমন রূপসী, তেমনই উদারহৃদয়।'

'একবার দেখেই যে কোনও নারীর ঔদার্য বুঝে ফেলা বড়ই কৃতিত্বের কাজ ভ্রাতা, স্বীকার করছি। আপনার চরিত্রটি যে স্বর্ণমণ্ডিত সে ব্যাপারেও সম্যক অবগত হওয়া গেল। আশা করছি আমাদের অভিযান সফল হলে বঙ্গরাজসভায় উচ্চপদই পাবেন। আপাতত ওইটিই এ দেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে স্থান পাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ কী না।'

এই সময় মায়া নামের কিঙ্করীটি অরিষ্ট এবং মৈরেয়পূর্ণ দু'খানি কলস রেখে গেলেন। যাওয়ার সময় একটি মোহিনী কটাক্ষ করে গেলেন জয়াপীড়ের দিকে। আচার্য বিরক্ত হলেন। জয়াপীড় দ্রুত বিষয়ান্তরে গিয়ে বললেন, 'ও সব ছাড়ুন। এখানকার সংবাদ কী? গৌড়নরেশ আদেশ দিয়েছেন—আমি যেন সর্বোতভাবে আপনাদের সাহায্য করি।'

আচার্য একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'সংবাদ ভালো নয়, ভ্রাতা।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন?'

'বঙ্গদেশ আজ এক অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন। চারিদিকে সর্বব্যাপী অরাজকতা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বঙ্গরাজ্ঞীর কঠিন শাসন।'

'শাসন তো কঠিন হওয়াই বাঞ্ছনীয়, আচার্য। শাসনদণ্ড কোমল ও পেলব হলে তো শাসন করাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। শাসকবর্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগ্রত হয়।'

একটি পাত্র মৈরেয়পূর্ণ করতে করতে মাথা নাড়লেন আচার্য। বললেন, 'ঠিকই বলেছেন বটে। দেশের শাসনরজ্জুটি যে একটু সবল হওয়া প্রয়োজন, সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই রজ্জু যদি ক্রমেই ফাঁস হয়ে দেশের কণ্ঠদেশে চেপে বসে তবে তো দেশের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। শাসন শুধু কঠিন হলে তো কথা ছিল না, কিন্তু সেই সঙ্গে বড় নৃশংসও যে।'

'শাসন যদি নৃশংসই হবে, তাহলে রাজ্য অরাজক হয় কী করে? একমাত্র একজন শক্তিশালী ও সবল রাজাই তো নৃশংস শাসন চালাতে সক্ষম।'

ম্লান হাসলেন আচার্য, 'নৃশংস হওয়ার সঙ্গে শক্তিশালী হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই ভ্রাতা। দয়া ও করুণা সবলের লক্ষণ। নৃশংসতা ভীরু কাপুরুষের চিহ্ন। অত্যাচারী মাত্রেই জানবেন দুর্বল ও অক্ষম, সদাসর্বদা প্রাণভয়ে ভীত। আর আপনার কথা যদি মেনেও নিই, তবুও জেনে রাখুন—রাজা শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে রাজ্য সুশাসিত হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। রাজা যদি চান তিনি রাজদণ্ড চালনা করবেন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, তাহলে তিনি যতই সবল আর সক্ষম হোন না কেন, শাসন যতই কঠিন হোক না কেন—রাজ্য কুশাসনের গ্রাসে পড়তে বাধ্য।'

'হুম। একটু বিশদে জানালে ভালো হয়।' পানপাত্র হাতে তুলে নিলেন জয়াপীড়।

'কী আর বলব। যত দিন যাচ্ছে, ততই এই উন্মাদ রানির রাজত্ব সহ্য করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভ্রাতা। শাস্ত্রে বলে রাজনিন্দা মহাপাপ। অনুমান করি রাজ্ঞীনিন্দার পাপও তার কাছাকাছিই হবে। কিন্তু এমন কামুক, উন্মার্গগামী, উন্মাদচরিত্র নারী যে দেশের সিংহাসনে আসীন, তার দুর্ভাগ্যের কথা আর কী বলব। সেই দেশের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের করুণাও বড় অল্প মনে হয়।' মৈরেয়পূর্ণ পাত্রে চুমুক দিলেন আচার্য।

খুক খুক করে হাসলেন জয়াপীড়, 'কিন্তু আচার্য, শ্বশুরমশাই যে আমাকে বলেছেন কয়েক বৎসর পূর্বে নাকি আপনারাই, এই বৌদ্ধ ধর্মগুরুরাই উঠে পড়ে লেগেছিলেন প্রকাশচন্দ্রকে বঙ্গদেশের শাসনক্ষমতায়

আসীন করতে? তখন তো কত গোপন সভা, কত গোপন ষড়, কত গুপ্তহত্যার পরিকল্পনা। সব বিস্মরণ হয়েছেন নাকি? নাকি এই কয়েক বৎসরেই মোহভঙ্গ হল?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আচার্য, 'কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় আর্য, আবার মিথ্যাও নয়। বলতে পারেন অর্ধসত্য। প্রকাশচন্দ্র রাজক্ষমতা অধিগত করেন সম্রাট রাজভটের তিব্বতীয় রাজ্ঞীর ভ্রাতা, রাজশ্যালক চারুদত্তকে বিভিন্ন উপায়ে বশীভূত করে। তবে আমরা, বৌদ্ধ আচার্যরা যে বিভিন্ন প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কারণে সেই সময় প্রকাশচন্দ্রকে প্রতিপোষণা করেছি—সে কথা অস্বীকার করা অসম্ভব।'

'তাহলে এখন এই আক্ষেপের কারণ? এই বিরুদ্ধ ষড়ের আয়োজন?'

স্তিমিতস্বরে আচার্য বললেন, 'বড় ভুল হয়ে গেছে ভ্রাতা জয়াপীড়, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমরা বুঝিনি যে, দেশজুড়ে অসংখ্য বিহার ও সদ্ধর্মস্তূপনির্মাণ, বৌদ্ধসংঘারামগুলিতে অপরিমিত দানধ্যান আসলে একটি মস্ত বড় কূট চাল ছিল। আমরা বুঝিনি যে, সেই কূট চালে মোহাবিষ্ট হয়ে, কত বড় সর্বনাশ ডেকে এনেছি নিজেদের। তাই তো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আপনাকে ডেকে আনা।'

'সর্বনাশ বলছেন কেন?'

'বঙ্গদেশের কোনও সংবাদই কি গৌড়ে পৌঁছয় না?' ক্ষুণ্ণ হলেন আচার্য, 'কী বিপুল অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে, অসীম দৈন্যের মধ্য দিয়ে, অরাজক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে এই দেশের মানুষ, তার কোনও সন্দেশই কি আপনারা রাখেন না?'

'কিছু কিছু কানে এসেছে আচার্য। কিন্তু পরিস্থিতি যে এতটা ভয়াবহ, কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু এই অবস্থা তো একদিনে হয়নি। পরিস্থিতির এত অবনতি হল কী করে?'

দীর্ঘশ্বাস প্রথমে চাপলেন আচার্য। তারপর ধীরে ধীরে সেটি ত্যাগ করে বললেন, 'সে অনেক দীর্ঘ কাহিনি। সংক্ষেপে বলছি শুনুন।

'সম্রাট বলভটের সিংহাসনে আরোহণের দিন রাজসভায় ঘটে যাওয়া সেই মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার কথা তো সবই জানেন। বস্তুতপক্ষে সেইদিন থেকেই বঙ্গদেশের রাজত্বের ভার এই মহাকূট, মহাধূর্ত, মহাখল মহাসামন্ত প্রকাশচন্দ্রের হস্তগত।

'প্রকাশচন্দ্র প্রথমেই সম্রাট রাজভটের অনুগামীদের এক এক করে নিশ্চিহ্ন করলেন। সম্রাট রাজভটের তিব্বতী মহিষী অকস্মাৎ আত্মঘাতী হলেন। প্রকাশচন্দ্রের পাপকাজের প্রধান অবলম্বন, সম্রাট রাজভটের শ্যালক চারুদত্ত একদিন উধাও হয়ে গেলেন, তাঁর কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না।'

তারপর প্রকাশচন্দ্র উৎকোচে বশীভূত করলেন শীর্ষস্থানীয় বৌদ্ধ আচার্যদের। নিজের বশংবদ অনুগামীদের অধিষ্ঠিত করলেন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে।

'রাজপ্রাসাদের চারদিকে নেমে এল লৌহকঠিন যবনিকা। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সেই সংবাদ বাইরে আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

'কিন্তু বাঙালি অত্যন্ত সংবাদ-উৎসুক জাতি। ভেসে আসতে লাগল, নানা কথা। প্রকাশচন্দ্র আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা নাকি রাজপ্রাসাদের মধ্যে ভয়াবহ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা শুরু করেছেন। সেইসব অদ্ভুত এবং ভয়াবহ ধর্মকৃত্যের বর্ণনা যেমন বিভীষিকাময়, তেমনই আতঙ্কজনক। তার মধ্যে নরবলি থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গে নররক্ত লেপন করে যৌনক্রিয়া, শিশুকাম থেকে শুরু করে সদ্যরজঃস্বলা কিশোরীদের রজরক্ত নিয়ে অদ্ভুত পূজা, অম্বুবাচীর রাত্রে বিধবা নারীদের নিয়ে গণসম্ভোগ...সবকিছুই আছে।

'শুধু কি তাই? মাঝেমধ্যেই নাকি গভীর রাত্রে নারকীয় আর্তনাদ ভেসে আসে প্রাসাদ থেকে। সেই মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কেউ কেউ নাকি দেখেছে, অমাবস্যার মধ্যরাতে অশরীরী ছায়ামূর্তিরা দলে দলে নেমে আসছে রাজপ্রাসাদের ছাদে। আবার কেউ দেখেছে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার

দিনে প্রকাশচন্দ্র নাকি রাজপ্রাসাদের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করে নিজবক্ষে ধারণ করছেন।'

অবিশ্বাসের সুরে জয়াপীড় বললেন, 'এসব গল্পকথা প্রকাশচন্দ্র নিজেই তাঁর অনুগত ভৃত্যদের দিয়ে রটনা করাননি তো?'

'হতে পারে। এসবই শ্রুত, প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যদি ধরেও নিই এসব রটনা, অন্তত একটি ঘটনা আমরা নিশ্চিত সত্য বলেই জানি। অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'কী সেই সত্য?'

প্রৌঢ় আচার্য ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে রইলেন। শেষে মৈরেয় পাত্র নিঃশেষিত করে বললেন, 'যবে থেকে এই নারী রাজপ্রাসাদে এসেছেন, প্রাসাদের অভ্যন্তরে কোনও পশু বা পাখি প্রবেশ করে না। এমনকী প্রাসাদের ওপর দিয়ে কোনও পাখি ওড়ে না। প্রাসাদের ছায়া যেখানে পড়ে, সেখানেও কোনও পশুপাখি বসে না।'

আশ্চর্য হলেন জয়াপীড়, 'আমাদের কাশ্মীর দেশেও অনেকানেক অদ্ভুত লোকশ্রুতি শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন বিচিত্র কথা কখনও শুনিনি আচার্য।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আচার্য, 'স্বচক্ষে দেখা সত্যকে অস্বীকার করি কী করে? অভিশাপ...আর্য জয়াপীড়, অভিশাপ। এই নারীর বেশে এক নারকীয় অভিশাপ নেমে এসেছে এই বঙ্গদেশের বুকে। তাই তো আজ বড় কষ্টে, বড় দুঃখে প্রতিবেশী রাজশক্তির কাছে সাহায্যের ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে।'

'হুম, অবগত হলাম। কিন্তু আচার্য, কে এই নারী? ইনি বঙ্গদেশে এলেন কোথা থেকে? আর আপনারাই বা এঁকে পেলেন কোথায়?'

'আমরা আনিনি, ভ্রাত জয়াপীড়। ইনি নিজে এসেছেন এই দেশে, ঘোর নিয়তি যেমন নেমে আসে শাপগ্রস্ত ভূমির ওপর। এঁকে রাজসান্নিধ্যে এনেছেন প্রকাশচন্দ্র। সেসব অনেক গূঢ় কথা, এখন সেসব প্রকাশের সময় নয়। শুধু জেনে রাখুন—ইনি প্রকাশচন্দ্রের শুধু শিষ্যা নন, স্বয়ং শক্তি, আত্মার আত্মীয়, সাধনসঙ্গিনী। প্রকাশচন্দ্র এঁকে কোথা থেকে পেলেন, বা ইনি কোন বংশের, কোন জাতির, কোন দেশের নারী—সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত।'

'কিন্তু এই সামান্যা নারী সমগ্র বঙ্গদেশের রানি হয়ে উঠলেন কীভাবে?'

'সে এই দীর্ঘ কাহিনির অন্য অর্ধাংশ। কিঞ্চিৎ মনযোগ দিয়ে শুনুন ভ্রাত।

'সম্রাট হওয়ার পর কুমার বলভট বাঁচেননি বেশীদিন। বঙ্গজনের বিশ্বাস, কোনও এক জটিল বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল তাঁকে। তারপর সম্রাট বলভটের শিশুপুত্র, উদীর্ণখড়্গের যে কী হল—সে সংবাদ পাওয়াই গেল না। লোকশ্রুতি, শিশুটিকে মেঘান্দ নদীর জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন প্রকাশচন্দ্র স্বয়ং। বলভটের পত্নী, সম্রাজ্ঞী ঊর্মিমালা শোকে দুঃখে আত্মঘাতী হলেন। কেউ কেউ আবার বলেন, তাঁকে হত্যা করা হয়।

'রাজপুত্র উদীর্ণখড়্গের পর বঙ্গদেশের সম্রাট হন প্রকাশচন্দ্রের জ্ঞাতিভ্রাতা ধর্মচন্দ্র। তখনই এই রানির আবির্ভাব। প্রকাশচন্দ্র এঁর সঙ্গে ভ্রাতা ধর্মচন্দ্রের বিবাহ দেন। যদিও ধর্মচন্দ্রের এক গৃহিণী পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন।'

'সে কী? এই যে বললেন ইনি প্রকাশচন্দ্রের...'

ম্লান হাসলেন আচার্য বুদ্ধগুপ্ত, 'চতুরঙ্গ বোঝেন—আর্য জয়াপীড়? এই চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় কেবলমাত্র একজনই রাজা আর একজনই রানি। প্রকাশচন্দ্র আর এই নারী। বাকি সবাই ক্রীড়নক। ধর্মচন্দ্র নামেই সম্রাট ছিলেন। রানি এবং প্রকাশচন্দ্রের অঙ্গুলিসংকেতে উঠতেন, এবং বসতেন।

'কিন্তু ধর্মচন্দ্রের কপালে রাজভোগ বেশিদিন সহ্য হল না। একদিন হঠাৎ আমরা তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর সংবাদ পেলাম। রাজপ্রাসাদসূত্রে জানানো হল যে উদ্যানে ভ্রমণকালে তিনি সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু...'

‘কিন্তু কী?’

‘বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম যে সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুল।’

‘কেন? আর এই বিশ্বস্ত সূত্রই কে বা কারা?’

‘ততদিনে আমরা, বৌদ্ধ আচার্যরা বুঝতে আরম্ভ করেছি যে কোন মহাপাপ বঙ্গদেশ গ্রাস করতে উদ্যত। আমরা ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হচ্ছি। কয়েকজন সামন্ত ও মহাসামন্ত, যাঁরা খড়্গবংশের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাঁরা গোপনে গোপনে আমাদের সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। রাজপ্রাসাদের কিছু নিম্নস্তরের কর্মচারীকে আমরা স্বর্ণদিনারে বশীভূত করলাম। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজবৈদ্য কুল্লুকভট্টর শিষ্য ও সহায়কসচিব। তাঁর মাধ্যমে যে সংবাদ পাওয়া গেল তা অত্যন্ত চমকপ্রদ।

‘জানা গেল যে, মহারাজ ধর্মচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর কোনও স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল না। মহারাজ এই নারীকে কিছুটা ভয়ই পেতেন। তিনি সচরাচর তাঁর প্রথমা স্ত্রী’র কক্ষেই রাত্রিযাপন করতেন। আর যখন দ্বিতীয়া স্ত্রী’র কক্ষে রাত্রিবাসে যেতেন, তখন নিজের ইচ্ছানুসারে যেতেন না। যেতেন সেই নারীর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে।’

‘সে কী? মহারাজ নিজ ইচ্ছায় তাঁর ধর্মপত্নীতে উপগত হতে পারতেন না?’

‘না। এই নারী মহা-স্বৈরিণী। নিজ কামাগ্নি প্রশমনের প্রয়োজন হলে তবেই ধর্মচন্দ্রকে আদেশ করতেন তাঁর কক্ষে রাত্রিবাস করতে। সেই আদেশ উপেক্ষা করার সাহস মহারাজের ছিল না। তবে এই ঘটনা তখনই ঘটত, যখন প্রকাশচন্দ্র প্রাসাদে অনুপস্থিত থাকতেন।

‘এখানে একটি সত্য রাখা প্রয়োজন। ধর্মচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রীর কক্ষে প্রকাশচন্দ্রের অবাধ যাতায়াত ছিল ও আছে—এই সত্যটি সর্বজনবিদিত। দুজনে নাকি প্রায়শই অর্গলবদ্ধ কক্ষে রাত্রিভর কীসব গুপ্ত অনুষ্ঠান করেন। তখনও করতেন, এখনও করেন।

‘রাজপ্রাসাদের কর্মচারীরা এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রাখতেন। এখানে উল্লেখ করে রাখা ভালো যে সেই বিশেষ গোপন অনুষ্ঠানের সময় কারও, এমনকী স্বয়ং মহারাজেরও নিজের ধর্মপত্নীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি ছিল না।

‘কিন্তু যেদিন মহারাজ ধর্মচন্দ্রের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়, তার ঠিক আগের রাত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছিল। সেদিন কোনও কারণে মহারাজ কিছু উত্তেজিত ছিলেন। সেইরাত্রে তিনি রাজসচিব প্রকাশচন্দ্রের ভবনে বিশেষ দূত পাঠান তাঁকে তাঁর সামনে সেই দণ্ডেই উপস্থিত হওয়ার আদেশ জানিয়ে। দূত ফিরে এসে জানায় যে রাজসচিব এখন তাঁর সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে বিশেষ ধর্মীয় আচারে লিপ্ত, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে রাজসকাশে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব।

‘শেষবার ধর্মচন্দ্রকে দেখা যায় উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর শয়নকক্ষের দিকে উন্মাদের মতো ধেয়ে যেতে।’

‘হুম। পুরুষের যৌনঈর্ষার মতো অন্ধ আবেগ আর হয় না। আর সেই অন্ধ ক্রোধ যদি কোনও ক্ষমতাবান পুরুষের হয়—তবে তো কথাই নেই!’

আচার্য যেন শুনেও শুনলেন না। বলে যেতে লাগলেন, ‘পরদিন প্রভাতে মহারাজ ধর্মচন্দ্রের শয্যায় তাঁর প্রাণহীন দেহ পাওয়া যায়। তাঁর প্রথমা স্ত্রী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁর পাশেই শায়িত ছিলেন।

‘পরিচারকেরা লক্ষ করে যে, মহারাজের কণ্ঠদেশে দুটি বিষদন্তের গভীর ক্ষত। সেই ক্ষতদুটির মধ্যেকার দূরত্ব অস্বাভাবিক রকমের বড়। কোনও বিষধর সর্পের মুখব্যাদান অত বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব। শুধু তাই নয়, ক্ষতদুটিও অস্বাভাবিক গভীর। অমন গভীর দংশন শুধু সর্প কেন, পৃথিবীর কোনও সরীসৃপ বা প্রাণীর পক্ষে সম্ভবই নয়।’

জয়াপীড় তৃতীয় পাত্র শেষ করতে গিয়েও থেমে গেলেন, ‘এর অর্থ?’

'সেই অর্থটাই তো আমরা সবাই খুঁজছি ভ্রাত জয়াপীড়। তবে আপনার আশ্চর্য হওয়ার মতো কারণ এখনও রয়ে গেছে।'

'কী আচার্য?'

'ধর্মচন্দ্রের সমস্ত দেহ নাকি বিষের প্রভাবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল।'

ভ্রুকুঞ্চিত হল জয়াপীড়ের, 'তীব্র বিষপ্রয়োগে দেহ নীলবর্ণ হয় বলে শুনেছি। কৃষ্ণবর্ণ তো কখনও শুনিনি!'

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়। শোনা যায়, মৃতদেহটি দেখে মনে হচ্ছিল যে, মহারাজ বজ্রাঘাতে দেহত্যাগ করেছেন—এতটাই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়েছিল তার দেহ। রাজবৈদ্য কুল্লুকভট্ট নিজেও নাকি মৃতদেহ দেখে এমন আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, মৃতদেহ নিজে স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন, অন্য কাউকেও স্পর্শ করতে নিষেধ করে দেন। শেষে ধর্মচন্দ্রের দুই বিশ্বস্ত দেহরক্ষী বাঁশের মাচায় মহারাজের মৃতদেহটি কোনওমতে তুলে নিয়ে গিয়ে মহাশ্মশানে দাহকার্য সমাধা করে। সেই সময় শ্মশানে অন্য কারও উপস্থিত থাকার অনুমতি দেননি প্রকাশচন্দ্র।'

'কিমাশ্চর্যম! রাজার মৃতদেহের সৎকার হচ্ছে এইভাবে!'

'শুধু তাই নয় ভ্রাত! তদ্যবধি মহারাজ ধর্মচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী কাঞ্চনাদেবীর কোনও সংবাদ নেই।'

'অর্থাৎ?' চমকিত হন জয়াপীড়।

'এই প্রশ্নের উত্তর মাসাধিককাল পূর্বাবধি শুধু আমি কেন, আমাদের কারও কাছেই ছিল না, তবে এখন আছে। সে যাই হোক, শেষাংশ শুনুন আপাতত।

'ধর্মচন্দ্রের পর রাজা হন তাঁর প্রথম স্ত্রীর পুত্র, সদ্যযুবা আনন্দচন্দ্র। অবস্থাটি অনুধাবন করুন একবার। মহারাজ ধর্মচন্দ্রের মৃত্যুরহস্য নিয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে উথালপাথাল চলছে। আনন্দচন্দ্রের মাতৃদেবী উন্মাদপ্রায়। যদিও সেইসবের বিবরণ জনারণ্যে প্রকাশিত হচ্ছে না। বঙ্গজন এক অনভিজ্ঞ সদ্যযুবাকে রাজা বলে স্বীকার করে নেবে কী না সে নিয়েও রাজন্যবর্গ যথেষ্ট সন্দিহান।

'এমন অনিশ্চয় অবস্থার মধ্যেই প্রকাশচন্দ্র বঙ্গরাজনীতির চতুরঙ্গ ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর পরের দান নিক্ষেপ করলেন। তিনি ধর্মচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রী তথা নিজের সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে আনন্দচন্দ্রের বিবাহ দিলেন।'

'সে কী!' ঘৃণায় চোখমুখ বিকৃত করলেন জয়াপীড়, 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই অজাচার আপনারা সহ্য করলেন কী ভাবে? এদেশ থেকে কি সদ্ধর্মের শেষ চিহ্নটুকুও লুপ্ত হয়েছে? বিমাতার সঙ্গে সন্তানের বিবাহ!'

ম্লান হাসলেন বৌদ্ধাচার্য, 'আগেই বলেছিলাম ভ্রাতা, ভঙ্গ বঙ্গদেশের এই চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় কেবলমাত্র একজনই রাজা আর একজনই রানি, বাকি সবাই ক্রীড়নক।'

জয়াপীড়ের চক্ষু ক্রমেই আরক্ত হয়ে উঠছিল। তিনি স্খলিতস্বরে বললেন, 'তারপর? আনন্দচন্দ্রের কী হল?'

'ছয়টি মাস। মাত্র ছয়টিমাস বেঁচে ছিল সেই কিশোর। তারপরেই একদিন তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় তার ধর্মমহিষীর কক্ষদ্বারের ঠিক বাইরে। কণ্ঠে সেই একই বিষদন্ত লক্ষণ। মৃতদেহ সেই একইভাবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। একই ভাবে মার্জার-সারমেয়বৎ দাহসংস্কার।'

উত্তেজিত জয়াপীড় সম্মুখস্থ চতুর্পদীটির ওপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন, 'অসম্ভব ভন্তে, এ অসম্ভব।'

'সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে ভ্রাতা।'

'কে এই নারী, ভন্তে? এত ক্ষমতা ইনি পেলেন কোথা থেকে?'

'কে এই নারী—সে সংবাদ ধীরে ধীরে আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে ভ্রাতা। এ মানুষী-নারী নয়, সাক্ষাৎ কালপিশাচী। প্রকাশচন্দ্র তাঁর নারকী সাধনার বিন্দু বিন্দু দিয়ে এই মহা অনিষ্টকারী রমণী সৃষ্টি

করেছেন। প্রকাশচন্দ্র যেমন চিরযুবক, ইনিও তেমনই চিরযৌবনা। প্রকাশচন্দ্রের মতো ইনিও অদ্ভুত এবং আশ্চর্য অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারিনী। ইনি প্রকাশচন্দ্রের সর্বোত্তম আয়ুধ, ভয়ঙ্করতম খড়্গ, তীক্ষ্ণতম ভল্ল।'

'কিন্তু এসব করে প্রকাশচন্দ্রের লাভ কী? তিনি কী চান?'

'তিনি যে কী চান, এই প্রশ্নের উত্তর আমরাও সন্ধান করে ফিরছি। তা না হলে এই পাপ থেকে বঙ্গভূমিকে মুক্ত করা অসম্ভব। আর শুধু প্রকাশচন্দ্র কেন, তাঁর সঙ্গে আরও ছয় জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী রয়েছেন। মহারানি এই সপ্তরথীবেষ্টিত হয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে বঙ্গভূমি শাসন করছেন। সেই শাসনযন্ত্রের নিপীড়নে দেশের চারিদিকে এখন ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ।'

'আমাকে কী করতে আদেশ করেন ভন্তে?'

জয়াপীড়ের দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেললেন আচার্য। 'আপনার বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডের কথা শুনেছি, মহাবীর জয়াপীড়। যিনি সামান্য ছুরিকাহস্তে একাকী পূর্ণবয়স্ক সিংহশিকারে সমর্থ হন, তাঁর মতো এক দুঃসাহসী এবং বীর যুবাপুরুষ আমাদের প্রয়োজন। আমরা আজ পঞ্চগৌড়েশ্বর মহারাজ জয়ন্তর জামাতা, আসমুদ্রহিমাচলজয়ী মহাবীর ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র, বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের কাছে সেই সাহায্য ভিক্ষা করছি।'

'কিন্তু আমি আর আপনি—দুজনে একত্র হয়ে এই অতিবৃহৎ কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হব?'

'আমরা একা নই ভ্রাত জয়াপীড়। বঙ্গভূমিকে অপশাসন থেকে মুক্ত করার এই মহতী যজ্ঞে আরও অনেকে আমাদের সঙ্গী হয়েছেন।'

'তাঁরা কে বা কারা?'

'সহজিয়া সিদ্ধ সাধকরা। তাঁরা জনগণের নাড়ীনক্ষত্র বোঝেন। অন্ত্যজ, দলিত, নিপীড়িত জনজাতির মধ্যে তাঁদের প্রভাব অসীম। গৌড়বঙ্গের সহজিয়া সিদ্ধরা একত্র হচ্ছেন। দিকে দিকে তাঁদের আহ্বানে একত্রিত হচ্ছে বিদ্রোহী জনসাধারণ। তারা ক্ষোভে, ক্রোধে ফুঁসছে। সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় সমাগত। আজ কালের মধ্যেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন তাঁদের সংগঠন শক্তি নিয়ে। আর তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুই মহাবলশালী পুরুষ সিংহ।'

জয়াপীড় কিছু বললেন না। নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন আচার্যর দিকে।

'সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ আচার্য দয়িতবিষ্ণুর পুত্র খণ্ডিতারাতি বপ্যট এবং তপশ্চর্যায় যিনি আদিদেব মহেশ্বরের সমতুল্য, সেই মহাযোগী লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ।'

স্থির দৃষ্টিতে আচার্যের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন জয়াপীড়। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'পিতামহ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় মহাবীর ছিলেন। স্বীয় বাহুবলে অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিলেন। তাঁর সৈন্যদলের পদভারে মেদিনী কম্পিত হতো। কিন্তু তাঁর জীবনকৃত্যে দুটি অনপনেয় কলঙ্ক ছিল।'

'জানি জয়াপীড়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মদ্যপ অবস্থায় অগ্নিসংযোগে প্রবরদেশ ধ্বংস করা।'

'ঠিক।' সম্মতি জানালেন জয়াপীড়, 'এবং দ্বিতীয়টি বহুদিন যাবৎ আপামর বঙ্গজনের হৃদয়ের রক্তক্ষরণের কারণ। গৃহদেবতা পরিহাসকেশবের নামে শপথ করে তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত বঙ্গাধিপকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করেন, এবং গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁকে ত্রিগ্রামীতে হত্যা করান। এই পাপের ক্ষমা নেই আচার্য। আমার পিতামহ যে একজন ক্রূরকর্মা বিশ্বাসঘাতক, এই চিন্তা আমাকে জন্মাবধি কুরে কুরে খেয়েছে।

'কিন্তু ঈশ্বরের কী অসীম অনুগ্রহ! আজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র জয়াপীড়ের সামনে সুযোগ এসেছে সেই কলঙ্ক অপনোদনের। এ আনন্দ আমি রাখি কোথায়? আমার রক্তে প্রবাহিত বিশ্বাসঘাতকতার দোষ শুদ্ধ হোক। বঙ্গজনের দুঃখ ঘুচে যাক। রামস্বামীর মন্দিরে প্রভুর সম্মানরক্ষার্থে নিহত গৌড়বীরদের আত্মা শান্তি পাক। আচার্য বুদ্ধগুপ্ত, আমি এই সংগ্রামের অংশ হতে পারলে সৌভাগ্যবান মনে করব।'

উঠে দাঁড়ালেন শালিবন বিহারের উপাধিবারিক, বজ্রযোগিনী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত। তারপর স্মিত হাস্যে বললেন, 'তাহলে এসো জয়াপীড়। তোমাকে এই যজ্ঞের ঋত্বিক এবং যজ্ঞযন্ত্রের বাকি

অধ্বর্যুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

রাজ্ঞী আসন গ্রহণ করলে বাকিরা নিজ নিজ আসনে উপবেশন করলেন। মহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্র অত্যন্ত শীতলকণ্ঠে বললেন, 'কাহিনির মূল অংশটি না হয় এই রক্ষীপ্রধানটির থেকেই শোনা যাক, কী বলেন মাননীয় অমিতাভভট্ট?'

প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট সম্মত হতেই সবার দৃষ্টি ন্যস্ত হল অভাগা মানুষটির ওপর।

রক্ষীপ্রধান তার শুষ্ক ওষ্ঠ দুটি লেহন করে নিল প্রথমে। তারপর কম্পিত ও স্তিমিতস্বরে বলা শুরু করল।

'মহাপ্রতীহার আর্য শান্তঘোষের আদেশক্রমে আমরা সসৈন্যে উপস্থিত হয়েছিলাম কমলাঙ্ক গ্রামে। গ্রামটির সন্নিহিত অরণ্যের পাশে বর্বর কিরাতজাতির বাস। তারা যে শুধু বর্বর তা নয়, অত্যন্ত দুর্বিনীত এবং অবাধ্যও বটে। সেই জংলী ইতর প্রাণীগুলি যদি বিনা বাধায় আমাদের কাজ করতে দিত, তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটতই না।'

বাকিরা নড়েচড়ে বসলেন।

'প্রথমে অনেক ধৈর্যের সঙ্গে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী, আমরা কেন এসেছি। দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই যে এই ভৈরবীচক্রের আয়োজন, আর সেই চক্রানুষ্ঠানের জন্যই তাদের কন্যা, মাতা ও ভগিনীদের আশু প্রয়োজন—সে কথাটাও বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বলা হয়। এমনকী ভৈরবীচক্রের পর যে সমস্ত নারীরত্নদের বিপুল কপর্দকরাশি এবং অন্যান্য উপহারসম্ভারের সঙ্গে সসম্মানে প্রত্যর্পণ করা হবে, সে কথাটাও বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছিল।

'কিন্তু বিধি বাম, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। তারা অত্যন্ত উগ্র এবং অসভ্যভাবে আমাদের অপমান করতে থাকে। তার মধ্যে বিবিধ অশ্রাব্য গালি তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল অত্যন্ত অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, আমাদের পরিবারের নারীদের চরিত্র নিয়ে উচ্চারিত কুবাক্য, এমনকী কেউ কেউ বড় বড় পাথরের টুকরো এবং গাছের ডাল হাতে আমাদের হুমকি দিতে থাকে। শুধু কি তাই? দু-একজন অতি অবাধ্য কিরাত আমাদের সঙ্গীদের ওপর থুতু ছিটোতে থাকে, এমনকী কয়েকজন তো আমাদের সঙ্গীদের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়ে নেবে বলে তর্জন করতে থাকে।

'অতএব নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাদের মৃদু বলপ্রয়োগ করতে হয়। মৃদু বলতে খুবই মৃদু। ওই অতি সামান্য বলপ্রয়োগে মনুষ্যশরীরে সাধারণ ক্ষতসৃষ্টি ছাড়া আর অন্য কোনও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই নেই।'

এই পর্যন্ত বলে অপরাধী দৃষ্টিতে চারিদিক একবার দেখে নিল গ্রামরক্ষী। প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'তারপর?'

'কিন্তু ওই দুর্বিনীত কিরাতদের কথা কী বলব প্রভু, তাদের বিবেচনাবোধ বলতে কিছুই নেই? আমরা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সামান্য ভল্ল এবং তরবারি চালনা শুরু করেছি কী করিনি, ওদের ওই গোষ্ঠীপ্রধান বৃদ্ধ অলম্বুষটিকে নিতান্ত অবিবেচকের মতো এর মধ্যে পড়ে নিহত হতেই হল? নিহত হওয়ার একটা পূর্বাপর বোধ নেই? সময় অসময় জ্ঞান নেই? এমনকী তার সঙ্গে তার শিশু পৌত্রটিও যে নিহত হবে...'

'কীরকম? বৃদ্ধটি যে দেহত্যাগ করল—সে না হয় বোধগম্য হল। কিন্তু শিশুটি কী করে...' জিতসেনের প্রশ্নটি অর্ধোক্তই রয়ে গেল।

'দৈব প্রভু, দৈবই প্রবল সর্বত্র।' গভীর আক্ষেপের সঙ্গে মাথা নাড়ল গ্রামরক্ষকটি, 'এক্ষেত্রেও শিশুটির দৈবই তাকে আকর্ষণ করে এনেছিল তার মৃত্যুর দিকে। যখন আমাদের রক্ষীদলের কুমার যোগেন্দ্র ক্রোধবশত তার ভল্লটি গ্রামপ্রধান বৃদ্ধের বক্ষের দিকে চালনা করে, তখন সেই বৃদ্ধ নিতান্ত মূর্খের মতো তার শিশুপৌত্রকে নিজবক্ষে ধারণ করে ছিল। ফলে ভল্লটি প্রথমে সেই শিশু...এবং তারপর বৃদ্ধটির...'

ভ্রূকুঞ্চন করলেন অগ্নিমিত্র, 'বৃদ্ধটি তার শিশুপৌত্রকে বক্ষে ধারণ করে এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল? আমাদের তাই বিশ্বাস করতে হবে?'

সামান্য ইতস্তত করল রক্ষীপ্রধান। তারপর বলল, 'না, ঠিক তা ঘটেনি। বৃদ্ধ যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়নি, সে কথা সত্য। এমনকি সে যে অসুস্থ অবস্থায় কুটিরের অভ্যন্তরে নিজের পৌত্র ও পৌত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণ করছিল— সেও সত্য। মহাবীর, মহাবলশালী কুমার যোগেন্দ্র নিতান্তই যৌবনমদমত্ত হয়ে সেই কুটিরে প্রবেশ করে...'

'শিশুপরিবেষ্টিত বৃদ্ধটিকে হত্যা করে, তাই তো?'

রক্ষীপ্রধানের অস্বস্তি চতুর্গুণ বেড়ে যায়। সে ধীরে ধীরে বলে, 'বলপ্রয়োগের সময় সর্বদা লক্ষ থাকে না যে...'

'বল কোথায় প্রয়োগ করা হচ্ছে, মহামান্য রক্ষীপ্রধান?' সামান্য ব্যঙ্গাত্মক সুরে প্রশ্ন করেন আনন্দগুপ্ত।

মরিয়া হয়ে ওঠে রক্ষীপ্রধান, 'কিরাতদল এমনই অসভ্যতা করছিল প্রভু—যে কী বলব! আর গালিবর্ষণের তো ইয়ত্তা ছিল না, সেসব অশ্লীল কুবাক্য আমি আপনাদের সামনে উচ্চারণও করতে পারব না। নেহাত বাধ্য হয়েই...অর্থাৎ কি না সামান্য উত্তেজিত হয়েই মহাবীর যোগেন্দ্র...'

'এই কর্মটি ঘটিয়ে ফেলেছে, তাই তো?'

দ্রুত সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে রক্ষীপ্রধান।

'তারপর? তারপর কী হল?' সামান্য ঝুঁকে শীতলস্বরে প্রশ্ন করলেন প্রকাশচন্দ্র। সেই স্বর শুনে রক্ষীপ্রধানের অস্বস্তি বহুগুণ বর্ধিত হয়। সে জানে না এই স্বরের মধ্যে কী আছে, কিন্তু শুনলেই এক অপার্থিব ভয়ের অনুভূতি আচ্ছন্ন করে শ্রোতাকে।

'তারপর প্রভু আমরা যখন আপনার আদেশানুসারে কয়েকজন যুবতী ও কিশোরীকে কেশাকর্ষণ করে নিয়ে আসছি, ঠিক তখনই...

গোপালদেব অকুস্থলে পৌঁছতেই এক অভূতপূর্ব নারকীয় দৃশ্যের সম্মুখীন হলেন।

কিরাতদের বসতির সামনে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ বলা ভুল, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল ভীম আক্রোশে ছারখার করে দিচ্ছে কিরাতদের ক্ষুদ্র বসতিটি। কিরাতপুরুষেরা বলশালী বটে, কিন্তু তাদের অন্ধ ক্রোধের উদ্গিরণ এবং সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাই তারা ছত্রভঙ্গ, প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্যর্থ। ওদিকে একটি অপেক্ষাকৃত বড় পর্ণকুটিরের সামনে থেকে হাহাকার এবং কান্নার আর্তনাদ ভেসে আসছে। কুটিরের সামনে দুটি মৃতদেহ শায়িত, একটি এক বৃদ্ধের, অন্যটি এক শিশুর।

গোপালদেব শান্তচোখে একবার বামদিকে আর একবার ডানদিকে তাকালেন। তারপরেই তাঁর চোখে পড়ল যে সৈন্যদের একটি ছোট অংশ কয়েকজন কিরাতরমণীকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

গোপালদেব চিরকালই লক্ষ করে এসেছেন যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে দেহে মনে এক আশ্চর্য প্রশান্তি অনুভব করেন তিনি। তাঁর স্নায়ু শান্ত ও ধীর হয়ে আসে, হাত এবং পায়ের পেশি লঘু অথচ শক্ত হয়ে ওঠে। আর আর হাতের খড়্গটিকে দেহের অংশ বলেই মনে হয়। মনে হয় যেন তারও প্রাণ আছে, আর সেই প্রাণবন্ত খড়্গ তার প্রভুর জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের রক্তপানেও পশ্চাৎপদ হবে না।

গোপালদেব তাঁর মহাখড়্গ কোষমুক্ত করলেন।

তাঁর একটু সামনে এক সৈন্য একটি কিশোরীকে চুল ধরে টেনে নিয়ে আসছিল। কিশোরীটির আর্তনাদ আর বুকফাটা কান্নায় কর্ণপাত করার কেউ নেই। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গের বল্কলটিও প্রায় যায় যায়।

কিশোরীটি একহাতে তার লজ্জাস্থান রক্ষার চেষ্টায় রত, আরেক হাত দিয়ে সেই সৈনিকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সৈনিকটি ঈষৎ মদমত্ত তো ছিলই। দুর্বলের ওপর অত্যাচারের মধ্যেও উত্তেজক আনন্দও আছে। সে পৌরুষকণ্ঠে কিশোরীর অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য নিয়ে ক্রমাগত অশ্লীল কুবাক্য উচ্চারণ করে যাচ্ছিল। বোধকরি সেই আক্রোশই তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই সে যখন দেখল তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে এক বলশালী যুবক, আর তার হাতে এক ভীমদর্শন খড়্গ, তখনও সে নিজের আশু সর্বনাশকে চিনে নিতে পারেনি। হুঙ্কার দিয়ে সে বলল, 'কে রে তুই? কোন সাহসে চন্দ্রসৈন্যের পথরোধ করিস?'

যুবক শান্তস্বরে বললেন, 'মেয়েটাকে ছেড়ে দে।'

সৈন্যটি উচ্চৈঃস্বরে হেসে বলল, 'বাহবা, বাঃ! বড়ই মজার কথা। আর যদি ছেড়ে না দিই?'

যুবকটি শান্তস্বরে বলল, 'তোর পক্ষে ভালো না-ও হতে পারে।'

দাঁতে দাঁত ঘষল উন্মত্ত সৈনিক। 'যদি এই মেয়েটিকে ছেড়ে দিই, তাহলে ভৈরবীচক্রের অগ্নিকুণ্ডটা জ্বালানো হবে কোথায়? তোর মাতৃদেবীর যোনিদেশে?'

যুবকটির চক্ষুদুটি সামান্য জ্বলে উঠেই শান্ত হল। তারপর বলল, 'কথাটা ভেবে বলিস। আমার মাতৃদেবী কিন্তু বয়সে তোরও মাতৃদেবীর মতোই হবেন।'

রাক্ষসের মতো হেসে সৈন্যটি বলল, 'হা হা হা। আমার মায়ের মতন? শোন রে রণ্ডাপুত্র, তোদের মা আর আমাদের মা আর এক নয়। তোদের ধর্ম আর আমাদের ধর্ম এক নয়। তোদের রক্ত আর আমাদের রক্ত এক নয়। নিজেদের অপবিত্র রক্তকে আমাদের রক্তের সঙ্গে তুলনা করিস না, ফল ভালো হবে না।'

যুবকটি শান্তস্বরে প্রশ্ন করল, 'কী রকম?'

'আমরা, প্রকাশচন্দ্রের অনুগামী রাজসেবকরা প্রভুর চরণকমলে নিজেদের উৎসর্গ করে দীক্ষিত হয়েছি, নিজেদের পাপজন্ম শুদ্ধ করেছি। আমরাই এই পৃথিবীর একমাত্র শুদ্ধতম জাতি, ঈশ্বরের অনুপ্রেরিত বিশেষ গোষ্ঠী। আমাদের পাঠানো হয়েছে বঙ্গদেশ শাসনের জন্য। আমাদের রক্ত পুণ্য, আমাদের উদ্দেশ্য পুণ্য, আমাদের তরবারি পুণ্য। সর্বোপরি—আমাদের সঙ্গে আছেন সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীপ্রকাশচন্দ্র। তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য বিশেষ পুরুষ।'

'আর যারা তোদের বিরুদ্ধে?' খড়্গখানি দৃঢ়ভাবে ধরে প্রশ্ন করলেন গোপালদেব।

'আমরা তাদের মানুষ বলে মনে করি নাকি?' ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করল সেই রক্ষী, 'যারা আমাদের পক্ষে থাকে, একমাত্র তাদেরই আমরা মানুষ বলে মানি। আর যারা আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ—তাদের প্রত্যেকে আমাদের শত্রু। তাদের আমরা কীটপতঙ্গের বেশি মনে করি না। তাদের পুরুষেরা অবশ্যবধ্য, তাদের নারীরা আমাদের যৌনদাসী হওয়ার জন্যেই জন্মেছে। তাদের শিশুরা জন্ম হতেই আমাদের দাস হওয়ার জন্য বলিপ্রদত্ত। তুইও তাদের মধ্যে একজন রে মূর্খ। তোদের নারীরা জন্মমাত্রেই আমাদের ভোগ্য। তাই তোর অপবিত্র বংশজাত বেশ্যাটিকে মা বলে মানতে...'

মুহূর্তের ভগ্নাংশে গোপালদেবের হাতে উত্তোলিত হল তাঁর মহাভৈরব খড়্গ।

রক্ষীপ্রধানটি বসতির মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ধ্বংসযজ্ঞটি উপভোগ করছিল। আহা, আজকের অভিযানটি সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আশা করা যায়, প্রভু পরমেশ্বর প্রকাশচন্দ্র নিশ্চয়ই প্রীত হবেন। আর লুণ্ঠিত নারীদের কিছু অংশ কি সে নিজেও পাবে না? লুণ্ঠনের অংশ গ্রহণ করা তো প্রভু প্রকাশচন্দ্রের অনুমত্যাদেশের মধ্যেই রয়েছে।

রক্ষীপ্রধান সহসা লক্ষ করল একটি যুবতী নারী প্রাণভয়ে তার পর্ণকুটিরের মায়া ত্যাগ করে অরণ্যের দিকে ধাবমান। হাতের ভল্লটি তুলে সে অনুগত একজন রক্ষীকে সেদিকে নির্দেশ করতেই কী যেন একটি গোলাকার বস্তু আকাশপথে উড়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল।

মাথা নীচু করল রক্ষীপ্রধান। তার পায়ের কাছে একটি বাদ্যছিন্ন নরমুণ্ড! আর সেই মুণ্ড আর কারও নয়, তারই বাহিনীর এক রক্ষীর।

প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল রক্ষীপ্রধান। তারপরেই সে দুরন্ত ক্রোধে চিৎকার করে উঠল, 'কার এই দুঃসাহস? কে হাত তুলেছে চন্দ্রসৈন্যের ওপর? কার ঘাড়ে একটার বেশি মাথা?'

সামান্য দূর থেকে ভেসে এল, 'যুদ্ধ তো সমানে সমানে হয় শুনেছিলাম রে নপুংসক। নাকি চন্দ্রবংশের সৈন্যদল এতই ক্লীব যে, বৃদ্ধ আর নারী ছাড়া আর কারও সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই তাদের?'

রক্ষীপ্রধান সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল অনতিদূরে এক মহাবল পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে ধরা মহাখড়্গটি থেকে তখনও চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত, আর পায়ের কাছে একটি মুণ্ডহীন দেহ।

উন্মত্ত ক্রোধে রক্ষীপ্রধানের দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। তারপরেই সে সরোষে চিৎকার করে উঠল, 'ওরে! কে কোথায় আছিস? এই রণ্ডাপুত্রটার ঘাড় ধরে আমার সামনে নিয়ে আয়! এর বীর হওয়ার ইচ্ছেটা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিই। শয়তানটার এত স্পর্ধা যে, চন্দ্রসৈন্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে?'

গোপালদেবের সবচেয়ে কাছে থাকা রক্ষীসৈন্যটি ভল্লহাতে ধাবিত হল তাঁর দিকে। গোপালদেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, খড়্গটি তুলে অবধি ধরলেন না। তারপর যে মুহূর্তে সৈন্যটি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তিনি তড়িৎগতিতে সরে গিয়ে সৈন্যটির ভল্ল বাঁহাতে ধরে আশ্চর্য কৌশলে সেই ভল্লটিরই অগ্রভাগ সম্পূর্ণরূপে গেঁথে দিলেন সৈন্যটির কণ্ঠদেশে।

বাকি রক্ষীসৈন্যরা অবিশ্বাসের চোখে সম্পূর্ণ ঘটনাটি দেখল। তারপর হিংস্র জংলি কুকুরের দল যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রুদ্ধ সিংহের উপর, সেইভাবেই উন্মুক্ত তরবারি এবং ভল্ল হাতে তারা ধেয়ে গেল গোপালদেবের দিকে।

গোপালদেব খড়্গটি তুলে রণহুংকার দিলেন, 'জয় গৌড়, জয় বঙ্গ, জয় শশাঙ্ক।'

তারপর যেভাবে সর্বগ্রাসী হুতাশন শুষ্ক তৃণভূমি দগ্ধ করে, সেভাবেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন সৈন্যদলের উপর।

'একাই তিনি সমগ্র রক্ষীদলকে ধ্বংস করলেন?' আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি বললেন, 'এ যে অবিশ্বাস্য!'

'সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটিই তো নিজের চোখের সামনে হতে দেখলাম ভন্তে। সে কোনও সাধারণ যুবক নয়। যেমন অদ্ভুত তার অস্ত্রচালনা, তেমনই আশ্চর্য তার যুদ্ধকৌশল। শুধু তাই নয় প্রভু, তার দুই বাহুতে যেন অযুত মত্তহস্তীর বল, আর ক্ষিপ্রতায় সে মহানাগ, মহাকালসর্প। দেখে মনে হচ্ছিল—যেন স্বয়ং পরশুরাম অবতীর্ণ হলেন।'

'কে এই যুবক?' প্রশ্ন করলেন জিতসেন।

'জানি না প্রভু।'

'কিন্তু সে তোমাকেই বা ছেড়ে দিল কেন রক্ষী?' এই প্রথম কথা বলে উঠলেন রাজ্ঞী। তাঁর কণ্ঠ সুমিষ্ট, অথচ কঠিন। চক্ষুদুটি সুন্দর, কিন্তু পলকহীন। তাঁর দিকে অধিক সময় চেয়ে থাকা যায় না। রক্ষীটি একবার রানির দিকে তাকিয়েই মাথা নত করে ফেলল।

'আর তুমিই বা কোন মুখে লগুড়াহত সারমেয়র মতো ফিরে এলে? তোমার শাস্তির ভয় নেই?' হিসহিস করে উঠলেন রানি।

'আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম দেবী।'—রক্ষীর স্বর কম্পিত হচ্ছিল, 'কিন্তু, সেই যুবকের অতিলৌকিক যুদ্ধপ্রতিভার কাছে পরাস্ত হতে বাধ্য হই। বিশ্বাস করুন দেবী, আমাদের সব কৌশল, সমস্ত পরাক্রম, সেই মহাবলীর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে।'

'সত্য বলো রক্ষী, তোমার সঙ্গে তার কোনও ষড় নেই তো? রাজদ্রোহের শাস্তি জানো তো?' বিষাক্ত মসৃণ স্বরে প্রশ্ন করলেন রানি।

বঙ্গদেশে রাজদ্রোহিতার শাস্তি অতি ভয়ঙ্কর। কর্মান্তবাসকের পশ্চিমপ্রান্তে একটি মস্ত বড় অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ আছে। তার সঙ্গে দুটি ছোট খাঁড়ি বরাবর মেঘান্দর যোগ রয়েছে। সেখানে প্রকাশচন্দ্র তাঁর অত্যন্ত পছন্দের একটি জলচর প্রাণী পোষেন, কুমির। বঙ্গদেশে রাজদ্রোহিতার একটাই শাস্তি, অপরাধীকে সেই হ্রদে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে দেওয়া। প্রকাশচন্দ্র চান—মানুষ মনে রাখুক, রাজদণ্ড কতটা নির্মম হতে পারে।

'সত্যি কথা বলো রক্ষী। তুমি জানো না—কে এই যুবক?'

'জানি না দেবী। আমার প্রয়াত মাতার নামে শপথ করে বলছি। অবশ্য...অবশ্য...আমি সংজ্ঞাহীন হওয়ার পূর্বে একটি কথা শুনেছিলাম।'

'কী? কী শুনেছিলে?'

'সেই যুবক যোগেন্দ্রর মুণ্ডু একটি ভল্লের আগায় গেঁথে আমার সামনে এনে বলেছিল, 'শোন রে মূর্খ, তোকে জীবন দিলাম একটিই কারণে। যাতে তুই ফিরে গিয়ে তোর প্রভুকে বলতে পারিস—বপ্যটপুত্র গোপালদেব এসেছেন!'

ঘর্ঘরধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করে সুসজ্জিত রথখানি কর্মান্তবাসকের উত্তরদ্বারে এসে পৌঁছতেই বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। নগরীতে প্রবেশের জন্য অপেক্ষমান জনতার অনেকেই ফিরে দেখতে থাকলেন।

বহুমূল্য রথখানি বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত। দুখানি স্বাস্থ্যবান কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব তার বাহন। এই প্রাণীটি বঙ্গদেশে একেবারে অদৃষ্টপূর্ব না হলেও অনেকের কাছেই কৌতূহলের বিষয়।

তবে সমবেত জনতা অধিক মনোযোগী ছিল রথারূঢ় যুগলের প্রতি। সুঠামদেহী তাম্রবর্ণ পুরুষটি পরেছেন অতি দুর্মূল্য চীনাংশুক। নাসিকা সামান্য খর্ব, আয়ত নয়ন ভারি মনোহর। আজানুলম্বিত বাহু। ঈষৎ কুঞ্চিত কেশদাম।

নারীও অপরূপ সুন্দরী। তাঁর গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। নাসা সুউন্নত। আঁখি গভীর ও শান্ত। সর্বাঙ্গে কমনীয়তা স্নিগ্ধ জ্যোতির মতো জড়িয়ে রয়েছে। সমবেত জনতা তাঁকে দেখেই যুক্তকরে প্রণাম জানাচ্ছে, মৃদু গুঞ্জন উঠে আসছে, 'ইনি নিশ্চয়ই কোনও উচ্চবংশের মহিয়সী। আহা, কী অসামান্য রূপমাধুরী, কী স্নিগ্ধ লাবণ্য! এমন দেবীদর্শনেও অশেষ পুণ্য।'

পুরুষটি মহিলার কানে কানে কৌতুকস্বরে বললেন, 'আর্যা মন্দার্ভা, শিশুকালে শুনেছিলাম সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। আজ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। আপনার একবার শুধু যোদ্ধবেশ ধারণ করে উন্মুক্ত খড়্গহস্তে রণভূমিতে আবির্ভূত হওয়ার অপেক্ষা। জনগণ 'জয় দেবী চামুণ্ডা' বলে আপনার পদতলে লুটিয়ে পড়বেই।'

নারী স্মিতহাস্য ওষ্ঠে ধরে রেখে বললেন, 'বাচালতা করবেন না, আর্য পদ্মসম্ভব। লোকেশ্বর যা আদেশ দিয়েছেন, যথাযথ পালনের ব্যবস্থা করুন। আর হ্যাঁ, অভিনয়ের প্রয়োজনে যতটা কাছে আসা প্রয়োজন ঠিক ততটাই আসবেন, তার বেশি নয়।'

পুরুষটি কপট হতাশার ভঙ্গি করলেন। ততক্ষণে রথ দ্বারপালের সামনে এসে পৌঁছেছে।

স্থূলোদর দ্বারপাল অতি মনোযোগ সহকারে চন্দ্রবংশের চিহ্নলাঞ্ছিত চতুষ্কী প্রস্তুত করছিল। শকট সামনে এসে দাঁড়াতে সে অলসভাবে জিজ্ঞেস করল, 'মহাশয়ের পরিচয়?'

পদ্মসম্ভব গম্ভীরভাবে বললেন, 'উড্ডীয়ানের শ্রেষ্ঠী আর্য কমলরক্ষিত এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী পদ্মাবতী।'

'এখানে আগমনের উদ্দেশ্য?'

‘বাণিজ্য। এই অপরূপ বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপরি প্রাপ্তি। আসলে...’ বলতে বলতে মন্দর্ভাকে কিছু কাছে টেনে নিলেন পদ্মসম্ভব, ‘আর্যা সদ্য গর্ভবতী হয়েছেন। তাই তাঁকেও নিয়ে এসেছি।’

মন্দর্ভা দ্বারপালের দিকে একটি সলজ্জ হাস্য উপহার দিলেন। তারপর অপাঙ্গে যে দৃষ্টিতে পদ্মসম্ভবের দিকে তাকালেন, তাতে সত্যযুগ হলে সেই মুহূর্তেই পদ্মসম্ভবের দেহভস্ম বাতাসে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা।

দ্বারপাল বলল, ‘কামরূপে আজকাল এরকম তেজিয়ান অশ্ব পাওয়া যাচ্ছে নাকি?’

পদ্মসম্ভবের হাসি বিস্তৃত হল। বললেন, ‘কামরূপের অনেককিছুই তো বঙ্গদেশের আপাত অজানা।’

দ্বারপাল এতক্ষণ মাথা নীচু করে ছিল। মুখ তুলেই চমকিত হয়ে লাফিয়ে উঠল ‘আপনি? এখানে? আর্যা মন্দর্ভা? আপনিও?’

মন্দর্ভা হতচকিত। মুহূর্তমাত্র দৃষ্টিপাত করেই পদ্মসম্ভব রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্বারপালের গলা জড়িয়ে বললেন, ‘মিত্র মল্ল সিংহোদর! তুমি এখানেও!’

তারপর মন্দর্ভার উদ্দেশে উচ্চস্বরে বললেন, ‘কী সৌভাগ্য প্রিয়ে, প্রাক্তন মিত্র সিংহোদরকে যে ফিরে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। নালন্দায় পঠনপাঠনের দিনগুলিতে ওর সঙ্গে কতই না সুমধুর দিন কাটিয়েছি। মনে পড়লেই চোখদুটি ভিজে উঠছে। তাই না ভাই সিংহোদর?’

সিংহোদর বলল, ‘সে আর বলতে?’ তারপর বলল, ‘আপনি এখানে কী মনে করে প্রভু?’

‘ধরে নাও যা বললাম তাই। এই দেশের সৌন্দর্য অবলোকন।’

একবার চারিপাশ দেখল সিংহোদর। তারপর চাপাস্বরে বলল, ‘আপনারা একাই? না কি আচার্য শান্তরক্ষিতও এসেছেন?’

‘গুরু বিনা কি শিষ্যের ভ্রমণ সফল হয়?’

‘কোথায় তিনি?’

পদ্মসম্ভব স্মিত হাসলেন।

মল্ল সিংহোদর কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, ‘দিনকাল ভালো নয় আর্য। এইসময়ে আর্যাকে নিয়ে বঙ্গদেশ ভ্রমণে এসে ভালো করেননি।’

‘ভালো নয়? কীরকম?’

সিংহোদর অস্ফুটে বলে, ‘এ দেশের অবস্থার ব্যাপারে কি কিছুই শোনেননি?’

‘শুনেছি বইকি। সেই জন্যই তো আসা।’

সিংহোদর কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপরেই তার চোখেমুখে অস্থির উত্তেজনা ফুটে উঠল। ‘আশা কি আছে প্রভু? এই পাপিষ্ঠার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব?’

পদ্মসম্ভব গভীর চোখে মল্ল সিংহোদরের দিকে চাইলেন। ডান হাতটি তার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, ‘আমার ওপর বিশ্বাস আছে ভাই সিংহোদর?’

‘আছে প্রভু।’

‘তাহলে শোনো। পৃথিবীতে আজ অবধি এমন কোনও শৃঙ্খল নির্মিত হয়নি—মানুষ যা ছিঁড়তে পারে না। এমন কোনও কারাগার প্রস্তুত হয়নি—মানুষ যা ভাঙতে পারে না। এমন কোনও অত্যাচারী জন্ম নেয়নি—মানুষ যাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না।’

মল্ল সিংহোদর জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকে পদ্মসম্ভবের দিকে।

‘সঙ্গে আছ, মল্ল সিংহোদর?’

‘আছি প্রভু।’

পদ্মসম্ভব তাঁর কানে কানে কিছু একটা বললেন। শুনতে শুনতে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মল্ল সিংহোদরের।

রাত্রির তৃতীয় যাম। রাজপ্রাসাদ অন্ধকার। আকাশে মেঘ। তমসাবৃত চরাচর। শুধু মৃদুমন্দ হাওয়ায় অলিন্দের শূন্য পিঞ্জর থেকে টুংটাং ধ্বনি ভেসে আসছে।

চন্দনপালঙ্কে রতিক্লান্ত দুই নরনারী। পুরুষের বুকে মাথা রেখে নারীটি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। একসময় অস্ফুটস্বরে বললেন, 'আপনাকে এত বিক্ষিপ্ত লাগছে কেন প্রভু?'

প্রকাশচন্দ্র রানির চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আমি অত্যন্ত চিন্তিত।'

'কারণ জানতে পারি প্রভু?'

অন্ধকারেই ম্লান হাসলেন প্রকাশচন্দ্র। এই নারী তাঁর আত্মার অংশ। যেদিন এই কন্যাকে তিনি নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, সে বড় পুণ্যের দিন ছিল। সেইদিন থেকে তাঁর জীবনে একের পর এক সাফল্য করায়ত্ত হয়েছে অনায়াসে। তন্ত্র ও মন্ত্রের জগতে এমন কোনও বিদ্যা নেই—যা তাঁর অধিগম্য নয়। এই নারীকে তিনি নিজের সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে সঙ্গে সঙ্গে রেখেছেন। মুহূর্তমাত্র নিজের থেকে আলাদা হতে দেননি।

ডান বাহু ললাটে রাখলেন প্রকাশচন্দ্র, আজকাল প্রায়শই কারণে অকারণে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছেন তিনি। এ কি বার্ধক্যের লক্ষণ?

তাং সম্রাট গাওজং এর প্রিয়তমা রক্ষিতা, চীন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম তন্ত্রবেত্তা য়ু জেতিয়ান ছিলেন তাঁর গুরুমাতা। তাঁর আশীর্বাদে আজ তিনি প্রলম্বিত যৌবনের অধিকারী। একমাত্র অপঘাত বা দুর্ঘটনা ব্যতীত তাঁর মৃত্যু নেই, গুরু য়ু জেতিয়ান এই বরও দিয়েছেন তাঁকে। তবুও এক অচেনা দুর্লক্ষণ ক্রমেই শঙ্কিত করে তুলছে মহাতান্ত্রিক প্রকাশচন্দ্রকে।

তাঁর জন্ম বঙ্গদেশের এক কায়স্থ পরিবারে। পিতা দিবানাথ ছিলেন চন্দ্রবংশের অধীনস্থ এক ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী। চন্দ্রবংশ তখন খড়্গারাজের অধীনস্থ এক সামন্তবংশ। দিবানাথ এক গ্রাম্য শৈবসাধক ছিলেন। বিবিধ শৈব সাধনায় তাঁর সিদ্ধাই ছিল। কিছুটা তার জোরে, এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভর করে তিনি চন্দ্রবংশের সিংহাসন দখল করেন। তবে শাসক হিসেবে অযোগ্য ছিলেন না। লোকে বলে দিবানাথ ন্যায়পরায়ণ এবং সুশাসক ছিলেন।

কিন্তু বহুদিন অপুত্রক ছিলেন দিবানাথ। উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর রাজত্ব কে দেখবে—সেই নিয়ে সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন তিনি। তারপর একদিন এক অঘোরী সিদ্ধপুরুষ তাঁর রাজ্যে আসেন। তাঁকে সেবায় তুষ্ট করলে তাঁর যোগমন্ত্রে দিবানাথের মহিষী গর্ভবতী হন। দিবানাথ আনন্দের বশে রাজ্যে তিন দিনের উৎসব ঘোষণা করেন।

এত কিছুর পরেও দিবানাথের আনন্দ স্থায়ী হয়নি।

নবজাতক যখন জন্মায় তখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ চলছিল। প্রকাশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে রাজপ্রাসাদের মাথার ওপর উড়তে দেখা যায় শ্যেন ও গৃধ্র, শোনা যায় রাসভ ও শৃগালের সমবেত উল্লাসধ্বনি।

এতগুলি অমঙ্গল চিহ্ন দেখে রাজ্যের মানুষ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। রাজজ্যোতিষী ঘোষণা করেন যে এই শিশু অত্যন্ত অশুভ, চন্দ্রবংশ ও দেশের অশেষ দুঃখের কারণ হবে। সভাসদ এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারীরা দিবানাথের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন শিশুটিকে ত্যাগ করার জন্য।

অবশেষে দিবানাথ নবজাতক শিশুপুত্রকে ত্যাগ করেন। তাঁর এক আত্মীয় অনন্তচন্দ্র ছিলেন হরিকেলের সম্পন্ন ব্যবসায়ী। অনন্তচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর কোনও সন্তান ছিল না। দিবানাথ তাঁর সদ্যোজাত পুত্রসন্তানটিকে

তুলে দেন তাঁদের হাতে। জীবনে তিনি তাঁর পুত্রের মুখদর্শন করেননি।

অল্প বয়স থেকেই প্রকাশচন্দ্র আশ্চর্য এবং অদ্ভুত সব ক্ষমতার পরিচয় দিতে থাকেন। বোঝা যায় যে, তিনি কোনও সাধারণ শিশু নন।

প্রকাশচন্দ্রের পালক মাতা কামিনীদেবী ছিলেন একজন ডাকসিদ্ধা যোগিনী। তিনি শিশুবয়সেই প্রকাশচন্দ্রকে তন্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত করেন। তিনি জানতেন, এই শিশুর শরীরে রাজলক্ষ্মণ আছে।

প্রকাশচন্দ্র যখন পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর, তখন অনন্তচন্দ্র যবদ্বীপে বাণিজ্য করতে যাবেন বলে সপ্তডিঙা নৌবহর সাজান। প্রকাশচন্দ্র পালকপিতাকে অনুরোধ করলেন তাঁকেও সঙ্গে নেওয়ার জন্য। অনন্তচন্দ্র সম্মত হলেন।

নৌযাত্রা যখন প্রায় শেষের পথে, সহসা দেখা দিল প্রবল ঘূর্ণিঝড়। শান্ত ধীর সমুদ্র ফুঁসে উঠল সহস্রশীর্ষ অজগরের মতো। সেই প্রবল বিপর্যয়ে অনন্ত সওদাগরের নৌকাগুলি যে কোথায় কোনদিকে ছিটকে পড়ল, কে জানে। জ্ঞান ফিরতে প্রকাশচন্দ্র দেখলেন তিনি সমুদ্রতীরে শুয়ে আছেন। একা। আশেপাশে আর কেউ নেই।

মনে নেই সেই কবে, কত হাত আর কত দেশ ঘুরে তিনি পৌঁছে যান এক আশ্চর্য দেশে। সুপ্রাচীন সভ্যতার চিন দেশ। ততদিনে হয়তো নিজের অধীত ভৌমবিদ্যার বলে নিজেকে মুক্ত করে দেশে ফিরে আসতে পারতেন প্রকাশচন্দ্র। কিন্তু অজানাকে জানার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

চীনে পৌঁছে বিস্মিত হতবাক প্রকাশচন্দ্র। বঙ্গদেশের থেকেও বহুগুণে বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ এদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম। তখন তিনি ক্রীতদাস।

ক্রীতদাস প্রকাশচন্দ্র রাজ পরিবারের পরিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর নিজগুণে তাং বংশের সম্রাট গাওজং-এর প্রিয়তম উপপত্নী য়ু জেতিয়ানের নজরে পড়েন তিনি। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর বঙ্গজ সৌকুমার্যও যথেষ্ট সহায় হয়েছিল। মহান সম্রাজ্ঞী য়ু জেতিয়ান, চীন দেশের প্রথম নারী শাসক য়ু জেতিয়ান, সমগ্র চীনদেশের শ্রেষ্ঠ তন্ত্রবিদ য়ু জেতিয়ান তাঁর সবটুকু ছিলেন। তাঁর মাতা, তাঁর প্রভু, তাঁর আত্মার আত্মীয়, এমনকী তাঁর প্রেমিকাও। য়ু জেতিয়ান তাঁকে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিলেন।

'কী ভাবছেন প্রভু?' প্রশ্ন করলেন রানি।

'কিছু একটা ঘটতে চলেছে প্রিয়ে। খুব বড় একটা কিছু!'

'কেন প্রভু? এরকম মনে হচ্ছে কেন?'

'আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রিয়ে। সে কখনও মিথ্যা বলে না।

'যেমন?'

'কাল মধ্যরাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে দেবী বজ্রচর্চিকার ধ্যানে রত ছিলাম। তুমি তো জানো, দেবী বড়ই জাগ্রত, সাধকের ধ্যানে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন সহ্য করেন না তিনি।'

'জানি নাথ।'

'কাল অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মনকে একাগ্র ও তন্ময় করে তুলতে পারছিলাম না। কী যেন একটা বাধা বার বার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে তুলছিল। শেষে আসন প্রত্যাহার করে উঠে আসব, এমন সময় একটি দৃশ্য দেখে বিহ্বল হয়ে গেলাম।'

রানি সপ্রশ্নচোখে চেয়ে রইলেন।

'দেখলাম পঞ্চমুণ্ডির নরমুণ্ডটির মুখগহ্বর থেকে একটি বৃহৎ কালকেউটে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে।'

পালঙ্কের ওপর দ্রুত উঠে বসলেন রানি। 'এর অর্থ কী নাথ?'

'জানি না প্রিয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে ঝড় বোধহয় আসন্ন।'

'আজ প্রভাতে রাজসভায় যে কাহিনিটি বলল প্রহরী, তার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে প্রভু?'

‘আছে প্রিয়ে।’ উঠে বসলেন প্রকাশচন্দ্র, ‘পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন। যে কূট পরিকল্পনার বীজ বহুদিন আগেই আমরা উপ্ত করেছি এই দেশের ভূমিতে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি পরিণতির দিকে, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একদল প্রতিস্পর্ধী মানুষ। তারা সাধারণ মানুষ নয়।

‘আমার চরেরা সংবাদ আনছে যে, বঙ্গদেশের চারিদিকে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে, তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে এই মানুষেরা। এই দেশের সঙ্গে তাদের নাড়ির টান অনেক গভীর। আমাদের পরিকল্পনা তারা বুঝে ফেলেছে। তারা ঐক্যবদ্ধ করছে আপামর জনতাকে।’

‘এরা কারা?’

‘একদল শৈব আর সহজিয়া সন্ন্যাসী। মানুষ তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের প্রভাব বিপুল। তারাই আজ সাধনার আসন ছেড়ে অস্ত্র ধরেছে আমাদের বিরুদ্ধে।’

‘কিন্তু কেন? ধর্মের সাধক রাজনীতির অঙ্গনে কেন?’

‘ধর্ম রানি, ধর্ম। ধর্মের ক্ষয়ই তাদের এই পথে টেনে এনেছে।’

‘কিন্তু এরা কী করে রোধ করবে আমাদের পরিকল্পনার গতি?’

‘এরা একদল প্রতিস্পর্ধী মানুষ, আমাদের উৎখাত করতে চায় রানি। বিদ্রোহের পথে, গণ-অভ্যুত্থানের পথে। এরা চায় চীন সম্রাট গাওজং আর গুরু য়ু জেতিয়ান-এর বঙ্গদেশ ধ্বংস করার স্বপ্নকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করতে।’

রানির চোখ দুটো অন্ধকারে ধ্বক করে জ্বলে উঠল, ‘অসম্ভব! আমাদের পরিকল্পনা পূর্ণ হবে, আরব্ধ কর্ম অবশ্যই সম্পন্ন হবে। এই দেশ একদিন ধর্ম আর নীতিবোধ জলাঞ্জলি দেবে, ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে মরবে, ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে উৎসন্নে যাবে, বেশ্যা আর ভিক্ষুকের দেশ হবে। হবে, হবে, হবেই।’

ভোর। হেমন্তের হিমেল ভোর।

ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রথম সূর্যকিরণ মেঘান্দ নদীর জল স্পর্শ করতেই শত সহস্র উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল ‘জয় বজ্রযোগিনীর জয়’ বলে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাববিহ্বল ভক্তের দলও পুণ্য-অবগাহনের উদ্দেশে নদীতে নেমে পড়লেন। মেঘান্দ’র বুকে আলোড়ন উঠল।

মাস দুই বর্ষা শেষ হয়েছে। মেঘান্দ এখন যুবতী নারীর মতো উচ্ছল। এখান থেকে নদীপথে পূর্বসাগরের মোহনা একদিনের যাত্রা। সমুদ্রগামী নৌকাগুলি যতই সাগরের নিকটবর্তী হয়, মেঘান্দ ততই উদ্দাম ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মেঘান্দ’র অন্য পাড়ে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সেই প্রান্তর শেষ হলে লালিম্ববন পাহাড়শ্রেণী। তার পাদদেশে সুবিশাল শালিবন বৌদ্ধবিহার। এই বিহার সমতটের দেববংশের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে আপাতত তার ভরণপোষণের দায়িত্ব চন্দ্রবংশের। প্রকাশচন্দ্রের আদেশই এখানে শেষ কথা।

অবগাহনের পর পুণ্যার্থীরা উঠে এসে সূর্যপ্রণাম করতে লাগলেন। ভক্তিমতী পুরুষ ও রমণীরা সিদ্ধাচার্যদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে লাগলেন। থেকে থেকে দেবী বজ্রযোগিনীর নামে গর্জন উঠতে লাগল।

জনারণ্য থেকে কিছু দূরে দুই নবীন যুবক সমগ্র কর্মকাণ্ড অবলোকন করছিলেন। তাঁরাও একটু আগে স্নান সেরে উঠেছেন। ঊর্ধ্বাঙ্গে উত্তরীয়, অধোমাঙ্গে খাটো অধোবাস। চুলগুলি অবিন্যস্ত। সরস ও প্রসন্ন মুখমণ্ডল, সর্বদাই কৌতুকে ঝলোমলো।

প্রথমজন বললেন, ‘নাটকের কুশীলবরা তো সবাই প্রস্তুত। কিন্তু প্রধান সূত্রধর মহাশয়ের কী সংবাদ?’

দ্বিতীয়জন বললেন, 'আজই তো তাঁর রঙ্গস্থলে উপস্থিত হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি আবার বড়ই লাজুক। কোথা থেকে কীভাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে—সে বলা ভারি মুশকিল।'

'রঙ্গমঞ্চের পর্দা উঠবে কখন?'

'আগে তথাগতর নামে, ধর্মের নামে, সঙ্ঘের নামে কিছু পূজাপাঠ হোক, তারপর নাহয় নাটক শুরু হবে। বুদ্ধনাটক কি অতই সহজ বস্তু ভায়া?'

'আমাদের এখন কাজ কী?'

'কিছুই না। শুধু দেখে যাও। শোনো ভায়া, শাস্ত্রে বলেছে—দেশকে যদি ভালোভাবে জানতে চাও, তাহলে দু'খানি স্থান অতীব প্রশস্ত। এক তীর্থস্থান, দুই শৌণ্ডিকালয়।

প্রথমজন কৌতুক অনুভব করলেন, স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করলেন, 'কীরকম?'

'তাহলে শোনো। ওই যে বিপুলোদর সন্ন্যাসীটিকে দেখছ, ওঁর নাম যোগী উড়ুম্বর। ইনি অতি বিখ্যাত মন্ত্রযানী বৌদ্ধ আচার্য। নর্মদাতীরে এঁর ধর্মস্থান বড়ই প্রসিদ্ধ, শিষ্য সংখ্যা কম করে হলেও দ্বিসহস্রাধিক। অর্থগৌরবে ইনি বড় বড় শ্রেষ্ঠীকে লজ্জা দিতে পারেন।

'ওই যে চর্মটিকাসদৃশ প্রৌঢ়কে দেখছ ধ্যানমুদ্রায় বসে থাকতে, উনি কর্মান্তবাসকের বিশিষ্টতম শ্রেষ্ঠী দিবোদাস। আর যে কন্যাটিকে দেখছ তাঁর গাত্রমার্জনা করে দিতে, উনি দিবোদাসের বিধবা পুত্রবধূ। প্রৌঢ়া দিবোদাস তাঁর সুন্দরী বিধবা পুত্রবধূটিকে বড়ই স্নেহ করেন, এমনকী বিদেশে গেলেও তাঁকে সঙ্গী করেন। এক্ষেত্রে স্নেহের গতি কিঞ্চিৎ কুটিল।

'ওদিকে যে সৌম্যদর্শন তরুণ স্নান সেরে উঠে আসছেন, তাঁর উজ্জ্বল ও মেধাবী মুখখানি ভালো করে লক্ষ করো। উনি শালিবন বিহারের অত্যুজ্জ্বলতম রত্ন, কুমার সিদ্ধার্থশর্মা। বিশুদ্ধসিদ্ধান্তকারিকা এবং শব্দার্থমঞ্জরী নামের দু'খানি অত্যুত্তম গ্রন্থের রচয়িতা। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তির পর ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত, তারপরে ইনি।

'ওই যে লোলচর্ম বৃদ্ধাকে দেখছ পূর্বাস্য হয়ে সূর্যপ্রণাম করতে, উনি কর্মান্তবাসকের বৃহত্তম গণিকালয়টির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নাম মঞ্জরী। ইনি চৌষট্টিকলায় মহা পারঙ্গম। কর্মান্তবাসকের যাবতীয় রাজন্য এবং বণিককন্যাদের নৃত্যগীত পটিয়সী করে তোলা, কলাবিদ্যা থেকে শুরু করে সীবনশিক্ষা, রন্ধনশিল্প থেকে শুরু করে উদ্যানবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার গুরুদায়িত্ব আপাতত এঁর বৃষস্কন্ধেই ন্যস্ত।

'ওই যে উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের দেখছ তাদের দীর্ঘ লিঙ্গগুলি পুণ্যলোভাতুর শিষ্যশিষ্যাদের মস্তকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ দিতে, ওঁরা এক বিশেষ সহজিয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, নাম সহজলিঙ্গ। এঁরা উলঙ্গ থাকেন, ভিক্ষা করে খান, খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার নেই। তবে স্বভাবে বড়ই উগ্র। সামান্য অশ্রদ্ধাজ্ঞানে খর্পর ও ত্রিশূল হস্তে রুদ্ররূপ ধারণ করেন।

'ওই যে দেখছ সুন্দরী পৃথুলা রমণীর দল উঠে আসছেন স্নান করে, ওঁরা কর্মান্তবাসকের বিভিন্ন বণিক, ব্রাহ্মণ, এবং রাজপদাধিকারীদের স্ত্রী ও বধূদের দল। ব্যস্ত গৃহস্বামীদের থেকে এঁরা না-পেয়েছেন প্রেম, না সময়। স্বামীদের অগোচরে এঁরা গৃহভৃত্য বা দেবরদের বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন। অনেকে আবার গৃহদেবতার সেবায় নিজেদের তনুমন সমর্পণ করেছেন।

'ওই দেখো, চটুল চপল কিশোরের দল একপ্রান্তে সমবেত হয়ে সিক্তবসনা রমণী দেখতে ব্যস্ত। তাদের চোখে দুরন্ত কৌতূহল। নারীশরীরের অপার রহস্য তাদের কাছে এখনও অধরা।

'ওই দেখ, বঙ্গদেশের বিশিষ্ট রাজন্যকদল স্নান সেরে উঠে আসছেন। সর্বাগ্রে আছেন রাজগুরু বিশুদ্ধকীর্তি। মহাপণ্ডিত হলে কী হবে, এই বয়সেও বৃদ্ধের নারীলিপ্সার অন্ত নেই।

'বিশুদ্ধকীর্তির দক্ষিণপার্শ্বে আছেন প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট। স্বভাবে বাতুল এবং কিঞ্চিৎ কোমল। কাব্য ও নাট্যপ্রেমী বলে বিখ্যাত। সরল ও কূটগরলবিহীন বলে জনমানসে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

'বিশুদ্ধকীর্তির বামপার্শ্বে আছেন মহাদণ্ডনায়ক জিতসেন। ঈষৎ স্থূল বুদ্ধি হলে কী হবে, ইনি সেই ত্রুটিটুকু পূরণ করেছেন সিংহাসনের প্রতি তাঁর প্রশ্নহীন আনুগত্য এবং সীমাহীন নৃশংসতা দিয়ে। তরবারি ছাড়া অন্য কিছুর ভাষা বোঝেন না।

সামান্য পশ্চাতে রয়েছেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্র। মহাধূরন্ধর। এঁর মুদ্রার লোভ অপরিমেয়। সামান্য কয়েকটি স্বর্ণদিনারের লোভে ইনি নরকের পথেও যাত্রা করতে পারেন।

'পেছনে রয়েছেন রাজবৈদ্য কুল্লুকভট্ট। প্রবীণ রাজবৈদ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। বৃদ্ধের পুরুষাকারও বড়ই প্রবল, প্রয়োজন হলে রানি বা প্রকাশচন্দ্র, কাউকেই উচিত কথা বলতে ছাড়েন না। ভয়ে হোক বা ভক্তিতে, এঁকে কেউ বিশেষ ঘাঁটান না।

'কুল্লুকভট্টের ঠিক পাশে আছেন রাজসেবকবাহিনী প্রধান গিরিকিশোর। লাম্পট্য, ক্রূরতা, নৃশংসতায় তুলনাহীন। এর মুখখানি যেমন শুকরতুল্য, স্বভাবটিও তেমন। জন্ম বারবণিতা গৃহে। পিতৃদেব ছিলেন জনৈক শৌণ্ডিক। এঁর নারীলিপ্সার কাহিনি বঙ্গদেশে প্রবাদপ্রায়। মাতৃ-মাতৃষ্বসা জ্ঞান নেই, কন্যা-কন্যাসমা জ্ঞান নেই, রজস্বলা নারী হলেই হল। অনেকেই অপেক্ষা করে আছেন যে, অভ্যুত্থান সফল হলে এই লম্পটপ্রবরের পুরুষাঙ্গ কর্তন করে শিবাভোগ দেওয়া হবে।

'সবার শেষে যিনি ধীর পদক্ষেপে উঠে আসছেন, ওঁকে বিশেষ করে লক্ষ করুন। উনি মহাপ্রতীহার শান্তঘোষ। কূটবুদ্ধি, ধূর্ততা এবং নিঃশব্দ নির্মমতায় বঙ্গদেশে এঁর তুল্য আর একজনই আছেন, স্বয়ং প্রকাশচন্দ্র। সর্বদিকে এঁর দৃষ্টি শকুনির মতো। মনে রেখো ভায়া, বঙ্গদেশের গূঢ়পুরুষবাহিনীর নেতৃত্বে আনন্দগুপ্তর মতো একজন মানুষ রয়েছেন। সেই ধুরন্ধর ব্যক্তি শান্তঘোষের মতামত ছাড়া চলেন না।'

'আনন্দগুপ্ত! তিনি কোথায়?'

'তিনি আপাতত দেবী বজ্রযোগিনীর মন্দিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছেন। প্রতি বছরেই থাকেন। আজ অবধি তাঁকে কেউ এই পুণ্যস্নানে অংশগ্রহণ করতে দেখেনি।'

'প্রকাশচন্দ্র এবং রানি?'

'তাঁদের স্নান ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে এখানে নয়, রাজপ্রাসাদে। মেঘান্দের জল কলসি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্নানের জন্য। তাঁরা তাঁদের পুণ্যস্নান সেখানেই সম্পন্ন করেছেন।'

'সে কী? আমি যে শুনেছিলাম রানি আর প্রকাশচন্দ্রের স্নানের পর এই মহাস্নান শুরু হয়?'

'গত বৎসর অবধি তাই-ই হতো ভায়া। কিন্তু অজ্ঞাত কারণবশত এইবার তার পরিবর্তন হয়েছে।'

'কারণ?'

'কারণ? বলা ভারি সমস্যা। তবে তুমি যদি খুব অনুরোধ করো, সূত্র দিতে পারি।'

'কী?'

অস্ফূটে দ্বিতীয় বক্তা বললেন, 'ওঁরা জানেন! ওঁরা জানেন যে আমরা জানি।'

'একটি কথা মানতেই হবে, মিত্র পদ্মসম্ভব,' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন প্রথম যুবক, 'আমি আর তুমি বোধহয় একই সময়ে এই অঞ্চলে একত্র হয়েছি। কিন্তু বঙ্গদেশের যাবতীয় সংবাদ যে দ্রুততার সঙ্গে তুমি সংগ্রহ করেছ—যেমন আশ্চর্যজনক, তেমনই বিচিত্র।'

পদ্মসম্ভব চাপাস্বরে হাসতে হাসতে বললেন, 'ওহে শ্রীমান জয়াপীড়, তুমি ভাগ্যদোষে কাশ্মীর প্রদেশ ছেড়ে এখানে এসেছ। আর আমি পূর্বদেশের ভূমিজ সন্তান। কামরূপ থেকে শুরু করে তাম্রলিপ্ত, বজ্জি থেকে শুরু করে হরিকেলের তটভূমি, কান্যকুব্জ থেকে শুরু করে তিব্বত, অর্ধেক ভারতবর্ষ আমি নিজের হাতের মতো চিনি। এতক্ষণ ধরে যে সংবাদ তোমাকে জানলাম, সে আমার অনেকদিনের পরিশ্রমের ফসল।'

জয়াপীড় বললেন, 'ও, সেইজন্যই লোকেশ্বর তোমাকেই বেশি বিশ্বাস করেন, তাই না?'

অট্টহাস্য করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন পদ্মসম্ভব, ‘নেহাত চারিদিকে লোকসমাগম, নইলে এই দণ্ডেই তোমার গালে স্নেহচুম্বন উপহার করতাম। বলো তো, এই শিশুসুলভ অভিমান কি মহা তেজস্বী জয়াপীড়কে মানায়?’

জয়াপীড় তবুও মুখ নিশ্চুপ কালো করে রইলেন। পদ্মসম্ভব একটু অপ্রতিভ হলেন। কৌতুক তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক অলঙ্কার। তাতে কেউ আহত হলে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে শরৎসূর্যের স্বর্ণাভ আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত। পুণ্যার্থীরা গৃহাভিমুখী। নদীতীর শূন্যপ্রায়। মেঘান্দের জলে এখন ভাঁটার টান। সেই স্রোতে অগণিত ফুলমালারাশি ভেসে যাচ্ছে।

এইসময় দুজনের পশ্চাতে একজন এসে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন, ‘দু’খানি কপর্দক দান করে এই ভিক্ষুককে কিঞ্চিৎ সাহায্য করবেন ভদ্রজনেরা, জগন্ময়ী বজ্রযোগিনী আপনাদের সহায় হবেন।’

জয়াপীড় পিছন না ফিরেই বললেন, ‘আপনি অন্য কোথাও ভিক্ষা অন্বেষণ করুন প্রভু। আমরা দরিদ্র কৃষক। আমাদের কাছে এই উত্তরীয় ভিন্ন আর কিছুই নেই।’

পদ্মসম্ভব কিছু বললেন না।

ভিক্ষার্থী পুনরায় বললেন, ‘উত্তরীয় দুটিই দান করুন ভদ্র। ভারতবর্ষের দুই মহাবীরের উত্তরীয় বিক্রয় করে দুই কপর্দক তো পাবই।’

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে পিছন ফিরলেন। জয়াপীড়ের ডান হাত তাঁর কটিদেশে, সেখানে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লুকোনো। পদ্মসম্ভব সচরাচর অস্ত্র বহন করেন না। তিনি কয়েকমুহূর্ত নির্নিমেষে ভিক্ষুকের দিকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। করজোড়ে বললেন, ‘আদিদেব শঙ্করের মূর্ত অবতার লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথকে প্রণাম।’

জয়াপীড় বিহ্বলচক্ষে ভিক্ষুককে দেখতে লাগলেন। ইনিই তাহলে সেই আসমুদ্রহিমাচল ভারতভূমির শ্রেষ্ঠতম যোগী মহেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ?

জয়াপীড় আভূমি প্রণাম করলেন, ‘যোগীশ্রেষ্ঠ মৎস্যেন্দ্রনাথের চরণ বন্দনা করি। অধমের নাম বিনয়াদিত্য জয়াপীড়, একদা ভারতবিজয়ী ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের পৌত্র, বর্তমান গৌড়েশ্বরের জামাতা। আপনাকে যে এই বেশে দেখতে পাব—ভাবিনি আচার্য। ঔদ্ধত্যের অপরাধ ক্ষমা করবেন।’

মৎস্যেন্দ্রনাথ জয়াপীড়কে সবলে আলিঙ্গন করলেন। জয়াপীড় যথেষ্ট বলশালী পুরুষ, তবুও এই সবল সস্নেহ আলিঙ্গনে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। মুক্ত হয়ে বললেন, ‘মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রথম স্নেহ আলিঙ্গন আমার স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।’

পদ্মসম্ভব নিরীহ স্বরে বললেন, ‘বুকের পাঁজরগুলি ভাঙেনি তো ভাই?’

জয়াপীড় বলে ওঠার আগেই মৎস্যেন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন, ‘ভ্রাতৃপ্রতিম পদ্মসম্ভবের কথায় কিছু মনে করবেন না রাজন। কৌতুক ওঁর চরিত্রের স্বাভাবিক ধারা। কিন্তু সেই কৌতুকরসের মাপকাঠিতে এই অদ্ভুতকর্মা মানুষটির দৃঢ়তা, বীরত্ব এবং দুঃসাহসের পরিমাপ করা অসম্ভব। রাজপুত্র পদ্মসম্ভব ভগবান বিষ্ণুর অবতার।’

পদ্মসম্ভব সখেদে বললেন, ‘আপত্তি নেই। কিন্তু আচার্য যদি একবার ষোল হাজার গোপিনীর বিষয়টা নিশ্চিত করে দিতেন, আমার দাবিটা তবে বেশ পাকাপোক্ত হতো।’

মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং জয়াপীড় দুজনেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। শূন্য মেঘান্দ তীরের দ্বিপ্রহর সেই হাসির কলরোলে মুখর হয়ে উঠল।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ক্লান্তস্বরে বললেন, ‘আমি অত্যন্ত শ্রান্ত। এই বিশাল মেঘান্দ নদীর ওপার হতে সাঁতার কেটে এপারে আসতে আসতে শক্তি নিঃশেষিত। আপাতত আমাদের গুপ্তগৃহে যাওয়া যাক না কি?’

জয়াপীড় এবং পদ্মসম্ভব দুজনেই শশব্যস্ত হলেন। পদ্মসম্ভব অপরাধী সুরে বললেন, ‘আচার্য শান্তরক্ষিত আমাদের বলেছিলেন আজ মেঘান্দতীরে আপনার জন্য প্রতীক্ষা করতে। তাঁর কাছে গুপ্তসংবাদ ছিল। কিন্তু

আপনি যে এই বিশাল নদী সাঁতরে আসবেন—সেটি কারোরই ধারণার মধ্যে ছিল না প্রভু। চলুন, আচার্য আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

তিনজনে ধীর পদক্ষেপে চলে যাওয়া মাত্র কাছের বিশাল অশ্বত্থ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। তার দেহ ধূলিধূসরিত, কটিতে কৌপীন, মাথায় মস্ত জটা, উন্নত কপাল চন্দন ও সিন্দূরে চর্চিত। মানুষটি মূক ও বধির। সকাল হতে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে বসেছিল গাছতলায়। স্নানার্থীদের দল তাকে ভিক্ষুক ভেবে সিন্দুরচর্চিত ফলমূল এবং কপর্দকরাশি উদারহস্তে বিলিয়ে গেছে।

কিন্তু ঈশ্বর তাকে মূক ও বধির করে পাঠালে কী হবে, সেই অক্ষমতা পূরণ করে দিয়েছেন অবিশ্বাস্য দুটি ক্ষমতা দিয়ে। এক, নির্মল আবহাওয়ায় সে অন্তত অর্ধক্রোশ দূরের দৃশ্য দেখতে পায়। দুই, মূক ও বধির হলেও সে মানুষের ওষ্ঠের চলন দেখে বক্তব্য অনুধাবন করতে পারে!

চারিদিক নিস্তব্ধ হলে সে কপর্দকগুলি কটিদেশে বেঁধে, ভিক্ষালব্ধ ফলগুলির কিছু গলাধঃকরণ করে দ্রুতপদে ধাবিত হল গন্তব্যের দিকে।

প্রভু ভাঁড়ুদত্ত তার অপেক্ষায় আছেন।

একই দিনের দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ড। নির্মল আকাশ, সূর্য মধ্যগগনে। বজ্রযোগিনীর মন্দিরের সামনে লোকে লোকারণ্য। শতাধিক পুণ্যার্থী একত্রিত হয়েছেন পূজার্চনার উদ্দেশে। ফুলের মালায় সজ্জিত। মন্দিরচত্বর চন্দনজলে ধৌত, চন্দনগন্ধে চারিদিক আমোদিত।

মূল গর্ভগৃহ থেকে মন্দিরের দুয়ার অবধি দুদিকের প্রাচীর বরাবর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। এঁরা বঙ্গদেশের বিভিন্ন ধনীগৃহে নিয়মিত পূজা পেয়ে থাকেন। এই দিনটিতে তাঁদের বজ্রযোগিনী মন্দিরে এনে রাখা হয় সাধারণের পূজা পাওয়ার জন্য। সবকটি মূর্তি তাম্রনির্মিত, পাতলা সোনার পাতের আবরণ। সূর্যের আলোয় তাদের ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বর্ধিত। অধিকাংশই তারাদেবীর মূর্তি। কিছু মঞ্জুশ্রী, জম্ভল, অমিতাভ ও অন্য বোধিসত্ত্ব মূর্তিও আছে। প্রতিটি দেবদেবীর মাথার ওপর প্রকাণ্ড ছত্র। তার স্বর্ণনির্মিত দণ্ড, দুর্মূল্য পশম বা রেশমের বস্ত্র। ছত্রে সোনার সূতার কাজ করা ঝালর, তার প্রতিটি প্রান্ত থেকে একটি করে মুক্তা ঝুলছে।

উত্তর পূর্ব কোণে কয়েকটি ভয়ালদর্শন মূর্তি রাখা। যেমন হেরুক, চণ্ডরোষণ, একজটা, বজ্রচর্চিকা ইত্যাদি। এসব মূর্তির পূজারীরা বজ্রযানী তন্ত্রমতে পূর্ণাভিষিক্ত সাধক এবং উচ্চপদস্থ শাসকবর্গ। নইলে এইসব ক্রোধী দেবদেবীদের গৃহস্থপূজা যে-সে মানুষের কর্ম নয়।

মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনে সাতজন শ্রমণ তারাদেবীর স্রগ্ধরা স্তোত্র পাঠ করছে। ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। পূজাপর্বের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। মন্দিরের প্রধান দ্বারের সামনে অতিবৃহৎ যূপকাষ্ঠ। কয়েকজন ভীমদর্শন ডোম তাদের খড়্গের ধার পরীক্ষায় ব্যস্ত। পূজা শেষে একশত আটখানি মহিষ বলি হবে। তাদের এক এক করে মন্দিরের পিছনদিকে এনে বেঁধে রাখা হচ্ছে।

উপস্থিত পুণ্যার্থীদের উচ্চ স্বরে সমগ্র অঞ্চল কোলাহলপূর্ণ। সকলে অপেক্ষা করছেন কখন প্রকাশচন্দ্র এবং রাজ্ঞী এসে পূজাপাঠ সমাপন করবেন। পুণ্যার্থীদের দলের একেবারে সামনে আছেন বজ্রযানী সন্ন্যাসীরা। তাঁদের উলঙ্গ ভস্মাবৃত দেহ, দীর্ঘ জটা আর খর্পর-খট্বাঙ্গ দেখে অন্যান্যরা একটু দূরে রয়েছেন।

আছেন কিছু সহজযানী সাধক। এঁদের অবস্থান সংসার এবং সন্ন্যাসাবস্থার মধ্যের বিন্দুতে। অনেকেরই বিবাহিতা স্ত্রী আছেন, বাকিদের সম্বল সাধনসঙ্গিনী। অধিকাংশই অন্ত্যজ এবং নিম্নবর্গীয় জাতিভুক্ত, স্থায়ী উপার্জন বলতে তেমন কিছু নেই। এঁরা নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ হলে কী হবে, স্বভাবে উদাস ও যাযাবর প্রবৃত্তির। সহজিয়া সাধকদের স্ত্রী বা সঙ্গিনীরা জন্মসূত্রে ডোম, রজক, মালি বা অন্যান্য অন্ত্যজ ঘরের কন্যা হয়ে থাকেন।

সাধকদের প্রায় সকলের মস্তক মুণ্ডিত। মুখমণ্ডল গুম্ফশ্মশ্রুতে আবৃত। আজানুলম্বিত বেশ, সেটি বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন রঙের ক্ষৌম, দুকূল, কৌষেয় এবং পট্টবস্ত্রের পট্টি বুনে প্রস্তুত।

দূর হতে ঢাক ঢোল ও মৃদঙ্গরব ভেসে এল। উপস্থিত জনতা সরে গিয়ে মন্দিরের প্রধানদ্বারের সম্মুখের স্থান উন্মুক্ত করে দিল। এইবার দেবীগর্জন শুরু হবে। প্রাকৃত সাধারণের ভাষায়, গাজন।

ভীষণদর্শন চণ্ডালের দল ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে, ভয়ঙ্কর রণহুংকার দিতে দিতে এগিয়ে আসতে থাকল। বাদ্যকারদের পেছনে পেছনে আরেক সারিবদ্ধ দল, বঙ্গদেশের সেনাবাহিনীর পদাতিক যোদ্ধা। তাদের একহাতে লাঠি এবং অন্যহাতে হ্রস্বদৈর্ঘ্যের তরবারি। প্রস্তরকঠিন দেহগুলি তৈলাক্ত, শরীর বেয়ে নেমে আসছে স্বেদবিন্দু। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গে ক্ষুদ্র অধোবাস মালকোচা করে পরা।

গর্জনদলের প্রথমে একটি ক্ষুদ্র রথ। ফল ফুল মালা দীপ ধূপে পূর্ণ। রথের চারিদিকে চারটি অতিদীর্ঘ বল্লম। বল্লমগুলি রৌপ্যনির্মিত, ফলা স্বর্ণের। রথটির মধ্যস্থানে একটি বংশদণ্ড প্রোথিত, তার মাথায় উড়ছে চন্দ্রবংশের পতাকা। তার সামনে স্বর্ণনির্মিত থালার ওপর একটি অদ্ভুতদর্শন তরবারি রাখা। প্রকাশচন্দ্রের অজেয়, অব্যর্থ তরবারি।

এই দলের ঠিক পেছনেই ভয়ালদর্শন ডোমের দল। তাদের সারা শরীরে বিচিত্র সব উল্কি, মুখে নানা রঙ, হাতে অতিদীর্ঘ ভল্ল। ভল্লগুলির শাণিত ফলার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে ঝলসাচ্ছে। এরা একটি বর্গাকার ব্যূহে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আসছে। মাঝখানে চারজনের সারি করে ষোলজন অশ্বারোহী, তাদের ঘিরে চৌষট্টিজন পদাতিক। তাদের গম্ভীর রণহুঙ্কারে চারদিকের বাতাস কেঁপে উঠতে লাগল। শিশুরা কেঁদে উঠল। মায়েরা তাদের মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

এই ডোমসৈন্য বঙ্গদেশের রণবাহিনীর প্রধান অংশ। এঁদের বীরত্বের কথা আসমুদ্রহিমাচল বিদিত। যতবার বঙ্গভূমি বৈদেশিক শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে, ততবার দেখা গেছে যে পরাজয়ের কারণ সৈনাপত্য ও রণনীতি। বঙ্গসেনার বীরত্ব নিয়ে কারও মনে কোনওদিনই কোনও সন্দেহ ছিল না। বঙ্গদেশের দেবী পূজার্চনায় চণ্ডাল, ডোম, শবর, এঁদের অধিকার সর্বাগ্রে।

ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত স্মিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রধান দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। সৈন্যদলের যিনি প্রধান, এগিয়ে এসে একটি ফল এবং একটি স্বর্ণখণ্ড ভন্তের হাতে দিলেন। বুদ্ধগুপ্ত দুহাত তুলে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলেন। চারজন সৈন্য অগ্রবর্তী রথখানি তুলে ধর্মস্তূপের সামনে রাখতেই উপস্থিত শ্রমণেরা শঙ্খধ্বনি করলেন। পুণ্যার্থীর দল সহর্ষে 'জয় দেবী বজ্রযোগিনীর জয়' বলে চিৎকার করে উঠল।

এবার ডোমসৈন্যের দল দুপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিতেই বজ্রযানী সন্ন্যাসীরা খট্বাঙ্গগুলি দুহাতে উপরে তুলে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। আরেকদল সন্ন্যাসী ভীষণ গালবাদ্যে চারিদিক সন্ত্রস্ত করে তুললেন। ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত মন্দিরের প্রধান ঘণ্টা বাজিয়ে দিতেই সন্ন্যাসীর দল একে একে মন্দিরে প্রবেশ করে গর্ভগৃহের সামনে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে লাগলেন। সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে গাইতে লাগলেন, 'এক সো পদ্ম চৌষঠী পাখুড়ী/ তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'

প্রধান দ্বারের বাইরে তখন এসে দাঁড়িয়েছে পুলিন্দ, ব্যাধ ও শবরের দল। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই আছে এই দলে। পুরুষদের অনেকের হাতে লাউয়ের খোলা আর আধহাত লম্বা বাঁশের টুকরো আর শুকরের অন্ত্রের তার দিয়ে বানান বাদ্যযন্ত্র। দু-এক জনের ঠোঁটে বাঁশি। এক বৃষস্কন্ধ প্রৌঢ়ের হাতে একটি বহুব্যবহৃত বীণা। তারা একটি বুদ্ধনাটিকার আয়োজন করেছে। নাটকের মূল নায়ক এক সহজযানী সাধক। তাঁকে ঘিরে তাঁর সঙ্গিনী নাচতে নাচতে গাইছেন,

'তেন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই না পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় না জাণী।।

হরিণী বোলও সুন হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।।'

প্রণয়ী সাধক উত্তর দিচ্ছেন,

'কইসনি হালো ডোম্বী তোহেরি ভাভরী আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী।
কেহো কেহো তোহেরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ না মেলই।।
কাহ্নে গায় তু কামচণ্ডালী
ডোম্বীত আগলি নাহি চ্ছিনালী।।'

অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দুজনেই সাবলীল। তাদের লীলা, লাস্য, গান, অভিনয় সবই অতি অপূর্ব। তার সঙ্গে বাকি বাদ্যকর এবং সহশিল্পীরাও যথাযথ সঙ্গত করছেন। বাকি অভিনেতারাও যথেষ্ট সুঠাম দেহী।

এরপর নাটক আরও বেশ সরস এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। নায়িকা চটুল চপল লাস্যের সঙ্গে নায়কের গলা জড়িয়ে বলছেন,

'যোইণি তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।'

নায়ক তার উত্তরে সোল্লাসে গেয়ে উঠলেন,

'ভব নির্ব্বাণে পড়হমাদলা।
মনপবণ বেণি করণ্ড কসালা।
জঅ জঅ দুংদুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্নু ডোম্বি বিবাহে চলিআ।'

এই রসসিক্ত আলাপে উপস্থিত জনগণের অনেকে উল্লসিত হয়ে বাহবা দিলেন, অনেকে আদিরসাত্মক টিপ্পনি কাটলেন। যুবতীরা সামান্য লজ্জা পেলেন, যুবকেরা আমোদ। হো হো হাসির শব্দে সমগ্র স্থানটি পরিপূর্ণ হল।

ততক্ষণে পূজাস্থল সাধারণ পুণ্যার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বজ্রযানী সন্ন্যাসীরা পূজাপাঠ সমাপান্তে নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করেছেন। সাধারণ পুণ্যার্থীরা মন্দিরে পূজা দিয়ে ফের প্রধান দ্বারের কাছে ফিরে আসছেন। এখনও নাটক শেষ হয়নি। তাছাড়া পূজার যে মূল আকর্ষণ, রাজ্ঞী ও প্রকাশচন্দ্রের পূজার্পণ এবং একশো আটখানি মহিষ বলি, সেটি তখনও অনুষ্ঠিত হওয়া বাকি।

নাটক প্রায় তুঙ্গমুহূর্তে, এমন সময় দূর হতে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল। বঙ্গভূমির রানি এবং মহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্র আসছেন।

চারিদিকে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। মন্দিরচত্বর শূন্য করে দেওয়া হল দ্রুত। নাট্যদল তাঁদের রঙ্গ বন্ধ করে মিশে গেল প্রধানদ্বারের দুইপাশে জনতার মধ্যে। কেবলমাত্র শ্রমণেরা এবং বুদ্ধগুপ্ত ছোটাছুটি করছেন।

যদিও বুদ্ধগুপ্তর বিশেষ ভূমিকা নেই। প্রকাশচন্দ্র এবং রানির সঙ্গে আচার্য বিশুদ্ধকীর্তিও আসছেন। বিশিষ্ট অতিথিদের পূজা এবং যজনের ভার তাঁরই ওপরে।

একজন শ্রমণ মন্দিরের প্রধান দ্বারের সামনে রাখা যূপকাষ্ঠটি মেঘান্দের জলে ধুইয়ে দিয়ে গেলেন। আরেকজন অতি দ্রুত সিন্দূর, রক্তচন্দন, দূর্বাঘাস এবং ফুলদল দিয়ে যূপকাষ্ঠ সজ্জিত করে দিলেন। বলশালী শৌনিকদল এক এক করে মহিষগুলিকে সামনে এনে রাখতে শুরু করল।

কাড়া, নাকাড়া এবং মৃদঙ্গের অতি উচ্চ নিনাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে অত্যুজ্জ্বল সুসজ্জিত রথশ্রেণী এগিয়ে আসতে থাকে। সামনে বাদ্যকরের দল। তার পিছনে প্রথম রথ। তাতে অধিষ্ঠিত আছেন রাজগুরু বিশুদ্ধকীর্তি এবং প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট স্বয়ং। দুজনেই যথেষ্ট সম্মানীয় মানুষ। উপস্থিত জনতা তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাল।

দ্বিতীয় রথে রয়েছেন মহাদণ্ডনায়ক জিতসেন এবং রাজসেবক বাহিনীপ্রধান গিরিকিশোর। জিতসেন বঙ্গজনের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। রুক্ষ, দৃঢ় এবং কঠোর শাসনদণ্ডে বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু গিরিকিশোর চিরলম্পট। তিনি নারীদের দিকে অসভ্য ইঙ্গিত করতে লাগলেন।

তৃতীয় রথে রয়েছেন মহাসান্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্র এবং মহাপ্রতীহার শান্তঘোষ। তাঁদের আপাত-উদাস মুখভার দেখে তাঁদের মনের মধ্যে কী চলছে বলা দুষ্কর। কিন্তু দুজনেই অতি উচ্চপদস্থ রাজন্য, জনতা সম্ভ্রমের সঙ্গে মাথা নত করে অভিবাদন জানাচ্ছিল।

চতুর্থ এবং সর্বশেষ রথটিই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অন্যান্য রথগুলি অশ্ববাহিত, এই রথের বাহন চারটি অতি ভীষণদর্শন বৃষ। রথখানিও অতীব সুসজ্জিত। স্বর্ণনির্মিত ছত্রের রক্তবর্ণ ধ্বজে একটি অর্ধচন্দ্র, এবং একটি তরবারি অঙ্কিত। এই লাঞ্ছন চন্দ্রবংশের বহু প্রাচীন ধ্বজচিহ্ন।

রথ ঘিরে ভীষণদর্শন খড়্গ এবং সুতীক্ষ্ণ ভল্ল হাতে কৃষ্ণবস্ত্রে সজ্জিত ষোলোজন যোদ্ধৃপুরুষ। সবাই জানে তারা কারা।

রথের ওপর রয়েছেন প্রকাশচন্দ্র এবং রানি। রানি প্রকাশচন্দ্রের বামদিকে অবস্থান করছেন, সদা সর্বদা তাই থাকেন। প্রকাশচন্দ্রের ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি দশাযুক্ত ক্ষৌমবস্ত্র। অধোবাসে ত্রিকচ্ছ কৌষেয় পট্ট। কাঁধ অবধি নেমে আসা কেশরাশি একখানি সরু বস্ত্রখণ্ড দিয়ে মাথার পেছনদিকে বাঁধা। বাহুদুটি আজানুলম্বিত, বৃষস্কন্ধ সবল এবং কটিদেশে সিংহসদৃশ। ললাট সুপ্রশস্ত, হনুদেশ কঠিন এবং চোখদুটি অন্ধকার।

রানির পরনে একটি অতিসূক্ষ্ম নীলাম্বরী চীনাংশুক। তসরের পট্টবস্ত্রে বক্ষ আবৃত। ভুজবন্ধে সুবর্ণনির্মিত অঙ্গদ। দেবদুর্লভ কুঞ্চিত কেশরাশি কবরীবন্ধনে মাথার উপর শিখণ্ডের মতো করে বাঁধা। তাতে মল্লিকাফুলের মালা জড়ানো। দুই কর্ণে বজ্রহীরকের কর্ণাভরণ। অনাবৃত বাহুদুটিতে চন্দনপঙ্ক এবং মৃগনাভির প্রলেপ, তার স্নিগ্ধ অথচ তীব্র সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। পদ্মপত্রতুল্য চক্ষু কাজলে সজ্জিত, সস্মিত ওষ্ঠে অলক্তরাগ, কণ্ঠে একটি বহুমূল্য স্বর্ণহার। তাঁকে দেখে উপস্থিত পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রণামের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

চারটি রথ ধীরে ধীরে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রধান দরজার সামনে প্রকাশচন্দ্র এবং রানির রথ। বাকি তিনটি রথ কিছু দূরে। প্রকাশচন্দ্র রথ থেকে নামলেন। তাঁর হাত ধরে সম্রাজ্ঞীও। বাকি তিনটি রথ থেকে অন্যান্য রাজপদাধিকারীরা নেমে এলেন। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি রানিকে অভিবাদন করে বললেন, 'হে বঙ্গমাতৃকা, প্রতি বৎসরের মতো এই বৎসরেও দেবী বজ্রযোগিনীর মহাপূজার জন্য আমি, ভন্তে বিশুদ্ধকীর্তি, আপনাকে সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বঙ্গদেশের কল্যাণ হোক, শান্তি ও কল্যাণ বারিধারার মতো ঝরে পড়ুক এই দেশের সর্বত্র। পরমেশ্বর প্রকাশচন্দ্র এবং আপনার স্নেহশাসনে এই দেশের জনসাধারণ ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, মৎস্য এবং মাংসে পরমসুখে প্রতিপালিত হতে থাকুক। আসুন দেবী, পরমমাতৃকা ব্রজযোগিনীর কাছে আমরা সমবেতভাবে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি। যেন আমাদের এই পরমপূজ্য মাতৃকাভূমির অক্ষয় সৌভাগ্যচিহ্ন...'

‘ঘৃতে, অন্নে, মৎস্যে, মাংসে তো দেহখানি দিব্যি বানিয়েছেন মশাই। দশটা বাঘে খেয়েও শেষ করতে পারবে না। সাধারণ মানুষ কী খেয়ে বেঁচে আছে জানেন?’

উপস্থিত জনতার মধ্যে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল কথা ক’টি। সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠে থেমে গেল।

রাজগুরু থমকে গেলেন। বাকি ছয় জন স্তম্ভিত। রানি এবং প্রকাশচন্দ্র স্থির।

এবার অন্যদিক থেকে কে যেন বলে উঠল, ‘রাজগুরু, আপনি না ধর্মপুরুষ? এই কুলটা, বহুভোগ্যা নারীর পাদবন্দনা করতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না?’

উপস্থিত জনতা নিঃশব্দ। ক্রুদ্ধা মহাসর্পিণীর মতো ঘুরে দাঁড়ালেন রানি। তাঁর কবরী খুলে গিয়ে কেশরাশি নেমে এল কটিদেশ অবধি। চক্ষু জ্বলছে।

বাকি ছয় জন এগিয়ে এসে রানির রথের সামনে দাঁড়ালেন। গিরিকিশোর কর্কশকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, ‘কার এতদূর স্পর্ধা আমাদের সম্রাজ্ঞীর চরিত্র নিয়ে কুকথা উচ্চারণ করে? সাহস থাকলে সামনে আয়। তোর জিহ্বা ছিঁড়ে কুকুরকে খাওয়াব।’

এবার উত্তর এল সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে, ‘ওরে লম্পট, তোর না হয় লঘুগুরু জ্ঞান নেই। রাজপদ লেহন করে তোর আর তোর উপগৃহিণীদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। কিন্তু আমাদের মতো বঙ্গবাসী এই স্বৈরিণী নারী আর প্রকাশচন্দ্র নামের ওই কূট কাপালিকের শাসনে কীভাবে জীবনধারণ করছে—তার কোনও সংবাদ রাখিস?’

রাজন্যবর্গ বিভ্রান্ত। কারা উচ্চারণ করছে এই কুবাক্য? এই সাহস, এই স্পর্ধা সাধারণ জনতার হল কীভাবে?

তবে দ্রুত তাঁরা সুস্থিত হলেন। জিতসেন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ‘রাজসেবকদল, তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, এই দণ্ডেই এই দুর্মুখ প্রজাদের আমাদের কাছে উপস্থিত করো।’

রাজসেবকসৈন্য প্রশ্ন করে না। শুধু আদেশ পালন করে। তারা রথশ্রেণীর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের একহাতে খড়্গ, অন্যহাতে ভল্ল। তাদের যদি বলা হয়, সমবেত জনতার প্রত্যেককে হত্যা করতে হবে, তারা তাই করবে। আদেশ পালন অথবা মৃত্যু, এই হচ্ছে তাদের ধর্ম।

কিন্তু তারা আগুয়ান হওয়ার আগেই আদেশ ভেসে এল, ‘আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন মহাদণ্ডনায়ক। পূজাপ্রাঙ্গণে রক্তপাত শ্রেয় নয়।’

প্রকাশচন্দ্রের কণ্ঠ শুনে থেমে গেল সৈন্যদল। শান্তঘোষ প্রকাশচন্দ্রের কাছে এসে বললেন, ‘আপনার আশঙ্কাই তাহলে সত্য হল প্রভু। বিদ্রোহ তাহলে কর্মান্তবাসকের রাজদ্বারে পৌঁছে গেল!’

প্রকাশচন্দ্র শান্তস্বরে বললেন, ‘তাই তো মনে হচ্ছে আর্য শান্তঘোষ।’

অপমানে রাজ্ঞীর হাত দুটি কাঁপছিল। চাপা ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘এরা কারা, নাথ? এদের এত স্পর্ধা হয় কী করে যে, সর্বসমক্ষে আমার নামে এই দুর্বাক্য উচ্চারণ করে?’

প্রকাশচন্দ্র নির্বিকার মুখে বললেন, ‘এরা তাঁরাই, যাঁদের কথা বলেছি রানি।’

‘কিন্তু এই জনারণ্যে এমন অসভ্যতা?’ প্রশ্ন করলেন বিস্মিত অমিতাভভট্ট।

‘জনসমাগমই অপরাধীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ যবনিকা, প্রধানমন্ত্রী মহোদয়। জনতার মুখ নেই, অবয়ব নেই, চরিত্র নেই। তার নিশ্চল অন্তরালে থেকে মহত্তম অপরাধ সংঘটিত করা সম্ভব।’

‘অর্থাৎ?’

‘অর্থাৎ আমাদের প্রতিস্পর্ধীরা আমাদের থেকে কম চতুর নয় মন্ত্রীমশাই!’

প্রকাশচন্দ্র বলতে বলতেই জনতার মধ্যে থেকে কারা যেন সমস্বরে বলে উঠল, ‘এই উন্মাদ রানির শাসনের অবসান চাই। চৈনিক ঘটদাস প্রকাশচন্দ্রের হাত থেকে মুক্তি চাই।’

রাজপদাধিকারীরা, বুদ্ধগুপ্ত এবং উপস্থিত শ্রমণেরা হতভম্ব। কর্মান্তবাসকের মাটিতে যে কোনওদিন এই ধ্বনি উঠতে পারে—এ তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু তাঁদের বিস্ময় বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে এবার আরও অধিক মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'চন্দ্রবংশ ধ্বংস হোক। সপ্তরাজন্যর কুশাসন উৎসন্ন হোক। জয় গৌড়, জয় বঙ্গ, জয় শশাঙ্ক।'

বিস্মিত হলেন অগ্নিমিত্র, 'এত কণ্ঠ? এত মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে?'

প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'অনেক নয় অগ্নিমিত্র, মাত্র কয়েকজনের কণ্ঠস্বর।'

রানি বললেন, 'কিন্তু অনেকের স্বর শোনা যাচ্ছে যে নাথ।'

'অনেকের স্বর শোনা যাচ্ছে, কারণ অনেকের স্বর শোনানো হচ্ছে।'

'কিন্তু...কিন্তু এ কী করে সম্ভব মাননীয়?' আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করলেন।

'খুবই সম্ভব মাননীয় রাজগুরু। এ অতি বিচিত্র বিদ্যা, এর নাম অভিস্বরক্ষেপণ। এর দ্বারা আপনি ওষ্ঠ বিন্দুমাত্র কম্পিত না করে স্বরপ্রয়োগ করতে পারেন। স্বরকে উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরাগত ধ্বনিতে পরিবর্তন করতে পারবেন। একই কণ্ঠ থেকে বহুজনের স্বর উৎপন্ন করতে পারবেন।'

'এ কেমন বিদ্যা প্রভু?'

'আশ্চর্য বিদ্যা, আচার্য। এর উদ্ভব অতিদূর পাশ্চাত্য দেশে। মহান সম্রাট গাওজং-এর রাজসভায় এই বিদ্যায় পারদর্শী এক পাশ্চাত্যদেশী যুবক এসেছিল। তার কাছেই আমি গোপনে এই আশ্চর্য শব্দবিদ্যা শিখেছি। আমাদের শত্রুরা এখন সেই বিদ্যারই প্রয়োগ করছে।'

বিশুদ্ধকীর্তি বিহ্বলভাবে বললেন, 'কিন্তু সেই বিদ্যা এদের কাছে পৌঁছল কী করে মহোদয়?'

'প্রশ্ন সেটি নয় রাজগুরু', সামান্য অধৈর্য হলেন প্রকাশচন্দ্র, 'প্রশ্ন হচ্ছে এই মুহূর্তে ওদের ঠিক কতজন উপস্থিত আছে এখানে।'

ছ'জন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, রানি, প্রকাশচন্দ্র এবং ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত তাকালেন উপস্থিত জনতার দিকে। এই প্রথম তাঁরা অনুভব করলেন যে তাঁরা কতটা একা। এবং কতটা অসহায়।

প্রকাশচন্দ্র নিম্নস্বরে বললেন, 'রাজগুরু, দ্রুত পূজা সম্পন্ন করুন।'

বিশুদ্ধকীর্তি দ্রুতপদে মন্দিরের ভিতরে অন্তর্হিত হলেন। প্রতিবার রানি ও প্রকাশচন্দ্র মন্দিরে আগত অন্যান্য মূর্তিগুলিকে প্রথমে অর্চনা করেন, তারপর বজ্রযোগিনীর আরাধনা সম্পন্ন করেন। কিন্তু আজ কেউ সেসবের মধ্যে গেলেন না। সরাসরি গর্ভগৃহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বুদ্ধগুপ্তর সঙ্গে বাকি শ্রমণেরা উচ্চৈঃস্বরে সমবেতভাবে যোগিনীমন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। একজন সেবক সজোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগল।

তখন মন্দিরের ঠিক বাইরে বলিপ্রদত্ত মহিষগুলিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। শৌনিকদল তাদের বৃহৎ খড়্গগুলির ধার পরীক্ষা করে নিচ্ছে শেষবারের মতো। প্রথম বলি প্রকাশচন্দ্র নিজের হাতে দেবেন। একটি অতি উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মহিষ তার জন্য প্রস্তুত।

কিছু পরেই প্রকাশচন্দ্র ও বাকিরা বেরিয়ে এলেন। প্রকাশচন্দ্রের প্রশস্ত ললাট জুড়ে আশীর্বাদী সিন্দুর। উন্মুক্ত সুঠাম নির্লোম বক্ষে অজস্র মুক্তার মতো স্বেদবিন্দু। প্রকাশচন্দ্রের ডানহাতে তাঁর অজেয় খড়্গ। উচ্চতায় সেটি তাঁর কোমর অবধি।

এই তরবারি সম্রাট গাওজং-এর ব্যক্তিগত তরবারিসহায়ক, শাও ফেং-এর নিজের হাতে প্রস্তুত। দীক্ষাদাত্রী য়ু জেতিয়ান এই 'তাংদাও'-টি স্বয়ং শোধন করে প্রকাশচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করেন। যতদিন এই তরবারি প্রকাশচন্দ্রের অধিগত থাকবে, ততদিন নাকি কোনও যুদ্ধে তাঁর পরাজয় হবে না।

প্রধান শৌনিক কৃষ্ণবর্ণ মহিষটিকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁর অজেয় তাংদাও নিয়ে মহিষটির দক্ষিণদিকে এসে দাঁড়ালেন। 'জয় দেবী বজ্রযোগিনীর জয়' ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত হল। সেই বিপুল কোলাহলে মহিষদল চঞ্চল হতে অপরাপর শৌনিকেরা তাদের গলার রশিগুলি শক্ত করে ধরল।

বিশুদ্ধকীর্তি দুই হাত তুলে অধীর জনতাকে শান্ত হতে বললেন। চারিদিকে উৎসুক নৈঃশব্দ্য নেমে এল। সবাই অপেক্ষা করে আছে প্রথম বলির জন্য। একটু আগেকার সাময়িক কটুবাক্যর কথা যেন কারও মনেই নেই।

প্রকাশচন্দ্র তাঁর তরবারি মাথার ওপর তুললেন।

চারিদিকে সগর্ভ নৈঃশব্দ্য। নিশ্চুপ উল্লাস।

বিশুদ্ধকীর্তি মুখ খুললেন বধমন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য।

কিন্তু তাঁর মুখ হতে প্রথম শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার আগেই মাথার ওপর একটি তীব্র সাঁই সাঁই শব্দ শোনা গেল। উপস্থিতজন মাথা তুলে দেখলেন একটি তীরবিদ্ধ গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ বস্তু উড়ে আসছে মন্দিরের প্রধান দ্বারের দিকে। তীরবিদ্ধ বস্তুটি যূপকাষ্ঠের ঠিক সামনে এসে পড়ল। অতি সাধারণ দর্শন একটি গোলাকার কন্দুক, তার মুখে একটি জ্বলন্ত পলিতা।

অন্যান্য রাজপুরুষরা হেসে উঠলেন। জিতসেন বললেন, 'বিদ্রোহীরা কি তাহলে আমাদের কন্দুকক্রীড়ায় আহ্বান করছে প্রভু প্রকাশচন্দ্র?'

প্রকাশচন্দ্র কিন্তু হাসছিলেন না। তিনি বিস্ফারিত চোখে মুহূর্তকাল চেয়ে রইলেন জ্বলন্ত কন্দুকটির দিকে, তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'সাবধান, সাবধান রাজন্যবর্গ! এই মুহূর্তেই ভূমিশয্যা নিন।'

এই বলে একহাতে রানিকে ধারণ করে ভূতলে শায়িত হলেন।

পরক্ষণেই অত্যুজ্জ্বল আগুনের সঙ্গে কর্ণবিদারী শব্দ। মনে হল যেন শতসহস্র বজ্রপ্রভা বিস্ফোরিত হল। প্রথমেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল যূপকাষ্ঠটি। যূপকাষ্ঠবদ্ধ মহিষটির ছিন্নমুণ্ড তীব্রবেগে আকাশে উত্থিত হয়ে গর্ভগৃহের সামনে গিয়ে পড়ল।

কয়েক ক্ষণের বিমূঢ় স্তব্ধতা। তারপরেই সহস্রককণ্ঠের অসহায় আর্তচিৎকার, আর আতঙ্কিত কলরোলে মুখরিত হয়ে উঠল মন্দিরপ্রাঙ্গণ। ভীত জনতার আর্তনাদ, শিশু ও নারীদের ক্রন্দন, আর উপায়হীন মানুষের অসহায় হাহাকার।

রাজন্যরা প্রকাশচন্দ্রের আদেশমাত্র ভূমিশয্যা নিয়েছিলেন, রাজসেবকদের প্রতিটি সেনাও তাই। একটু পর তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। পরক্ষণে তাঁদের চোখের সামনে সমগ্র দৃশ্যটির স্বপ্নাতীত পরাবাস্তবতা প্রকট হল।

এই বিস্ফোরণ এবং উপস্থিত জনতার আর্তনাদ বিচলিত করে তুলেছে মহিষদলকে। সবলে মুক্ত হয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভাবে ছুটে আসছে মন্দিরের প্রধানদ্বারের দিকে। ফলে এই অশান্ত মহিষদল এবং আতঙ্কতাড়িত জনরাশি, এখন এরা তাঁদের দিকেই সর্বগ্রাসী মৃত্যুর মতো ধাবমান!

আর সেই উন্মত্ত মহিষদলের মধ্যমণি যে পর্বতপ্রমাণ মহিষটি, তার পিঠের ওপর শৃঙ্গদুখানি ধারণ করে আছে কে? ও কার অবয়ব?

রাজসেবকসেনা ততক্ষণে তাদের অভ্যস্ত দায়িত্ববোধে ফিরে এসেছে। তারা তৎক্ষণাৎ রাজ্ঞী, প্রকাশন্দ্র এবং অন্যান্য রাজন্য, বুদ্ধগুপ্ত এবং শ্রমণদের ঘিরে দাঁড়াল।

তারপরেই যেন পাতালের গহীন অন্ধকার থেকে পূর্বসমুদ্রের ভয়াবহতম ঝঞ্ঝা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের ওপর।

কেউ জানে না কত দণ্ড পর, এই ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ থামল। সবাই উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণ শূন্য, কেবল ইতিউতি কয়েকটি আহত দেহ পড়ে আছে। আর পড়ে আছে ধ্বংসলীলার হৃদয়বিদারক চিহ্ন। সৌভাগ্যক্রমে মন্দিরের মধ্যে কেউ প্রবেশ করেনি। কিন্তু তাতেও ক্ষতি যা হয়েছে তাও কম নয়। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি ভূমিশয্যা থেকে ওঠার চেষ্টা করে ফের শুয়ে পড়েছেন। ভন্তে বুদ্ধগুপ্ত এবং বাকি শ্রমণেরা নিজেরাও অল্পবিস্তর আহত। তবুও তাঁরা চেষ্টা করছেন আচার্য বিশুদ্ধকীর্তিকে তুলে ধরার। জিতসেন এবং শান্তঘোষ শক্তধাতের মানুষ, তাঁদের সৈন্যাভ্যাস আছে।

তাঁরাও যথেষ্ট আহত, তবুও এইসব আঘাত সামলে নিয়ে তাঁরা উঠে দাঁড়িয়েছেন। মহাসান্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্র তাঁর বিধ্বস্ত রথের চক্রটি অবলম্বন করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। তিনি দৃশ্যতই বিস্রস্ত, বিচলিত এবং বিধ্বস্ত। প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট নরম মনের এবং নরম শরীরের মানুষ। কিন্তু তাঁর মানসিক বল অসাধারণ। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, তবুও ইতিমধ্যেই তিনি উঠে বসেছেন। চক্ষু দু'খানি মুদিত করে কী যেন বিড়বিড় করছেন।

শুধুমাত্র প্রকাশচন্দ্র অবিচলিত!

তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে উঠে দাঁড়িয়েছেন আহত এবং ক্রুদ্ধ পশুরাজ। তাঁর দুই বাহুর পেশিগুলি ফুলে উঠেছে বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো। প্রশস্ত বক্ষ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্তবর্ণ মুক্তাবিন্দু। চোখে ঝলসে উঠছে প্রতিশোধের অগ্নি। তাঁর পায়ের কাছে অবশ লতার মতো লুটিয়ে আছেন বঙ্গদেশের অবিসংবাদী কর্ত্রী, বঙ্গসম্রাজ্ঞী। তাঁর দেহে প্রাণ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। প্রকাশচন্দ্র ক্ষণিকের জন্য নীচু হয়ে রানির নাকের কাছে নিজের করতল প্রসারিত করলেন। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে কে কোথায় আছিস? রানিকে প্রাসাদে নিয়ে চল, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দে।'

বলেই তিনি চকিতে চারিদিকে ক্ষিপ্ত শার্দূলের মতো তাকালেন। কই, তাঁর মহাখড়্গ কই? যা দিয়ে তিনি এতদিন শাসন করে এসেছেন এই অভিশপ্ত ভূমি, য়ু জেতিয়ান-এর আশীর্বাদধন্য সেই অজেয় তাংদাও কোথায়?

ক্রোধবহ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে কঠোর সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করলেন প্রকাশচন্দ্র। আরও অনেককিছুর মতো এই বিপর্যয় নিয়ে গেছে তাঁর অবলম্বনটিকেও।

তাঁর অজেয় খড়্গ উধাও!



অন্তপর্ব

অন্ধকার কুটির। জানালাদুটি বন্ধ। অল্প হাওয়ায় দরজা কাঁপছে তিরতির করে। অশ্বত্থের কাণ্ড-জটা বেয়ে, বৃক্ষশাখানির্মিত দরজার ফাঁক দিয়ে বিষণ্ণ চাঁদের আলো উঁকি মারছে। চারিদিকে কোনও শব্দ নেই। ঘরের মধ্যে জমাট বাঁধা স্তব্ধতাও যেন শ্বাস বন্ধ করে রয়েছে।

ধীরে ধীরে দরজাটি উন্মুক্ত হল। কয়েকটি ছায়ামূর্তি নিঃসাড়ে, নিঃশব্দে ঢুকে এল ভেতরে। দুজন দরজার বাইরে রয়ে গেল, পাহারা দেওয়ার জন্য।

আগন্তুকরা সবাই মাটিতে গোল হয়ে বসলেন। একটু পরে চকমকি পাথরের ঠোকাঠুকির শব্দ। একটি শুষ্ক গাছের ডাল জ্বলে উঠল। তারপর কেউ সেই অগ্নিশিখাটি নিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালালেন।

প্রদীপের অল্প আলোয় ঘরটি আলোকিত হয়ে উঠল। সেই আলোয় দেখা গেল ঘরের মাঝখানে একটি কাঠের তৈরি নীচু চতুর্পদী। তার ওপর একটি বড় মাটির প্রদীপ। পাশে রাখা রয়েছে একটি অতি দীর্ঘ তরবারি।

মৎস্যেন্দ্রনাথ রুদ্ধস্বরে বললেন, 'প্রকাশচন্দ্রের অজেয় তাংদাও। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তরবারি শিল্পী শাও ফেং-এর বানানো সর্বোত্তম শিল্প।'

উপস্থিত বাকিরা উদগ্র আগ্রহের সঙ্গে তরবারিটিকে দেখতে লাগলেন।

তরবারিটি দৈর্ঘ্যে দু'হাত লম্বা, হাতলটি আধ হাত। হাতলে সোনা আর হাতির দাঁতের বিচিত্রসুন্দর কারুকার্য। লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণধার দেহকাণ্ডটি ছয় অঙ্গুলি প্রশস্ত। প্রদীপের স্তিমিত আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে ফলার উদ্ধত ঔজ্জ্বল্য। হাতলের বাঁটের কাছে একটি ধাতুনির্মিত বলয়। তাতে কোনও এক অজানা লিপিতে লেখা কয়েকটি অক্ষর। শীর্ষটি ঈষৎ বক্র ও ক্রুর।

'কীভাবে এটি হস্তগত হল প্রভু?' প্রশ্ন করলেন কান্তিপ্রভ। তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না—প্রকাশচন্দ্রের অজেয় তরবারি এখন তাঁর কুটিরে। এই তরবারি চিরকাল বঙ্গবাসীর মনে যুগপৎ ভয় এবং সমীহ সৃষ্টি করে এসেছে। লোকমুখে প্রচলিত যে, যতদিন এই তরবারি প্রকাশচন্দ্রের হাতে থাকবে, ততদিন তিনি যে-কোনও দ্বন্দ্বে বা রণে অপরাজেয় থাকবেন।

'আমাদের বন্ধু, কুমার বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের সৌজন্যে।' মৎস্যেন্দ্রনাথ মৃদু হাসলেন।

জয়াপীড় কিছু বললেন না। এখনও তাঁর মুখের একদিক ফোলা। চোখের নীচে গভীর ক্ষত। ডান বাহুতে একটি কাপড়ের পট্টি বাঁধা। সেটি কালচে রক্তে মাখামাখি। তিনি উদাসীন স্বরে বললেন, ‘গৌড়ের রাজপথে একদা সিংহশিকার করেছিলাম বটে, কিন্তু সে নেহাত বাধ্য হয়েই। কিন্তু ওই উন্মত্ত মহিষের পিঠে চড়া আর স্বয়ং যমরাজকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানান যে একই ব্যাপার--সেটি পূর্বে অনুমান করিনি। করলে এই কাজে সম্মত হতাম কি না বলতে পারি না।’

‘হুম, কুমারের অভিজ্ঞতা বিশেষ সুখকর হয়নি মনে হচ্ছে।’

কথাটা শুনেই একবার সামান্য কেঁপে উঠলেন জয়াপীড়, তারপর বললেন, ‘বাপরে বাপ কোনওমতে মোষটার পিঠে চড়েছি কি চড়িনি, মনে হল যেন রোখের বশে কোন এক মারাত্মক ঘূর্ণিঝঞ্ঝার টুঁটিই টিপে ধরেছি, আর সে ক্রমাগত আমাকে নীচে ফেলে পিষে মারবে বলে মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে। কী তার আক্রোশ! কী তার উন্মত্ততা! বাপ রে, এমন প্রলয়ঙ্করী জীব জীবনে দুটি দেখিনি।’ বলে একবার চোখ বুজে শিউরে উঠলেন জয়াপীড়।

‘এরজন্যই তো একজন বীরোত্তমের প্রয়োজন হয় কুমার।’ জয়াপীড়ের পিঠে হাত রাখলেন বপ্যট, ‘তবে একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা হিসেবে এ কথা বলতে পারি, আজ আপনি যে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। আপনি বীর ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের যোগ্য উত্তরসূরি।’

এসব কথা শুনছিলেন না আচার্য শান্তরক্ষিত। তিনি বললেন, ‘এই তরবারির বিশেষত্ব কী, প্রভু?’

প্রদীপের আলো মৎস্যেন্দ্রনাথের শান্ত স্থিতধী মুখের উপর আলোছায়ায় আলপনা আঁকছিল। তিনি স্বগতসুরে বলতে লাগলেন, ‘তরবারিটি যে বিশিষ্ট সে নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বিশেষত্বর বিষয়ে জানার আগে আরও কয়েকটি ব্যাপার আমাদের বিশদে জানতে হবে ভ্রাতা। মহাঅভ্যুত্থান আমাদের দ্বারপ্রান্তে। এখন সময় এসেছে সমস্ত কিছু বিশদে ব্যক্ত করার।

‘এই মুহূর্তে বঙ্গদেশের ভাগ্য ঘিরে রেখেছে তিনটি প্রধান রহস্যজাল। সেগুলির মীমাংসা না করে এই অভ্যুত্থান সফল করা কঠিন। তার মধ্যে আপাতত খণ্ডিতারাতি বপ্যটের বংশ ও জন্মসংক্রান্ত রহস্যটির সমাধান হয়েছে। আমরা জানি যে কুমার গোপালদেবের বঙ্গদেশের শাসক হওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। যোগ্যতাও যে আছে তার প্রমাণ গোপালদেব নিজেই দেবেন।

‘দ্বিতীয় রহস্যটি হচ্ছে--প্রকাশচন্দ্রের এই অতিলৌকিক, অতিমানবিক শক্তির উৎস কী? এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কী চান। এবং কে এই রানি? কে তিনি? এই রঙ্গমঞ্চে তিনি প্রধানা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন কী করে?

বহুদিন ধরে আমি এই দ্বিতীয় রহস্য সমাধানের চেষ্টায় রত ছিলাম। এর জন্য আমাকে বহুদিন ধরে বহু শ্রমে বহু অনুসন্ধান করতে হয়েছে। দেশে-বিদেশে অনেক চর প্রেরণ করেছি। বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। অনেক তথ্য আহরণ করেছি। কিন্তু কিছুতেই কোনও সমাধানসূত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে দেবাদিদেব আদিনাথ দয়া করলেন। অকস্মাৎ এক ঝটিকায় সমস্ত রহস্যের উপর হতে যবনিকা উত্তোলিত হল।

প্রতিবেশী দেশগুলি যে সদা সর্বদাই একে অন্য দেশের অভ্যন্তরে নিজ নিজ চর প্রেরণ করে, সে আপনাদের অজানা নয়। চীন দেশেও তিব্বতনরেশ মে অগছোমের প্রেরিত কয়েকটি গুপ্তচর দল সক্রিয়। তাদের মধ্যে একটি দলের অধিনায়ক হলেন রিনছেন সাংপো। গুপ্তচরবিদ্যায় ইনি তিব্বতে প্রায় প্রবাদপুরুষ।

‘আজ থেকে দুই বৎসর পূর্বে রিনছেন সাংপোর হাতে দৈবাৎ রাজকীয় গ্রন্থাগারের কিছু গোপন পুঁথি এসে পড়ে। তাতে তিনি এমন কিছু খুঁজে পান, যা তাঁর কৌতূহল চতুর্গুণ বর্ধিত করে। অনেক গোপন সন্ধান চালানোর পর গত হেমন্তে জনৈক চীনদেশীয় বৃদ্ধের সঙ্গে রিনছেন সাংপো’র যোগাযোগ হয়। এই বৃদ্ধের পিতামহ চীনের সম্রাট গাওজং-এর ঘনিষ্ঠতম মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সেই ধুরন্ধর গুপ্তপুরুষটি এক

অত্যন্ত গোপন ও চাঞ্চল্যকর কাহিনি উদ্ধার করেন। তিনি সেই দীর্ঘ কাহিনি লিপিবদ্ধ করে তিব্বত রাজপুত্র ঠ্রিসং দেৎসেনের উদ্দেশে একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। কুমার দেৎসেন সেটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভন্তে কমলশীলের হাতে দেন। কমলশীল রাজপুত্র পদ্মসম্ভবের সহায়তায় সেই পত্রটি সহ আরও দুখানি অতি মূল্যবান বস্তু সঙ্গে নিয়ে গৌড়ে ফিরে আসতে সমর্থ হয়। সেই পত্রটির সহায়তায় আমি সমগ্র পরিস্থিতি সম্যকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি। অসামান্য এবং অত্যাশ্চর্য কাহিনি। তবে তার আগে চীনদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আপনাদের জানা উচিত। আপনারা মন দিয়ে শুনুন।

আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে চীনদেশ শাসন করছিলেন তাং বংশের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট তাইজং এবং তাঁর পুত্র সম্রাট গাওজং।

চীন সম্রাটদের মধ্যে রাজ্যের সুন্দরীতম কন্যাদের উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার প্রথা আছে। রাজার রক্ষিতা হতে পারা চীনদেশে বিশেষ গৌরবের বিষয়। রাজানুগ্রহপ্রার্থীরা সম্রাটের অন্তঃপুরে নিজ নিজ কন্যাদের পাঠাতে পারলে নিজেদের সৌভাগ্যবান বিবেচিত করেন।

সম্রাট তাইজং-এর উপপত্নীদের মধ্যে একটি চতুর্দশী কন্যা ছিল, নাম য়ু জেতিয়ান। তার পিতা ছিলেন তাং রাজসভার এক উচ্চপদস্থ রাজন্য।

য়ু জেতিয়ান তাঁর সময়ের নারীদের তুলনায় বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অনেকাংশে অগ্রসর ছিলেন। তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে তাঁর নৈপুণ্য ছিল। তাঁর প্রতিভা দেখে সম্রাট তাইজং চমৎকৃত হন এবং য়ু জেতিয়ানকে তাঁর সচিব পদে নিয়োগ করেন।

য়ু জেতিয়ান অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী নারী ছিলেন। তিনি দ্রুত রাজকার্য-সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি শিখে নেন এবং রাজসভায় তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। বিদেশনীতি বা কূটনীতিতে তাঁর আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি ছিল। তিব্বতরাজ স্রোংচান গ্যাম্পোর সঙ্গে রাজকুমারী ওয়েনচেং-এর বিবাহও তাঁর বুদ্ধিতেই স্থির করা হয়। ক্রমেই তিনি সম্রাটের নির্ভরযোগ্য সঙ্গিনী হয়ে ওঠেন।

এই সময়েই তাঁর পরিচয় হয় সম্রাট তাইজং এর সন্তান, তরুণ রাজপুত্র গাওজং এর সঙ্গে।

কিন্তু পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগেই সম্রাট তাইজং মৃত্যুবরণ করেন।

চীনের প্রথা হচ্ছে সম্রাট দেহরক্ষা করলে রাজার সমস্ত উপপত্নীদের মস্তক মুণ্ডন করে সঙ্ঘের শরণ নিতে হয়, যাতে রাজার উচ্ছিষ্ট অন্য কেউ ভোগ করতে না পারে। সম্রাট তাওজং-এর তিরোধানের পর য়ু জেতিয়ানও সেই প্রথানুসারে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। কিন্তু এরপরেই ঘটে যায় এক আশ্চর্য কাণ্ড। কয়েকমাস পরেই দেখা গেল য়ু জেতিয়ান ফিরে এসেছেন রাজপ্রাসাদে, এবং নির্বাচিত হয়েছেন নতুন সম্রাট গাওজং-এর প্রধানা উপমহিষী রূপে।'

'এ যে ঘোর অজাচার।' অস্ফুটস্বরে বললেন বপ্যট।

ম্লান হেসে মাথা নাড়লেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। 'সেই অজাচারের বিষই তো প্রবেশ করেছে বঙ্গদেশের রাজপ্রাসাদে। নইলে রাজকুমার আনন্দচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিমাতার বিবাহ কি আমরা দুঃস্বপ্নেও আশঙ্কা করেছিলাম মিত্র বপ্যট?'

বপ্যট চুপ করে গেলেন। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

'সম্রাট গাওজং দুর্দান্ত প্রকৃতির সম্রাট হলেও কোনও এক অজানা রোগে প্রায়শই রাজকর্ম থেকে অব্যাহতি নিতেন। তাঁর পরিবর্তে রাজকার্য সামলাতেন তাঁর প্রিয়তমা উপপত্নী, য়ু জেতিয়ান।

বলা বাহুল্য, য়ু জেতিয়ানের এই উত্থান রাজসভার অনেকেই ভালোভাবে নেননি। তবে তাঁদের ক্ষোভ নিয়ে সম্রাটের ঘনিষ্ঠতম উপপত্নীর কোনও চিন্তা ছিল না। তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল অন্য দুই মহিলাকে নিয়ে। সম্রাটের বৈধ পত্নী, সম্রাজ্ঞী ওয়াং; এবং য়ু জেতিয়ানের পূর্বে যিনি প্রধানা উপপত্নী ছিলেন, সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ঝাও শুফেই।

সম্রাজ্ঞী ওয়াং সন্তানহীনা ছিলেন। ঝাও শুফেই-এর একটি পুত্র ও দুটি কন্যাসন্তান ছিল। প্রথা অনুযায়ী ঝাও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই পরবর্তী সম্রাট হওয়ার কথা। কিন্তু তাঁরা প্রমাদ গণলেন যখন য়ু জেতিয়ান পরপর দুটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। সম্রাট যদি প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে ঝাও শুফেই-এর পুত্রের বদলে প্রিয়তমা য়ু জেতিয়ানের পুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন?

এই নিয়ে রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটা চোরা স্রোত বইতে লাগল।

এদিকে সম্রাটের শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছে। রাজকার্য পরিচালিত হচ্ছে য়ু জেতিয়ান-এর পরামর্শ অনুসারে। রাজবৈদ্য সন্দেহ করছেন রাজার ওপর কোনও দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু অব্যর্থ বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। সন্দেহের তীর য়ু জেতিয়ানের দিকেই। কিন্তু তার কোনও প্রমাণ নেই।

এমন সময় য়ু জেতিয়ানের একটি কন্যাসন্তান হয়। আর এখান থেকেই সমস্ত সর্বনাশের শুরু।'

সবাই একটু নড়ে চড়ে বসেন। প্রদীপের শিখা ম্লান হয়ে আসছিল। কান্তিপ্রভ প্রদীপের মধ্যে একটু সর্ষের তেল ঢেলে দিতে পলিতাটি ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'যেদিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেইদিনই সন্ধেবেলায় তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। শিশুটির গলায় ছিল আঙুলের দাগ। স্পষ্ট বোঝা যায় কেউ শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যা করেছে এই সদ্যোজাত নিষ্পাপ শিশুটিকে।

'য়ু জেতিয়ান অভিযোগ আনেন--সন্তানহীনা সম্রাজ্ঞী ওয়াং ঈর্ষাবশত তাঁর কন্যাকে হত্যা করেছেন। কারণ মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো যখন শিশুটিকে জীবিত দেখা যায়, তখন সম্রাজ্ঞী ওয়াং ছাড়া তার কাছে আর কেউ ছিল না। আর এই ঘৃণ্যকর্মে তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেছেন ঝাও শুফেই!

তাং বংশের বিচারব্যবস্থা বড়ই কঠিন। সম্রাজ্ঞী ওয়াং এবং ঝাও শুফেই-এর বিরুদ্ধে বিচার শুরু হল। সম্রাজ্ঞীরা নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলেন না। তাঁদের হাত পা কেটে মদের জালার মধ্যে ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। য়ু জেতিয়ানের পথ নিষ্কণ্টক হল। তিনি সম্রাট গাওজং-এর প্রধানা মহিষীর পদে অধিষ্ঠিতা হলেন। শিশুটির মৃতদেহ নিয়ে য়ু জেতিয়ান চলে গেলেন তাঁর পিতৃগৃহে, সেখানেই সমাধিস্থ করবেন বলে।

এরপর য়ু জেতিয়ান-এর দ্রুত উত্থান ঘটে। কালক্রমে তিনি মহাচীনের প্রথম এবং অদ্যাবধি একমাত্র নারী শাসকের পদে আসীন হন। কিন্তু এই অবধি যা বললাম, তা সবই প্রকাশ্য কাহিনি। তাহলে রিনছেন সাংপো'র হাতে এমন কী তথ্য তুলে দিলেন সেই বৃদ্ধ?

'তিনি তুলে দিয়েছিলেন য়ু জেতিয়ান-এর শৈশব, পরিবার এবং ওই মৃত শিশুটি নিয়ে এক রোমহর্ষক সত্য, যা বহু সাবধানে গোপন রাখা হয়েছিল রাজপরিবারের পক্ষ থেকে। সেই রোমহর্ষক তথ্যটি জ্ঞাত হওয়া মাত্র গুপ্তচরশ্রেষ্ঠ রিনছেন সাংপো তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ সমস্ত গুপ্তচরদের আদেশ দেন য়ু জেতিয়ানের শৈশবের ব্যাপারে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে। তিব্বতী গুপ্তপুরুষেরা বহু কষ্টে যেসব তথ্য উদ্ধার করে এনেছেন, সেসব একত্র করে কাহিনিটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া গেছে।'

উপস্থিত প্রত্যেকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিটি কথা শুনছিলেন। বাইরে তখন রাতচরা পাখির টি টি শব্দের সঙ্গে মিশেছে মৃদু বাতাসের শব্দ। এই কুটিরটি কমলাঙ্ক গ্রামের একদম শেষপ্রান্তে, অরণ্যের সীমারেখার ভিতরে। বৃক্ষশাখানির্মিত কুটিরটি একটি অতি বৃহৎ অশ্বত্থের পাদদেশে অবস্থিত। সেটির চারিপাশে নেমে এসেছে অশ্বত্থের বৃহৎ কাণ্ডজটারাশি। বহিরাগত কারও পক্ষে এই গোপন গৃহটি আবিষ্কার করা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও বটে।

কান্তিপ্রভ'র আদেশ বা অনুরোধে অরণ্যচারী কিরাতদল এই গোপন কুটির প্রস্তুত করে দিয়েছে মাসাধিককাল পূর্বে। ব্রাহ্মণ কান্তিপ্রভ এই কিরাতদের স্পর্শ করেন না বটে, কিন্তু এদের সুখ সুবিধার যথেষ্ট সংবাদ রাখেন। এদের বক্তব্য গ্রামিক বা পঞ্চকুল অবধি পৌঁছে দেওয়া, কারও জটিল রোগব্যাধিতে গ্রামের একমাত্র অম্বষ্ঠ বৈদ্যটির কাছ থেকে ঔষধ এনে দেওয়া, এইসব দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে

নিয়েছেন। তাই তারাও তাঁকে ঈশ্বরপ্রতিম শ্রদ্ধা করে। অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা এজন্য তাঁকে যথেষ্ট উপহাস করেন বটে, তবে কান্তিপ্রভ সেসব স্মিতহাস্যে এড়িয়ে যান।

আপাতত এই কুটিরের বাইরে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে প্রহরারত আছেন রাজকুমার পদ্মসম্ভব এবং বপ্যটপুত্র গোপালদেব। আরও কিছু দূরে ধনুর্বাণ ও কুঠার হাতে আপাতঅদৃশ্য প্রহরাবৃত্ত রচনা করে রয়েছে অরণ্যচারী কিরাতদল। তাদের চোখ এবং কান এড়িয়ে একটি শশকও প্রবেশ করতে পারবে না এই গোপন কুটিরে, এতই নিশ্ছিদ্র সেই প্রহরা।

'কথিত আছে যেদিন য়ু জেতিয়ান জন্ম নেন, সেইদিন ছিল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, যা কি না সমগ্র চীনদেশ জুড়ে দৃশ্যমান ছিল। সেই অত্যন্ত অশুভ সময়ে জন্মগ্রহণ করা নারীটি জন্ম থেকেই কিছু আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁর বাবা য়ু শিহুও ছিলেন একজন প্রভাবশালী রাজকর্মচারী। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে সাধ্যমত শিক্ষাদান করেন, যা ওই দেশের নারীদের পক্ষে বিরল ঘটনা। তবে তার কারণ ছিল।

'য়ু শিহুও'র পরিবারে বহু প্রাচীন কাল থেকে এক বিশেষ গুপ্তবিদ্যার প্রচলন ছিল--বিষবিদ্যা। বিষ ও বিষের প্রতিষেধক, এ বিষয়ে তাঁদের কাছে সহস্রাধিক বৎসরের সঞ্চিত বিদ্যার আধার ছিল। তাঁরা জানতেন না এহেন বিষের সন্ধান এই পৃথিবীতে নেই। সেই বিষবিদ্যা দিয়ে তাঁরা প্রাণহরণ করতেও জানতেন, প্রাণদান করতেও জানতেন। তাঁরা জানতেন কীভাবে এই বিদ্যার প্রয়োগে মানুষকে দীর্ঘজীবন দান করা যায়, ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী করা যায়, আশ্চর্য ঐশী ক্ষমতা অধিগত করা যায়।

'য়ু জেতিয়ান শৈশব থেকেই সেই বিদ্যায় অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি দেখাতে থাকেন। তাঁর পরিবারের লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত যে, সাক্ষাৎ নাগমাতা কা দে লু তাঁদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় যাবতীয় বিষবিদ্যা অধিগত করাই শুধু নয়, নিজের প্রতিভায় য়ু জেতিয়ান এক আশ্চর্য উদ্ভাবন করেন। তার রাসায়নিক প্রয়োগে একজন মানুষকে জড়পদার্থে পরিণত করে রাখা যায়। আবার বিরুদ্ধ রসায়ন প্রয়োগে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

'তবে যে বিশেষ বিষবিদ্যায় য়ু জেতিয়ান আশ্চর্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন তার নাম আমার জানা নেই বটে, কিন্তু তার প্রয়োগের ফলে যে কী অনর্থ উৎপন্ন হয় সেটি আমরা, বঙ্গবাসীরা, অস্থিতে অস্থিতে অনুভব করছি।'

'কী সে বিদ্যা, প্রভু?' শুষ্ক স্বরে প্রশ্ন করলেন জয়াপীড়।

'নাগকন্যা।' ফিসফিস করে বললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'য়ু জেতিয়ান পারতেন একজন নারীকে অর্ধেক মানুষী, অর্ধেক নাগিনী করে তুলতে। সেই নারী তখন তার নিজের ইচ্ছায় একবার মানুষী আরেকবার নাগিনীরূপ ধারণ করতে পারত। তার বিষের তীব্রতা এতই প্রবল যে শিকারের সমস্ত দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। সেই মৃতদেহ এতই বিষাক্ত হয়ে দাঁড়ায় যে সেটি স্পর্শমাত্রে স্পর্শকের জীবন সংশয় হতে পারে।'

ঘোর উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন বপ্যট, 'এ যে অবিশ্বাস্য! আপনি কী বলতে চাইছেন লোকেশ্বর? বঙ্গদেশের রানি প্রকৃতপক্ষে...' অন্যান্যরাও শ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের দিকে।

এই সময়ে দূরে কোথাও যেন একটা ক্ষীণ শিসের শব্দ হল। কিন্তু প্রত্যেকে এতই উত্তেজিত ছিলেন যে কেউ বিশেষ মনোযোগ দিলেন না।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তারপর গম্ভীরস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ ভ্রাতা বপ্যট, তাং সম্রাজ্ঞী য়ু জেতিয়ানের সেই আপাতমৃত কন্যাই এই দেশের রানি।'

উপস্থিত প্রত্যেকে প্রস্তরবৎ বসে রইলেন। কারও মুখে একটি শব্দ উচ্চারিত হল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'আমার কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বটে, তবে সমস্ত সূত্র একই দিকে ইঙ্গিত করছে। নিজের সদ্যোজাত শিশুকন্যাটিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষীর যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিলেন নাগসম্রাজ্ঞী য়ু

জেতিয়ান। নিজের উদ্ভাবিত বিষে তাকে মৃতবৎ আচ্ছন্ন করে রাখেন, এবং তার কণ্ঠে স্বহস্তের পাঁচ অঙ্গুলির ছাপ এঁকে দেন, যাতে সম্রাজ্ঞী ওয়াং এবং ঝাও শুফেইয়ের ওপর সেই ঘৃণ্য অপরাধের কলঙ্কলেপন করা যায়। তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়।

তারপর তিনি শিশুটিকে নিয়ে চলে যান তাঁর পিতৃগৃহে, পারিবারিক সমাধিস্থলে। সেখানে তিনি শিশুটিকে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে শিশুকন্যাটি বড় হতে থাকে, যতদিন না তাকে বৃহত্তর উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায়।'

'কিন্তু লোকেশ্বর, চীনের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজরক্ষিতার সঙ্গে বঙ্গদেশের ভাগ্য এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেল কী করে?' প্রশ্ন করলেন শান্তরক্ষিত।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, 'নিয়তি, নিয়তি কেন বাধ্যতে! নইলে চীন আর তিব্বতের অন্তর্বিরোধের ছায়া বঙ্গদেশের ভাগ্যাকাশে এমন পূর্ণগ্রাস গ্রহণ ডেকে আনবে কেন?

'তাং বংশ অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজবংশ। মহারাজ তাইজং বিশ্বাস করতেন পূর্ব চীন সমুদ্র থেকে কাম্বোজ দেশ, গান্ধার থেকে ভারতভূমি শাসন করার একমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার মহান তাং রাজবংশের। তিনি এও জানতেন ভারতবর্ষ অধিকার করার পথে তাঁর সবচেয়ে বড় কাঁটা তিব্বত। তিব্বত অধিকারে না এলে মহাচীনের পক্ষে ভারতভূমি হস্তগত করার স্বপ্ন সফল হবে না।

কিন্তু তখন তিব্বতে এক নতুন নায়ক মাথা তুলছেন, স্রোংচান গ্যাম্পো। সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে রণদুর্মদ মহাবীর। তাঁকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরাস্ত করা দুর্ধর্ষ তাইজং-এর পক্ষেও অসম্ভব। নিয়তির নির্বন্ধে সম্রাটের সামনে এক সুবর্ণসুযোগ এসে উপস্থিত হল।

'স্রোংচান গ্যাম্পো একবার চীন দেশ ভ্রমণে এসে এক অভিজাতবংশীয়া চীনা তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হন এবং প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রেমে পড়েন। এঁর নাম রাজকুমারী ওয়েনচেং, সম্রাট তাইজং-এর দূরসম্পর্কের এক ভাই দাওজং-এর কন্যা। স্রোংচান গ্যাম্পো তাং রাজসভায় রাজকুমারী ওয়েনচেং-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন।

'কিন্তু দাওজং রাজসভার মহা প্রতিপত্তিশালী রাজন্য, একাধারে মহাসান্ধিবিগ্রহিক এবং প্রধান বিচারপতি। তিনি এই অর্ধবর্বর তিব্বতী রাজার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হলেন।

ক্রুদ্ধ স্রোংচান গ্যাম্পো সসৈন্যে তাং রাজধানী লুওই-ইয়াং অবরোধ করলেন। অসভ্য বর্বর তিব্বতী সৈন্যবাহিনীর হাতে তাং রাজবংশের প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটল। প্রত্যাখ্যাত স্রোংচানের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হতে থাকল লুওই-ইয়াং-এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও নগরসমূহ।

এইসময় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন য়ু জেতিয়ান। তিনি প্রশ্ন করলেন—এত অনর্থক বাদ বিসম্বাদ যুদ্ধোদ্যোগ কীসের জন্য? জয়লক্ষ্মী যখন স্বয়ং রাজদ্বারে উপস্থিত, তখন ভল্ল তরবারি সহযোগে তাঁকে তাড়না করার অর্থ কী?'...

কুটিরের বাইরে থেকে অত্যন্ত ক্ষীণ কিছু শাখাপ্রশাখা ভাঙার শব্দ উঠেই থেমে গেল। বপ্যট একবার ভ্রুকুঞ্চন করে দরজার দিকে তাকালেন। তারপর পুনরায় কাহিনিতে মনোনিবেশ করলেন।

'য়ু জেতিয়ান সম্রাটকে বোঝালেন—তিব্বতকে বশীভূত করার এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। একবার যদি রাজঅন্তঃপুর করায়ত্ত হয়, রাজা যদি চীন রাজকুমারীর সৌন্দর্যে বশীভূত হন, তাহলে তিব্বত রাজসভায় চৈনিক প্রভাব বিস্তার করতে কতক্ষণ? দেশ দখল করতে হলে সদাসর্বদা যে তার ভূমিই দখল করতে হবে তার কী প্রয়োজন!

মহারাজ তাইজং এই যুক্তিতে চমৎকৃত হলেন। বিশ্বস্ত ভ্রাতা দাইজং-কে প্রাসাদে ডেকে প্রভূত পরামর্শ হল। অবশেষে কুমারী ওয়েনচেং তিব্বতনরেশ স্রোংচান গ্যাম্পো'র ঘরণী হয়ে, শাক্যমুনির তরুণ

রাজকুমারমূর্তি নিয়ে, পোতালা প্রাসাদে গমন করলেন। চীন সম্রাটের পরিকল্পনা কালসর্প হয়ে তিব্বত রাজ-অন্তঃপুরবাসিনী হল।

কিন্তু য়ু জেতিয়ান আর সম্রাট তাইজং-এর ষড়যন্ত্র সফল হল না।

স্রোংচান গ্যাম্পো'র প্রথমা স্ত্রী ছিলেন লিচ্ছবিরাজ অংশুবর্মণের কন্যা ভৃকুটী। তিনি ভগবান তথাগত'র পুণ্য জন্মস্থান কপিলাবস্তুর ভূমিকন্যা। তিনিও বিবাহের পর তারা, অক্ষোভ্য এবং মৈত্রেয়মূর্তি নিয়ে এসেছেন। তিব্বতরাজ স্রোংচান গ্যাম্পো দুই মহিষীর জন্য দুটি পৃথক মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। তাঁর উৎসাহে তিব্বতীয় লিপি ও ব্যাকরণের জন্ম হল। বিভিন্ন বৌদ্ধ পুঁথির পাঠোদ্ধার করে তার তিব্বতীয় অনুবাদ শুরু হল। শুরু হল দুই মহিষীর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রাম।

তিব্বতের রাজসভায় সামন্তশাসকরা চিরকালই প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে এসেছেন। তাঁরা মহারাজের বৌদ্ধধর্মে মতির কথা শুনে আশঙ্কিত হলেন। স্পষ্ট হয়ে গেল যে সম্রাট সামন্তপ্রভাব খর্ব করে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চান। সামন্তরা প্রায় প্রত্যেকেই তিব্বতের প্রাচীন পোন ধর্মের অনুসারী। তাই রাজদণ্ড এবং সামন্তচক্রের এই দ্বৈরথে মহারাজ স্রোংচান গ্যাম্পো অবলম্বন করলেন বৌদ্ধধর্ম, আর তাতে তাঁর প্রধান সঙ্গী হলেন তাঁর মহিষী ভৃকুটী।

দুই মহিষীর মধ্যে মনোমালিন্যের কথা গোপন রইল না। সামন্তরা দেখলেন শক্তিবৃদ্ধির এই সুবর্ণসুযোগ। তাঁরা গোপনে রাজ্ঞী ওয়েনচেং-এর পক্ষাবলম্বন করলেন। তাং রাজসভার সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র তৈরি হল। তাঁরা সম্রাট তাইজং-কে জানালেন তিব্বতনরেশকে নৈতিক শক্তি যোগাচ্ছেন ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত, শেচনমুনপা'রা। আরও বিশেষ করে বলতে গেলে বঙ্গদেশের বৌদ্ধপণ্ডিতবর্গ।'

'সেইদিনই প্রবল ক্রুদ্ধ হলেন তাইজং এবং য়ু জেতিয়ান। তাং বংশ সহস্রাধিককাল রাজত্ব করবে, এই সসাগরা পৃথিবী তার অধীনস্থ হবে, এর কি অন্যথা হতে পারে কখনও? সেই ইশ্বরনির্দিষ্ট পথ রোধ করে রাখবে ক'জন নির্বীর্য বঙ্গদেশী বৌদ্ধপণ্ডিত?

'সেইদিনই দু'জনে বঙ্গদেশের সর্বাংশে সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন—প্রয়োজন হলে দীর্ঘকালব্যাপী পরিকল্পনা নিতে হবে, যাতে বঙ্গদেশের সমূহ ক্ষতি হয়।

'কী করে সেই কূটপরিকল্পনা সফল হবে?

তাঁরা স্থির করেন—সর্বাগ্রে বঙ্গদেশের ধর্মনাশ করতে হবে। কারণ সম্রাট তাইজং জানতেন যে, ধর্ম দুষ্ট হলে মানুষ নষ্ট হয়, আর মানুষ নষ্ট হলে দেশ উৎসন্নে যায়। তিনি জানতেন ধর্মহীন, নীতিহীন দেশের থাকা না-থাকা সমান।'

এই সময় বাইরে বেশ কিছু রাতচরা পাখি কাছেই টি টি করে ডেকে উঠল। বপ্যটের ভ্রু কুঞ্চিত হল। তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করে মৎস্যেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। বপ্যট তাঁর তরবারি উঠিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে বাইরে চলে গেলেন।

'কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে মস্ত অসুবিধা ছিল। এর জন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল এমন একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের, তাং রাজবংশের অনুগত এমন একজন ভৃত্যের, কূটপ্রতিভায় যে অতুলনীয়। যার দেহ বঙ্গদেশের জলবায়ুতে পুষ্ট, কিন্তু বিবেক ও চৈতন্য তাং বংশের কাছে বন্ধকীকৃত। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সম্রাট তাইজং-এর আদেশানুসারে বঙ্গদেশের সর্বনাশ করা।

আর সেই মাহেন্দ্রক্ষণে য়ু জেতিয়ান-এর কাছে এসে পৌঁছলেন এক তরুণ ক্রীতদাস, যার জন্ম বঙ্গদেশে। এবং যার জন্মলক্ষণ তাঁর নিজের জন্মলক্ষণের সঙ্গেও মিলে যায়।'

'কিন্তু তিনি, মানে প্রকাশচন্দ্র সেখানে পৌঁছলেন কী করে?' অন্ধকারে প্রশ্নটি ভেসে এল।

'প্রকাশচন্দ্রের জীবনের প্রথম দিকের কাহিনি এখানে অনেকেই অবগত। তবু আপনার অবগতির জন্য জানাই, ইনি হরিকেলের চন্দ্রবংশের মহারাজ দিবানাথের ঔরসজাত পুত্র। দিবানাথ যখন হরিকেলের

শাসনক্ষমতা অধিকার করেন, তখন বঙ্গদেশ শাসন করছেন সম্রাট দেবখড়্গ। দিবানাথ দুর্দান্ত প্রকৃতির সামন্ত ছিলেন। তাঁকে বশ করতে সম্রাটকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।

'প্রকাশচন্দ্র পালিত হন মহারাজের আত্মীয়, অনন্তচন্দ্রের গৃহে। অনন্তচন্দ্র বণিক ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র যখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক, তখন অনন্তচন্দ্র তাঁকে সঙ্গে নেন যবদ্বীপে বাণিজ্যের উদ্দেশে। সেই যাত্রায় প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে অনন্তচন্দ্রের নৌবহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাঁর সঙ্গীসাথীদের প্রায় সকলের সলিলসমাধি ঘটে। অনন্তচন্দ্র কোনওক্রমে বেঁচে যান। বহু শ্রমে, বহু ক্লেশে তিনি তাঁর দু-তিনজন জীবিত সঙ্গীদের নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। প্রকাশচন্দ্রের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। সবাই অনুমান করে নেন, প্রকাশচন্দ্রও সেই সামুদ্রিক ঝড়ে নিহত হয়েছেন।'

ঠিক এই সময়েই ঘরের দরজা ক্ষণিকের জন্য উন্মুক্ত হয়েই বন্ধ হয়ে গেল। বায়ুপ্রবাহের জন্য? বুঝলেন না মৎস্যেন্দ্রনাথ। কিছু ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল দরজার সামনে থেকে।

'তার প্রায় বিশ বৎসর পর, তখন বঙ্গদেশের সিংহাসনে আসীন খড়্গসম্রাট রাজভট, প্রকাশচন্দ্র দেশে ফিরে এলেন। সঙ্গে এক অপরূপা সুন্দরী নারী। সেই নারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চন্দ্রবংশের শাসনভার হস্তগত করেন। বিশ বৎসর ধরে তিনি কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, কীভাবে ফিরে এলেন, ফিরে আসার পর কীভাবে তিনি নিজের পরিচয় প্রমাণ করলেন—সেসব দীর্ঘ কাহিনি। তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। শুধু একদিন অকস্মাৎ জানা গেল, চন্দ্রবংশের শাসনভার অধিগত হয়েছে প্রকাশচন্দ্রের হাতে। তার সঙ্গে হরিকেল জুড়ে তিনি এক নতুন ব্যভিচারী ধর্ম শুরু করেছেন।

তারপর ধীরে ধীরে তিনি কীভাবে সম্রাট বলভটকে বশ করে সম্রাটের মাতুল চারুদত্ত'র সহায়তায় বঙ্গদেশের শাসনে অধিষ্ঠিত হলেন, সেই কাহিনি আমাদের জানা। তবে আমি নিঃসন্দেহ যে তাঁর সঙ্গে আসা নারীটিই সম্রাজ্ঞী য়ু জেতিয়ান-এর সেই কন্যা, এবং বঙ্গদেশের বর্তমান রানি।'

একটু আগের কণ্ঠ ফের বলে উঠল, 'বাহ্ বাহ্, শৈবযোগী দেখছি একজন অতি উৎকৃষ্ট মহাসান্ধিবিগ্রহিক তথা গুপ্তপুরুষও। দেশ বিদেশের অনেক সংবাদ রাখেন। রাজ সচিব প্রকাশচন্দ্র আর আমাদের রাজ্ঞীর সর্বাঙ্গীন পরিচয় জানার জন্য জীবনপাতই করে ফেলেছেন। তা মহাপ্রাজ্ঞ যোগীপ্রবর আপাতত নিজের সঙ্গীসাথীদের সংবাদ রেখেছেন কি?'

চমকে উঠলেন ঘরের প্রত্যেকে। মুহূর্তে ঘরের ভেতরে ঢুকে এসেছে কয়েকজন মানুষ, তাদের হাতে মশাল। সেই আলোয় দেখা গেল, অন্তত দশজন সশস্ত্র রাজসেবকসৈন্য ঘিরে ধরেছে তাঁদের।

জয়াপীড় হুঙ্কার দিয়ে তাঁর অসিটি কোষমুক্ত করতে যাচ্ছিলেন, একটি তীক্ষ্ণধার ভল্ল তাঁর স্কন্ধস্পর্শ করল।

বাহিনীর প্রধানের দিকে তাকিয়ে মৎস্যেন্দ্রনাথ স্থির কণ্ঠে বললেন, 'কী সৌভাগ্য, মহাপ্রতীহার শান্তঘোষ স্বয়ং। পথ চিনে আসতে কষ্ট হয়নি মহাত্মন? সব কিছু কুশল ও মঙ্গল তো?'

শান্তঘোষের চোখ একবার জ্বলেই নিভে গেল। শীতলস্বরে বললেন, 'আমার সব কিছুই অত্যন্ত কুশল ও মঙ্গল যোগীবর। এবার সঙ্গীসাথীসহ গাত্রোত্থান করুন, মহারাজ্ঞী স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে কিছু বার্তালাপ করতে চান। আর মহারাজসচিব তথা মহামাত্য প্রকাশচন্দ্র তো আপনাদের সঙ্গে আলাপিত হওয়ার জন্য বড়ই উদগ্রীব হয়ে আছেন।'

মৎস্যেন্দ্রনাথ যুক্তকর মাথায় ঠেকালেন, 'মহারানির অসীম অনুগ্রহ।'

'আর তুমি, মূর্খ ব্রাহ্মণ,' কান্তিপ্রভ'র দিকে ফিরলেন শান্তঘোষ, 'শেষবার নিজের পত্নী ও কন্যার সঙ্গে দেখা করে যেও। অনেকদিনের সম্পর্ক তো, এটুকু দয়া আমরা করেই থাকি। আমাদের রাজসেবকসৈন্যরা আবার তোমার কন্যার সঙ্গে আলাপ করার জন্য অতি ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।'

কান্তিপ্রভ কিছু বললেন না। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন শান্তঘোষের দিকে।

শান্তঘোষ এবার ফিরলেন আচার্য শান্তরক্ষিতের দিকে। ছদ্মবিস্ময়ের ভাব করে বললেন, 'অহো, বঙ্গদেশের কী অসীম সৌভাগ্য, স্বয়ং আচার্য শান্তরক্ষিত আজ আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। আপনার চরণস্পর্শে আজ এই দেশের প্রতিটি ধূলিকণা ধন্য হল ভন্তে। রাজ্ঞী আজকের রাত্রিটি আপনার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করবেন বলে স্থির করেছেন। আপনার আশৈশব ব্রহ্মচর্যের ব্যাপারে তাঁর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে বলে মনে হল।'

চোখ বন্ধ করলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত, শান্তরক্ষিত। ঠোঁট সামান্য নড়ে স্থির হল।

তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে জয়াপীড়ের চিবুকটি নিজের দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলেন শান্তঘোষ। ব্যঙ্গস্বরে বললেন, 'আহা, গৌড়েশ্বর জয়ন্ত উপযুক্ত জামাতাই পেয়েছেন বটে। পরের রাজ্যে তস্করের মতো প্রবেশ করে রাজদ্রোহে ইন্ধন সরবরাহ—এই তো জামাতার উপযুক্ত কর্ম। তবে বঙ্গদেশের জামাতা-আপ্যায়নের সুনাম আছে, সে সুনাম আমরা ক্ষুন্ন হতে দিতে পারি না। গাত্রোত্থান করুন। কাল না হয়...'

কথা বলতে বলতে শান্তঘোষ বোধহয় অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন জয়াপীড়। এক ঝটকায় তাঁর ডান কাঁধ স্পর্শ করে থাকা ভল্লটি ধরে টান দিতেই ভল্লধারী সৈন্য উলটে পড়ল সামনের দিকে। একই সঙ্গে বামহাত তাঁর কটিদেশ থেকে বার করে এনেছে একটি ছুরিকা। সেটি তিনি সজোরে বসিয়ে দিলেন শান্তঘোষের উরুদেশে। শান্তঘোষ চিৎকার করে উঠলেন। বাকি সৈন্যরা নিমেষে তাদের ভল্লগুলি তুলে জয়াপীড়ের ওপর লক্ষ স্থির করতেই মৎস্যেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ প্রদীপটি উলটে দিলে! জয়াপীড় ঝাঁপ দিলেন প্রকাশচন্দ্রের তরবারির দিকে।

বাইরে সশস্ত্র রাজসেবক সৈন্যরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুটির ঘিরে। তখন কুটিরের মধ্যে ঘটে চলেছে, অবিশ্বাস্য নাটক।

আনন্দগুপ্ত দূরে একটি অশ্বত্থের নীচে অপেক্ষা করছিলেন। আকাশে প্রথমার ক্ষীণ চন্দ্রমা। তাঁর মাথার ঠিক ওপরে একটি অশ্বত্থের শাখা দুলছিল। তাঁর মুখ একবার আলোকিত হচ্ছিল, আরেকবার অন্ধকার।

কান্তিপ্রভ'র উপর তাঁর গুপ্তচরদের অনেক দিন ধরেই লক্ষ ছিল। স্থানীয় সমিতি সূত্রে তিনি সংবাদ পাচ্ছিলেন যে, গত কয়েক মাস যাবৎ এই ব্রাহ্মণ কমলাঙ্ক গ্রামের যাবতীয় কিরাত, শবর এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা স্থানীয় সমিতির প্রধান তথা গ্রামপতির কাছে ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল।

বঙ্গদেশের অলিখিত নিয়ম, একমাত্র চন্দ্রবংশের অন্ধ অনুগামী বা তাঁদের অনুমোদিত গুটিকয় ভাগ্যবান ব্যতীত কারও পক্ষে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা নিষিদ্ধ। কারও মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা গেলেই চন্দ্রবংশের পোষিত স্থানীয় সমিতির সদস্যরা সর্বশক্তি দিয়ে তার চরিত্র হননে নেমে পড়ে। তার নামে কালিমা, কুৎসা, মিথ্যে অভিযোগ আর স্বকপোলকল্পিত কলঙ্ককাহিনির স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু শতেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণের চরিত্রে বিন্দুমাত্র কালিমালেপন সম্ভব হয়নি। কান্তিপ্রভ'র পাণ্ডিত্য, চরিত্র, বিনয় এবং সুমধুর ব্যবহার তাঁকে ক্রমেই কমলাঙ্ক গ্রামে জনপ্রিয় করে তুলছিল। এতে আনন্দগুপ্ত'র উদ্বেগ বেড়েছে বই কমেনি।

ঠিক এই সময়ে অশ্বত্থের শীর্ষদেশ থেকে একটি জলের ফোঁটা আনন্দগুপ্ত'র মাথায় ঝরে পড়ল।...

দিকে দিকে যে চন্দ্রবংশের অরাজক শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ ক্রমেই ধূমায়িত হচ্ছে এবং ক্ষুব্ধ জনতার নেতৃত্ব দিতে উঠে এসেছেন অন্ত্যজ শ্রেণীর বৌদ্ধ সাধক ও শৈবযোগীদের একটি গোষ্ঠী, সে সংবাদও রাজপদাধিকারীদের মধ্যে গোপন ছিল না। শুধু তাদের অধিনায়কদের চিহ্নিত করা সম্ভবপর হচ্ছিল না।

তাই যেদিন এই অরণ্য-সন্নিহিত স্থানটিতে জনৈক অস্ত্রধারী মানুষ সম্পূর্ণ একটি সশস্ত্র গ্রামরক্ষীবাহিনীকে একাকী ধ্বংস করলেন, সেদিনই আনন্দগুপ্ত'র মস্তিষ্কের ধূসর কোষ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এই স্পর্ধা তো

রাজদ্রোহের সঙ্গে তুলনীয়! এই মানুষটি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেই একজন। নইলে এত সাহস কার হবে?

আনন্দগুপ্ত'র কাছে এ ঘটনা ঘোর বিপদের সংকেত। সেদিন এই গ্রামে যা ঘটেছে, কাল বজ্রযোগিনী মন্দিরের পূজাপ্রাঙ্গনে যা ঘটেছে তা অচিন্ত্যনীয়। এতটাই সংগঠিত হয়ে উঠেছে এরা? এত শক্তিশালী? অতর্কিতে এত দ্রুত, এত অব্যর্থ আঘাত হানতে পারে?

আনন্দগুপ্ত জানেন, এর অর্থ একটাই। এর পেছনে অবশ্যই এক বা একাধিক অন্তর্ঘাতকের গুপ্তসহায়তা রয়েছে। অন্যথায় কোনও বহিরাগত শক্তির পক্ষেই প্রকাশ্যে এমন সংগঠিত তাণ্ডব চালান অসম্ভব।

কে বা কারা হতে পারে সেই অন্তর্ঘাতক? অবশ্যই এমন কেউ যার সমাজের সর্বস্তরে যোগাযোগ আছে, যে স্বীয় গুণে খ্যাতিমান পুরুষ, যার কাছে চন্দ্রবংশের অন্ধ আনুগত্য আশা করা অসম্ভব।

অবশ্য এই মুহূর্তে কে যে চন্দ্রবংশের প্রতি প্রকাশ্যে অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করছে আর গোপনে রাজদ্রোহীদের সহায়তা করছে, সে নিয়ে গুপ্তপুরুষ আনন্দগুপ্ত নিজেও সন্দিহান। তবুও পাশার ঘুঁটিগুলি মেলাতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। যে মুহূর্তে আনন্দগুপ্ত'র গুপ্তচর এসে খবর দিল যে কান্তিপ্রভ'র কুটিরে একজন বিদেশী এসে আশ্রয় নিয়েছেন, তার সঙ্গে কমলাঙ্ক গ্রামের পার্শ্ববর্তী অন্ত্যজ গ্রামগুলিতে বেশ কিছু অচেনা মানুষের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে, সেদিনই তিনি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলেন। তবে সাবধানে, যথাযোগ্য সতর্কতা সহ। মুহূর্তে মুহূর্তে স্থানীয় সমিতির সদস্য তথা রাষ্ট্রীয় গুপ্তচরবাহিনী তাঁকে এই ক'টি পরিবারের প্রতিটি আনাগোনার সংবাদ সরবরাহ করে গেছে।

আজ রাত্রে আনন্দগুপ্ত এমনিতেও এদের এই গুপ্তকুটিরে হানা দিতেন। কিন্তু তার পূর্বেই, বজ্রযোগিনী মন্দিরে পূজা উৎসবের মধ্যেই যে এরা এত বড় আঘাত হানবে, তার কোনও সঙ্কেত তাঁর কাছে ছিল না।

বজ্রযোগিনী পূজার নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁর। বৎসরের এই একটি দিনেই রাজ্ঞী ও রাজসচিব সহ বঙ্গদেশের সপ্তরাজন্য একই স্থানে একত্রিত হন। ফলে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু আনন্দগুপ্ত'র সুচারু পরিচালনায় আজ অবধি এই উৎসবে কোনওদিন ছন্দপতন হয়নি। এজন্য তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারও ছিল।

কিন্তু সেই অহঙ্কার আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অন্যান্য রাজন্যবর্গ, প্রকাশচন্দ্র এবং স্বয়ং রাজ্ঞীর চোখে সেই অবিশ্বাসের ছায়াই দেখেছেন তিনি। তাতে তাঁর অন্তরাত্মা মরমে মরে গেছে। তার সমুদায় ব্যর্থতার দায়িত্ব তাঁর, একমাত্র তাঁরই।

অশ্বত্থের মাথা থেকে আবারও একটি জলবিন্দু ঝরে পড়ল। উত্তরীয় দিয়ে আবার মাথা একবার মুছে নিলেন আনন্দগুপ্ত।

তাঁর মনের মধ্যে অস্বস্তিকর প্রশ্নটি পুনরায় জেগে উঠল। এত শক্তিশালী এরা? এত সংগঠিত? তিনি গুঢ়পুরুষ বাহিনীর প্রধান আনন্দগুপ্ত। তাঁর অগোচরে এই বিষবৃক্ষ এতদুর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে?

কাল থেকে মরমে মরে আছেন আনন্দগুপ্ত। ক্ষুব্ধ, আহত, অপমানিত বাঘের মতো ছটফট করেছেন। যে করেই হোক ভূলুণ্ঠিত সম্মান উদ্ধার করতেই হবে। রাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী সারমেয় সন্তানদের প্রকাশ্য রাজপথে রজ্জুবদ্ধ পশুর মতো কশাঘাত করতে করতে নিয়ে যাবেন তিনি। আর কালক্ষেপ করেননি, মহাপ্রতীহার শান্তঘোষের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন অভিযান সফল করার জন্য।

দুঃসহ ক্রোধে আনন্ধগুপ্ত'র সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। তাই আবার যখন অশ্বত্থের মাথা থেকে কয়েকটি তরলবিন্দু তাঁর মাথায় ঝরে পড়ল, তখনও ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারলেন না তিনি। তাঁর মনের মধ্যে কয়েকটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন খেলা করছিল।

শুরু থেকেই এই গুপ্ত অভিযানের বেশ কিছু লক্ষণ তাঁর ঠিক সুবিধার লাগছে না।

এই কুটিরের সংবাদ তাঁকে এনে দেয় ভাঁড়ুদত্তের নিযুক্ত এক মূক ও বধির চর। চরটির একটি আশ্চর্য প্রতিভা আছে। শ্রবণে অক্ষম হলে কী হবে, বক্তার ওষ্ঠসঞ্চালন দেখে সে প্রতিটি শব্দ অনুধাবনের ক্ষমতা

রাখে। বলাবাহুল্য ভাঁড়ুদত্ত'র এই গুপ্তবৃত্তির সংবাদ একমাত্র আনন্দগুপ্ত ব্যতীত আর কেউ রাখেন না। শান্তঘোষও নয়। তার কথামতই তাঁরা এসেছিলেন গ্রামটিকে ঘিরে, অরণ্যের মধ্য থেকে।

প্রথমা'র রাত্রি সত্ত্বেও পথ চিনে আসতে শান্তঘোষ বা তাঁর বিশেষ ক্লেশ হয়নি। আর সৈন্যদের তো এমনিতেও অরণ্যচারণার অভ্যাস আছে। কিন্তু কুটিরের নিকটবর্তী হয়ে যখন তিনি দেখলেন কুটিরটির দ্বারে কোনও প্রহরা নেই, তখন তাঁর মনে সামান্য দ্বিধা উৎপন্ন হয়েছিল। কুটিরের অভ্যন্তরে রাজদ্রোহীদের এমন গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ, আর দ্বারখানি সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত?

তবে তৎক্ষণাৎ এই চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এই মূর্খের দল ভাবতেই পারেনি যে এমন সাফল্য উদযাপনের দিনেই এমন দারুণ প্রত্যাঘাত নেমে আসতে পারে তাদের উপর।

দাঁতে দাঁত ঘষেছিলেন আনন্দগুপ্ত। ভালো রে ভালো! ওই আনন্দে ওরা যতটা ডুবে থাকে ততই ভালো।

অশ্বত্থশীর্ষ থেকে ঝরে পড়া তরলবিন্দু উত্তরীয় দিয়ে মুছে নিলেন আনন্দগুপ্ত। এত জল কীসের? তেমন তো বৃষ্টি হয়নি এই অঞ্চলে!

তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার থেকে অনতিদূরে কুটিরটি বেষ্টন করে অবস্থান নিয়েছে রাজসেবকসেনা। তাদের মধ্য থেকে পাঁচজন সৈন্য নিয়ে কুটীরের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন শান্তঘোষ।

চারিদিকে নিবিড় আরণ্যক নীরবতা। কুটিরের মধ্য থেকে ম্লান আলোকরেখা আনন্দগুপ্তকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তাঁদের লক্ষ্যভেদ অনিবার্য। একবার শুধু ওই কুটিরে শান্তঘোষের প্রবেশের অপেক্ষা। তারপরেই...

কিন্তু...কিন্তু...এই অরণ্যের প্রান্তদেশে আদিম কিরাতজাতির বাস। এই সময়ে মদ্যপ কিরাতদের উল্লাসবাদ্য এবং যৌথনৃত্যের শব্দ বহুদূর হতে শোনা যায়। আজ নৈঃশব্দ্য কেন? এই অঞ্চলের বন্যসারমেয়কূল তাদের ক্ষিপ্রতা, উগ্রতা এবং হিংস্রতার জন্য কুখ্যাত। তাঁরা এতদূর এলেন। এদের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কেন?

কান্তিপ্রভ'র স্ত্রী এবং কন্যাকে ধরে নিয়ে আসার জন্য রাজসেবকপ্রধান গিরিকিশোর নিজেই গিয়েছিলেন তার কুটিরে। গিয়েছিলেন দুজন রাজসেবকসহ, অভিযান শুরুর কিছু আগেই। পরিকল্পনা ছিল, যে মুহূর্তে কুচক্রীদল একত্র হবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই কান্তিপ্রভ'র অরক্ষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন গিরিকিশোর। নারীনির্যাতনে গিরিকিশোরের খ্যাতি প্রবাদপ্রতিম। তাঁকে দেখামাত্র নারীরা আতঙ্কে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যায়। গৃহস্থরা তাদের স্ত্রীকন্যাদের তৎক্ষণাৎ অন্দরে লুকিয়ে রাখে। এহেন গিরিকিশোর দুজন অবলা বঙ্গললনার কেশাকর্ষণ করে গ্রামপথ দিয়ে টেনে আনতে এত কালক্ষেপ করছেন কেন?

গিরিকিশোরের সন্ধানে আরও দুজন রাজসেবককে পাঠানো হয়েছে। তারাই বা ফিরে আসতে এত সময় নিচ্ছে কেন?

আবার অশ্বত্থের শীর্ষ থেকে তরলবিন্দু। বিরক্ত হলেন আনন্দগুপ্ত। উত্তরীয় দিয়ে মাথা একবার মুছে নিলেন। এত জল কোথা থেকে আসছে? মুখ তুলে ওপরে তাকাবেন, ঠিক এই সময়ে দুজন সৈন্য নিঃশব্দে আনন্দগুপ্ত'র পিছনে এসে দাঁড়াল। ঘাড় না ঘুরিয়েই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গিরিকিশোর এসেছে?'

উত্তর এল, 'না প্রভু। কান্তিপ্রভ'র কুটিরে তাঁকে দেখতে পেলাম না।'

আবার টুপ টুপ করে বেশ কিছু তরলবিন্দু। কিন্তু সেদিকে মন দিলেন না আনন্দগুপ্ত। তিনি পুনরায় অঙ্গবস্ত্রটি দিয়ে মাথা ও ঘাড় মুছে ভ্রুকুটি করে বললেন, 'দেখতে পেলে না মানে?'

'কান্তিপ্রভ'র কুটির নিষ্প্রদীপ ও জনশূন্য প্রভু। আমরা চারিদিক ভালো করে দেখে এসেছি। কোনও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।'

অকস্মাৎ আনন্দগুপ্ত'র ঘাড়ের রোমগুলি দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর অবচেতনে কোনও অজানা বিপদের ছায়াপাতমাত্র এই ঘটনা ঘটে। কী যেন একটা ঠিক হচ্ছে না! কী সেটা?

'আর গিরিকিশোর?'

'তাঁরও কোনও সন্ধান নেই প্রভু।' উত্তর দিল দ্বিতীয় জন।

এইবারে বুঝলেন আনন্দগুপ্ত। এই স্বরদুটি বিলক্ষণ চেনেন তিনি।

বজ্রযোগিনী মন্দিরের সামনে সমবেত সেই জনারণ্যে তিনি ছিলেন। ছদ্মবেশে সমস্ত ঘটমান পরিস্থিতির ওপর লক্ষ রেখে চলেছিলেন। মন্দিরের সামনে যখন নাটিকাটি চলছিল, তখন তিনি নাট্যদলের দুজন সুবেশ তরুণকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এখানে কী হচ্ছে ভায়া? এ পূজা কোথায়, এ তো কৌতুকের রঙ্গ মনে হচ্ছে। এই দেশে দেবীপূজা এইরকমই হয় নাকি?'

একজন সকৌতুকে উত্তর দিয়েছিল, 'মহাশয় এই দেশে নতুন মনে হচ্ছে। পূর্বে কখনও বজ্রযোগিনীর উৎসবে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি, তাই না?'

অন্যজন গম্ভীরমুখে উত্তর দিয়েছিল, 'অত কথার কী দরকার ভ্রাত? সরাসরি উত্তর দিলেই তো হয়। শুনুন মহাশয়, একে বুদ্ধনাটিকা বলে।'

অন্য কেউ হলে অত শব্দব্রহ্মের মধ্যে শ্রুত স্বরদুটি স্মরণে থাকত না। কিন্তু আনন্দগুপ্ত গুপ্তচরবৃত্তিতে সিদ্ধপুরুষ। এই দুটি কণ্ঠস্বর তাঁর বিলক্ষণ স্মরণে আছে।

কালকের নাট্যদলের কুশীলবদের স্বর এখানে কেন? রাজসেবকসেনার বেশে এরা কারা?

মুহূর্তের মধ্যে আনন্দগুপ্ত'র চোখের সামনে থেকে আড়াল সরে গেল। আপত অসঙ্গতিগুলির উত্তর পেয়ে গেছেন তিনি। আর উত্তরটি হৃদয়ঙ্গম করা মাত্র ভয়ঙ্কর সত্য তাঁর মস্তিষ্কে বিদ্যুতের মতো গেঁথে গেল।

ওই নাট্যদলই তার মানে মূল চক্রীদের গোষ্ঠী। কালকের ধ্বংসকাণ্ড তাদেরই কর্ম। তাদেরই দুইজন এখন রাজসেবকসেনার বেশ ধরে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

অর্থাৎ পুরো ঘটনাটাই সাজানো। অতি যত্নে তাঁদের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে এই অরণ্যের মধ্যে। তারা জানত আজ রাত্রে আনন্দগুপ্ত সদলবলে অভিযানে নেমেছেন। তারা জানত মহাপ্রতীহার শান্তঘোষ নিজে আসছেন রাজসেবকসেনা নিয়ে। তা সত্বেও তারা তাদের আয়োজন প্রত্যাহার করেনি। অর্থাৎ তাঁরা যেমন এই কুচক্রীদের আয়োজনের সংবাদ রাখছেন, তারাও তাঁদের সমস্ত অভিযানের অগ্রিম সূচনা পেয়ে যাচ্ছে!

এই অভিযানের সংবাদ জানতেন কেবলমাত্র মহারানি নিজে আর প্রকাশচন্দ্র সহ বাকি ছ'জন রাজপুরুষ। তা সত্বেও এদের কাছে এই অভিযানের সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার একটাই অর্থ।

তাঁদের মধ্যে, এই সপ্তরাজন্যের মধ্যেই একজন বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে আছে!

শিকার করতে এসে এখন তাঁরা নিজেরাই শিকার!

সন্তর্পণে তিনি তাঁর ডানহাতটি কোষবদ্ধ তরবারির হাতলে রাখলেন। সতর্কস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'সন্ধান নেই মানে? তাঁকে যে কান্তিপ্রভর কুটিরে পাঠানো হল?'

অশ্বত্থের শীর্ষদেশ থেকে বামাকণ্ঠে উত্তর এল, 'আপনাদের পরম অনুগত ভৃত্য, শ্রী গিরিকিশোর আপাতত এখানে, মহামান্য আনন্দগুপ্ত।'

দু'খানি তরবারির অগ্রভাগ তাঁর কাঁধ স্পর্শ করেছে। স্তম্ভিত আনন্দগুপ্ত ওপরে তাকাতেই দেখলেন—অশ্বত্থের শীর্ষদেশে বেঁধে রাখা আছে একটি মানুষের দেহ। আর তার পাশে একটি ছায়ামূর্তি। পরক্ষণেই দেহটি ফেলে দেওয়া হল! সেটি এসে পড়ল আনন্দগুপ্তর পায়ের কাছে।

গিরিকিশোর!

কিন্তু এ কী অবস্থা হয়েছে মহাবীর গিরিকিশোরের! বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন আনন্দগুপ্ত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহ, অস্ত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন। হাত-পা মুখ বাঁধা। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছিল তার সমস্ত শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। শরীরে সাড় আছে বটে, তবে না থাকার মতোই।

সচকিত হয়ে নিজের উত্তরীয়র দিকে তাকালেন আনন্দগুপ্ত। শ্বেত শুভ্র উত্তরীয়তে কয়েকটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের দাগ। এতক্ষণে বুঝলেন আনন্দগুপ্ত, এই বৃষ্টিহীন রাত্রিতে তাঁর মাথায় ঝরে পড়া তরলবিন্দু জল নয়, ছিল গিরিকিশোরের রক্ত!

সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল আনন্দগুপ্ত'র। মাথার মধ্যে বেজে উঠেছে বিপদসঙ্কেত। বিপদ! সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ!

ততক্ষণে অশ্বত্থ-শীর্ষের ছায়ামূর্তিটি সরীসৃপের মতো শাখাপ্রশাখা বেয়ে তরতরিয়ে নেমে এসেছে মাটিতে। কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত দেহটি খর্বকায় কিন্তু সবল। একটি খড়্গ আনন্দগুপ্ত'র কণ্ঠদেশে ধরে সেই ছায়ামূর্তি ক্রুরকণ্ঠে বলল, 'আপনার অনুগত পাপবুদ্ধির অবস্থা দেখলেন তো রাজন্যপ্রবর? এই ধর্ষক পশুটির পুরুষাঙ্গখানি আপাতত অরণ্যের পশুদের খাদ্য হয়েছে। জেনে রাখুন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার আর আপনার সঙ্গীদের অবস্থাও তাই হতে চলেছে।'

এই অবস্থাতেও বুদ্ধিভ্রষ্ট হননি আনন্দগুপ্ত। বিদেশে এরকম বহু বিপদজনক পরিস্থিতি নিজের স্থিরবুদ্ধি এবং সাহসে ভর করে নির্বিঘ্নে পার করেছেন তিনি।

চারিপাশে তাকিয়ে একবার পরিস্থিতি অনুধাবন করে নিলেন আনন্দগুপ্ত। সামান্য দূরে কুটীরের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে রাজসেবকসেনা। কিছু আগেই অতি সন্তর্পণে কুটিরের অন্দরে প্রবেশ করেছেন শান্তঘোষ। কিছু শব্দ ভেসে আসছে কুটীরটি থেকে। সেনারা জানে না যে কী ভীষণ বিপদের মধ্যে আছেন তিনি।

দ্রুত চিন্তা করলেন আনন্দগুপ্ত। একবার উচ্চকণ্ঠে সংকেত দেওয়ার অপেক্ষামাত্র। রাজসেবকসেনার আঘাত করার দ্রুততা ভয়ঙ্কর কালসর্পের থেকেও ক্ষিপ্রতর। মুহূর্তের মধ্যে এই তিন আততায়ীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বটে, কিন্তু তার আগে এরা যে তাঁর মুণ্ডখানি দেহকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, সেটা নিশ্চিত।

তাহলে উপায়?

আনন্দগুপ্ত'র অভিজ্ঞতা বলে এইসব ক্ষেত্রে বাক্যবিন্যাসের জাল ছড়াতে হয়। কথায় কথায় বিলম্বিত করতে হয় মুহূর্ত। তারপর সঠিক ক্ষণ খুঁজে নিয়ে প্রত্যাঘাত হানতে হয় বিদ্যুতের মতো।

আনন্দগুপ্ত চাপাস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কারা?'

পিছনে দাঁড়ানো দুই অস্ত্রধারীর একজন উত্তর দিল, 'আজ্ঞে আমরা আপনার আজ্ঞাবহ দাস, প্রভু।'

ব্যঙ্গ গায়ে মাখলেন না আনন্দগুপ্ত? 'কী চাও তোমরা।'

অন্য স্বরটি গম্ভীরস্বরে উত্তর করল, 'আজ্ঞে, আপনার মুণ্ড।'

'তোমরা জানো আমি কে?'

'না জানলে কি আর এই অশ্বত্থের তলায় আপনার জন্য ফাঁদ পাতি, প্রভু আনন্দগুপ্ত?' সেই কৌতুকস্বর।

'আমাকে হত্যা করার ফলাফল জানো তো?'

'সে নিয়ে আপনাকে না ভাবলেও চলবে। আপাতত বরং যমরাজের কাছে কীভাবে এই ইহজীবনে কৃত অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি চাইবেন, সেই নিয়ে ভাবুন।' উত্তর দিল দ্বিতীয় স্বর।

'ওরে মূর্খের দল, রাজাদেশে কৃত অকর্তব্যের দায় অধীনস্থের ওপর বর্তায় না, সে কথা জানিস না?' এদের উত্তেজিত করতে চাইছেন আনন্দগুপ্ত। কুটিরের মধ্য থেকে কিছু কথা ভেসে আসছে। আনন্দগুপ্ত জানেন ও শান্তঘোষের স্বর।

তরবারি দুটি আরও গভীর ভাবে চেপে বসেছে স্কন্ধে। আনন্দগুপ্ত অনুভব করলেন যে তাঁর দেহ থেকে রক্তপাত শুরু হয়েছে। কৌতুকস্বর এবার অকস্মাৎ তীব্র, 'রাজাজ্ঞার দোহাই দিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর কৃত অত্যাচারের পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না আনন্দগুপ্ত। শত সহস্র সর্বহারার চোখের জল, শত সহস্র দরিদ্র কৃষকের হাহাকার, শত সহস্র ধর্ষিতা বঙ্গনারীর লাঞ্ছিত সিঁদুরের অভিশাপ আপনাদের কাউকে অব্যাহতি দেবে না।'

'সে বিচার ঈশ্বর করবেন। তোমরা বিচার করার কে?'

'সে তো বটেই। ঈশ্বর যাতে দ্রুত সে বিচার সম্পন্ন করতে পারেন তার জন্যই তো এ আয়োজন।'

‘কে হত্যা করবে আমাকে? এই অবলা নারী?’

নারী দৃপ্তকণ্ঠে স্বরে বলে উঠল, ‘কেন রে পশু, এই অবলা নারী যদি নরাধম গিরিকিশোরের এই অবস্থা করতে পারে, তাহলে তুই কোন বীর?’

এইবার সত্যিই ভয় পেলেন, ভীত হলেন আনন্দগুপ্ত। রক্তস্নাত খড়্গ থেকে উঠে আসছিল জান্তব ঘ্রাণ। মেয়েটি যে মিথ্যে বলছে না, তার প্রমাণ ছিল তার রক্তচক্ষুতে, এই প্রায়ান্ধকারেও যেটি ধক-ধক করে জ্বলছিল।

সামান্য স্খলিতস্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘কে তুমি?’

খড়্গটি আরও হিংস্রভাবে চেপে বসল তাঁর কণ্ঠনালীর ওপর। প্রবল ঘৃণার সঙ্গে উচ্চারিত হল, ‘আমি কে, তা জানতে চাস? তবে দেখ,’ এই বলে সেই নারী নিজের মুখখানি অনাবৃত করলেন, ‘আমাকে চিনতে পারিস রে পাপপিণ্ড? আমার কথা মনে পড়ে আনন্দগুপ্ত? আমি অমাত্য জয়নাথের সেই ভাগিনেয়ী, দেদ্দদেবী।’

আনন্দগুপ্ত আতঙ্কে স্থবির হয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে কুটির থেকে নিঃশব্দ বিদীর্ণ করে ভেসে এল শান্তঘোষের আর্তচিৎকার। রাজসেবকসেনা তৎক্ষণাৎ দু’হাতে কুঠার আর খড়্গ নিয়ে প্রস্তুতি নিল। কিন্তু তারা কুটিরের দিকে অগ্রসর হতে না হতেই অরণ্য প্রকম্পিত করে ভীমনাদ ভেসে এল, ‘জয় গৌড়, জয় বঙ্গ, জয় শশাঙ্ক।’

সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের বিচিত্র গোপন স্থান থেকে জেগে উঠল কিরাতযোদ্ধাদের ছায়া-অবয়ব। তাদের কটিদেশে তীক্ষ্ণধার দাও, হাতে খর্বকায় অথচ শক্তিশালী ধনু। সেই ধনু থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসতে লাগল মর্মভেদী বিষাক্ত তীরের দল। আক্রোমণোদ্যত রাজসেবকসৈন্যদের অধিকাংশ তাতেই ধরাশায়ী হল। যারা ধরাশায়ী হল না তাদের জন্য মহাদ্রুমের শাখা-প্রশাখা থেকে কুঠার হাতে লাফিয়ে নেমে এল কিরাত আর শবরের দল। তাদের জান্তব আক্রোশের সঙ্গে মিশেছে সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষিপ্রতা। রাজসেবকসেনা এই প্রশিক্ষিত উন্মত্ততার সঙ্গে পরিচিত নয়। তারা নির্মমভাবে নিহত হতে থাকল।

অরণ্যের মধ্যে সেই ঘোর যুদ্ধটির সমাপ্তি আনন্দগুপ্ত আর শান্তঘোষ কেউই দেখতে পেলেন না। কারণ তাঁদের মুণ্ডদুখানি অরণ্যের মধ্যে দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের পায়ের কাছে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল।

অন্ধকার কারাগারের পাথুরে মেঝে থেকে উঠে আসছিল শব্দগুলো। একদল রক্ষীর হেঁটে আসার শব্দ। তবে তার সঙ্গে আরও একটি চেনা শব্দ ছিল। চেনা অথচ অচেনা। স্মৃতি আজকাল বড় বিশ্বাসঘাতকতা করে। অনেক চিরপরিচিত শব্দ, অর্থ, বা চিত্র বুঝতে পারেন না।

তারা হেঁটে আসছিল দীর্ঘ অন্ধকার অলিন্দ ধরে। শব্দগুলি প্রথমে স্তিমিত, তারপর ক্রমেই উচ্চকিত হয়ে উঠছে।

অলিন্দের শেষে বাঁক নিয়েই কয়েকটি অন্ধকার কারাকক্ষ। একজন নারী ভূমিশয্যায় শায়িত। তিনি প্রকাশচন্দ্রের এই গুপ্তকারাগারের একমাত্র বন্দি। তাঁর কান উদগ্রীব হয়—আসছে, খাদ্য আসছে!

এককালে এই দেশের সম্রাটের পট্টমহিষী ছিলেন তিনি। কী ছিল না তাঁর? আদেশ পালনের জন্য নিযুক্ত ছিল শতাধিক দাসদাসী। স্নান করতেন চন্দনজলে, প্রসাধন করতেন দুর্মূল্য কুঙ্কুম আর মহার্ঘ ফুলরেণুতে। তাঁর দেবনিন্দিত দেহকাণ্ডটি বেষ্টন করে থাকত মধুরার মহার্ঘ নীলাম্বরী। তাঁর ইঙ্গিতমাত্র স্বাদুতম খাদ্য ও মহার্ঘতম পানীয়ের ভাণ্ডার সাজিয়ে দেওয়া হতো তাঁর সামনে। আমোদে, আহ্লাদে, গরিমায় এবং ঐশ্বর্যে তিনি সত্যই রাজেন্দ্রাণী ছিলেন।

আর আজ?

বৃদ্ধা সামান্য মাথা তুললেন। এই অন্ধ কারার অন্তরালে কেটে গেছে কতগুলি বছর। কত বছর, তার আর গণনা করেন না। এই নরকের অন্ধকার ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁর সবটুকু। তাঁর চোখের জ্যোতি ম্লান হয়েছে, শিথিল হয়েছে চর্মগ্রন্থি। ঘন মেঘতুল্য কৃষ্ণকেশরাশি এখন শণতন্তুর মতো। একদা রাজেন্দ্রাণীর এখন একটি মাত্র ছিন্নকন্থা সম্বল। কারাকক্ষের এককোণে একটি মৃৎপাত্রে দুর্গন্ধযুক্ত জল রেখে যায় ওরা, তৃষ্ণায় তাই পান করেন তিনি।

এককালে তিনি সম্রাজ্ঞী ছিলেন। আজ তিনি সাক্ষাৎ প্রেতিনী।

পায়ের শব্দরা আরও এগিয়ে আসছে। এইবার তিনি অন্য শব্দটি চিনে নিলেন। লৌহশৃঙ্খলের শব্দ। তার মানে নতুন কোনও বন্দিকে নিয়ে আসা হচ্ছে এই নরকে।

তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বন্দি মানে মানুষ। একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ, তাঁকে হোক না রাখা পাশের কারাকক্ষে। তবুও, কথা বলার মতো একটি মানুষ তো পাবেন তিনি।

শেষবার এসেছিল একজন। কোন এক বিদেশি গুপ্তচর। সাধারণ গুপ্তচর নয়, খুব উচ্চপদস্থ কেউ। নইলে প্রকাশচন্দ্রের এই বিশেষ অন্ধকূপে আনা হতো না তাকে। রোজই রক্ষীরা তাকে নিপীড়ন কক্ষে নিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত অত্যাচার করত গুপ্তসংবাদের খোঁজে। দূর হতে ভেসে আসা সেই অত্যাচারের শব্দে, মানুষটির আর্তনাদের শব্দে সিঁটিয়ে থাকতেন তিনি।

রক্ষীরা তার রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত দেহটি পার্শ্ববর্তী কারাকক্ষে ফেলে চলে যাওয়ার পর সেই হতভাগ্যটির সঙ্গে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে কিছু কথা বলতেন তিনি। তাঁর কাছ থেকেই জেনেছিলেন ওই পিশাচী নারীর সঙ্গে তাঁর প্রাণাধিক সন্তানের বিবাহের সংবাদ। জেনেছিলেন যে তাঁর স্নেহের পুত্তলিটিকে সেইভাবেই হত্যা করেছে ওই পাপিষ্ঠা নাগিনী, যেভাবে নিহত হয়েছিলেন তাঁর স্বামী।

সেই বন্দি অবশ্য বেশিদিন সঙ্গ দেয়নি তাকে। প্রকাশচন্দ্র নিজে এসে তাঁর কারাকক্ষের সামনেই সেই হতভাগ্যর মুণ্ডচ্ছেদ করেন। ওঃ, সে কী রক্ত!

সেইদিন আরও একটি কথা উচ্চারণ করেছিলেন প্রকাশচন্দ্র, সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতৃশ্বশুর প্রকাশচন্দ্র, যাঁর অনুগ্রহে তাঁর স্বামী এই বঙ্গদেশের সম্রাট হয়েছিলেন—সেই প্রকাশচন্দ্র। সেই বিদেশি গুপ্তচরের ছিন্ন দেহ দেখে তিনি যখন বমন করছেন, তখন প্রকাশচন্দ্র বলেছিলেন, 'রক্ত দেখে ঘৃণার উদ্রেক হচ্ছে রে রণ্ডা? উচিত ছিল তোর ওই অবাধ্য মূর্খ সন্তানটিকে তোর সামনে এভাবেই বধ করে তার রক্তমিশ্রিত অন্ন তোকে খাওয়ানো। তবে যদি সম্রাজ্ঞী য়ু জেতিয়ান-এর ঋণের কিছুমাত্র শোধ করতে পারি।'

মুহূর্তের জন্য একবার চোখ বন্ধ করেই খুললেন তিনি। ইশ্বরের নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। নইলে এখনও তিনি কেন বেঁচে আছেন?

রক্ষীদলের পায়ের শব্দ এসে তাঁর কারাকক্ষের সামনে থামল। ভূমিশয্যা থেকে শ্লথভঙ্গিতে উঠে বসলেন তিনি। দুজন রক্ষী মৃৎপাত্রে করে সামান্য অন্ন ঠেলে দিল কক্ষের মধ্যে। অন্য রক্ষীদের মধ্যে অগ্রগামী রক্ষীটি তাঁর পাশের কক্ষটির লৌহদ্বার উন্মুক্ত করল। বন্দি সেই কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দ্রুত বন্ধ করা হল দ্বার।

তারপর বাকিরা প্রস্থান করলে দুজন রক্ষী ভল্ল হাতে কারাকক্ষের সামনে প্রহরায় রয়ে গেল।

সামান্য আশ্চর্য হলেন তিনি। নিরাপত্তা এতই সুদৃঢ় যে এখান থেকে পলায়নের কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

এ হচ্ছে প্রকাশচন্দ্রের নিজস্ব কারা। এখানে একমাত্র প্রকাশচন্দ্র ছাড়া আর কারও শাসন চলে না, বঙ্গদেশের সম্রাটেরও নয়। লালিম্ববন পাহাড়ের বিস্তীর্ণ গুহার মধ্যে এর অবস্থান। গুহার সামনে রাজসেবকরক্ষীর এক বিশিষ্ট গোষ্ঠীর কঠিন প্রহরা। এদের নিযুক্ত করার পূর্বে প্রকাশচন্দ্র স্বয়ং এদের পরীক্ষা নেন। রক্ষীদের সহায়তার জন্য আছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিংস্র কুকুরের দল।

মেঘান্দর একটি শাখা এই গুহার পিছনদিক বেষ্টন করে আবার মূল ধারার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তার গভীরতা অধিক না হলেও স্রোত প্রবল। সেই শাখানদী থেকে একটি নাতিবৃহৎ খাল কেটে কারাগারের সামনে সৃষ্টি করা হয়েছে জলপূর্ণ পরিখা। তাতে প্রকাশচন্দ্রের কয়েকটি প্রিয় পোষ্য বসবাস করে। কুমীর!

পরিখাটি লাফিয়ে পার হওয়া অসম্ভব। কারাগারের মূল দ্বার থেকে পরিখার অন্যদিকে যাতায়াতের জন্য একটি সেতু আছে। আর প্রকাশচন্দ্রের বিশেষ অভিজ্ঞানচিহ্ন ব্যতীত সেই সেতু কখনই নামানো হয় না।

এ কারাগার নয়, সাক্ষাৎ নরক। এখানে একবার যারা আসে, পৃথিবীর বুক থেকে তাদের অস্তিত্ব মুছে যায়।

পরিখার এদিকে থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক ভেসে এল, 'পাটাতন নামাও হে সেতুরক্ষী, বন্দির জন্য অন্ন এনেছি।'

পরিখার এপারে সেতুরক্ষীর আদেশে তার সহকারী ধীরে ধীরে একটি কপিকলের রজ্জু আকর্ষিত করতে লাগল। দু'পারের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ামাত্র ওপার থেকে সেতুর ওপর উঠে এল এক বিশাল অবয়ব। তার ডান হাতে একটি দণ্ডদীপিকা, বাম হাতে বৃহৎ পাত্র।

এপারে এসে দণ্ডদীপিকাটি একটি আকর্ষীতে গুঁজল আগন্তুক। সেতুরক্ষীর সহকারী যুবা অন্নপাত্রটি নামিয়ে সেটি উত্তমরূপে পরীক্ষা করতে লাগল। সেতুরক্ষী আগন্তুকের পরিধেয় বস্ত্র পরীক্ষা করতে লাগলেন।

আগন্তুকের পরিধেয় কৃষ্ণবর্ণ অধোবাস, ঊর্ধ্বাংশ উন্মুক্ত। মুখের অর্ধেক সেই একই বস্ত্রে আচ্ছাদিত। সেতুরক্ষী আগন্তুকের মুখের বস্ত্রখানি উন্মোচিত করে মুখ দেখে নিলেন। তারপর আগন্তুকের কচ্ছটিকা পরীক্ষা করলেন, পাদুকা পরীক্ষা করলেন, মস্তকাবরণ পরীক্ষা করলেন। শুধু আগন্তুকের দক্ষিণ মণিবন্ধের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'এটি কী?'

মণিবন্ধে একটি চওড়া এবং পুরু চর্মনির্মিত বাহুভূষণ, পট্টির মতো করে জড়ান। আগন্তুক উত্তর দিল, 'আজ গৃহে দেবী অট্টহাসের পূজা, এ তারই চিহ্ন। তুমি মনে হচ্ছে এই অঞ্চলে নতুন। অট্টহাসের পূজাবিধি কিছুই জানো না!'

পাটাতনরক্ষী এদিকের লোক নন। তার ওপর তিনি বৌদ্ধ নন। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। একবার দেবী অট্টহাসের মূর্তি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। সেই ক্ষুৎকামা, শীর্ণকায়া, ভয়ঙ্করী মূর্তি দর্শনের স্মৃতি খুব একটা সুখকর নয়। তিনি আর কিছু বললেন না।

আগত রক্ষী কটিদেশ থেকে একটি নামাঙ্কিত চতুষ্কী বার করে প্রহরীকে দেখিয়ে নিলেন। ততক্ষণে তাঁর আনা অন্নপাত্রটির পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি পুনরায় দণ্ডদীপিকা এবং পাত্রটি হাতে তুলে এগিয়ে গেলেন একটু দূরের একটি মস্ত বড় গুহামুখের দিকে। ওটিই এই নরকের প্রবেশদ্বার।

গোগ্রাসে অন্ন গ্রহণ শেষ করে মৃৎপাত্রটি কারাকক্ষের বাইরে ঠেলে দিলেন বন্দিনী। সামান্য জল পান করলেন। তারপর নিদ্রার ভান করে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে রক্ষীদের কিছু কথা কানে আসতে লাগল তাঁর।

'ইনি কি সেই তিনি?'

'হ্যাঁ ভাই। ইনিই তিনি।'

'বিশ্বাস হয় না। ইনি তো শুনেছি ইন্দ্রজালে বিশেষ সিদ্ধিপ্রাপ্ত। ধরা পড়লেন কী করে?'

'হুঁ-হুঁ বাবা, রাজসেবকসেনা কী যেমন তেমন সৈন্য হে। তাদের প্রশিক্ষণই আলাদা। আর ঐন্দ্রজালিক হন বা সিদ্ধপুরুষ, শেষ অবধি মানুষ তো বটে।'

'ধরা পড়লেন কী ভাবে?'

‘কাল রাত্রে নাকি এঁদের সন্ধানে কমলাঙ্ক গ্রামের অরণ্যে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছিল। স্বয়ং আনন্দগুপ্ত আর শান্তঘোষ তার দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে দুইপক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দুইপক্ষেরই অনেক অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে। তারপর ওরা যখন জঙ্গলের আরও গভীরে পালিয়ে যাচ্ছিল, ইনি নাকি কোন এক গুপ্তকুটিরের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন। জনৈক রাজসেবকসেনা এঁর সন্ধান পেয়ে বাকিদের ডেকে আনে।’

‘কিন্তু অভিযানটি চালানো হল কেন?’

‘কয়েকদিন আগে বজ্রযোগিনী উৎসবের সময়ে যে মহা অনর্থ ঘটেছিল, তার পেছনে নাকি ইনি আর এঁর কয়েকজন সঙ্গীসাথীই প্রধান।’

‘বল কী হে?’

‘শুধু কী তাই? আরও কারা কারা আছেন শুনলে মাথা ঘুরে যাবে।’

‘যেমন?’

‘মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বপ্যট। বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। আরও অনেকে।’

‘বাপ রে! সবাই তো স্বনামধন্য পুরুষ।’

‘সে আর বলতে? আরও চিন্তার বিষয় কী জান? ওদের হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল কিরাত আর শবরের দল।’

‘কিরাত আর শবর? ওরাও এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?’

‘সেটাই তো! আর তারা নাকি যুদ্ধও করেছে একেবারে প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর মতো। আমাদের সেনার অনেকেই নিহত হয়েছে। আহত আরও বেশি। শুধু তাই নয়, সেই যুদ্ধের পর থেকে শান্তঘোষ আর আনন্দগুপ্ত'র সংবাদ নেই। রাজপ্রাসাদ থেকে বলা হচ্ছে, ওঁরা যুদ্ধে মারাত্মক আহত। কুল্লুকভট্টর অধীনে রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এদিকে শোনা যাচ্ছে তাঁরা আর বেঁচে নেই, নিহত হয়েছেন সেই যুদ্ধে।’

‘বলো কী হে?’

‘ঠিকই বলছি ভায়া। আরও যা সব শুনছি—সে সব যেমন ভয়ঙ্কর তেমনই উদ্বেগজনক।’

‘কীরকম?’

‘সে বড় গুহ্যসংবাদ হে, নিজের কাছেই রেখো। আমার শ্যালক অধিরথকে তো চেনো। সদ্য সদ্য সে বিশাখসেনের আপ্তসহায়ক নিযুক্ত হয়েছে। সে আমাকে বলেছে, গত কয়েকদিন ধরেই নাকি করসংগ্রাহকের কাছ থেকে সংবাদ আসছে যে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হচ্ছে। কর দিতে অস্বীকার করছে। বলছে—যে রানি দরিদ্রের বস্ত্রের সংস্থান করতে পারেন না তাঁকে আবার করদান কীসের!’

‘বলো কী হে? চিন্তার বিষয়। কিন্তু সামন্তপ্রভুরা কী করছেন? তাঁদের রক্ষীবাহিনী?’

‘সেখানেই তো আরও দুশ্চিন্তা। সামন্ত প্রভুরা প্রায় সবাই নিষ্ক্রিয়। তার একটা বড় কারণ হল, রক্ষীবাহিনীর মধ্যেও অনেকে আর দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে চাইছে না। তাই সামন্তপ্রভুরা সেনাবিদ্রোহের ভয় পাচ্ছেন।’

‘ব্বাবা! তাহলে তো খুবই সঙ্গীন অবস্থা।’

‘সঙ্গীন বলে সঙ্গীন? বিভিন্ন জায়গা থেকে ভয়ঙ্কর সব সংবাদ পাচ্ছি ভায়া। শুনছি, দু-একদিনের মধ্যেই নাকি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হবে। তাতে কৃষক আর রক্ষীবাহিনীর অনেকেই যোগ দেবে। সামন্তরাও অনেকে সমর্থন করছেন এই বিদ্রোহ।’

‘চুপ চুপ! বন্দির জন্য খাদ্য আসছে। এখন চুপ থাকো।’

বন্দিনী নিজের কানদুটি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এতক্ষণ যা সব শুনলেন, তার সব সত্যি? এই দেশ তাহলে সত্যিই জেগে উঠেছে! এই জীবনে তিনি দেখে যেতে পারবেন? আবেগে তাঁর হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কিছু পরে এক বিশালদেহী রক্ষী মস্তবড় পাত্রে করে অন্নব্যঞ্জন নিয়ে এল নতুন বন্দির জন্য। সেই সুপক্ক ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণে জিভে জল চলে এল বন্দিনীর। আহা, কতদিন হল ভালো খাদ্য জোটেনি তাঁর।

আগত রক্ষী অন্নপাত্র নামিয়ে দিল মাটিতে। প্রহরারত রক্ষীদল পাত্র ঠেলে দিল কারাকক্ষের মধ্যে। আগন্তুক রক্ষীটি ধীর পায়ে প্রস্থান করল।

বন্দি তাঁর পাত্র নিয়ে কক্ষের শেষপ্রান্তে চলে গেলেন। প্রহরারত রক্ষীরা দুজন আবার বিশ্রম্ভালাপে রত হলেন।

বন্দিটি তাঁর অন্নের স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কী যেন সন্ধান করতে লাগলেন। বস্তুটি হস্তগত হতেই উৎফুল্ল দেখাল তাঁকে। সেটি সন্তর্পণে কটিদেশে গুঁজলেন। তারপর খাদ্যগ্রহণে রত হলেন।

নাহ, ব্যবস্থা তো মন্দ নয়! নিজের মনেই চন্দ্রবংশের আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন তিনি। এই কারাগারের ব্যাপারে যতটা নিন্দা শুনেছিলেন তিনি, অবস্থা ততটা নিকৃষ্ট নয়। লোকে বলে এই কারাগারে নাকি একদিন অন্তর অন্তর বন্দিদের খাদ্য পরিবেশন করা হয়, তাও অপক্ক বা দুর্গন্ধযুক্ত। কই, এই তো তাঁকে সুপক্ক শালিধানের সঙ্গে ওলকন্দের ঝোল দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে হরিণের মাংস। কে বলে প্রকাশচন্দ্রের এই নরকে বন্দিদের অভুক্ত রাখা হয়? যারা বলে তারা মিথ্যুক, তারা শঠ।

বিশালদেহী রক্ষী পরিখার সামনে এসে বলল, ‘পাটাতন নামানো হোক।’

সেতুরক্ষী নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, ‘অধ্যাদেশ?’

বিশালদেহী রক্ষীটি ক্রুদ্ধস্বরে বলল, ‘একটু আগেই তো এখান থেকে গেলাম, নবাগত বন্দির জন্য খাদ্য নিয়ে। তুমিই তো পাটাতন নামিয়ে যেতে দিলে হে। এক অধ্যাদেশ বার বার দেখাতে হবে নাকি?’

সেতুরক্ষী শীতল ও নৈর্ব্যক্তিক সুরে বললেন, ‘তুমি মনে হচ্ছে এই অঞ্চলে নতুন। এই কারাগারের নিয়মবিধি জানো না। এই পাটাতন ওঠাবার বা নামাবার সময় প্রত্যেকবার মহামান্য প্রকাশচন্দ্রের অভিজ্ঞান আবশ্যক।’

আগত রক্ষী বুঝল যে একটু আগে তার ওই অট্টহাস পূজা নিয়ে বলা কথাটার প্রত্যুত্তর দিল সেতুরক্ষী। সে ক্রুদ্ধভাবে কটিদেশ হতে তাম্রনির্মিত চতুষ্কী বার করে পাটাতনরক্ষীর সামনে মেলে ধরল। সেতুরক্ষীটি একবারমাত্র দেখেই পাটাতন নামানোর জন্য উদ্যোগী হলেন।

বিশালদেহী রক্ষী হেলেদুলে পার হয়ে গেল পরিখা। ওদিকে একদল রক্ষী দাঁড়িয়ে আছে ভল্ল হাতে, এই বিশালদেহী রক্ষীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে।

সেতুরক্ষীটির ভ্রূদুখানি কুঁচকে রইল। কী যেন একটা ঠিক হল না। কী যেন একটা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। কিন্তু সেটা কী? কিছুতেই মনে পড়ছে না।

খাদ্যগ্রহণ শেষ হলে শূন্য পাত্র এক পাশে সরিয়ে রাখলেন নবাগত বন্দি। তারপর বেশ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, ‘নাহ, আপনাদের ব্যবস্থা তো বেশ ভালোই দেখছি।’

প্রহরারত রক্ষীদুজন অপ্রস্তুত হল। এই কারাগারে বন্দিদের সঙ্গে বার্তালাপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু এখন যিনি বন্দি আছেন তিনি সাধারণ মানুষ নন। ইনি নাকি জন্ম থেকেই সহজাত যোগবিভূতির অধিকারী।

সমস্ত অবিশ্বাস্য এবং অলৌকিক কর্মে এঁর সিদ্ধি প্রবাদপ্রতিম। রক্ষীদের মধ্যে একজন ইতস্তত করে বলল, ‘ইয়ে, আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো কুমার?’

অন্ধকারের মধ্যেই আকর্ণবিস্তৃত হাসলেন পদ্মসম্ভব। ‘না না অসুবিধা কীসের। দিব্য সুন্দর আপ্যায়ন। খাবারের স্বাদও চমৎকার। শুধু আপনাদের পাচককে বলবেন যে হরিণের মাংসে একটু টক দিতে। তাতে স্বাদ বেশ খোলতাই হয়। আর ওলকন্দের ঝোলে মরিচ আরেকটু বেশি হলে খারাপ হতো না। আমাদের কামরূপে আবার, বুঝলেন কী না, পিপ্পলি মরিচ একটু বেশিই খাওয়া হয়। তবে হ্যাঁ, পাচকের রান্নার হাত বড়ই উত্তম।

রক্ষীদুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। অন্যজন সাহস করে বলল, ‘আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু শুনেছি প্রভু।’

পদ্মসম্ভব শঙ্কিতস্বরে বললেন, ‘খারাপ কিছু শোনেননি তো? দেখুন মশাই, কয়েকটা কথা স্পষ্ট বলে রাখছি। কারণে অকারণে কিছু শত্রু বানিয়ে ফেলেছি বটে, কিন্তু আমার মতো সচ্চরিত্র, জিতেন্দ্রিয়, মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। আমার নামে যেসব নিন্দেমন্দ শুনবেন তার অধিকাংশই মিথ্যে। দোষের মধ্যে সুরাসক্তি কিঞ্চিৎ বেশি আর পরিহাস করার স্বভাবটা একটু বেয়াড়া ধরনের। তা দোষেগুণে মিলিয়েই তো মানুষ, না কী?’

দুই রক্ষী হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

অভিমান ভরে পদ্মসম্ভব বলতে লাগলেন, ‘স্বভাব চরিত্রে আমার মতো সদাশয় মানুষ আপনি দ্বিতীয় পাবেন? এই তো কুমার জয়াপীড়, সামান্য দুশ্চরিত্র হলে কী হবে, অতবড় বীর, আমার নামে কী কুৎসাটাই না করেন!’

একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করল, ‘কী কুৎসা?’

কারাগারের একেবারে সামনে এগিয়ে এলেন পদ্মসম্ভব, ‘শুনবেন? শুনবেন বলছেন? আহা, আপনারা তাহলে শুনুন।

‘এই তো কাল রাত্রে যখন প্রবল লড়াই চলছে, আমি সবেমাত্র চতুর্থ রাজসেবকসেনার মুণ্ডখানি দেহবিচ্ছিন্ন করে জয়াপীড়কে প্রশ্ন করেছি, ‘কী হে ভায়া, তোমার সংবাদ কী?’ সে তার হাতের ভল্লটি অন্য একটি সৈন্যের তলপেটে বিদ্ধ করে বলল, ‘এই তো, সবে ষষ্ঠ সৈন্য বধ করলাম।’ তাতে আমি সন্দেহ প্রকাশ করতেই সেই বহিরাগত কী বলল জানেন?’

রক্ষীদুটি স্তব্ধ।

পদ্মসম্ভব সেদিকে লক্ষ করলেন না। আরও উৎসাহভরে বলতে লাগলেন, ‘বলল, “যাও যাও, তোমরা পূর্বীদেশের মানুষেরা যুদ্ধের জানোটাই বা কী আর বোঝটাই বা কী? তার ওপর তুমি যেমন অলস, তেমন নারীসংসর্গপ্রিয়। তোমার দ্বারা এসব যুদ্ধ টুদ্ধ হবে না ভায়া।” আচ্ছা, আপনারাই বলুন, এ অপমান নয়? কুৎসা নয়? চরিত্রে কলঙ্কলেপন নয়? না হয় মন্দর্ভা আমাকে প্রীতির চোখেই দেখেন। তাই বলে সেটা অমন সবার সামনে ঘটা করে বলার কী দরকার শুনি?’

রক্ষী দুজন স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইল পদ্মসম্ভবের দিকে। এই সেই রাজকুমার? এই নির্বোধ বাচাল লোক? কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে না তো?

এদিকে পদ্মসম্ভব বলেই চলেছেন, ‘সেই জন্যই তো আমাকে নেহাত বাধ্য হয়েই ঝটপট করে আরও দুজন রাজসেবকসৈন্য বধ করে ফেলতে হল। নইলে মুখ দেখাতে পারছিলাম না যে। চারিদিকে অত মান্যগণ্য লোক, সবার সামনে অত বড় অপমানটা মেনে নেওয়া কি ঠিক দেখায়? আপনারাই বলুন।’

‘মান্যগণ্য লোক বলতে?’ নির্বোধের মতো প্রশ্ন করে একজন।

‘সে অবশ্য বেশি নয়, এই যেমন ধরুন লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ, বিনয়াদিত্য জয়াপীড়, খণ্ডিতারাতি বপ্যট, বপ্যটপুত্র গোপালদেব, এই ক’জনই। ওহো, ভালো কথা, বলি গোপালদেবের নাম শুনেছেন তো? শোনেননি? বলেন কী? সে তো বড় আশ্চর্যের কথা। তাহলে একটা গোপন সংবাদ দেব নাকি?’

রক্ষী দুজন নির্নিমেষে চেয়ে রইল। খাটো করে পদ্মসম্ভব বললেন, ‘এই গোপালদেবই কিন্তু সামনের ক’দিনের মধ্যে আপনাদের রাজা হবেন, বুঝলেন? কথাটা আবার পাঁচকান করবেন না। অত্যন্ত গুপ্তসংবাদ। আপনাদের বেশ হৃদয়বান বলে মনে হচ্ছে বলেই বললাম।’

রক্ষী দুজন দ্বন্দ্বে পড়ে গেল।

পদ্মসম্ভব কিন্তু থামলেন না। তিনি মুষ্টিবদ্ধ দুটি হাত প্রসারিত করে বললেন, ‘সেই গোপালদেবও যখন ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন তখন আর থাকা গেল না বুঝলেন। আমার তখন মনটা ভারি খারাপ হল, বলতে গেলে খুবই অপমানিত বোধ করতে লাগলাম। তাই নেহাত বাধ্য হয়েই আপনাদের ওই শান্তঘোষ নামের লোকটার মুণ্ডখানা নামিয়ে দিতে হল। লোকটা অনেকক্ষণ ধরেই একখানা মস্ত তরবারি নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিল। বলে কী না সেটা নাকি আপনাদের ওই প্রকাশচন্দ্রের বিশেষ তরবারি।’

রক্ষীদুজনের শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত নেমে গেল। লোকটা কি উন্মাদ?

পদ্মসম্ভব কারাগরাদের বাইরে হাত দুখানি প্রসারিত করে আক্ষেপের সঙ্গে বলতে লাগলেন, ‘সেই দেখে গোপালদেবের সে কী রাগ! বলে কি না, ‘এই যে আপনাকে অত করে বললাম শান্তঘোষ আমার, আর আনন্দগুপ্ত আপনার, আর আপনিও যে ঘাড় নেড়ে সম্মত হলেন, তার কী কোনও মূল্য নেই?’ লোকটা এমনিতে ভালো আর উদার হলেও রাগলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তার ওপর গায়ে হাতির মতো জোর, তেমনই বাঘের মতো ক্ষিপ্র। আপনারা কিন্তু সাবধানে থাকবেন ভায়া। এ মানুষ শাসক হিসেবে প্রকাশচন্দ্রের থেকে কম কঠোর নন।’

রক্ষী দুজনের মাথার মধ্যে বিপদঘণ্টি বেজে উঠল। এসব সংবাদ কারাধ্যক্ষকে জানাতেই হবে। কোথাও একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। কিছু একটা ঠিক হচ্ছে না...

কিন্তু তারা উঠে দাঁড়াবার আগেই পদ্মসম্ভব আরও গলা নামিয়ে বললেন, ‘তবে গোপালদেবের একটি মস্ত দুর্বলতা আছে। জানতে চান নাকি? তাহলে কাছে আসুন। এসব উঁচু স্বরে বলা ঠিক নয়, দেওয়ালেরও কান আছে।’

রক্ষী দুজন কাছে আসতেই দুটি বলিষ্ঠ হাত দিয়ে তাদের কাছে টেনে নিলেন পদ্মসম্ভব, হয়তো বা গোপন কথা বলতেই। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেরই মাথা আর ঘাড়ের ঠিক মধ্যস্থলে দু’খানি ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণ শলাকা সজোরে বিদ্ধ হল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল রক্ষী দুজন। তারা তরবারি বার করল। কিন্তু সেই তরবারি তোলবার আগেই তারা আবিষ্কার করল যে অবশ হয়ে আসছে তাদের হাত।

পদ্মসম্ভব তখন স্থির এবং শীতল চোখে লক্ষ করছেন দুজনকে। রক্ষী দুজন চিৎকার করার চেষ্টা করেই বুঝল যে তাদের গলা থেকে স্বর বেরোচ্ছে না। পালাবার জন্য দু-পা এগিয়েই আর পারল না, অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

কপালের ঘাম মুছলেন পদ্মসম্ভব। মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন তিনি। শলাকাদুটিতে যে বিষ মাখানো ছিল তাতে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতিকে বেশ কয়েক দণ্ডের জন্য নিদ্রাভিভূত করা যায়। এই ভেষজ বিষের উৎসস্থল কামরূপের পূর্বতম প্রান্তের নাগাভূমির গহীনতম পাহাড়ি অরণ্যে। প্রতি বর্ষায় সেই অরণ্যে এক গুল্মলতা জন্মায়। তার ফুলের নির্যাস থেকে প্রস্তুত হয় এই মহাবিষ। নাগাভূমির বাইরে এর বিষয়ে কেউ জানে না। এর তীব্রতা কালনাগিনীর বিষের থেকেও বহুগুণ অধিক।

ভুলক্রমেও যদি শলাকা দুখানি তাঁর নিজের হাতে বিদ্ধ হতো, তাহলে এতক্ষণে তিনি আর বেঁচে নেই!

কটিদেশ থেকে চামড়ার পট্টিটি বার করে আনলেন পদ্মসম্ভব। তাঁর যা যা প্রয়োজন, তার সবই রয়েছে এখানে। মল্ল সিংহোদর তার কথা রেখেছে।

পট্টি থেকে দৈর্ঘ্যে এক অঙ্গুলি পরিমিত একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল শলাকা বার করে আনলেন তিনি। তার অগ্রভাগ বিশেষভাবে বক্র।

কারাকক্ষটির লৌহদ্বার যেখানে মিলেছে, সেখানে একটি চতুষ্কণী লৌহফলক। সেখানে একটি ছিদ্রে শলাকা ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। একটু পরেই খুট করে একটা শব্দ হল। সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

পাশের কারাকক্ষে বন্দিনী নারীটি গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্পূর্ণ বাক্যালাপ স্বকর্ণে শুনেছেন তিনি। রক্ষীদুটির অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়াও স্বচক্ষে দেখেছেন। অন্য কোনও নারী হলে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতেন। কিন্তু এককালে এই দেশের রাজ্ঞী ছিলেন তিনি। এখনও তাঁর স্নায়ুর ওপর কিছু দখল অবশিষ্ট আছে।

পদ্মসম্ভব দ্রুত পাশের কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। তারপর সামান্য সরে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে বললেন, ‘আসুন মা।’

নারীটি বাইরে এলেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন। অস্ফুটে প্রশ্ন করলেন, ‘কে তুমি?’

‘আপনার এক সন্তান, মা। দ্রুত আমার সঙ্গে চলুন।’

নির্মল শরতের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সেতুরক্ষীটি। অনেকক্ষণ ধরে একটা অস্বস্তি তাঁর মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে। কিন্তু কী—সেটি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি।

একটু পর সহকারী যুবা এসে সামনে দাঁড়াল। তিনি তার দিকে না তাকিয়েই বললেন, ‘কী চাই?’

‘কালকে আমি হয়তো আসতে পারব না প্রভু।’

ভ্রুকুঞ্চন করলেন সেতুরক্ষী, ‘কেন?’

‘আজ্ঞে কাল আমার একমাত্র ভাগিনেয়র অন্নপ্রাশন।’

‘হুম। ঠিক আছে।’ অন্যমনস্ক ভাবে বললেন সেতুরক্ষী। তারপর প্রশ্ন করলেন, ‘তা ভাগিনেয়কে কী দিয়ে আশীর্বাদ করবি?’

‘আজ্ঞে, একটি স্বর্ণনির্মিত অঙ্গদ আর বালা কিনেছি প্রভু...’

লাফিয়ে উঠলেন সেতুরক্ষী, ‘কী বললি আবার বল...’

সামান্য অপ্রস্তুত হল যুবক, কিছু ভুল বলল নাকি? আবার বলল, ‘আজ্ঞে একটি অঙ্গদ আর বালা। নইলে শিশুটির মণিবন্ধ বড় শূন্য দেখায়...’

হাতের ভল্লটি নিয়ে কারাগারের প্রধানদ্বারের দিকে ছুটলেন সেতুরক্ষী। তাঁর মাথার মধ্যে বিপদঘণ্টা বেজে চলছিল।

পদ্মসম্ভব একটু এগিয়ে অলিন্দের মুখে একবার উঁকি দিলেন।

অলিন্দ একটু গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মুখে একটি প্রহরী দাঁড়িয়ে। নিদ্রাহীন, ভাবলেশহীন মুখ।

তাঁরা দুজন যেখানে বন্দি ছিলেন, তার পাশে আরও তিনটি কারাকক্ষ আছে। এই পাঁচটি কক্ষগুচ্ছের সামনে থেকে একটি অলিন্দ এঁকেবেঁকে চলে গেছে কারাগারের মুখ্যদ্বারের দিকে। এরকম আরও দুখানি

অলিন্দ এসে যুক্ত হয়েছে সেখানে। কারাগারের মুখ্যদ্বারের পাশেই কারাকর্তার কার্যালয়।

সামান্য নীচু হয়ে অস্পষ্ট শব্দ করলেন পদ্মসম্ভব। রক্ষী এদিকে মুখ ফেরাল। গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করল, 'শ্রীধর, ভদ্রসেন, সব ঠিক তো?'

কোনও উত্তর নেই।

রক্ষীটি আবারও প্রশ্ন করল, 'উত্তর দাও শ্রীধর।'

কোনও উত্তর নেই।

রক্ষীটি আকর্ষি থেকে দণ্ডদীপিকা খুলে এগিয়ে আসতে থাকল।

দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইলেন পদ্মসম্ভব। জ্ঞানহীন রক্ষীদুজনের দেহ এখন কারাকক্ষের মধ্যে। তাদের একজনের পোশাক তাঁর অঙ্গে, তরবারি তাঁর হাতে।

রক্ষীটি অলিন্দের ঠিক মুখে আসতেই একটি সূক্ষ্ম শলাকা ঠিক তার ডান কানের পাশে বিদ্ধ হল। রক্ষীটি দ্রুত সেটি টেনে বার করে দূরে নিক্ষেপ করল। তারপর ডানদিকে ঘুরেই দেখল তার ঠিক সামনে তরবারিহাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষটি—একটু আগেই যাঁকে সদ্য বন্দি করে আনা হয়েছে। দ্রুত বিস্ময় কাটিয়ে সে কোষমুক্ত করল তরবারি। কিন্তু তার আগেই একটি মুষ্ট্যাঘাত তাকে বাধ্য করল জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে।

দণ্ডদীপিকা তুলে নিলেন পদ্মসম্ভব। মৃদুস্বরে বললেন, 'আসুন মা, দেখবেন, যেন শব্দ না হয়।'

সেতুরক্ষী উন্মত্তের মতো কারাদ্বারের সামনে এসে উচ্চৈঃস্বরে বলল, 'দ্বার উন্মুক্ত করো রক্ষী।'

প্রধান দ্বাররক্ষী উঁকি দিয়ে দেখল। একটু পরেই কপিকলের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেল। দ্বারখানি সামান্য উন্মুক্ত হতেই ঝড়ের মতো প্রবেশ করল সেতুরক্ষী। তারপর কারাকর্তার কার্যালয়ের দ্বারখানির ওপর সজোরে করাঘাত করতে লাগল। বাকি রক্ষীরা সচকিত এবং বিস্মিত হয়ে তাকাল।

কারাকর্তা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বাইরে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার প্রহরী?'

সেতুরক্ষীটি ঊর্ধ্বশ্বাসে বলল, 'কয়েক দণ্ড আগে যে রক্ষীটি নবাগত বন্দির জন্য অন্নপাত্র নিয়ে এসেছিল, তার সন্ধানে রক্ষী পাঠান প্রভু, এখনই। আর আমার সঙ্গে আরও দুজন রক্ষী দিন, আমি নবাগত বন্দিটিকে একবার দেখে আসতে চাই।'

কারাকর্তা একবার তাকালেন সেতুরক্ষীর উত্তেজিত মুখের দিকে। একজন রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন রাজপ্রাসাদে জেনে নিতে, কে এসেছিল অন্নপাত্র নিয়ে। আর নিজেই দণ্ডদীপিকা তুলে নিয়ে বললেন, 'চলো।'

অলিন্দ দিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে এলেন দুজনে। প্রথম বাঁক পেরিয়ে গেলেন। প্রথম আর দ্বিতীয় বাঁকের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে কোথাও একটি গুপ্তপথ আছে। এই অন্ধকারা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ। তার সন্ধান খুব কম মানুষ জানেন।

সেই গুপ্ত পথটির সন্ধান করতে হবে দুজনকে। পথটি কোথায়, বহুকষ্টে সেই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু তাকে চেনার কী উপায়—সে ব্যাপারে কেউ জানে না। সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধি ও কৌশলের ওপর নির্ভর করে তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে সেই গুপ্তপথের মুখ।

দ্বিতীয় বাঁকের সামনে এসে পদ্মসম্ভব উঁকি দিলেন একবার। দূরে একজন রক্ষী দাঁড়িয়ে। সে এদিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার?'

দুজনেরই মুখ কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত। পদ্মসম্ভব পিছিয়ে এলেন। সঙ্গিনীকে ইশারায় বললেন নিশ্চল হয়ে থাকতে।

এইবার পরীক্ষা। পদ্মসম্ভব নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছিলেন।

পদ্মসম্ভব দেওয়ালের গায়ে ধীরে ধীরে আঘাত করছেন! কোথাও কোনও ফাঁপা শব্দ উঠছে কি? একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রবেশ করতে পারে এমন একটি গুপ্তপথ দেওয়ালের ওপারে থাকলে তার শব্দ অবশ্যই অন্য হবে। কিন্তু শব্দ শোনা গেল না।

দণ্ডদীপিকার আলো কমে আসতে লাগল। একটু পরেই দীপ্যধিকারী আসবে নতুন আলো নিয়ে। তার পূর্বেই গুপ্তপথটির সন্ধান পেতে হবে তাঁদের। এছাড়া আর পথ নেই তাঁদের সামনে। কারাকক্ষের মধ্যে তিনজন কারারক্ষীর মৃতদেহ শায়িত।

তিনি তাঁর প্রচেষ্টা দ্রুততর করলেন। দুপাশের দেওয়ালে বারংবার আঘাত করে দেখতে লাগলেন পূর্ণদৈর্ঘ্যের মানুষের পালাবার মতো পথের সন্ধান পাওয়া যায় কী না। প্রতিটি জোড় বা ফাটলের মুখ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু না, সব চেষ্টাই নিষ্ফল হল। প্রার্থিত পথের চিহ্নই পাওয়া গেল না।

স্বেদবিন্দু জমতে লাগল পদ্মসম্ভবের কপালে। দণ্ডদীপিকার আলো আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দীপ্যধিকারীর আসতে আর বেশি দেরি নেই। যা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই করে ফেলতে হবে।

অসহায়ের মতো একবার অলিন্দের ছাদের দিকে তাকালেন পদ্মসম্ভব। কে জানে, পথটি হয়তো...

সঙ্গী নারীটি একবার শব্দ করতে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিলেন। পদ্মসম্ভব সচকিত হয়ে নীচে তাকালেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন—একটি ছোট ইঁদুর দেওয়ালের নীচ দিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

অর্থাৎ দেওয়ালের নীচে কোনও না কোনও পথ আছে, সেই পথ দিয়ে মূষিকজাতীয় প্রাণী যাতায়াত করে। নিভু নিভু দণ্ডদীপিকাটি হাতে নীচু হয়ে বসলেন পদ্মসম্ভব।

ইঁদুরটি যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল, তার চারপাশের দেওয়ালটি হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকলেন। ধীরে ধীরে অমসৃণ দেওয়ালের গায়ে একটি বড় বৃত্তাকার পাথর ফুটে উঠল। খুব ভালো করে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে সেটি এই দেওয়ালের অংশ নয়, আলাদা করে প্রস্তুত করে এনে এখানে বসানো হয়েছে। প্রস্থে সেটি প্রায় দুই মানুষ সমান প্রশস্ত।

পদ্মসম্ভব তার গায়ে ধীরে ধীরে তিনবার আঘাত করলেন।

পরক্ষনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে গোল পাথরটির চারিধারে খোঁচাতে লাগলেন। একটু পরেই পাথরটি নড়তে লাগল। অতি সাবধানে সেটি ধাক্কা দিলেন পদ্মসম্ভব।

পাথরটি ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে ঘুরে গেল।

দণ্ডদীপিকাটি তিনি নামিয়ে আনলেন।

ভেতরে একটি গুপ্তপথ। প্রস্থে দুই মানুষ সমান হলে কী হবে, উচ্চতা বেশি নয়। তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়ার উপায় নেই, চতুষ্পদের মতো চার হাতে পায়ে যেতে হবে।

পদ্মসম্ভব উঠে দাঁড়ালেন। প্রবল পরিশ্রমে তাঁর সমস্ত দেহ ঘর্মাক্ত। এইবার আসল পরীক্ষা। দুজনকে এই গুহাপথের ওপারে পৌঁছতে হবে।

সঙ্গিনীর দিকে ইশারা করলেন পদ্মসম্ভব। তাঁর চোখে একটা আতঙ্কের ছায়া দেখে অভয় ইঙ্গিত করলেন। তারপর তাঁকে সেই গুহাপথে প্রবিষ্ট করে নিজেও অগ্রসর হলেন। বহুকষ্টে হস্তপদদ্বয়ের সঞ্চালনে বৃত্তাকার গুহাদ্বারটি বন্ধ করতেই নিকষ অন্ধকার নেমে এল।

সেতুরক্ষী আর কারাকর্তা দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছিলেন অলিন্দপথ ধরে। কারাকর্তা প্রথম যে সৈন্যটিকে পেলেন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'সব ঠিক আছে প্রহরী?'

সৈন্যটি বিনীতভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ প্রভু, কোথাও কোনও গোলযোগ নেই।'

কারাকর্তা ফিরে তাকালেন সেতুরক্ষীর দিকে। তারপর বললেন, 'দেখলে তো, সব ঠিকই আছে।'

সেতুরক্ষী বিনীতস্বরে বলল, 'যখন এতটাই এসেছি প্রভু, নতুন বন্দির সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হতো না?'

'আচ্ছা, চলো দেখেই আসা যাক।'

সংকীর্ণ গুহাপথ দিয়ে ক্রমাগত সরীসৃপের মতো এগিয়ে যাচ্ছিলেন দুজন। নিবিড় অন্ধকার। আদি নেই, অন্ত নেই, ঊর্ধ্ব নেই, অধঃ নেই। শুধু আছে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দে বহুদিনের বদ্ধ গুহাপথের কটু বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। কতকাল এই গুহাপথ উন্মুক্ত করা হয়নি কে জানে। প্রথমদিকে তো নিঃশ্বাস নেওয়াই যাচ্ছিল না। তবে বাতাস একটু একটু করে সহনীয় হয়ে উঠছিল, এটাই যা আশার কথা।

গুহাপথটি সমতল নয়, একটু একটু করে উপরদিকে উঠেছে। কিছুটা যাওয়ার পর পরই একটি করে বাঁক। তার মধ্য দিয়ে শরীর নিয়ে যাওয়া এক দুরূহ কর্ম। পদ্মসম্ভব কিছুটা চেষ্টা করে তাও পারছিলেন। কষ্ট হচ্ছিল বৃদ্ধা সঙ্গিনীর। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে দিয়ে সেই অসম্ভব কর্মটিও করিয়ে নিচ্ছিল।

বেশ কিছুটা যাওয়ার পর গুহাপথটি সামান্য প্রশস্ত হল। এবার পথটি মোটামুটি সরল। দুজনে আরও দ্রুতবেগে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন।

একটি প্রশস্ত স্থান পাওয়া গেল। সেখানে মাথা উঁচু করে বসা যায়। দুজনে সেখানে বসে পরিশ্রান্ত পশুর মতো হাঁপাতে লাগলেন। দুজনেরই গলা শুকিয়ে কাঠ। হাত এবং পায়ের বিভিন্ন অংশে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

পদ্মসম্ভব অন্ধকারের মধ্যেই চাতালের বিপরীত দিকের গুহামুখে হাত বুলিয়ে বুঝেছেন যে সামনের পথটি আরও প্রশস্ত।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর দুজনে আবার অগ্রসর হলেন অন্যদিকের গুহাপথ বেয়ে। এবার গুহাপথে বয়ে আসা নির্মল বাতাসের আভাস তাঁদের ক্রমে উজ্জীবিত করতে থাকল। দুজনে এবার তাঁদের শরীরের অন্তিম শক্তিটুকুর সাহায্য এগিয়ে যেতে থাকলেন অন্য প্রান্তের দিকে।

অলিন্দের মধ্যপথে এসে সেতুরক্ষীটি থেমে গেলেন। নত হয়ে মেঝে থেকে কিছু গুঁড়ো হাতে তুলে নিলেন। তারপর নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'এগুলো এখানে কেন? অলিন্দটি কি রোজ পরিষ্কার করা হয় না?'

কারাকর্তা ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বললেন 'তুমি কি এবার এই কারাগৃহের কর্মপরিচালন নিয়েও মাথা ঘামাবে?'

সেতুরক্ষীটি তৎক্ষণাৎ বললেন, 'আমি তা বলতে চাইনি প্রভু।'

তিনজনে সামনে এগিয়ে গেলেন। প্রথম বাঁকের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে সতর্ক হলেন কারাকর্তা। এখানে একজন প্রহরীর প্রহরারত থাকার কথা। অথচ কেউ নেই!

কারাকর্তা সন্তর্পণে ডাকলেন, 'প্রহরী।'

কোনও উত্তর নেই।

তিনজনে নিজেদের তরবারি কোষমুক্ত করলেন। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন সামনের দিকে।

ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে উঠছিল গুহাপথ। দুজনে চার হাত পায়ে দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে। বাতাস আরও নির্মল হয়ে উঠছিল। একটু পরেই গুহাপথটি ডানদিকে বেঁকে গেছে। দুজনে সেই বাঁকটি ঘুরতেই দেখলেন একটু দূরে পথের শেষ। একটি বৃত্তাকার লৌহদ্বার তার মুখটি অবরুদ্ধ করে আছে।

দুজনে লৌহদ্বারের সামনে জড়োসড়ো হয়ে বসলেন। দুজনের দেহ ঘামে প্লাবিত।

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নারীটির চোখ জ্বলজ্বল করছিল। পদ্মসম্ভব ধীরে, অতি ধীরে মরিচা-ধরা লৌহদ্বার বাইরের দিকে খোলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটি বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুত হল না। শক্তিপ্রয়োগের পরিমাণ বাড়াতে থাকলেন পদ্মসম্ভব। কিন্তু সেই অনড় লৌহদ্বারটি বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। দুবার সজোরে পদাঘাত করলেন তিনি। তাতেও কোনও ফললাভ হল না।

প্রচণ্ড ক্রোধে শেষবারের মতো শরীরে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে যাবেন পদ্মসম্ভব, এমন সময় তাঁর সঙ্গিনী তাঁর কাঁধ স্পর্শ করে থামতে বললেন। একটু এগিয়ে এসে দ্বারটির চারিদিক হাত বুলিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করে পরিধির প্রান্ত থেকে একটি কীলক খুলে নিলেন।

দ্বারটি ভিতরদিকে খুলে এল।

পদ্মসম্ভব খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর সশব্দে হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

অলিন্দ ধরে উন্মাদের মতো ছুটে আসছিলেন তিনজন। কারাকর্তা মুখ্যদ্বারের কাছে পৌঁছেই চিৎকার করে উঠলেন, ‘দ্বাররক্ষী, বজ্রশিঙা বাজাও। মহারাজসচিবের কাছে সঙ্কটবার্তা পাঠাও। প্রত্যেক প্রহরীকে সমবেত করো।’

প্রহরীরা হতবাক হয়ে গেল। কারাকর্তা শীতল মস্তিষ্কের মানুষ, আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে এত উত্তেজিত হতে দেখেনি। জনৈক প্রহরীপ্রধান ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন, ‘কী হয়েছে প্রভু?’

‘অদ্যাবধি যা হয়নি, তাই হয়েছে। আজ সন্ধ্যাকালে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দিটিকে আমাদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল, তিনি পালিয়েছেন। তার সঙ্গে পালিয়েছেন ধর্মচন্দ্রের মহিষী কাঞ্চনাদেবীও।’

প্রহরীদল স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে। সংবাদটি তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এও কি সম্ভব? এই নরক থেকে পালানো শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তবও বটে।

কারাকর্তা কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ‘শুধু তাই নয়; শ্রীধর, ভদ্রসেন, কীর্তিপতি—তিন প্রহরী নিহত। তাদের দেহ পাওয়া গেছে শূন্য কারাকক্ষের মধ্যে। আমি জানি না এরপর কী হবে!’

পদ্মসম্ভব গুহাগহ্বরটি থেকে মাথা বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখলেন। এদিকে রক্ষীদের আসার প্রশ্নই ওঠে না। তাই সতর্কতার কোনও প্রয়োজন নেই।

তাঁর মাথার ঠিক ওপরে লালিম্ববনের পর্বতের শীর্ষদেশ। পর্বতগাত্রটি মসৃণ, পাথুরে এবং উল্লম্ব। কিছু নীচে বয়ে চলেছে মেঘান্দ’র খরস্রোতা শাখানদী। এতদূর থেকেও তার ফেনিল গর্জন শোনা যাচ্ছে। কোনও অবলম্বন ছাড়া এই পর্বতগাত্র বেয়ে নদীতীরে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব।

তিনি কটিদেশ থেকে পুনরায় সেই চর্মপট্টিটি বার করলেন। বেরিয়ে এল দুটি ক্ষুদ্র পাথর। তারপর নিজের পরিধেয় বস্ত্রের শুষ্কতম অংশ ছিঁড়ে তার ওপর অতি যত্নে পাথরদুটি ঘষতে লাগলেন। গুহাদ্বার রইল তাঁর পিঠের দিকে, যাতে বাতাস এসে বিঘ্ন না ঘটায়।

পাথরদুটিতে বোধহয় দাহ্যচূর্ণ সম্পৃক্ত ছিল। সামান্য পরিশ্রমেই শুষ্ক বস্ত্রখণ্ডটি জ্বলে উঠল। পদ্মসম্ভব অতি সাবধানে সেটি বাড়িয়ে ধরলেন বাইরের দিকে।

নদীর ওপারে কয়েকজন এই সংকেতের জন্যই অপেক্ষা করছিল। মুহূর্তের মধ্যে সেদিক থেকে একটি ক্ষুদ্র নৌকা এপারের উদ্দেশে রওনা দিল। একইসঙ্গে লালিম্ববনের শীর্ষদেশে সচল হয়ে উঠল কয়েকটি ছায়ামূর্তি।

একটু পরেই পদ্মসম্ভবের ঠিক সামনে একটি শনের রজ্জু এসে পড়ল। লালিম্ববনের শীর্ষদেশ থেকে কেউ যেন সেটি ঝুলিয়ে দিয়েছে।

পদ্মসম্ভব সঙ্গিনীকে বললেন, 'আমার পিঠে চড়ে কাঁধ আর গলা জড়িয়ে বসুন মা।'

সঙ্গিনী ইতস্তত করতে লাগলেন। পদ্মসম্ভব বিনীতভাবে বললেন, 'দেবী, আপনি রাজমাতা, আমার মাতৃসমা। এই অধম সন্তানের কাছে সংকোচ করবেন না মা। মনে করুন আমিই আপনার সেই মৃত সন্তান আনন্দচন্দ্র, আপনাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

নারীটির দুই চোখে ধক করে আগুন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। স্বামী আর সন্তান হত্যার প্রতিশোধ।

তিনি পদ্মসম্ভবের পিঠে চড়ে বসলেন। পদ্মসম্ভব দুই হাতে আর পায়ে রজ্জুটি জড়িয়ে নিলেন তারপর ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকলেন।

ক্রুদ্ধ এবং আহত বাঘের মতো ফুঁসছিলেন প্রকাশচন্দ্র। আজ অবধি তাঁকে কখনও এত ক্রোধান্বিত হতে দেখা যায়নি। শত জটিল সমস্যা, উদ্বেগজনক পরিস্থিতি, বিক্ষোভ সংবাদ—এসবের মধ্যেও তাঁর স্থৈর্য অচঞ্চল ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন শান্ত ভঙ্গিতে, আজ অবধি তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু আজ তাঁর পদচালনা অস্থির। আচরণ উন্মত্ত। বাক্য রূঢ় এবং অসংযত। প্রকাশচন্দ্র, বঙ্গের অবিসংবাদী শাসক প্রকাশচন্দ্রের প্রতিটি বাক্যে, পদক্ষেপে, আচরণে ফুটে উঠছিল বুদ্ধিহীনতার লক্ষণ।

বঙ্গদেশের রানি রাজসিংহাসনে আসীন। বজ্রযোগিনীর মন্দিরের বিস্ফোরণের আঘাত থেকে সদ্য নিরাময় হয়ে উঠেছেন তিনি। প্রসাধন সত্বেও তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে এখনও কিছু ক্ষতচিহ্ন। মুখখানিও আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে।

চারজন রাজন্য কঠিন মুখ করে বসেছিলেন। সভার মধ্যে কম্পিতদেহে দাঁড়িয়েছিলেন কারাকর্তা আর সেতুরক্ষীটি।

'কী করে সম্ভব হল মাধব?' ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন প্রকাশচন্দ্র।

'প্রভু, এ ত্রুটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত...' আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করছিলেন কারাকর্তা।

'আমি কোনও মিথ্যা স্তোকবাক্য শুনতে চাইনি মাধব,' ধমকে উঠলেন প্রকাশচন্দ্র, 'ওরা পালাল কীভাবে, সেইটি জানতে চেয়েছি।'

কারাকর্তার দিকে তাকিয়েছিল কয়েক জোড়া কঠিন নিষ্করুণ চোখ। সেই দেখে তাঁর দাঁতে ঠকঠকানি লেগে যাচ্ছিল। সেই অবসরে মুখ খুললেন সেতুরক্ষীটি, 'মহামান্য মহারাজসচিব! কাঞ্চনাদেবী এবং কুমার পদ্মসম্ভব যে কারাকক্ষগর্ভে ছিলেন সেখান থেকে অনতিদূরে, অলিন্দের মধ্যে একটি বৃত্তাকার গুপ্তপথ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে সেই পথেই দুজনে পলায়ন করেছেন।'

'গুপ্তপথ?' ভ্রুকুঞ্চন করলেন প্রকাশচন্দ্র, 'কোন গুপ্তপথ?'

'প্রভু, আমরা আবিষ্কার করেছি কারাকক্ষগামী অলিন্দের নিম্নদেশে একটি বিশেষ গুপ্তগুহা আছে। সেটির মুখ একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত বৃত্তাকার প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। আমরা নিঃসন্দেহ যে এই দুই বন্দি ওই পথেই পলায়ন করেছেন।'

'এই বন্দিশালা আমার সৃষ্টি। এখানে কোনও গুপ্তপথ থাকার তো কথা নয়।' প্রকাশচন্দ্রের স্বর প্রস্তরকঠিন। তাঁর মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। তাঁরই নির্দেশে নির্মিত কারাগারে এই গুপ্তগুহার অস্তিত্ব তিনি নিজেও জানতেন না? এ কী করে সম্ভব?

সবাই নিশ্চুপ। সেই অবসরে তিক্ত কাঠিন্যের সঙ্গে প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'আমার বেতনভুক রক্ষীর দল যে পথের সন্ধান পেল না, তার সন্ধান ওরা পেল কী করে? এত অর্থব্যয় করে, এত সযত্নে তোমাদের পুষছি কেন মাধব? এর থেকে তো কয়েকটি জংলি কুকুর পুষলেই বরং ভালো হতো।'

কারাকর্তা মাথা নীচু করে রইলেন।

অগ্নিগর্ভ নৈঃশব্দের পর প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'কারাকক্ষের প্রহরা এড়িয়ে ওঁরা সেই গুপ্তপথ অবধি পৌঁছল কী করে?'

কারাকর্তা কম্পিতস্বরে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, ঘটনাটি এতই আকস্মিক আর অসম্ভব যে এখনও এর পারম্পর্য বুঝে উঠতে পারিনি।'

প্রকাশচন্দ্র কিছুক্ষণ অগ্নিবর্ষী চোখে কারাকর্তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সেতুরক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, 'আর তুমি, সেতুপ্রহরী! তোমার কী মত? তুমিই তো শুনলাম সর্বপ্রথম বিপদসংকেত দিয়েছিলে।'

সেতুরক্ষী বলে ওঠে, 'প্রভু, কুমার পদ্মসম্ভবকে বন্দি করে আনার কিছু পরেই জনৈক রক্ষী তাঁর কাছে রাজপ্রাসাদ থেকে অন্নপাত্র নিয়ে আসে। আমি প্রাথমিক দেহপরীক্ষার সময় লক্ষ করেছিলাম যে রক্ষীটির দক্ষিণ মণিবন্ধে একটি প্রশস্ত চর্মপট্ট বাঁধা আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় যে, সেটি দেবী অট্টহাসের ব্রতধারণপট্ট। আমিও সেই নিয়ে প্রশ্ন করিনি।

সেই রক্ষী চলে যাওয়ার সময় নিয়ম অনুসারে তার দ্বিতীয়বার দেহপরীক্ষা হয়। তখন তাকে আমি যেতে দিই। কিন্তু তার অব্যবহিত পর দৈবগতিকে আমার মনে পড়ে যে, বেরোবার সময় রক্ষীটির মণিবন্ধে সেই চর্মনির্মিত ব্রতপট্টটি ছিল না। আমার সন্দেহ হয়। তৎক্ষণাৎ আমি কারাকর্তাকে সেই বিষয়ে সতর্ক করি...'

হাত তুললেন প্রকাশচন্দ্র, 'বুঝেছি, আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বন্দি দুজন যে পথে পালাল, সেই গুপ্তপথটির সন্ধান তোমরা পেলে কী করে?'

ইতস্তত করল সেতুরক্ষী, 'প্রভু, আমি বন্দিদের সন্ধানে যাওয়ার পথেই লক্ষ করেছিলাম যে অলিন্দের মাটিতে কিছু সূক্ষ্ম প্রস্তরচূর্ণ বিক্ষিপ্ত আছে, যেরকম চূর্ণ কোনও প্রস্তরখণ্ডকে দেওয়ালে বদ্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। সেই সূত্রে অনুসন্ধান করতে করতে বৃত্তাকার গুপ্তদ্বারটির সন্ধান পাই প্রভু।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রকাশচন্দ্র। তাঁর মনের মধ্যে একটা কুটিল সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছিল। তাহলে কি তাঁর অজ্ঞাতেই...

'কে সেই রক্ষী যে অন্নপাত্র নিয়ে গেছিল?'

'প্রভু, অনেক অনুসন্ধানের পর জেনেছি, তার নাম মল্ল সিংহোদর। সদ্য মগধ থেকে ভাগ্যান্বেষণে এই দেশে এসেছে। তার পূর্বে সে নালন্দা মহাবিহারের দ্বাররক্ষী ছিল। এই ঘটনার পর থেকেই সে উধাও, তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।'

প্রকাশচন্দ্রের পায়ের কাছে একটি নীচু ত্রিপদী রাখা ছিল। তার ওপর একটি অরিষ্টপূর্ণ রৌপ্যনির্মিত কলস, আর একটি স্বর্ণনির্মিত পানপাত্র। প্রকাশচন্দ্র সেই ত্রিপদীতে সজোরে পদাঘাত করলেন। ঝনঝন শব্দে কলসটি সভার একদিকে নিক্ষিপ্ত হল। মদিরা নির্গত হয়ে দুর্মূল্য গালিচা ভিজিয়ে দিতে লাগল। পানপাত্রটি উড়ে এসে

কারাকর্তার কপালে আঘাত করল। তিনি শুধু ক্ষতস্থান একহাতে চেপে ধরলেন, মুখ থেকে একটি শব্দও নির্গত হল না। শুধু উষ্ণ রক্তধারা নেমে এল তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

প্রকাশচন্দ্র আদেশ দিলেন, 'রক্ষীদল, এই অপদার্থ কারাকর্তাকে এই মুহূর্তে কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করো। রাজকর্মে অবহেলার অর্থ রাজদ্রোহ। এ যেন রাজদ্রোহীর উপযুক্ত শাস্তিই পায়। লক্ষ রেখো, এর শরীরের একটি অংশও যেন দাহকার্যের জন্য অবশিষ্ট না থাকে।'

কারাকর্তার হাহাকারে সভার বাতাস আকুল হয়ে উঠল। উপস্থিত রাজন্য বা সামন্তদের কারও ভ্রুকুঞ্চন হল না। সেতুরক্ষীটির হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। হতভাগ্য কারাকর্তা কাঁদতে কাঁদতে রানির কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন। রাজ্ঞী এদিকে তাকালেন না।

উপস্থিত রাজসেবকরক্ষীরা হতভাগ্য কারাকর্তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'আর তুমি, সেতুরক্ষী, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম রঙ্গলাল, প্রভু।'

'তুমি মল্ল সিংহোদরের মুখ দেখলে চিনতে পারবে?'

'অবশ্যই পারব প্রভু। আমি কারও মুখ একবার দেখলে ভুলি না।'

প্রকাশচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে আদেশ দিলেন, 'সমগ্র কর্মান্তবাসকে প্রহরা চতুর্গুণ করো। আমি নির্দিষ্টভাবে জানতে চাই এই রাজদ্রোহের পিছনে কারা আছে। ঘোষণা করে দাও, যে বা যারা বজ্রযোগিনী মন্দিরের সামনে ঘটে যাওয়া অন্তর্ঘাতের সঙ্গে জড়িত কারো সন্ধান দিতে পারবে, তারা এক কলসী রৌপ্যদ্রম্ম পারিতোষিক পাবে।

আর এই রঙ্গলালের সঙ্গে চৌষট্টিজন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজসেবক দেওয়া হোক। শোনো রঙ্গলাল, যদি এই মল্ল সিংহোদর, কাঞ্চনাদেবী বা কুমার পদ্মসম্ভব—এদের সন্ধান দিতে পারো, একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম উপহার হিসেবে পাবে। মনে থাকবে?'

রঙ্গলাল সায় দিতেই একজন রক্ষী এসে তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

সভাস্থলে আবার অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল।

কিছু পর প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'জিতসেন, আজ থেকে গূঢ়পুরুষবাহিনীর প্রধানের দায়িত্বও আপনিই নির্বাহ করুন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত গুপ্তচরদের মধ্যে যারা দক্ষতম তাদের ডেকে পাঠান। তাদের কর্মান্তবাসকের সর্বত্র নিয়োজিত করুন। আমি জানি, বিদ্রোহীরা আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তাদের সেই গর্ত থেকে টেনে বার করে আনতে হবে। তারপর তাদের এমন শাস্তি দেব যা দেখে ঈশ্বরও ভয়ে কেঁপে উঠবেন।'

প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট ইতস্তত‌স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'শান্তঘোষ আর আনন্দগুপ্ত'র হত্যাকারীদের সন্ধান দেওয়ার জন্য কি অন্য কোনও পারিতোষিক ঘোষণা করা হবে মহামান্য রাজসচিব?'

কিছুক্ষণ অমিতাভভট্ট'র দিকে চেয়ে রইলেন প্রকাশচন্দ্র। মানুষটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং রাজসেবায় নিবেদিতপ্রাণ হলে কী হবে, কূটবুদ্ধিতে নিতান্ত শিশু।

প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'না আর্য। প্রথমত, আমরা জানি এই কাজ কাদের। একই কাজের জন্য দুবার পারিতোষিক ঘোষণা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। দ্বিতীয়ত, শান্তঘোষ এবং আনন্দগুপ্ত'র হত্যার সংবাদ এখনও জনারণ্যে প্রকাশ করা হয়নি। তাই পারিতোষিক ঘোষণার প্রশ্নই ওঠে না।'

অগ্নিমিত্র অনুচ্চ স্বরে যোগ করলেন, 'আমরা কৌশলে রটনা করেছি যে ওঁরা দুজন কোনও এক বিশেষ এবং গোপন রাজকার্যে বিদেশযাত্রা করেছেন।'

শান্তস্বরে প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'আপনাদের মতই শান্তঘোষ এবং আনন্দগুপ্ত ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনক্ষমতার অচ্ছেদ্য অংশ। বিদ্রোহীরা তাঁদের হত্যা করেছে, এই সংবাদ প্রচার হলে জনসাধারণের মধ্যে

নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাবে। আমরা সেটি হতে দিতে পারি না।'

আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি বললেন, 'তাছাড়া আরও একটি কারণ আছে।'

অন্য রাজন্যরা আচার্য'র দিকে ফিরে চাইলেন। তিনি কঠিনস্বরে বললেন, 'আমাদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। তার পরিচয় উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবাদ জনারণ্যে প্রচার করা ঠিক হবে না।'

সভার মধ্যে থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল। অগ্নিমিত্র ইতস্ততভাবে বললেন, 'এরকম অনুমানের কারণ কি আচার্য?'

বিশুদ্ধকীর্তি ওষ্ঠপ্রান্ত সামান্য বিকৃত হল, 'ঘটনাপ্রবাহের পারম্পর্য বিচার করলেই এ কথার সত্যতা প্রতীয়মান হবে। সেই রাত্রের অভিযানের কথা আমরা সপ্তরাজন্য এবং স্বয়ং মহারানি ছাড়া আর কেউ জানতেন না। সমগ্র অভিজানটির জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল। কারণ আমরা চেয়েছিলাম—একই সঙ্গে সব কজন কুচক্রীকে বন্দি করতে।

'তা সত্ত্বেও তাঁরা যে তাঁদের উদ্দেশ্যপালনে শুধু ব্যর্থ হয়েছিলেন তা নয়, এই দুই মহারথী নির্মমভাবে নিহত হন। রাজসেবকসৈন্যদল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাহিনীপ্রধান গিরিকিশোরের মৃতদেহ এমন নৃশংসভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে যে তার দিকে তাকানো যায় না।

এই বঙ্গদেশের বুকে দাঁড়িয়ে কেউ এমন শাসকবিরোধী অন্তর্ঘাত ঘটাতে পারে, এ আমরা এতদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু তাইই ঘটেছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম এ হয়তো আমাদের গুপ্তচরদের আত্মতুষ্টির ফল।

'কিন্তু সেইরাত্রের অভিযানের ক্ষেত্রে তো সমস্তরকম সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই ঘটনা সম্ভব হল কী করে?

'যে কয়েকজন রাজসেবক বেঁচে ফিরে এসেছে, তাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে শান্তঘোষ এবং আনন্দগুপ্ত যখন রাজসেবকবাহিনী নিয়ে শত্রুদের প্রায় অধিকৃত করে ফেলেছেন, ঠিক তখনই তাঁদের ওপর অতর্কিতে প্রতিআক্রমণ নেমে আসে। বলা বাহুল্য, ওঁরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। নইলে অত সহজে দুই মহারথী এবং অমন দুর্ধর্ষ, দুর্বধ্য রাজসেবকদের নির্মূল করা অসম্ভব।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই আপাত অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হল কী করে? এর একটিই উত্তর। এই প্রতিআক্রমণ একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন এই অভিযানের সংবাদ আগেই শত্রুদের কাছে যদি যায় পৌঁছে।

অর্থাৎ আমাদের মধ্যেই এমন কেউ আছেন, যিনি আমাদের সমস্ত আলোচনা শত্রুপক্ষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন।'

প্রত্যেকে পাথরের মতো বসে রইলেন। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তির শেষ বাক্যটি যেন অনুচ্চারে সন্দেহের জাল বুনে দিচ্ছিল সবার মনে। আর তার সঙ্গে সবার মনের মধ্যে চারিয়ে যাচ্ছিল ভয়, মহাভয়।

প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'আমি নিশ্চিত যে, আমাদের মধ্যেই কেউ একজন সেই বিশ্বাসঘাতক। তবুও আপনাদের আশ্বস্ত করছি যে, যতক্ষণ না অপরাধী ধরা পড়ছে বা নিজের অপরাধ স্বীকার করছে, ততক্ষণ আপনারা প্রত্যেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

কালই আমি আর রানি বিশেষ যজ্ঞসাধনায় বসব। আমি আমার সমস্ত সাধনপ্রকরণ দিয়ে চেষ্টা করব সমস্ত মিথ্যাজাল ছিন্ন করতে। মা বজ্রযোগিনী আমাদের সহায় হোন।'

একটা শিরশিরে ভয় প্রত্যেকের শিরদাঁড়া বেয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে উঠে আসতে লাগল। উত্তপ্ত পারদের মতো, শান্ত আগ্নেয় লাভার মতো, শীতল মৃত্যুর মতো সেই ভয়।

প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'আর্য অগ্নিমিত্র, আমার ধারণা চূড়ান্ত সংঘর্ষের সময় উপস্থিত। শত্রুরা যে কোনও মুহূর্তে চূড়ান্ত এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। এখন কর্মান্তবাসকের সৈন্যশিবিরে কত সৈন্য উপস্থিত?'

‘পঞ্চসহস্রের কিছু অধিক, মহারাজসচিব।’

‘সে কী! আমাদের সৈন্যসংখ্যা তো বিশসহস্রাধিক!’

‘অন্যান্য সৈন্যরা আপাতত বঙ্গদেশের বিভিন্ন সামন্তপ্রদেশে রাজদ্রোহদমনে ব্যস্ত মহারাজসচিব।’

পরের প্রশ্ন এল রাজ্ঞীর থেকে। ‘আশ্চর্য! রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর তিন চতুর্থাংশ বিভিন্ন সামন্তরাজ্যে রাজদ্রোহনির্বাপণে সন্নিবিষ্ট, আর সেই সংবাদ আমাকে বা মহারাজসচিবকে কেউ জানায়নি?’

অগ্নিমিত্র সামান্য অপ্রতিভ হলেন, ‘প্রয়াত শান্তঘোষ স্বয়ং এই বিষয়ে অবগত ছিলেন মহারানি। বিগত বেশ কয়েক পক্ষকাল যাবৎ আমরা সংবাদ পাচ্ছিলাম যে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন সামন্তপ্রদেশে বিদ্রোহের উদ্রেক ঘটছে। কোথাও সামন্তসৈন্যরা দ্রোহী হয়েছে, কোথাও বা কৃষক এবং অন্যান্য কৃষ্যমানকেরা। অনুগত সামন্তরা ক্রমাগত সাহায্য প্রার্থনা করে বার্তা প্রেরণ করছিলেন। তাই তাঁদের সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছে।’

রাজ্ঞীর মুখমণ্ডলে প্রশ্নচিহ্নের উদয় হল, ‘তার মানে প্রকৃতপক্ষে কর্মান্তবাসক এখন অরক্ষিত, তাই তো?’

‘অরক্ষিত বলা ভুল হবে মহারানি। কর্মান্তবাসকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্ব অনেকাংশেই রাজসেবক বাহিনী নির্বাহ করে। তবে সৈন্যদলের একটি বৃহদাংশ এই মুহূর্তে অন্যত্র নিয়োজিত, এ কথা সত্য।’

প্রকাশচন্দ্র বললেন, ‘আর যেসব অঞ্চলে সামন্তশাসন অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব এবং আয়ত্তাধীন, তাঁদের সৈন্যবাহিনী?’

অগ্নিমিত্র অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, ‘সেইসব সামন্তদের সৈন্যবাহিনীও ওই একই কর্মে নিয়োজিত হয়েছে, রাজসচিব।’

প্রকাশচন্দ্রের মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। প্রশ্ন করলেন, ‘আর্য অগ্নিমিত্র, যে যে সামন্তপ্রদেশে সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়েছে তাদের নাম বলুন।’

অগ্নিমিত্র পাঁচটি সামন্তপ্রদেশের নাম বললেন।

প্রকাশচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ‘এগারোটি সামন্তপ্রদেশের মধ্যে পাঁচটিতে এতই বিদ্রোহের উন্মেষ ঘটছে যে দেশের রাজধানী অরক্ষিত রেখে সেখানে সৈন্যসন্নিবেশ করতে হয়েছে? এমনকী অন্য ছ’টি সামন্তপ্রদেশ থেকেও? কে নিয়েছে এত বড় সিদ্ধান্ত?’

অগ্নিমিত্র বিব্রত হলেন, ‘এই সিদ্ধান্ত একান্তই শান্তঘোষের ছিল, মাননীয় রাজসচিব।’

প্রকাশচন্দ্র খানিকক্ষণ স্থির চোখে চেয়ে রইলেন অগ্নিমিত্রর দিকে। তারপর শান্ত এবং ধীরস্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘এই ঘটনা কবে ঘটেছে?’

‘আমরা মাসাধিককাল থেকে এই মর্মে সংবাদ পাচ্ছিলাম, মাননীয় মহারাজসচিব। অবশেষে শরতের প্রারম্ভে উপায়ান্তর না দেখে আমরা সৈন্যপ্রেরণ করতে বাধ্য হই।’

রাজ্ঞী প্রশ্ন করলেন, ‘আর্য জিতসেন, এই পাঁচটি সামন্তপ্রদেশে নিশ্চয়ই আমাদের গুপ্তচরেরা রয়েছে। তাদের কাছ থেকে কী বার্তা এসেছে?’

জিতসেন বললেন, ‘তারাও একই বার্তা প্রেরণ করেছে মহারানি। সর্বত্র পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটেছে। অধিকাংশ স্থানেই সামন্তসৈন্যদল বিদ্রোহী হয়েছে। সামন্তবর্গ এবং তাঁদের অধীনস্থ রাজপদাধিকারীরা প্রাণভয়ে ভীত। বিদ্রোহী সৈন্যদল প্রতিটি সামন্তপ্রদেশের প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলি তো অধিকার করেইছে, অনেক ক্ষেত্রে রাজধানীর দিকেও অগ্রসর হয়েছে। তার সঙ্গে বিদ্রোহী হয়েছে কৃষক এবং অন্যান্য কৃষ্যমানকেরা। তারা কর দিতে অস্বীকার করছে। অন্তত তিনটি সামন্তপ্রদেশে রাজকোষ লুণ্ঠিত হয়েছে। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে আর্য শান্তঘোষ এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।’

প্রকাশচন্দ্রের মুখমণ্ডল অবিকৃত রইল। তিনি বললেন, ‘আশা করি আর্য শান্তঘোষ সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি বিষয়ে জ্ঞাত হতে চাই আর্য জিতসেন।’

‘আদেশ করুন প্রভু।’

‘আপনারা তো জানেন যে প্রতিটি সামন্তপ্রদেশের রাজপদোপজীবিদের মধ্যে এক বা দুজন এমন গুপ্তপুরুষ আছেন যাঁরা গোপনে আমাদের সহায়তা করেন। তাঁদের থেকে কি এই বিদ্রোহবিষয়ে কোনও সংবাদ পেয়েছেন?’

জিতসেন বললেন, ‘আমরা গণনা করে দেখেছি যে ওই পাঁচটি প্রদেশে ঠিক ছ’জন রাজপুরুষ আছেন যাঁরা কর্মান্তবাসক থেকে নিয়মিত গুপ্ত অর্থ পেয়ে থাকেন। তাঁদের পাঁচজনের কাছ থেকে পাওয়া বার্তায় আমরা একই সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা নিঃসন্দেহ যে এই বিদ্রোহসংবাদ সম্পূর্ণ সত্য।’

‘ষষ্ঠজন কে?’

‘বিক্রমপুরাধিপতি ধর্মসেনের কোষাধ্যক্ষ চণ্ডকীর্তি।’

প্রকাশচন্দ্র কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি প্রশ্ন করলেন, ‘একটি কথা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না আর্য প্রকাশচন্দ্র। যে পথে কুমার পদ্মসম্ভব এবং কাঞ্চনাদেবী পালিয়েছেন, তার সন্ধান ওঁরা পেলেন কী করে?’

প্রকাশচন্দ্র আত্মগতভাবে বললেন, ‘এর একটিই উত্তর সম্ভব আচার্যদেব। আর সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে ষড়যন্ত্রের মূল অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। আমি যা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক বেশি গভীরে। এবং সেক্ষেত্রে প্রতিটি অস্বাভাবিক ঘটনা আমাদের বার বার যাচাই করে দেখতে হবে, তার স্বপক্ষে যতই সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকুন না কেন।

‘আর্য অগ্নিমিত্র, স্থানিক সমিতি বা আমাদের গুপ্তভৃতকদের থেকে যে গোপন পত্রগুলি এসেছে, সেগুলি আমি এখনই একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।’

অগ্নিমিত্র বললেন, ‘সেগুলি আমার সঙ্গেই আছে, আপনি এখনই পরীক্ষা করতে পারেন।’

অগ্নিমিত্র’র ইঙ্গিতে একজন রক্ষী কয়েকটি তালিপত্র এনে দিল প্রকাশচন্দ্রের সামনে। তিনি এক এক করে পড়তে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর প্রকাশচন্দ্র যখন মুখ তুললেন তখন তাঁর মুখ থমথম করছে। তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, ‘জিতসেন, আপনি এখনই সমস্ত সৈন্যদের কর্মান্তবাসকে ফিরে আসার আদেশ দিন। আর চণ্ডকীর্তির সন্ধানে এক্ষুনি চর প্রেরণ করুন। আমার আশঙ্কা যদি সত্য হয়, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে।’

আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি প্রশ্ন করলেন, ‘কী ঘটতে চলেছে মহারাজসচিব? কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করছেন আপনি?’

‘আমার ধারণা আমাদের স্থানিক সমিতির প্রধান বা গুপ্তসচিবরা বন্দি। এই পত্রগুলি হয় তাদের ভয়প্রদর্শন করে লেখানো হয়েছে, অথবা পত্রগুলি নকল।’

জিতসেন বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘কেন এমন ভাবছেন প্রভু?’

‘পত্রগুলি আপনি যদি পরীক্ষা করতেন, তাহলে লক্ষ করতেন যে তালিপত্রগুলি এক, তাদের আকার এক, পত্রের ভাষা প্রায় এক, ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ একেবারে একইরকম। বিভিন্ন সামন্তপ্রদেশ থেকে আসা প্রতিটি পত্রের মধ্যে এত সাদৃশ্য হতে পারে!’

সকলে আবার নিশ্চুপ। প্রকাশচন্দ্র অমিতাভভট্টের দিকে ঘুরলেন, ‘আর্য অমিতাভভট্ট, আপনাকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজের ভার দিতে চাই। এর জন্য আপনার থেকে উপযুক্ত আর কেউ নেই।’

অমিতাভভট্ট সাগ্রহে বললেন, ‘কী কাজ মহারাজসচিব?’

‘আপনাকে একবার হরিকেল যেতে হবে আর্য। সেখানে আমার এক প্রাচীন মিত্র ইশ্বরচিন্তায় বার্ধক্যাতিপাত করছেন। তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।’

‘আপনার মিত্র? হরিকেলে?’ বিস্মিত হলেন অমিতাভভট্ট, ‘কে তিনি?’

‘আর্য চারুদত্ত।’

মানুষটি দ্রুত হাঁটছিল অন্ধকারের মধ্যে। দুর্ভেদ্য অরণ্য। এর মধ্য দিয়ে দ্রুত চলাফেরা করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। পদে পদে পা জড়িয়ে ধরে নাম না জানা লতা। কোথাও বা গভীর গহ্বর, কোথাও বিষাক্ত লতার ঘন ঝোপ।

আর বন্য জন্তুর তো কথাই নেই। বন্য বরাহ, হিংস্র সারমেয়, শৃগাল, বন্য মহিষ ইত্যাদিতে পূর্ণ এই অরণ্য। আর বিষধর সাপ! রাজগোক্ষুরো থেকে শুরু করে কালাচ, শাঁখামুটি, কেউটিয়া কী নেই অরণ্যে?

মানুষটি তবুও তার যাত্রা থামাল না। তাকে যে করেই হোক পৌঁছতে হবে অরণ্যের অন্য প্রান্তে। কারণ তার পিছনে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণী।

মানুষ।

একটি অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত স্থানে এসে গভীর নিঃশ্বাস নিল মানুষটি। দেহ ঘর্মাক্ত। দেহের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষশাখার আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত থেকে রক্তপাত হচ্ছে। কিন্তু সেদিকে তার মন নেই। তার মন পড়ে আছে ফেলে আসা পথের দিকে। কারও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না তো? ধর্মসেনের গুপ্তঘাতকরা তার সন্ধান পেয়ে গেল না তো?

অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে কান পেতে রাখার পর নিশ্চিন্ত হল মানুষটি। একবার আকাশের দিকে তাকাল সে। নক্ষত্র অবস্থান দেখে দিকনির্ণয় করতে হবে তাকে। কাল দ্বিপ্রহরের মধ্যেই যেনতেন প্রকারেণ কর্মান্তবাসকে পৌঁছনো আবশ্যক। নইলে মহা অনর্থ ঘটে যাবে।

কিন্তু এক পা এগোতেই মানুষটি অনুভব করল যে তার সমস্ত শরীর তীব্র ব্যথার কশাঘাতে জর্জরিত। দেহের প্রতিটি অংশ যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। মাথা ভার, পা দুটি আর চলতে চাইছে না। অবশ্য তার কারণও আছে।

দীর্ঘ দুই রাত্রি সে প্রায় অনাহারে রয়েছে। বন্য জন্তুর মতো ছুটে বেরিয়েছে বিক্রমপুরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। আশ্রয় ভিক্ষা করেছে পরিচিত মিত্রজনেদের কাছে। কিন্তু না, ধর্মসেনের রুদ্রচক্ষুর সামনে কারও সাহস হয়নি তাকে আশ্রয় দেওয়ার।

শেষে বহু পুরাতন পরিচিতির সূত্র ধরে জনৈক তস্কর তাকে আজ প্রভাতে এই অরণ্যের প্রান্তে ছেড়ে যায়। অবশ্যই কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে। সেই থেকে সে এই অরণ্যপথে ক্রমাগত ছুটে চলেছে কর্মান্তবাসকের দিকে। যৎসামান্য ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে বনজ ফলে। অরণ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে মেঘান্দ’র এক ক্ষুদ্র শাখা। তার জলে তৃষ্ণানিবারণ করেছে সে। আর ক্রমাগত কান পেতে বোঝার চেষ্টা করেছে, ধর্মসেনের ঘাতক রক্ষীরা তার সন্ধানে ছুটে আসছে না তো?

মাটিতে বসে পড়ল সে। শরীর আর দিচ্ছে না। চক্ষু বন্ধ করল।

মাসাধিককাল যাবৎ বিক্রমপুরের রাজন্যবৃত্তের মধ্যে সে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছিল। হঠাৎ করেই গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীদের অন্য দায়িত্বে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। মহামাত্য এবং অন্যান্য কিছু বিশিষ্ট রাজপদাধিকারীদের অসময়ে রাজপ্রাসাদে আনাগোনা বেড়ে গেছিল। ইতিউতি কিছু অসন্তোষের সংবাদও আসতে শুরু করেছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

কিন্তু তাতে সে বিশেষ আমল দেয়নি। অমন সহস্রাধিক অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ নিমেষে নির্বাপিত করার ক্ষমতা রাখে ধর্মসেন। শুধু মাত্র নিজের কর্তব্যপালন করে যাচ্ছিল। দিনগত পাপক্ষয়। সুযোগমতো বিশ্বস্ত পারাবত কামিনীর মাধ্যমে আর্য শান্তঘোষের কাছে সংবাদ প্রেরণ করতে হবে।

এদিকে পরিস্থিতি ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠছিল। সে বুঝতে পারছিল যে, রাজপ্রাসাদের সর্বত্র একটা থমথমে অবিশ্বাসের আবহাওয়া চারিয়ে যাচ্ছে। ঠিক একমাস পূর্বে এক রাত্রির মধ্যে তার পরিচিত জগত সম্পূর্ণ পালটে গেল।

পরিচারক এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই শয্যার ওপর উঠে বসলেন অগ্নিমিত্র। তাঁর চোখেমুখে চাপা উত্তেজনার ছাপ। এই মুহূর্তটির অপেক্ষা করছিলেন তিনি। অবশেষে, অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে।

'তিনি কি একাই এসেছেন?'

'না প্রভু, ভাঁড়ুদত্তও সঙ্গে আছেন।'

প্রীত হলেন অগ্নিমিত্র। বণিকশ্রেণীর মানুষদের তিনি চিরকালই দেখেছেন শাসকের পক্ষ নিতে। স্বাভাবিক, কারণ শাসকের কোপে পড়া মানে বাণিজ্যের ক্ষতি, অর্থাগমের ক্ষতি। কোনও বণিকই সেই ঝুঁকি নেন না।

তাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিজগুণেই শাসকদের বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠেন। শাসকপক্ষের প্রীতিবর্ধক কাজে সহযোগিতা করেন, শাসকপক্ষের আদিষ্ট কর্ম সম্পাদনে বিশেষ উৎসাহ নেন। ভাঁড়ুদত্ত এমনই একজন মানুষ।

ভাঁড়ুদত্তর আবাসলয়টি এই কর্মান্তবাসকের উচ্চবর্গের আনন্দনিকেতন বিশেষ। সেখানে অনেকানেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ক্লান্তি অপনোদন করতে আসেন। তাই বহুদিন থেকেই ভাঁড়ুদত্ত'র মাধ্বীশালার ওপর রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টি রয়েছে।

শান্তঘোষ একবারই মিলিত হয়েছিলেন ভাঁড়ুদত্তর সঙ্গে। অগ্নিমিত্রও ছিলেন সেই আলাপচারিতায়। এই অর্থলোভী মনুষ্যটিকে স্ববশে আনতে বেশি পরিশ্রম হয়নি তাঁদের।

'ওঁদের আসতে বলো।' আদেশ দিলেন অগ্নিমিত্র।

সামান্য অপেক্ষার পর ওঁরা দেখা দিলেন। শাসকবান্ধব ভাঁড়ুদত্ত এবং জনৈক অতিথি। নবাগত অতিথিটির আচার আচরণের মধ্যে অস্বস্তির চিহ্ন প্রবল। মুখচ্ছবি শীর্ণ। অক্ষিমণি চঞ্চল। হাত দুখানি পরস্পরের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠবদ্ধ।

নবাগত আগন্তুককে স্বাগতসম্ভাষণ জানালেন অগ্নিমিত্র, 'আসুন ভন্তে, আপনার জন্যই তো এত আয়োজন। তারপর, কোন মদিরাসেবন ইচ্ছা করেন বলুন, অরিষ্ট না মৈরেয়?'

'মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগতপ্রায় কুমার। আজ রাতেই আমাদের সেই মহাকর্মসাধনে প্রবৃত্ত হতে হবে। আর সময় নেই।'

মানুষটি বসেছিলেন পদ্মাসনে। সামনে একটি প্রদীপ। তার শিখার মৃদু কম্পনে পিছনের দেওয়ালে দুটি মানুষের ছায়াচিত্র ফুটে উঠছিল।

'কিন্তু লোকেশ্বর,' সংশয়াকুল স্বরে প্রশ্ন করলেন পদ্মসম্ভব, 'আপনি এই ঔষধির গুণাগুণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ তো?'

'যদি আমার চরেরা সঠিক সংবাদ দিয়ে থাকে, তাহলে এই ঔষধি কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না কুমার। আর যে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই লতাগুল্মটি রক্ষিত ছিল, তাতে তো প্রমাণ হয়েই যায় এই সেই প্রার্থিত সর্ববিষহর ঔষধি।'

পদ্মসম্ভব তবুও ইতস্তত করতে লাগলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি আপনার চাঞ্চল্যের কারণ অনুমান করতে পারি কুমার। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সামনে অন্য কোনও পথ নেই।'

পাশের ঘর থেকে শিলবাটার শব্দ ভেসে আসছিল। কমলশীল প্রাণ হাতে করে যে সর্ববিষহর লতাগুল্মটি নিয়ে এসেছেন, তার থেকে ঔষধ প্রস্তুত করা হচ্ছে। ভিক্ষুণী মন্দর্ভা স্বয়ং তার দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুর্বেদ বিদ্যায় অসামান্য ব্যুৎপত্তি আছে তাঁর। নালন্দা মহাবিহারের শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার দায়িত্ব তিনিই নির্বাহ করেন।

তাঁকে সাহায্য করছেন এক তরুণী। তাঁর মুখখানি আবেগহীন এবং গম্ভীর হওয়ায় বয়সের তুলনায় তাঁকে অনেক বয়স্ক দেখায়। এই বিংশতিবর্ষীয়াকে দেখলে কে বলবে অস্ত্র হাতে কী ভয়ঙ্কর হতে পারেন তিনি। রাজসেবকপ্রধান গিরিকিশোরকে সম্মুখ দ্বৈরথে স্বহস্তে বধ করেছেন। তাঁর এক খড়্গাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে আনন্দগুপ্ত'র মস্তক। তাঁর অসামান্য যুদ্ধকৌশল দেখে বিস্মিত হয়েছেন বপ্যট স্বয়ং।

ঘরের এককোণে চুপ করে বসে আছেন দুজন। গোপালদেব এবং আচার্য শান্তরক্ষিত। গোপালদেব নির্বিকার। তাঁর শান্ত সমাহিত মুখ দেখে মনের মধ্যে কী চলছে বোঝা অসম্ভব। আচার্য শান্তরক্ষিতের মুখে অবশ্য উদ্বেগ এবং উত্তেজনা স্পষ্ট। তিনি শাস্ত্রাধ্যায়ী শিক্ষক। কর্তব্যের প্রেরণায় এই মহাবিদ্রোহের একজন অংশ হয়ে পড়েছেন বটে, কিন্তু স্থৈর্য আয়ত্ত করতে পারেননি।

গোপালদেব চেয়েছিলেন বিংশতিবর্ষীয়া কন্যাটির দিকে। তিনি মহাবীর, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। জীবন ও মৃত্যুকে দুই হাতে অঙ্গদের মতই ধারণ করেন তিনি। নিঃশঙ্কহৃদয়ে, ভাবনাহীন চিত্তে শত্রুনিপাতে তাঁর দক্ষতা সহজসিদ্ধ। কিন্তু এই কন্যার যুদ্ধক্ষমতা তাঁকে বিস্মিত করেছে। কী অনায়াস অস্ত্রচালনা, কী দ্রুত শরীরসঞ্চালন, কী শান্ত অথচ নির্ভয়চিত্ত একাগ্রতা। বঙ্গদেশের মৃদু, শান্ত, শ্যামল মৃত্তিকায় এমন বীরাঙ্গনা জন্ম নেয় তা হলে?

যুবক গোপালদেবের হৃদয় শ্রদ্ধার সঙ্গে এক অন্য অনুভূতিতে ভরে যাচ্ছিল। একে বীর তিনি, তদুপরি সুপুরুষ। অদ্যাবধি নারীদের কাছ থেকে প্রণয় ইঙ্গিত কম পাননি। কিন্তু কোনও কারণে গোপালদেবের হৃদয়ের গোপন গহীন কন্দর নির্জিতই রয়ে গেছিল। অথচ সেই রক্তাক্ত রাত্রির পর থেকে এই তরুণীর খড়্গধারী উন্মুক্তকেশী চামুণ্ডারূপটি তাঁর হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে গেছে। তিনি সেই ভয়ঙ্করসুন্দর রূপ ভুলতে পারছেন না।

মন্দর্ভা কাজ করতে করতে নীচু স্বরে আদেশ দিচ্ছিলেন তরুণীকে। তরুণী যন্ত্রের মতো আদেশ পালন করে যাচ্ছিল। গোপালদেব সামান্য অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আর্যা, আর কতক্ষণ?'

মন্দর্ভা উত্তর দিলেন, 'আরও কিছু সময় লাগবে, আর্য গোপালদেব। ধৈর্য ধরতে শিখুন। এ আপনার খড়্গের তীক্ষ্মমার্জনা নয়।'

গোপালদেব অপ্রস্তুত হলেন। আর্যা মন্দর্ভাকে তিনি অত্যন্ত ভয় করে চলেন। বয়সে ছোট হলে কী হবে, এই ভিক্ষুণীর চরিত্রে, ব্যক্তিত্বে, আচরণে এমন একটি দার্ঢ্য আছে যা তাঁর মতো যুদ্ধনায়কের কাছ থেকেও সম্ভ্রম দাবি করে। তিনি শুধু লক্ষ করলেন যে মন্দর্ভার বাক্য শুনে তাঁকে অপ্রতিভ হতে দেখে তরুণীর ওষ্ঠে একটি বঙ্কিমরেখা দেখা গেল।

যাক, এ মেয়ে তাহলে হাসে, পাষাণ প্রতিমা নয়!

গোপালদেব সন্তর্পণে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা এখন যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন তার তুল্য নিরাপদ, গোপন স্থান কর্মান্তবাসকে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রকাশচন্দ্র আর তার বেতনভুক সারমেয়র দল শত চেষ্টাতেও এর সন্ধান পাবে না। নিজের মনেই মহর্ষি মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হলেন গোপালদেব। এই অসামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতা সত্যিই শিক্ষণীয়।

স্ফটিকনির্মল আকাশ থেকে হিমঋতুচ্ছায়া সূক্ষ্ম কুয়াশার মতো নেমে আসছে পৃথিবীর ওপর। একটু দূরে কলস্বিনী মেঘান্দ। এখান থেকে তার ক্ষীণ স্রোতগর্জন শোনা যায়। অঙ্গনে কয়েকটি কেতকী, জাতি এবং নাগচম্পার গাছ। দূরে দেখা যায় কয়েকটি কক্ষে প্রদীপশিখা। আরও দূরের কোন মন্দির থেকে সান্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল।

আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন গোপালদেব। অগণন নীহারিকাপুঞ্জ থেকে স্নিগ্ধ আলোকবিন্দুর মতো নেমে আসছে নক্ষত্রের আলো। সেই অলৌকিক নক্ষত্রালোকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে লালিম্ববন পর্বত আর তার সংলগ্ন অরণ্যানী।

আজ হতে প্রায় অর্ধশতবৎসর পূর্বে তাঁর পিতামহ আচার্য দয়িতবিষ্ণু কর্মান্তবাসকের ভূমিতে দাঁড়িয়ে কি এভাবেই দেখেছিলেন আকাশ? কী দেখেছিলেন? অনাগত পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী? অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের অভ্রান্ত দিকচিহ্ন?

কয়েক দণ্ড সময় কেটে গেল। কে যেন তাঁকে পিছন থেকে ডাকল, 'আর্য গোপালদেব, আসুন। আপনার ঔষধি প্রস্তুত।'

গোপালদেব ফিরে তাকালেন। সেই তরুণী তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে, হাতে একটি প্রদীপ। গম্ভীর অথচ কমনীয় মুখখানি প্রদীপের শিখায় সদ্যস্নাতা করবীর মতো পবিত্র দেখাচ্ছে। গোপালদেব মৃদু হেসে বললেন, 'চলুন আর্যা।'

এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল, ঘরের মধ্যে একটি পাথরের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্ষুণী মন্দর্ভা। তাঁর একপাশে আচার্য শান্তরক্ষিত, অন্যপাশে কুমার পদ্মসম্ভব। আর তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মৎস্যেন্দ্রনাথ।

এই দৃশ্য দেখে মনে যেটুকু সংশয় ছিল তা কেটে গেল গোপালদেবের। এঁরা যদি সঙ্গে থাকেন তো ত্রিলোকে কাউকে ভয় পান না তিনি। স্বয়ং যমরাজকেও না।

ঘরের দিকে এগোতে যাচ্ছেন, এইসময় তরুণী বলে ওঠে, 'কুমার, আমার বড় ভয় করছে। অবলোকিতেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি যেন সুস্থ থাকেন।'

মুহূর্তের মধ্যে যেন স্তব্ধ হল সৌর আবর্তন। গোপালদেবের বুকের মধ্যে জ্বলে উঠল সহস্র আলোকমঞ্জীর। এক কোমল কস্তুরীঘ্রাণ তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে অপার্থিব স্রোত হয়ে নেমে আসতে লাগল তাঁর সুষুম্নাকাণ্ড বেয়ে।

গোপালদেব হেসে বললেন, 'আমার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করবেন আর্যা। আমাদের অনেক যৌথ সংগ্রাম বাকি রয়ে গেল।'

তরুণী বললেন, 'আর্যা নয় কুমার। আমার নাম দেদ্দদেবী। আমাকে সেই নামেই ডাকবেন।'

মানুষটি কতক্ষণ বনতলে শুয়েছিল, সে জানে না। এতদিনের পরিশ্রমে অভুক্ত অশান্ত দেহ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। তাই চোখ খুলে যখন সে দেখল যে তখনও রাত্রির ঘন অন্ধকার, তখন সে বিশেষ আশ্চর্য হয়নি। আশ্চর্য হল আকাশের দিকে তাকিয়ে।

নক্ষত্রের বিচলন বা চন্দ্রকলার হ্রাসপ্রাপ্তি দেখে দিনক্ষণ গণনা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তাঁর স্মৃতি যদি খুব বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তাহলে বর্তমান চান্দ্রতিথি জানাচ্ছে যে উপর্যুপরি দুই রাত সে এখানে নিদ্রাভিভূত ছিল।

কথাটি হৃদয়ঙ্গম হতেই একটা শিহরিত অনুভূতি নেমে গেল তার মেরুদণ্ড দিয়ে। দীর্ঘ দুইটি দিন এই হিংস্র উন্মুক্ত অরণ্যপ্রান্তরে ঘুমিয়েছিল সে? তা সত্ত্বেও সে জীবিত? কোনও বন্য পশুর খাদ্য হয়নি? কোনও মহাসর্পের কালদংশনের শিকার হয়নি?

এ নিশ্চয়ই নিয়তিনির্দিষ্ট কাললক্ষণ। অর্থাৎ এত সহজে মরণ হবে না তার!

কথাটা মাথায় আসতেই শরীরে মনে যেন দ্বিগুণ বল ফিরে এল। দ্রুত উঠে পড়ল ভূমিশয্যা ছেড়ে। কোঁচড়ে তখনও কিছু ফল রয়ে গেছিল, তার একটি দ্রুত নিঃশেষ করল সে। তারপর ফের এগোতে লাগল তার উদ্দিষ্ট পথে। কর্মান্তবাসকের দিকে।

যে করেই হোক প্রকাশচন্দ্রের কাছে পৌঁছতে হবেই তাকে। আর পৌঁছতে হবে অতি দ্রুত। যে সুনিপুণ ষড়যন্ত্রের জাল ঘিরে ধরেছে কর্মান্তবাসককে, তা ছিন্ন করতেই হবে। চাই কী, হয়তো মহারানি তাকে বিক্রমপুরের সামন্তই করে দিলেন। আর সেদিন সে দেখে নেবে কত বড় সামন্ত হয়েছে ধর্মসেন! মনশ্চক্ষে নিজের নামটিও দেখতে পেল সে, মহাসামন্ত চণ্ডকীর্তি।

আজ থেকে ঠিক এক মাস আগের ঘটনা। নৈশাহার সমাপ্ত করে সবে শয্যাগ্রহণ করতে যাবে, এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত। এই করাঘাতের ক্রম এবং ছন্দ তার পরিচিত। দ্বার উন্মুক্ত করতেই দ্রুত প্রবেশ করেছিল তার ব্যক্তিগত চর, ভীম।

ভীম মহাসামন্ত ধর্মসেনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। ধর্মসেন তাকে নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত আলোচনা তার সামনেই হয়। ভীমও প্রভুগতপ্রাণ, বিশ্বাসহন্তা হওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না।

তবুও বহু আয়াসে, সেই অসম্ভব কর্ম সম্ভব করেছিল চণ্ডকীর্তি। অর্থ নয়, ভয় নয়, নারীসংসর্গবর্জিত ভীমকে ধর্মসেন প্রলোভিত করেছিল নারীদেহ দিয়ে। আর সেই পাপকর্মে তাকে যথাবিহিত সাহায্য করেছিল বিক্রমপুরের উদীয়মান নগরনটী, সেঁউতি। উদ্ভিন্নযৌবনা এই বারবধূর বরতনুর জালে জড়িয়ে পড়েছিল ভীম। ফেরার পথ ছিল না তার।

ভীম সেই রাতে যা বলেছিল, তাতে হাত পা অবশ হয়ে এসেছিল চণ্ডকীর্তির।

বিক্রমপুরনরেশ যে বহুবিধ কারণে কর্মান্তবাসকের প্রতি বিরূপ, সে ইঙ্গিত অনেকবারই পেয়েছে চণ্ডকীর্তি। কিন্তু সে জানত যে, ধর্মসেন যতই প্রতাপশালী দুর্দমনীয় সামন্ত হন না কেন, অযথা চন্দ্রশাসকদের বিরুদ্ধতা করার মতো দুর্বুদ্ধি কখনই হবে না তাঁর।

কিন্তু সেই রাতে ভীম জানিয়েছিল—সেই দুর্বুদ্ধিই হয়েছে ধর্মসেনের। আরও বেশ কয়েকজন সামন্ত'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অবিশ্বাস্য অন্তর্ঘাতের পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

সেই পরিকল্পনার কথা শুনে স্থির থাকতে পারেনি চণ্ডকীর্তি। ভেবেছিল পরদিন ভোর হওয়ার আগেই পৌঁছে যাবে বিক্রমপুরের গুপ্তচর প্রধানের কাছে। এত বড় স্পর্ধা কী করে হয় ধর্মসেনের, সেই সংবাদটা নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু পারেনি চণ্ডকীর্তি। গুপ্তচর প্রধানের কাছ থেকে কোনও প্রয়োজনীয় সংবাদই নিষ্কাশন করতে পারেনি সে। ধূর্ত প্রৌঢ়টি যেন কোন জাদুমন্ত্রে বদলে গেছিলেন। মাথা নেড়ে যান্ত্রিক স্বরে শুধু বলে যাচ্ছিলেন, 'অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন চণ্ডকীর্তি। এই সময়ে আমাদের নিশ্চুপ এবং নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত। ধর্মসেন যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ঠিকই নিচ্ছেন। এতে শেষাবধি বিক্রমপুর তথা বঙ্গদেশের উপকারই হবে।'

তখনই মনে হয়েছিল চণ্ডকীর্তির, কোথাও একটা মস্ত বড় ফাঁকি রয়ে গেছে। প্রাজ্ঞ মানুষটির এই আচরণ অস্বাভাবিক।

পর দিন থেকেই সে বুঝতে পারছিল যে, তার চারিপাশে একটা অদৃশ্য জাল যেন বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। কোন অদৃশ্য চোখ যেন নিরীক্ষণ করে চলেছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ। সর্বক্ষণ। সে কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে কথা বলে, কী খায়, কোন মদিরা পান করে—সব কিছুই যেন কাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের অধীন।

নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়েছিল চণ্ডকীর্তি।

এদিকে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল বিক্রমপুরের রাজনৈতিক আবহাওয়া। চারদিকে সৈন্যবিদ্রোহের রণধ্বনি, অথচ রাজপ্রাসাদ বিস্ময়জনকভাবে নিরুদ্বেগ। এক এক করে বেশ কিছু ক্ষুদ্র অমাত্য এবং রাজসভাসদরা অকস্মাৎ অদৃশ্য হতে লাগলেন। কয়েকদিন বাদে তাঁদের দেহ পাওয়া যেতে লাগল বিক্রমপুরের বিভিন্ন অস্থানে কুস্থানে। কুখ্যাত শৌণ্ডিকালয়ে, বহুগম্যা বারবণিতাগৃহে, নির্জন অরণ্যপ্রদেশে।

সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠছিল চণ্ডকীর্তির। এই আপাত-বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটি সুচারু সাধারণী সূত্র তার সন্ধানী চক্ষু এড়াতে পারেনি। কোথাও যেন কিছু একটা অসঙ্গতি।

আজ থেকে ঠিক দুইদিন আগে সেই অসঙ্গতি স্পষ্ট হয়ে গেছিল তার কাছে। তারপর থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে।

নিজের ভাবনা থেকে সহসা জেগে উঠল সে। কোথা থেকে যেন কুলুকুলু ধ্বনি ভেসে আসছে না? এর অর্থ কাছেপিঠেই কোথাও নদী আছে, অর্থাৎ কী না জল! পেয়।

তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে গেছিল চণ্ডকীর্তির। সেই শব্দের উৎসের দিকে ছুটল সে।

একটি সুবিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ পার হতেই ছোট্ট নদী চোখে পড়ল তার। অরণ্যের কোন অন্ধকার প্রান্ত থেকে বয়ে এসেছে সে, বয়ে গেছে দক্ষিণের দিকে। চণ্ডকীর্তি প্রায় উড়ে গিয়ে সেই ক্ষীণকায়া তটিনীর কূলে শুয়ে আকণ্ঠ জল পান করতে লাগল।

তৃষ্ণাজর্জর বুক শীতল হতেই তার শিক্ষিত কানে এল শব্দটা। আগেই আসা উচিত ছিল যদিও, কিন্তু তৃষ্ণার্ত চণ্ডকীর্তির অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিল না।

ব্রাহ্মমুহূর্ত শুরু হতে আর কয়েকদণ্ড বাকি। রাত্রির তমসা সামান্য স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। খানিক দৃষ্টি দিতেই সে দেখতে পেল, নদীর অপর তটপ্রান্ত জুড়ে কয়েকটি দেহ। কয়েকটি নয়। কয়েক সার দেহ। একের পর এক বিচিত্র ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে। অন্ততপক্ষে শতখানেক তো বটেই। মৃতদেহ নাকি?

একটু পরেই অবশ্য ভুল ভেঙে গেল তার। খানিকপর একটি আবছায়া দেহ কোথা থেকে যেন উদয় হল দেহগুলির মধ্যে। মনে হল, সে যেন প্রহরা দিচ্ছিল সমগ্র স্থানটি। এক এক করে নাম ধরে ডাকতে লাগল সে, আর এক একটি শরীর তাতে সাড়া দিয়ে জেগে উঠতে লাগল।

এই ঘন আরণ্যক অন্ধকারে এত মানুষ! বোধবুদ্ধি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চণ্ডকীর্তির। তার মানে ওরা মৃতদেহ নয়? এত মানুষ নদীতীরে নিশ্চিন্তে রাত্রিযাপন করছিল? কিন্তু কেন? এরা তো তীর্থিক নয়! সৈন্য নয়!

তাহলে এরা কারা?

ধীরে, অতি ধীরে নিজের দেহ পিছিয়ে নিতে লাগল চণ্ডকীর্তি। ওরা যেন না দেখে ফেলে তাকে। তাকে জানতে হবে এরা কারা। কোথায় যাচ্ছে। এবং কেন।

অশ্বত্থবৃক্ষটির আড়ালে উঠে দাঁড়াল চণ্ডকীর্তি। তারপর সাবধানে তাকাল নদীর অপর প্রান্তের দিকে।

ততক্ষণে আকাশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত আগতপ্রায়। শরীরগুলি উঠে দাঁড়াল ছায়ামানুষের মতো। আর তাদের দেখে হাত-পা শীতল হয়ে এল চণ্ডকীর্তির।

নদীর অপর পারে উঠে দাঁড়িয়েছে একের পর এক সারি সারি উলঙ্গ নারীমূর্তি। এই অর্ধতমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাদের সুঠাম দেহ, উদ্ধত স্তন, উন্মুক্ত কেশদাম!

এরা কারা? কোন গহীন পাতাল থেকে উঠে এসেছে এই নগ্ন নারীর দল? কোন সর্বনাশের সঙ্কেত নিয়ে এসেছে?

এক পা, দু'পা করে পিছিয়ে যাচ্ছিল চণ্ডকীর্তি। ঠিক চতুর্থ পদক্ষেপের পর কর্ণমূলে একটি তীক্ষ্ণ ধাতব স্পর্শ পেয়ে থামতে বাধ্য হল সে। কে যেন উৎফুল্লস্বরে বলে উঠল, 'বারে বা বাহ, এই দেখ, অনেকদিন পর বেশ নধর একটি মানুষ পাওয়া গেছে রে কালী। মনে হচ্ছে ঝলসে খেতে বেশ আনন্দই হবে, কী বলিস? তোরা না হয় হাত পা, পাছা আর মাথাটা নিস। বাকিটা আমার জন্য ছেড়ে রাখিস বুঝলি। আমার আবার মানুষের পাঁজর আর মেটে খুব পছন্দ, জানিসই তো।'

মহার্ঘ অরিষ্টপানে হয়তো কিঞ্চিৎ প্রগলভ হয়ে থাকবেন নবাগত অতিথি। অথবা এমত দুর্মূল্য মদিরাপানের অভ্যাস নেই তাঁর। নইলে ষষ্ঠ পাত্রটি নিঃশেষিত হওয়ার পর কেনই বা অসংলগ্ন স্বরে চিৎকার করে উঠবেন তিনি, 'অর্থ কই মহামান্য অগ্নিমিত্র? কোথায় সেই অর্থ, যার লোভে আমি আমার ইষ্ট, ইহকাল, পরকাল সব নরকাগ্নিতে সমর্পণ করলাম?'

মদিরাপান করতে করতে সামান্য হাসলেন অগ্নিমিত্র। কূট এবং কৌশলী বাক্যপ্রয়োগে অপরপক্ষ থেকে সংবাদ নিষ্কাশনে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি। আর এই নবাগত অতিথি তো জনৈক বিভ্রান্তচিত্ত বৌদ্ধসন্ন্যাসী বই আর কেউ নয়!

আপাতত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সংবাদ এই মূর্খটির থেকে নিষ্কাশন করে নিয়েছেন তিনি। আপাতত এর প্রয়োজন শূন্য।

মদ্যপানের অবসরেই অগ্নিমিত্রর অঙ্গুলি ইঙ্গিতে কয়েকটি দীর্ঘদেহী ছায়া প্রবেশ করল এই কক্ষে। সেই ইঙ্গিত অপ্রকৃতিস্থ। নবাগত অতিথি লক্ষ করলেন না। লক্ষ করলেন ভাঁড়ুদত্ত। তাঁর মুখচ্ছবি কঠিনরূপ ধারণ করল।

দীর্ঘদেহী ছায়াশরীরগুলি অধিক সময় ব্যয় করল না। চকিতে একটি বস্ত্রখণ্ড নবাগত অতিথির মুখ চেপে ধরল। সামান্য শারীরী প্রতিবাদের পর নিশ্চল হয়ে পড়লেন অতিথি মহাশয়। ছায়াশরীরগুলি এবং জ্ঞানহীন দেহটি অপসৃত হল।

ঘরটি সাধারণ, মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি। একটি মাত্র বাতায়ন উত্তরদিকে। তার মধ্য দিয়ে ত্রয়োদশীর অন্ধকার ছড়িয়ে আসছিল ঘরটির ভেতরে।

দ্বারপ্রান্তে একটি দীপ জ্বলছে। তাতে অবশ্য কক্ষের অন্ধকার দূর হয়নি। প্রদীপশিখার কাছে স্তূপীকৃত কর্পূর রাখা। কর্পূরের স্নিগ্ধ অথচ তীব্র গন্ধে কক্ষের বাতাস ভারী হয়ে আছে।

কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটি কাঠের পাটাতন পাতা। তার ওপর একটি বলিষ্ঠ দেহ শায়িত। দেহটি সম্পূর্ণ নগ্ন, একটি সুতো অবধি নেই। হাত এবং পা রজ্জুবদ্ধ।

লক্ষ করলে বোঝা যায় যে শুয়ে থাকা মানুষটি এখনই স্নান করে এসেছে। তার সিক্ত কেশ থেকে ক্ষীণ জলের ধারা বয়ে নেমে আসছে কাঠের পাটাতন বেয়ে। মানুষটির সমস্ত শরীরে অগুরুর স্নিগ্ধ ঘ্রাণ।

তার মাথার কাছে দুইটি মানুষ বসে আছেন। একজন নারী, আর একজন পুরুষ। দুজনের মনের মধ্যে জমে থাকা উদ্বেগ তাঁদের চোখেমুখে স্পষ্ট। দুজনেরই কপালে স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে আসন্ন প্রক্রিয়াটির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায়।

নারীর হাতে একটি পাথরের পাত্র। তার মধ্যে টলটল করছে ঘনকৃষ্ণবর্ণের এক সান্দ্র তরল। তার গন্ধ অত্যন্ত উগ্র। নারীটি বুঝতে পারছিলেন, হাতে ধরা পাত্রটি ধীরে ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

নারীটি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আর কতক্ষণ ভন্তে?'

পুরুষটি গম্ভীরস্বরে বললেন, 'অধৈর্য হবেন না ভিক্ষুণী মন্দর্ভা। আর মাত্র কয়েক পলের অপেক্ষা। এখনই কৃত্তিকায় চন্দ্র আর তুলায় রবি প্রবেশ করবেন। সোম এখন কৃত্তিকার আলোকে উজ্জ্বল হবেন, আর রবি নীচস্থ। তখনই আসবে পবিত্র মুহূর্ত।'

মন্দর্ভা চুপ হয়ে গেলেন। পাত্রটি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। মন্দর্ভা পাত্রটি একবার এই হাত থেকে ওই হাতে নিতে লাগলেন। তাঁর করতল ক্রমশ রক্তবর্ণ ধারণ করতে লাগল।

সেদিকে একবার তাকালেন আচার্য শান্তরক্ষিত। বললেন, 'বায়ুস্পর্শে এই তরল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, সেরকমই প্রয়োগশ্রুতি। আমি জানি আপনার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাকে সাহায্য করতে অপারগ

ভিক্ষুণী মন্দর্ভা। এই ঔষধ সম্পূর্ণভাবে নারীহস্তে প্রস্তুত হতে হবে, নারীহস্তে রক্ষিত হতে হবে, নারীহস্তে সেবিত হতে হবে। এই এর প্রয়োগবিধি।'

'কিন্তু কেন ভন্তে?'

মৃদু হাসলেন আচার্য শান্তরক্ষিত, 'কারণ নারীর কল্যাণস্পর্শের থেকে পবিত্রতম বিষহর আর কিছুই হতে পারে না, আর্যা মন্দর্ভা।'

এই সময় মানুষটি চোখ খুলে চাইলেন। মৃদুস্বরে একবারমাত্র বললেন, 'আচার্য...'

শান্তরক্ষিত বললেন, 'সময় এসেছে ভিক্ষুণী, ঔষধ প্রয়োগ করুন।'

মন্দর্ভা বড় যত্নে, বড় আদরের সঙ্গে পাত্রস্থিত তরলটি গোপালদেবের মুখে ঢেলে দিতে লাগলেন। মনে হল যেন মাতৃসমা কনিষ্ঠা বড় মমতার সঙ্গে অসুস্থ অগ্রজের মুখে ঔষধ ঢেলে দিচ্ছেন।

কিছুটা তরল মুখে যাওয়ার পর মুখ বিকৃত করলেন গোপালদেব। সামান্য থামলেন মন্দর্ভা। তারপর পুনরায় তরল ঢালতে লাগলেন।

এইবার খক খক করে কেশে উঠলেন গোপাল। মাথা একদিকে কাত করলেন। মনে হল যেন সেই উগ্রগন্ধী তরল বমন করে দেবেন বাইরে। মন্দর্ভা দ্রুত নাক চেপে ধরলেন গোপালদেবের। তিনি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য মুখ হাঁ করতেই তরল তাঁর পেটে চলে গেল।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তার পরেই যেন অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর মুচড়ে উঠল গোপালদেবের। বলশালী দেহটি প্রবল আক্ষেপে কেঁপে উঠল একবার। তারপর জ্বরগ্রস্ত রোগীর মতো কাঁপতে লাগলেন। প্রবল কষ্টে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে এল। মনে হল কাঠের পাটাতন যেন দুটুকরো হয়ে যাবে যে কোনও মুহূর্তে।

সেই দৃশ্যের অভিঘাতে কেঁপে গেলেন মন্দর্ভা এবং শান্তরক্ষিত। আতঙ্কিত মন্দর্ভা অগ্রজের হাত চেপে ধরলেন। শান্তরক্ষিত বললেন, 'বাকি ঔষধটুকু সেবন করান ভিক্ষুণী।'

সম্পর্কে সহোদর-সহোদরা হলেও সদ্ধর্ম গ্রহণের পর একে অন্যকে সাধারণ ভিক্ষুর মতোই সম্বোধন করেন। কিন্তু আজ আর থাকতে পারলেন না মন্দর্ভা, সজলচোখে বললেন, 'ভাই, ও যে মরে যাবে।'

আচার্য শান্তরক্ষিত বামহাত অনুজার মাথায় রাখলেন। রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ভয় পাস না বোন, যা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে। জেনে রাখিস, আমরা ধর্মের পথে আছি। স্বয়ং তথাগত আমাদের সহায়। বাকিটুকু খাইয়ে দে, যে করে হোক। লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ যে ঔষধ আনিয়েছেন, তার ওপর বিশ্বাস রাখ।'

মন্দর্ভা ধীরে ধীরে সন্তর্পণে বাকি ঔষধটি গোপালদেবের মুখের কাছে আনলেন। আর ঠিক তখনই যেন কোন যাদুমন্ত্রে গোপালের সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেল। আর খুলে গেল দুটি চোখ।

সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে, প্রদীপের আলোয় স্তম্ভিত মন্দর্ভা আর শান্তরক্ষিত দেখলেন—গোপালের চোখদুটি লাল, টকটকে লাল। আর অক্ষিকোটরে কোনো মণি নেই!

মন্দর্ভার হাত দুটি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সেই অতিলৌকিক দৃশ্য দেখে। শান্তরক্ষিতের কপালে স্বেদবিন্দু আরও ঘন হয়ে এল। তিনি কম্পিতস্বরে বললেন, 'বোন, ওর মুখে বাকি তরলটুকু ঢেলে দে। ভয় পাস না।'

মন্দর্ভা কোনওক্রমে পাত্রটি গোপালদেবের মুখের ওপর নিয়ে যেতেই গোপালের মাথাটি ধীরে ধীরে মন্দর্ভার দিকে ঘুরে গেল। তারপর সম্পূর্ণ অজানা এক কর্কশ স্বর নির্গত হল গোপালদেবের কণ্ঠ থেকে, 'দয়া করো নারী, দয়া।'

মন্দর্ভা আর পারলেন না। কোনওমতে অবশিষ্ট তরলটুকু গোপালের মুখে ঢেলে দিয়ে জ্যামুক্ত শরের মতো সরে গেলেন ঘরের অন্যপ্রান্তে।

গোপাল তরল গলাধঃকরণ করলেন। তারপর সহসা শান্ত হয়ে গেলেন। যেন সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা চকিতে অন্তর্হিত হয়েছে। চোখ দুখানি বন্ধ হয়ে এল। সমস্ত শরীর স্থির, নিষ্পন্দ।

একটু পর অনেকখানি সাহস একত্রিত করে গোপালদেবের মুখের ওপর ঝুঁকে এলেন শান্তরক্ষিত। শ্বাস চলছে তো মানুষটির। হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে তো?

ধক করে আবার খুলে গেল গোপালদেবের চোখ। তারা এখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অক্ষিগোলক উধাও। অস্বাভাবিক স্বরে গোপালদেব বলে উঠলেন, 'আহ, বড় কষ্ট, বড় কষ্ট। একটু জল দেবে কেউ? একটু জল দাও না। আর যে পারি না।'

আর সহ্য করতে পারলেন না মন্দর্ভা। দ্রুত ঘরের বাইরে চলে গেলেন। স্থির হয়ে বসে রইলেন শান্তরক্ষিত। আজ সমস্ত রাত্রি গোপালদেবকে এইভাবেই থাকতে হবে। এক বিন্দু জল দেওয়াও নিষিদ্ধ!

গোপালদেবের মাথার কাছে বসে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হলেন নালন্দার অধ্যক্ষ আচার্য শান্তরক্ষিত। সাধনালব্ধ শক্তি তাঁরও কম নয় কিছু। দেখা যাক, যোগবলে তিনি গোপালদেবের যন্ত্রণার কিছু উপশম করতে পারেন কি না।

কাঞ্চনাদেবী বসেছিলেন মেরুদণ্ড ঋজু করে। পদ্মাসনে। পরিধানে একটি শুভ্র কার্পাসবস্ত্র। পলিতকেশরাশি উন্মুক্ত। শুষ্ক হাতদুটি জুড়ে বার্ধক্যের সহস্র শিরা উপশিরা। চোখ স্থির এবং আবেগহীন। তাঁর জরাকবলিত মুখে এখনও রাজকীয় আভিজাত্য এবং দৃঢ়তার অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়।

তাঁর সামনে মৎস্যেন্দ্রনাথ আর বপ্যট বসেছিলেন। তাঁদের সবল সমর্থ শরীরে মৃদু দীপালোক খেলে যাচ্ছিল দীঘির জলে প্রতিফলিত জ্যোৎস্নার মতো। বসার ভঙ্গিতে সম্ভ্রমের ভাব ছিল স্পষ্ট।

মৎস্যেন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বললেন, 'রাজমাতা...!'

কাঞ্চনা কঠিনস্বরে বললেন, 'ওই নামে আমাকে সম্বোধন করবেন না আর্য মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই সম্মান আমি বহুপূর্বেই হারিয়েছি। তাকে আর ফিরে পেতে চাই না।'

মৎস্যেন্দ্রনাথ করজোড়ে বললেন, 'সন্তানের জন্য মাতার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার আজ্ঞাপালনে আমরা অপারগ মাতা। আমাদের কাছে মহারাজ ধর্মচন্দ্র এবং কুমার আনন্দচন্দ্রই বঙ্গদেশের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। এই কামোন্মাদ নাগিনীর শাসন আমরা মানি না। আপনিই আমাদের রাজমাতা।'

বৃদ্ধার চিবুক কঠিন হল। তিনি বললেন, 'আমার স্বামী আর সন্তান মৃত। ন্যায্যত আমি রাজমাতা অভিধার উপযুক্ত নই। তবুও আমি এই নিয়ে তর্ক করব না, কারণ এই সঙ্কটকাল তর্কাতিপাতে কালক্ষেপের জন্য নয়। বলুন, আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি।'

বপ্যট বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'মা, আপনার শুভাশিস আর আশীর্বাদ ব্যতীত আর কিছুই চাই না আমাদের।'

এই প্রথম কাঞ্চনাদেবীর অধরে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'আর্য, জানি আপনি মহাবীর, খণ্ডিতারাতি বপ্যট। কিন্তু বিস্মরণ হবেন না, আমি একজন প্রাক্তন মহারানি। কূটনীতিতে আমার অধিকার আপনার থেকে কিঞ্চিৎ অধিক। এক স্বামীহারা, সন্তানহারা মায়ের আশীর্বাদ আপনাদের সঙ্গে সর্বদাই রয়েছে। কিন্তু মহাবল পদ্মসম্ভবের মতো একজন অদ্ভুতকর্মা মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন শুধু আশীর্বাদের জন্য, এই কথা বিশ্বাস করতে বলেন?'

বপ্যট অপ্রতিভ হলেন। তিনি কূটনীতিক ভাষাপটুত্বে অভ্যস্ত নন। বুঝলেন যে, এই বৃদ্ধা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং স্পষ্টবক্তা। তিনি আর অযথা বাগাড়ম্বরের মধ্যে গেলেন না। সরাসরি প্রসঙ্গে এলেন। বললেন, 'রাজমাতা, আপনি জানেন যে শতবর্ষব্যাপী মাৎস্যন্যায় এই দেশের ভাগ্যে কী অভাবনীয় দুর্ভোগ এনে দিয়েছে। তার ওপর প্রকাশচন্দ্র আর এই নাগিনীর কুশাসনে বঙ্গদেশের শ্বাসবায়ু ওষ্ঠাগতপ্রায়।

'অনেকদিন ধরেই সমাজের সর্বস্তরে এই অপশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। শুধুমাত্র উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সেই বিক্ষোভ কোনও পরিণতিসূচক রূপ নিতে পারছিল না। অবশেষে লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আমরা বিদ্রোহী হয়েছি। এই বিদ্রোহের বিশদ পরিকল্পনা তথা ঘটনাপ্রবাহ বিবৃত করে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। শুধু এইমাত্র জেনে রাখুন যে, আমরা চূড়ান্ত সংঘাতের জন্য প্রস্তুত। কেবল একটিমাত্র তথ্য আমাদের অজানা মাতা। সে জন্যই আপনার দ্বারস্থ হওয়া।'

রাজমাতা কাঞ্চনাদেবী। স্থিরস্বরে বললেন, 'শুধুমাত্র একটি তথ্যের জন্য এত প্রাণপাত? বলুন আর্য, কী সেই অতি মূল্যবান তথ্য, যার জন্য আপনারা এত ঝুঁকি নিয়ে আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন।'

বৃদ্ধার বক্তব্যের মধ্যে কিছু তিক্ততা ছিল। সেটি অগ্রাহ্য করলেন বপ্যট। বললেন, 'মাতা, এই বিদ্রোহ তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা এই নারকীযজ্ঞের দুই হোতা, বঙ্গরাজ্ঞী এবং তাঁর ভৈরব প্রকাশচন্দ্র, এই দুজনকে হত্যা করতে পারব। তবেই উৎখাত হবে এই কুৎসিত কুশাসন।

'কিন্তু মহারানিকে হত্যা করা অত সহজ নয়। তিনি শুধু একজন বিষকন্যা নন, অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী এক বিশিষ্ট নাগিনী। প্রকাশচন্দ্রও একজন পিশাচসিদ্ধ, চীনাচারতন্ত্রে মহারথ ঐন্দ্রজালিক। এই দুজনের স্বরূপ আপনার থেকে উত্তম আর কেউ জানে না। তদুপরি এঁদের সদাসর্বদাই ঘিরে থাকে শিক্ষিত প্রহরীর দল, ছ'জন উচ্চপদস্থ রাজপদোপজীবি এবং সর্বোপরি প্রকাশচন্দ্রের নিজস্ব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত সিদ্ধি। সেই প্রহরাবৃত্ত ভেদ করা প্রায় অসম্ভব।

'তবুও, সেই প্রহরাবৃত্ত ভেদ করার পরেও, যদিবা আমাদের ঘাতক সেই নাগিনী বা প্রকাশচন্দ্র অবধি পৌঁছে যায়ও, তবুও তাঁদের বধ করার কোনও নির্দিষ্ট উপায় আছে কি না সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে চাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হওয়া। আপনি ছাড়া এই নারীকে উত্তমরূপে চেনেন এমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই।'

তিক্ত হাসলেন কাঞ্চনাদেবী, 'উত্তমরূপে চেনা? তাই বটে। সপত্নীকে উত্তমরূপে অন্য কেই বা চেনে।

'শুনুন আর্য। এই নারীর স্বরূপ আপনাদের কাছে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই উন্মোচিত। আশা করি জানেন যে, এঁর শিরায় বইছে প্রাচীন নাগজাতির রক্তধারা। এও জানেন যে, এই নারীর মা ছিলেন মহাচীনের সম্রাজ্ঞী। শুধু তৎকালীন মহাচীনের কেন, এই সসাগরা ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠতম বিষবৈদ্য ছিলেন তিনি। তার সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রে মহাসিদ্ধা ছিলেন তিনি, ডাকিনীবিদ্যায় অলৌকিক বিভূতি আয়ত্ত করেছিলেন।

'তিনি তাঁর কন্যাকে নাগজাতির শতসহস্র বছরের অধীত বিদ্যা দিয়ে তিলে তিলে প্রস্তুত করেছেন। নিজের অধীত যাবতীয় বিদ্যা এবং প্রকরণ উজাড় করে দিয়েছেন নিজের কন্যার মধ্যে।

শুনুন আর্য মৎস্যেন্দ্রনাথ, এই নারীর হত্যার পরিকল্পনা প্রায় অসম্ভব। কারণ দেহাকৃতিতে মানুষী হলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে একটি পিশাচী নাগিনী। এঁর প্রাণ নেই, তাই ইনি চিরজীবী, চিরযৌবনা। এঁর শরীরে মানুষী রক্তমাংস নেই, তাই কোনও সাধারণ অস্ত্রাঘাতে একে বধ করা যায় না। এঁর প্রাণবীজ এক প্রাচীন নাগমন্ত্রে নির্মিত।

'আরও জেনে রাখুন আর্য, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মুখ্য আয়ুধ ওই কামুক নাগিনী হতে পারে বটে, কিন্তু মূল চক্রী প্রকাশচন্দ্রই। তাঁকে হত্যা করলে তবেই মুক্তি। প্রকাশচন্দ্রই ধনুক, রানি জ্যা'তে আরোপিত তীর। প্রকাশচন্দ্রই যন্ত্রী, রানি যন্ত্র।

'প্রকাশচন্দ্র নিজে জন্মসূত্রে আশ্চর্য আধিভৌতিক শক্তির অধিকারী। চৈনিক তন্ত্রসাধনায় তাঁর সেই শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই চীনসম্রাজ্ঞী তাঁর কন্যাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি অসামান্য সাধন সম্ভব করেছিলেন।'

এতক্ষণ দুজনে একাগ্রচিত্তে শুনছিলেন। কাঞ্চনাদেবী থামতে প্রশ্ন করলেন, 'কী সেই সাধন, রাজমাতা?'

অন্ধকার ঘরে যেন দৈববাণীর মতো শোনাল সেই বৃদ্ধার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'প্রকাশচন্দ্র তাঁর জীবনীশক্তির একটি অংশ বঙ্গরনির পৈশাচীবীজে সন্নিবেশিত করে রেখেছেন। তাঁকে হত্যা করতে গেলে আগে রানিকে হত্যা করতে হবে। যতক্ষণ ওই নাগিনী জীবিত আছে, ততক্ষণ প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যু নেই।'

স্তম্ভিত হয়ে রইলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং বপ্যট। এ তো অসম্ভব! এই অসম্ভবের জন্যই জীবনের সবকিছু ছেড়ে এই মহাবিপ্লবে যোগদান করেছেন তাঁরা? আর শুধু তাঁরা কেন, আচার্য শান্তরক্ষিত, কুমার পদ্মসম্ভব, কুমার জয়াপীড়, ভিক্ষুণী মন্দর্ভা, আরও কত না শৈব সন্ন্যাসী এবং সহজিয়া বৌদ্ধদের দল, গৌড়েশ্বর জয়ন্ত, মুখ্য সামন্তচক্র, কতশত সঙ্গী, সাথী, সহযোদ্ধা—এঁদের এতদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নসৌধ এক নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?

কাঞ্চনাদেবী দুজনের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'নিরাশ হবেন না আর্য। কোনও মানুষী কৌশলই কখনও অভেদ্য, অপরাজেয় হতে পারে না। যুদ্ধে যে পক্ষ ধর্মের পথে থাকে, ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সহায় হন।

'এবার যে কথা বলব, মন দিয়ে শুনবেন। এই গূঢ় তথ্য অতি গোপন, কেবলমাত্র প্রকাশচন্দ্র আর ওই নারীই জানে। আর জানতেন মহারাজ ধর্মচন্দ্র। কোনও এক দুর্বল অসতর্ক মুহূর্তে আমার স্বামীকে জানিয়ে ফেলেছিল ওই নাগিনী। তার পর তাঁর জীবনসংশয় ঘটে। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা নেই জেনে সেই অতি গোপন, অতি গূঢ় তথ্য তিনি আমাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন।

'পক্ষকাল ধরে এই পিশাচীর বিষগ্রন্থিতে মহাকালকূট বিষ জমা হতে থাকে। পক্ষকালের অন্তে সেই বিষের নিষ্কাশন না হলে ইনি সেই বিষের আবেশে উন্মাদপ্রায় হয়ে যান। আর তখনই এঁর কামতৃষ্ণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়।

'সেই জন্যই প্রতি পক্ষকালে একটি সমর্থ যুবকের প্রয়োজন হয় এই নারীর। নিজের কামতৃপ্তির জন্যও বটে, নিজের মহাবিষ উদগীরণের জন্যও বটে। আর যখন কোনও যুবকশরীর জোটে না, তখন?

তখন প্রকাশচন্দ্রই আসেন সেই নাগিনীর ভয়াল ভয়ঙ্কর কামাবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। তিনি, একমাত্র তিনিই পারেন ওই কামোন্মত্ত বিষধর নাগকন্যাকে শান্ত করতে, সেই মহাবিষ ধারণ করতে।

এই নারীর বিষগ্রন্থিটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে দংশনযোগ্য বিষ প্রস্তুত হতে ঠিক এক পক্ষকাল সময় প্রয়োজন। তার পূর্বে এই বিষের মারণক্ষমতা প্রায় শূন্য। অর্থাৎ একবার যদি সেই নাগিনীর দংশন ব্যর্থ করে দেওয়া যায়, তবে অন্তত এক পক্ষকাল এঁর সঙ্গে অন্য সাধারণ নারীর কোনও প্রভেদ নেই।

তবে ওই দংশনের কাল এড়ানো বড় কঠিন, প্রায় অসম্ভব। আর সেই দংশনে যা বিষ, দশটি পূর্ণবয়স্ক হাতিকে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট।'

চুপ করলেন কাঞ্চনাদেবী। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু দেবী, এখানেই তো শেষ নয়। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে ওই পিশাচীমূর্তিরও সামূহিক বিনাশ। তার যদি কোনও মানুষী শরীর না থাকে, তবে তাকে হত্যা করব কী করে?'

ধীরে ধীরে মাথা ওপর নীচে করলেন কাঞ্চনাদেবী, 'আছে আর্য, আছে। এই নারীকে হত্যার একটি, কেবলমাত্র একটিই উপায় আছে। যে নাগপিশাচীর আত্মা ওই শরীর অধিকার করে আছে, তা অধিষ্ঠান করে রানির কপালে, ভ্রূমধ্যে। ঠিক সেইখানে অগ্নিবাণ বিদ্ধ করতে হবে। ওটিই একমাত্র উপায়। অগ্নিদাহন ব্যতীত ওই পিশাচীর মৃত্যু নেই।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলেন তিনজন। তারপর মৎস্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'দেবী, ঈশ্বরেচ্ছায় এই নাগিনীকে নিশ্চিহ্ন করার দুটি উপায়ই আপাতত আমাদের করায়ত্ত। আশীর্বাদ করুন, চূড়ান্ত সংগ্রামে যেন বিজয়ী হই।'

উদভ্রান্তের মতো সামনের দিকে হাঁটছিল সর্বাঙ্গধূলিধূসরিত চণ্ডকীর্তি। কেশরাশি অবিন্যস্ত। দেহের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত। চর্মপাদুকাটি ছিন্নপ্রায়।

চণ্ডকীর্তির পাশে হাঁটছিল আরেকজন। দর্শনমাত্রে বোঝা যায় সে একজন অন্ত্যজ বনচর। কটিদেশে একটি ক্ষুদ্র ছাগচর্ম ব্যতীত দেহটি প্রায় উলঙ্গ। কুঞ্চিত কেশদামের শুভ্রতা দেখে বোঝা যায় যে মানুষটি মধ্যবয়সি। যদিও তার বলিষ্ঠ শরীর যে-কোনও যুবককে লজ্জা দেবে।

আর এই দুজনের পিছনে যারা হাঁটছিল তাদের দিকে চাইতে ভয় করছিল চণ্ডকীর্তির। ভয় করছিল এই দ্বিপ্রহরেও। ভীষণ ভয়। জীবনে এত ভয় কখনও পায়নি সে।

বনচর মানুষটি প্রশ্ন করল, 'কী রে, আর কতদূর?'

চণ্ডকীর্তি ভীতস্বরে বলল, 'আর দুইদিনের পথ।'

'বেশ বেশ।' প্রসন্ন দেখায় মানুষটিকে, 'দ্রুত চল। আর পথ ভুল হলে বা প্রভু প্রকাশচন্দ্রের কাছে পৌঁছতে দেরি হলে কী হবে জানিস তো?'

সে আর জানে না চণ্ডকীর্তি? খুব জানে। শুধু এইটি বোধগম্য হচ্ছিল না তার, এই কুৎসিত এবং ভয়ঙ্কর ডাকিনী বাহিনীর প্রয়োজন পড়ল কেন মহারাজসচিবের। বিদ্রোহীরা কী এতই শক্তিশালী?

আজ থেকে ঠিক তিনদিন পূর্বে এই প্রশ্নই মাথায় এসেছিল তার।

শান্তঘোষ যখন তাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করেন, তখনই তাকে গুপ্তচরবৃত্তির প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সতর্কতা ও মন্ত্রগুপ্তি তার প্রধান। তার প্রশিক্ষণ, তার শিক্ষা, তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে বলছিল তার চারিপাশের জাল ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। কাদের যেন সর্বক্ষণের অদৃশ্য প্রহরা চলে তাকে ঘিরে। যে কোনওদিন, যে কোনওদিন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে সে। দেহ হয় তো খুঁজে পাওয়া যাবে কোন বারাঙ্গণার দ্বারে..

সেই রাতে শয্যাগ্রহণের আগে আবার সেই করাঘাত। গুনে গুনে ঠিক তিনটি। নির্দিষ্ট ব্যবধানে।

তবুও দরজা খোলেনি সে। দরজার এপার থেকেই প্রশ্ন করেছিল, 'কে?'

ওপাশ থেকে পরিচিত স্বরে প্রশ্ন এসেছিল, 'দ্বিতীয় পাণ্ডব।'

দরজা খুলে দিতেই ঢুকে পড়েছিল ভীম। আর যা সংবাদ দিয়েছিল, তাতে হাত পা অবশ হয়ে এসেছিল চণ্ডকীর্তির।

'রাজগুরু দর্ভপাণি বন্দি হয়েছেন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল ভীম, 'তিনি প্রকাশ করে ফেলেছেন আপনার কথা।'

'সে কী? কী করে?'

'সেঁউতি ওদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। কাল সারারাত্রি সে সেবা করেছে রাজগুরুর। রাজগুরুও মাধ্বীর আবেশে সব কথা বলে ফেলেছেন। আজ ভোররাত্রে সে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিহারকে সব কিছু জানিয়ে দেয়। সেই থেকে রাজগুরু বন্দি। শুনেছি বন্দিশালায় নাকি অকথ্য অত্যাচার চলেছে তাঁর ওপর। চারজন প্রহরী দুই প্রহর ধরে কণ্টকাকীর্ণ কশা দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করেছে তাঁর সর্বাঙ্গে, তারপর সেই ক্ষতে লবনের পট্টি লেপন করে রাখা হয়েছে। এখন নাকি লৌহদণ্ড উত্তপ্ত করা হচ্ছে...'

শুনে দৃশ্যতই শিহরিত হয়েছিল চণ্ডকীর্তি।

'সেই অত্যাচারের যন্ত্রণায় স্থির থাকতে পারেননি রাজগুরু। আপনার নাম প্রকাশ করে দিয়েছেন তিনি। আপনি পালান চণ্ডকীর্তি! পালান!'

'কী করে পালাব? কোথায় পালাব?'

'আমি ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে ফিরে আসছি। সেঁউতিকে ছেড়ে তো কোথাও যেতে পারব না, ওকে নিয়েই আসছি। একটি গোপন পথ আছে, আমার চেনা। আমরা তিনজনে সেই পথে পালিয়ে যাব পুণ্ড্রের দিকে।

কেউ আমাদের ধরতে পারবে না।'

সেই রাতেই পালিয়েছিল চণ্ডকীর্তি। না, ব্রাহ্মমুহূর্তর জন্য অপেক্ষা করেনি সে। পালিয়েছিল তার অনেক আগেই, মধ্যরাত্রেই।

কারণ ধর্মসেনের অনুগত ভৈরবদল ভীমকে স্ববশে আনলে কী হবে, সব কিছু ঠিক করে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠাতে পারেনি। দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাদের কাছে ছিল না।

এক, রাজগুরু দর্ভপাণি জানতেনই না যে চণ্ডকীর্তি কর্মান্তবাসকের একজন গুপ্তচর। সে সংবাদ তাঁর কাছে গোপন রাখা হয়েছিল শান্তঘোষের নির্দেশে।

দুই, সেঁউতি গত তিন রাত্রি ধরে তাঁর গৃহে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের আবহাওয়ায় নিজেকে সুরক্ষিত মনে করেনি সে। তাই তার প্রিয়তম এবং সবচাইতে নির্ভরযোগ্য দয়িতের কাছে ছুটে এসেছে। তার পক্ষে পূর্বরাত্রে রাজগুরুর সেবা করা অসম্ভব, কারণ সেই সময় সে চণ্ডকীর্তির শয্যায় শায়িতা।

সেইদিনই পালাতে পালাতে ভেবেছিল চণ্ডকীর্তি, বিদ্রোহীরা এতই শক্তিশালী?

তার ভাবনাসূত্র ছিন্ন হল পাশের বনচর মানুষটির কণ্ঠস্বরে, 'দুদিন বাদে পূর্ণিমা, না?'

'হ্যাঁ, অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা।' সংক্ষেপে উত্তর দিল চণ্ডকীর্তি। এই অসভ্য, উগ্র এবং ভয়ঙ্কর বন্যবাহিনীর সঙ্গে বেশি বার্তালাপ করতে চায় না সে।

'বাহ বাহ,' অমার্জিত দাঁতগুলো বার করে হাসল বন্য মানুষ, 'পূর্ণিমার আলোয় শ্মশানে বসে চিতার আগুনে নরমাংস ভোজ বেশ ভালোই হবে, কী বলিস ভাই?'

নিজের কক্ষে বসে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আয়োজন করছিলেন আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি। কয়েকদিনের পরিশ্রমে বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। গত দুদিন বুদ্ধগুপ্ত'র দেখা নেই। সে থাকলে পরিশ্রমের ভার কিছুটা কমে। আজ বিশুদ্ধকীর্তির বিশ্রামের প্রয়োজন। আজ রাত্রে প্রকাশচন্দ্র বিশেষ পূজার আয়োজন করেছেন। আজ কার্তিকী চতুর্দশী, তন্ত্রমতে কায়াপূজার প্রকৃষ্ট দিন। প্রকাশচন্দ্র বলেছেন, আজকের পূজা তিনিই করবেন।

বড় কৌতূহলে আছেন বিশুদ্ধকীর্তি। প্রকাশচন্দ্রের বহু বিচিত্র কৃৎকৌশলের সাক্ষী তিনি, অনেক অলৌকিক কর্মও অনায়াসে সম্পাদন করতে দেখেছেন। কিন্তু কখনও কোনও পূজাপাঠ সম্পাদন করতে দেখেননি। তবে বিশুদ্ধকীর্তি মনে মনে জানেন এবং স্বীকার করেন যে, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক, দু'প্রকার সিদ্ধিতেই প্রকাশচন্দ্র অতি উচ্চমার্গের সাধক। বজ্রযানতন্ত্রে বিশুদ্ধকীর্তিরও কিছু কিছু সিদ্ধি আছে বটে, তবে প্রকাশচন্দ্রের কাছে নিতান্ত তুচ্ছ।

একটু আগেই মালিনী তাঁর দ্বিপ্রাহরিক সেবা করে গেছে। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েও যথেষ্ট পরিমাণে সেবা নিতে পারেন বিশুদ্ধকীর্তি। মালিনীও সেবাকলায় যথেষ্ট পটিয়সী। তাঁদের মধ্যে সেবার নামে যেটা হয় তাকে খণ্ডযুদ্ধই বলা চলে।

সদ্যলব্ধ সেবার মৌতাতে নিদ্রাটি বেশ গভীর হয়ে এসেছিল বিশুদ্ধকীর্তির। আবেশ ভাঙল মালিনীর চাপা কণ্ঠস্বরে, 'প্রভু, জেগে আছেন?'

'আবার কী হল মালিনী?' মৃদু হাসলেন বিশুদ্ধকীর্তি, 'জানো তো, এখন আর আমার দুবার সেবা নেওয়ার ক্ষমতা নেই। বরং বেশি রাত্রের দিকে একবার...'

কথা শেষ করতে দেয় না মালিনী, 'প্রভু, মহাসান্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্র এসেছেন।'

বিস্মিত হলেন বিশুদ্ধকীর্তি, 'সে কী! অগ্নিমিত্র এখন? এই অসময়ে?'

মালিনী বলে, 'দেখা করবেন কি?'

আশ্চর্য হন বিশুদ্ধকীর্তি, 'সে কী? রাজ্যের মহাসান্ধিবিগ্রহিক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, দেখা করব না মানে? নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।'

মালিনী কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সন্দিগ্ধ হলেন আচার্য, প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার, কিছু বলবে মনে হচ্ছে।'

মালিনী একটু ইতস্তত করে বলে, 'না, মানে আজ ওঁকে কেমন যেন মনে হল।'

'বটে? কীরকম?'

'অতিথিকক্ষে বসে অপেক্ষা করতে বললাম, বসলেন না। বললেন এখনই দেখা করতে হবে, এখানেই, আপনার শয়নকক্ষেই। তাঁর আচরণে কেমন যেন একটা উন্মত্ত অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল। তার ওপর...'

'তার ওপর কী?'

'আমার দিকে কেমন বুভুক্ষু চোখে তাকাচ্ছিলেন।'

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন বিশুদ্ধকীর্তি। মালিনীর প্রতি অনেকেই যে আকৃষ্ট, তা তিনি বেশ বোঝেন এবং উপভোগ করেন। মালিনী তাঁর অহঙ্কার।

তিনি সহাস্যে বললেন, 'যাও, ওঁকে নিয়ে এসো। নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।'

অগ্নিমিত্র কক্ষে প্রবেশ করে আচার্যর সামনের আসনে উপবিষ্ট হলেন। সেই মুহূর্তেই আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি অনুভব করলেন যে কোথাও একটি গুরুতর গণ্ডগোল আছে। মহাসান্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্র তাঁর শিষ্যস্থানীয়, দেখা হলেই প্রণত অভিবাদন করেন। এখন সেসব কিছুই করলেন না তিনি। সরাসরি আসনে উপবেশন করলেন, আচার্যর অনুমতির অপেক্ষা করলেন না। শুধু তাই নয়, আচার্য বুঝলেন যে, অগ্নিমিত্র আকণ্ঠ মদিরাপান করে এসেছেন, তার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তির সামনে সে মদ্যপ অবস্থায় এসেছে, এও এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

আশ্চর্য হলেন আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি। প্রগলভস্বরে অগ্নিমিত্র বললেন, 'অসময়ে এসে আপনার দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালাম নাকি আচার্য?'

এবার সতর্ক হলেন আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি, 'না না অগ্নিমিত্র, আমি কিছুমাত্র বিব্রত হইনি। এই অসময়ে আপনি নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজনীয় সংবাদ নিয়ে এসেছেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজন আমার দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'রাষ্ট্রের প্রয়োজন? বেশ বেশ!' হাসলেন অগ্নিমিত্র, 'বঙ্গদেশের রাজগুরু তথা রাজপুরোহিত রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা ভাববেন না তো কে ভাববে।'

'সে তো বটেই। তাছাড়া আমি একা কেন, আপনি আছেন, জিতসেন আছেন, প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট আছেন, মহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্র আছেন, সর্বোপরি বঙ্গেশ্বরী স্বয়ং আমাদের মাথার ওপর আছেন, রাষ্ট্রের কল্যাণের কথা ভাবার মানুষ কি কম?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' মাথা নাড়লেন অগ্নিমিত্র, 'তবে কিনা রাষ্ট্রকল্যাণের ক্ষেত্রে আমরা হলাম গিয়ে গুল্মলতা, মহীরুহ বলতে তো আপনি ছাড়া আর কাউকে দেখি না।'

বিশুদ্ধকীর্তি শান্তস্বরে বললেন, 'অগ্নিমিত্র!' দয়া করে বলবেন, ঠিক কী উদ্দেশে এই বৃদ্ধের কাছে এসেছেন আপনি?'

'বৃদ্ধ?' কপট বিস্ময়ে বললেন অগ্নিমিত্র, 'প্রৌঢ় বলুন। অবশ্য মালিনীর শয্যায় আপনাকে যুবকের থেকে কিছুমাত্র কম মনে হয় না বলেই শালিবন বিহারের গোপন সংবাদ।'

'বাচালতা বন্ধ করুন অগ্নিমিত্র!' শীলিতস্বরে বললেন আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি, 'কী প্রয়োজনের এসেছেন, বলুন। এই অর্থহীন বন্ধ্যালাপে আপনার আমার, কারোরই কোনও লাভ হবে না।' বলতে বলতেই

বিশুদ্ধকীর্তি লক্ষ করলেন যে দ্বারপ্রান্তে যবনিকার অন্তরালে দুখানি পায়ের পাতা দৃশ্যমান। মালিনী সব শুনছে।

মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হল সম্মানের আবরণ। স্থির নেত্রে অগ্নিমিত্র বিশুদ্ধকীর্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন বার্তালাপ বন্ধ্যা, আর কোন বার্তালাপ শ্রেয় সে বিষয়ে তো আপনি ভালোই জানেন আচার্য। মাসাধিককাল পূর্বে জাহোরের এক পরিত্যক্ত প্রাসাদে মৎস্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বপ্যট, গৌড়েশ্বর জয়ন্ত, ধর্মসেনসহ অন্যান্য সামন্তদের এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আশা করি সেখানকার আলোচনা যথেষ্ট অর্থবহ এবং ফলপ্রদই ছিল।'

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হল! সেই সভার সংবাদ এঁর কাছে পৌঁছল কী করে?

বিশুদ্ধকীর্তি অনুভব করলেন তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে হিমেল স্রোত যাচ্ছে। অকম্পিত স্বরে বললেন, 'আপনি কোন সভার কথা বলছেন অগ্নিমিত্র? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন অগ্নিমিত্র। বললেন, 'সে কী? কিছুই মনে পড়ছে না আচার্যদেব? মনে করাবার অনেক উপায় অবশ্য আমাদের রাজসেবকদের জানা আছে। তবে কি না আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, বিষয়টি অতদূর যেতে দেবেন বলে মনে হয় না।'

বিশুদ্ধকীর্তি গর্জে উঠলেন, 'আপনার এই বাতুল প্রলাপ শোনার সময় আমার নেই অগ্নিমিত্র। এই অবান্তর প্রলাপ বন্ধ হলে আপনি যেতে পারেন।'

'অনেক সময় আছে আচার্য।' অগ্নিমিত্রর মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল, 'এত তাড়া কীসের? আপনাদের এতদিনের পরিকল্পনা এত সহজে কয়েক দণ্ডের মধ্যে জেনে যাব—সে কি সম্ভব? তারপর বলুন, কবে থেকে চলছে আপনাদের এই রাষ্ট্রবিদ্রোহের পরিকল্পনা? আর আপনিই বা এর মধ্যে ঢুকলেন কীসের লোভে?'

বিশুদ্ধকীর্তি কণ্ঠস্বরে ক্রুদ্ধভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন, 'এখনও বলছি, সতর্ক হোন! আর একটিও বাতুল প্রলাপ যদি উচ্চারণ করেন...'

'তাহলে কী করবেন? আমার নামে প্রকাশচন্দ্রের কাছে অভিযোগ করবেন? সে অবশ্য করতে পারেন। রাজগুরুর কথা প্রকাশচন্দ্র মন দিয়ে শুনবেন বলেই বিশ্বাস। তবে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি কী পদক্ষেপ নেবেন সে কথা মহামান্য রাজগুরু ভেবে রেখেছেন তো?'

বিশুদ্ধকীর্তি কিছু বললেন না। স্থিরচোখে চেয়ে রইলেন অগ্নিমিত্রর দিকে।

অগ্নিমিত্র তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন, 'আমি যে মিথ্যা অভিযোগ করছি না সে আপনি ভালো করেই জানেন আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি। প্রমাণ চাই? এই দেখুন।'

এই বলে অগ্নিমিত্র কটিদেশের বস্ত্রপাক থেকে একটি অঙ্গুলিপরিমাণ বস্তু বার করে বিশুদ্ধকীর্তির সামনে মেলে ধরলেন।

বিশুদ্ধকীর্তির কিছু সময় লাগল বস্তুটি কী সেটি অনুধাবন করতে। তারপরে শিউরে উঠলেন।

বস্তুটি শুধু অঙ্গুলিপরিমাণ নয়, একটি আঙুল। একটি কাটা মধ্যমা। ওই মৃত, শুষ্ক অঙ্গুলি একজনেরই।

'কী হয়েছে বুদ্ধগুপ্তর?' প্রশ্ন করলেন বিশুদ্ধকীর্তি। আতঙ্কে থরথর কাঁপছিলেন।

'আহা, কী আর হবে। আপাতত জীবিত আছেন বলেই সংবাদ পেয়েছি। তবে কতদিন জীবিত থাকবেন বলতে পারছি না। তার কারণ আপাতত ডানহাতের আঙ্গুলগুলোই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এর পর বামহাত আছে। পায়ের আঙুল আছে। আমার তো ইচ্ছে কাটা আঙুল দিয়ে একটি মালা প্রস্তুত করে মহামান্য বুদ্ধগুপ্তের গলায় পরিয়ে বজ্রযোগিনীর মন্দিরের সামনে একটি বুদ্ধনাটিকার আয়োজন করাব। নাম দেব 'এ যুগের অঙ্গুলিমাল।'

বিশুদ্ধকীর্তির চপেটাঘাত অগ্নিমিত্রর গণ্ডে আছড়ে পড়ার আগেই হাত ধরে ফেললেন অগ্নিমিত্র। হিসহিস স্বরে বললেন, 'এই স্পর্ধা করবেন না আচার্য। এখনও যে আপনাকে আর আপনার সাধের মালিনীকে উলঙ্গ করে, বেত্রাঘাত করতে করতে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না, সে আপনার পূর্বপুরুষদের কষ্টার্জিত সুকৃতির ফল। জেনে রাখুন—আপনি যে এখনও জীবিত আছেন, আপনার নশ্বর দেহটি যে মহামান্য রাজসচিবের পোষা কুমীরদের খাদ্য হয়নি, সে কেবলমাত্র আমার দয়ায়। অতএব শান্ত হয়ে বসুন। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তাতে শেষাবধি আপনার কল্যাণ হবে। অন্যথায় আপনার আর আপনার বেশ্যার নিরাপত্তার দায় আমি নেব না।'

উঠে দাঁড়ালেন অগ্নিমিত্র। কক্ষটির এদিক থেকে ওদিক হাঁটা শুরু করলেন। তার সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'বেশ কয়েকদিন পূর্বে একটি ঘটনা ঘটে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী নিজের মনশ্চক্ষে পর্যবেক্ষণ করছিলাম, বুঝলেন। তখনই
বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনার উচ্চারিত একটি বাক্য আমার মনে কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল।

'বেশ কয়েকদিন পূর্বে কমলাঙ্ক গ্রামের অরণ্যে জনৈক গোপালদেব রাজসেবকদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে একাই নিশ্চিহ্ন করেন, আশা করি তার কথা মনে আছে আপনার। তার পরদিন সেই সেবকবাহিনীর প্রধান তথা গ্রামরক্ষকটিকে রাজসভায় ডাকা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাটির ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া। সেই সভায় স্বয়ং মহারানি আর আমাদের সাতজনের বিশিষ্ট গোষ্ঠী ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না। তার আগে সেই দুর্ঘটনার সংবাদ জানতেন একমাত্র শান্তঘোষ আর জানতাম আমি। আর কেউ জানত না।

আপনি সভায় এসেই একটি উক্তি করেছিলেন মহামান্য আচার্যদেব। মনে আছে?'

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন বিশুদ্ধকীর্তি।

'আপনি অসতর্কভাবে বলে ফেলেছিলেন, ''এই কাপুরুষ গ্রামরক্ষকটিকে এখানে আনা হয়েছে কী করতে?'' তাই তো?

'এবার বলুন তো, আপনি কী করে জানলেন যে ওই গ্রামরক্ষক একজন কাপুরুষ? যদি না যেই ঘটনাটির সংবাদ আপনার কাছে আগে থেকেই অবগত থাকে?

'সেই প্রথম আমার মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়।

'আমরা অবগত ছিলাম, শালিবন বিহারের উপাধিবারিক বুদ্ধগুপ্ত আপনার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। আপনার অনুপস্থিতিতে তিনিই শালিবন বিহারের যাবতীয় দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

'তারপর আমি বিশেষভাবে বুদ্ধগুপ্তর জন্য একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচরকে নিয়োগ করি।

আমাদের সেই গুপ্তচর জানায় যে, ইনি যে শুধু আপনার ঘনিষ্ঠতম সহচর তাই নয়, আপনার দক্ষিণহস্ত, এমনকী আপনার ওই মালিনী সময়ে অসময়ে বুদ্ধগুপ্তকেও সন্তুষ্ট করে থাকেন।

'অতএব মহামান্য বুদ্ধগুপ্তর জন্য আমরা গুপ্তজাল বিছিয়েছিলাম। অর্থ, ভয়, আদর্শ, আর আকাঙ্ক্ষা, এই চারটি হচ্ছে প্রধান কারণ—যার জন্য মানুষ পক্ষ পরিবর্তন করে। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, বুদ্ধগুপ্তকে কী দিয়ে ক্রয় করা সম্ভব।

অবশেষে বুঝতে পারলাম যে বুদ্ধগুপ্ত অর্থের কাঙাল। তিনি অল্পবয়সে ভিক্ষু হয়েছেন। তাঁর মাতা এবং পিতা, দুজনেই ছিলেন শালিবন বিহারের বৌদ্ধসন্ন্যাসী। তাঁরা পড়ার সময়ে পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি আসেন এবং প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। বুদ্ধগুপ্ত সেই অবৈধ আসঙ্গলিপ্সার ফসল। তাঁর মাতা এবং পিতা দুজনেই শালিবন বিহার থেকে বিতাড়িত হন। তারপর থেকে কষ্টে, কায়ক্লেশে দিন কেটেছে তাঁদের।

বুদ্ধগুপ্ত তাঁর অসামান্য মেধার অধিকারে শালিবন বিহারে প্রবেশাধিকার পেলে কী হবে, দারিদ্র্যেহর কারণে শৈশব বা যৌবনের রূপরসগন্ধ কিছুই আস্বাদন করতে পারেননি। চিরকাল অর্থাভাবে বিব্রত হয়েছেন।

তাই যখন আমার প্রেরিত গুপ্তপুরুষ তাঁকে এক কলসপূর্ণ রৌপ্যদ্রম্মের লোভ দেখায়, তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত গতকাল রাত্রে আমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছেন।'

এই বলে বিশুদ্ধকীর্তির ওপর ঝুঁকে এলেন অগ্নিমিত্র, 'এই মুহূর্তে আমি সব জানি আচার্যদেব। আমি জানি কারা কারা আপনাদের সঙ্গে আছেন। তাঁরা কোথায় লুকিয়ে আছেন। কী আপনাদের পরিকল্পনা। আপনাদের এতদিনের সযত্নলালিত সাধের অভ্যুত্থান পরিকল্পনার প্রতিটি অংশ এখন আমার সামনে উন্মুক্ত। বলুন আচার্য, আমার কী করা উচিত।'

'কী চান অগ্নিমিত্র?' শুষ্কস্বরে প্রশ্ন করলেন বিশুদ্ধকীর্তি।

আরও ঝুঁকে এলেন অগ্নিমিত্র। কদর্য মদ্যপ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বিশুদ্ধকীর্তির নাসারন্ধ্রে।

'আমার অর্থ চাই আচার্য। অপরিমিত অর্থ। আজ অবধি বঙ্গদেশের শাসকবর্গ, শ্রেষ্ঠী এবং বণিকশ্রেণী অপরিমিত অর্থ দান করে গেছেন ওই বজ্রযোগিনীর মন্দিরে আর শালিবন বিহারে। সেই অপরিসীম সম্পদের কুঞ্জি গচ্ছিত আছে কেবল আপনার কাছে।

জেনে রাখুন আচার্য, এতক্ষণ যা বললাম সেই তথ্য শুধুমাত্র আমার কাছে, কেবলমাত্র আমার কাছেই অধিগত। প্রকাশচন্দ্র বা রাজ্ঞী এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এই মুহূর্তে আপনাকে, আপনার এই সাধের শালিবন বিহার এবং আপনার মিত্রবর্গকে রক্ষা করতে পারি আমি। একমাত্র আমি।'

এতক্ষণে কথা ফুটল বিশুদ্ধকীর্তির মুখে, 'সে সম্পদে একমাত্র সদ্ধর্মের অধিকার, অগ্নিমিত্র!'

'বটে! জেনে রাখুন, নিজের প্রাণ বাঁচানোর থেকে বড় ধর্ম আর নেই। এই মুহূর্তে যাবতীয় স্বর্ণ এখানে একত্রিত করতে আদেশ দিন আচার্য।'

'কিন্তু তার জন্য সময় চাই অগ্নিমিত্র,' বোঝানোর চেষ্টা করেন বিশুদ্ধকীর্তি, 'এত দ্রুত অত বৃহৎ সম্ভার একত্র করব কী করে?'

'সে আপনার সমস্যা বিশুদ্ধকীর্তি।' উচ্চস্বরে বলে ওঠেন অগ্নিমিত্র, 'আমার কাছে সময় নেই। আমি আজ রাত্রের মধ্যেই এই সম্পদ চাই। তারপর আমি আর এখানে নেই। আমি জানি এই দেশ নষ্টদের অধিকারে যাবে, তার আগেই আমি পালাতে চাই।'

বিশুদ্ধকীর্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি।'

অগ্নিমিত্র সহাস্যে বললেন, 'বেশ, বেশ। তবে একলা অপেক্ষা করার অভ্যাস আমার নেই। মালিনীকে বলুন কিছু উত্তম সুরা সহ আমাকে সঙ্গ দিতে।'

অমিতাভভট্ট যখন হরিকেলে পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা নামছে। কর্মান্তবাসক থেকে হরিকেল কম দূর নয়। একটি অশ্ববাহী রথে দুদিনে এই পথ অতিক্রম করেছেন অমিতাভভট্ট। তিনি, তাঁর সারথি এবং অশ্বদুটি অত্যন্ত শ্রান্ত। অথচ সময় নেই।

কুটিরের সামনে রথ থামতেই প্রায় লাফিয়ে নামলেন অমিতাভভট্ট। উপস্থিত প্রহরীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশ্রাম করছিল। তারা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে দেখে স্তম্ভিত।

রক্ষীদের ওইভাবে বসে থাকতে দেখে বিরক্ত হলেন অমিতাভভট্ট। কঠিনস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'বাহিনীর অধিনায়ক কে?'

প্রহরীরা সন্ত্রস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল। প্রধান প্রহরী এগিয়ে এসে বিনীতস্বরে বলল, 'আমি প্রভু। অধীনের নাম বিদ্যাধর। আশা করিনি যে আপনি এত দ্রুত এসে উপস্থিত হবেন।'

আশ্চর্য হলেন অমিতাভভট্ট। তাঁর এখানে আসার সংবাদ তো এদের জানার কথা নয়।

তাহলে? গম্ভীরস্বরে বললেন, 'বিদ্যাধর, আর্য চারুদত্তকে আমি কর্মান্তবাসকে নিয়ে যাব। তাঁকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে দাও।'

বিদ্যাধর অন্যদের সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। অমিতাভভট্ট বললেন, 'কী হল, কথা কানে যাচ্ছে না?'

বিদ্যাধর বলল, 'প্রভু, গতকাল রাত্রেই আর্য চারুদত্ত'র দেহাবসান হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কর্মান্তবাসকের উদ্দেশে দূত প্রেরণ করেছি এই মৃতদেহের দাহসংস্কারের বিষয়ে জানার জন্য। ভাবলাম আপনি হয়তো কোনোভাবে সেই সংবাদ পেয়েই উপস্থিত হয়েছেন। যদিও...'

বিদ্যাধরের কোনও কথাই কর্ণগোচর হচ্ছিল না অমিতাভভট্ট'র। বজ্রাহতর মতো তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। একটিমাত্র কাজের ভারই তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন প্রকাশচন্দ্র। তাতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন তিনি! এখন কোন মুখে গিয়ে প্রকাশচন্দ্রের সামনে দাঁড়াবেন? কী ভাববেন বাকি সতীর্থরা?

কিছুক্ষণ পর বিদ্যাধর ইতস্তত করে ডাকল, 'প্রভু...!'

শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন অমিতাভভট্ট।

'বলছিলাম যে আর্য চারুদত্ত'র সৎকার বিষয়ে মহামান্য রাজসচিব কি কোনও নির্দেশ দিয়েছেন?'

একটি চপেটাঘাত সশব্দে আছড়ে পড়ল বিদ্যাধরের গালে। চিৎকার করে উঠলেন অমিতাভভট্ট, 'রাজসচিব, রাজসচিব আর রাজসচিব। কেন, সব কিছুতে রাজসচিবের নির্দেশ প্রয়োজন হবে কেন? তোরা জানিস না আমি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী? আমি কি এতই অপদার্থ, যে একটা মৃতদেহের সৎকার বিষয়েও তোরা রাজসচিবের আদেশের অপেক্ষা করবি? কী ভেবেছিস, আমি রাজসচিবের বার্তাবহ দূত? কেন?'

প্রহরীরা হতভম্ব। অমিতাভভট্ট মৃদুভাষী এবং সজ্জন বলে পরিচিত। রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করতে শোনেনি তারা। বিদ্যাধর বাম হাত গালে চেপে বসে পড়েছে।

রক্তচক্ষু অমিতাভভট্ট গর্জে উঠলেন, 'হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কী? আমাকে মৃতদেহের কাছে নিয়ে চল। আমি যা বলব, ঠিক সেরকম করবি, বুঝেছিস?'

এর থেকে অধিক যত্ন করে বিদ্যাধরকে আজ অবধি কেউই কিছু বোঝায়নি। সে 'আসুন প্রভু, আসুন,' বলতে বলতে দ্রুতপদে অন্তর্হিত হল কুটিরের অভ্যন্তরে।

ভিতরে ঢুকতেই উৎকট গন্ধ নাকে এল অমিতাভভট্টর। মৃতদেহে পচন শুরু হয়েছে।

উত্তরীয়ের প্রান্তটি নাকে চেপে একবার ঘরটি দেখে নিলেন অমিতাভভট্ট। অতি সাধারণ ঘর। যেটুকু না হলে জীবনধারণ অসম্ভব, কেবলমাত্র সেটুকুই আছে। শত্রুর শেষ রাখেন না প্রকাশচন্দ্র। তবে এঁর ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড না দিয়ে যা শাস্তিবিধান করেছিলেন সে প্রাণদণ্ডের থেকেও সাঙ্ঘাতিক!

ঘরের মধ্যে এক জায়গায় এসেই দৃষ্টি স্থির হল অমিতাভভট্ট'র। মৃতদেহের পাশে ওটা কী? ভূর্জপত্র নাকি?

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি অনুসরণ করে বিদ্যাধর। তারপর সন্ত্রস্তস্বরে বলে, 'আর্য চারুদত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর আমরা কক্ষ একবার পরীক্ষা করে দেখি। চারুদত্ত'র একটি প্রিয় উপাধান ছিল, সেটি কাউকে স্পর্শ করতে দিতেন না। সেই উপাধান থেকে এই ভূর্জপত্র উদ্ধার হয়েছে।'

চকিতে বিদ্যাধরের দিকে ফিরলেন অমিতাভভট্ট, 'কী আছে ওতে?'

সেই দৃষ্টির সামনে যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেল বিদ্যাধর, 'জানি না প্রভু। প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম যে ওটি একটি দীর্ঘ পত্র। মহামান্য, মানে ইয়ে, প্রকাশচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত। পত্রটি বহুদিন পূর্বে লেখা।'

'পড়েছিস?'

'আজ্ঞে?'

'পত্রটিতে কী লেখা আছে পড়েছিস?'

'আজ্ঞে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।' যেন শিউরে উঠল বিদ্যাধর, 'আমি ভেবেছিলাম মহামান্য, মানে ইয়ে, রাজসচিবের উদ্দেশেই যখন পত্রটি লিখিত, সেটি খুলে দেখা ঠিক হবে না।'

স্থিরনেত্রে বিদ্যাধরের দিকে তাকিয়ে থাকেন অমিতাভভট্ট। কর্মান্তবাসক থেকে বহুদূরে প্রকাশচন্দ্রের একজন ঘোষিত শত্রুর মৃত্যু হয়েছে। তারপর তাঁর কাছ থেকে প্রকাশচন্দ্রের নামে লিখিত একটি দীর্ঘ পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও ধুরন্ধর ব্যক্তি পত্রটি হস্তগত করত, পাঠ করত, এবং তার বিপুল কূটনৈতিক মূল্যের সদ্ব্যবহার করত!

'নিয়ে আয়।'

বিদ্যাধর একবার পত্রটির দিকে, আরেকবার অমিতাভভট্টর দিকে করুণচোখে তাকাল।

'কী রে, কথা কানে যাচ্ছে না?' ধমকে ওঠেন অমিতাভভট্ট। ওই পত্রটি তাঁর চাই। জীবনে অনেক তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করেছেন তিনি। আর নয়। এইবার প্রকাশচন্দ্রকে তিনি দেখে নেবেন।

কিছু দোলাচলের পর বিদ্যাধর ভূর্জপত্রটি এনে অমিতাভভট্ট'র হাতে দেয়। অমিতাভভট্ট বহু যত্নে সেটি কুক্ষিগত করেন। তারপর বেরিয়ে আসেন পূতিগন্ধপূর্ণ কক্ষটি থেকে।

বিদ্যাধর পিছনে পিছনে বেরিয়ে আসে গড়ুরহস্ত হয়ে, 'অধীনের প্রতি কী আদেশ প্রভু?'

রথে উঠে নির্বিকার চিত্তে আদেশ দেন অমিতাভভট্ট, 'কুটিরটিতে অতি উত্তমরূপে অগ্নিসংযোগ কর। সব কিছু যেন ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর হ্যাঁ, এই মুহূর্ত থেকে তোদের কর্ম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। তোরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যা। গিয়ে বল যে বঙ্গদেশের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমাদের আর বাঁচবার আশা নেই।'

বিশুদ্ধকীর্তি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সমস্ত শরীর স্বেদস্রাবে প্লাবিত। এ এক এমনই কাজ যে কাউকে সঙ্গে নেওয়ার উপায় নেই। বজ্রযোগিনী মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও শালিবন বিহারে যে পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত আছে, তার পরিমাণ কম নয়। তার একটি বৃহৎ অংশ বয়ে এনেছেন তিনি।

বন্ধ দ্বারের সামনে এসে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করতে লাগলেন। কী একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

এদিক ওদিক ক্ষণেক দেখে নিলেন। তাঁর বাসস্থান বিহারের এক প্রান্তে। বিশেষ কারণ ছাড়া এদিকে কেউ আসে না।

দ্বারদেশে কান পাতলেন বিশুদ্ধকীর্তি। পরক্ষণে নির্ভুলভাবে চিনতে পারলেন ভেসে আসা শব্দকে। নারীর শীৎকারের শব্দ।

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল বিশুদ্ধকীর্তির। থরথর করে হাত পা কাঁপতে লাগল তাঁর। মনে হল এক পদাঘাতে বন্ধ দ্বার খুলে অগ্নিমিত্র'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। তারপর যা হওয়ার তাই হবে।

অনেক কষ্টে উদগত ক্রোধ সংবরণ করলেন বিশুদ্ধকীর্তি। নিজেকে প্রবোধ দিলেন। হয়তো সম্মতি ছিল না মালিনীর। পাষণ্ডটা নিশ্চয়ই বলপ্রয়োগে তাকে বাধ্য করেছে।

ভাবতে ভাবতেই মালিনীর শীৎকারমিশ্রিত হাসির শব্দ ভেসে এল। সঙ্গে কিছু অর্ধসমাপ্ত বাক্য। বলছে এমন চরম সুখ বহুকাল পায়নি সে। অগ্নিমিত্র যে কাজকৌশলে বিশুদ্ধকীর্তির তুলনায় কত পটু তাঁর বিবরণ দিচ্ছে।

আর অনুরোধ করছে, অগ্নিমিত্র যেন তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান!

বিশুদ্ধকীর্তি কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। যে নারীকে এত প্রেম উপহার দিয়েছেন তিনি, সযত্নে মাথার মণি করে রেখেছেন, এত দ্রুত আনুগত্য পরিবর্তন করে ফেলল? এত কুহকিনী, এত কুলটা, এত ছলনাময়ী হতে পারে নারী?'

একটু পর কঙ্কণের শব্দ ভেসে এল। পোশাক পরছে মালিনী। শোনা গেল অগ্নিমিত্রর কিছু তরল হাস্যপরিহাস।

মালিনীর অনুরোধও শুনতে পেলেন বিশুদ্ধকীর্তি। অতি উৎকৃষ্ট মৈরেয় এনেছিল সে। অগ্নিমিত্র তো সেসব মুখেই দিলেন না। মালিনীকে দেখেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অত যত্নে আনা পানীয় সেবন করবেন না অগ্নিমিত্র? মালিনীর সেবা কি বৃথা যাবে?

অগ্নিমিত্র'র উচ্চ হাসি ভেসে এল। তিনি বলেছেন, এমন সুন্দরীকে ভোগ করার জন্য এতই ব্যগ্র ছিলেন যে মদিরাপানের জন্য অপেক্ষা করতে পারেননি। তবে মালিনীর স্বহস্তে প্রস্তুত মদিরা তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন বইকি!

তার সামান্য কিছু পরে পানীয়তে চুমুকের শব্দ। উচ্চস্বরে মালিনীকে সাধুবাদ দিচ্ছেন অগ্নিমিত্র। দাঁড়িয়ে আছেন বিশুদ্ধকীর্তি। প্রতিটি শব্দ, শূলের মতো বিদ্ধ হচ্ছে তাঁর কর্ণকুহরে।

একটু পর খক খক করে কেশে উঠলেন অগ্নিমিত্র। তারপর একটি ধাতব শব্দ। পানীয়ের পাত্র পড়ে গেল?

আর থাকতে পারলেন না বিশুদ্ধকীর্তি। এক ধাক্কায় দ্বার উন্মুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। ঝাঁকুনি খেয়ে তিনি থেমে গেলেন।

শয্যার ওপর শুয়ে ছটফট করছেন অগ্নিমিত্র। চোখের মণি বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে শ্বেতস্রাব।

অবিশ্বাসী চোখে মালিনীর দিকে তাকালেন বিশুদ্ধকীর্তি। মালিনীর মুখ রক্তশূন্য। ফিসফিস করে বলল, 'বিষ। ভিক্ষুণী মন্দর্ভা দিয়েছিলেন।'

মালিনীর সংজ্ঞাহীন দেহটি মাটিতে পড়েই যেত, যদি বিশুদ্ধকীর্তি ধরে না ফেলতেন।

অনুচ্চ পাথুরে টিলা দাঁড়িয়ে আছে সাগরের গা ঘেঁষে। তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। টিলার চূড়ায় উঠলে অনেক দূরের দিগন্ত অবধি দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হয়। এই সন্ধ্যাবেলায় জনহীন টিলার সারা দেহে সূর্যাস্তের আলো।

টিলার চূড়ার দিকে চেয়েছিল অমিতাভভট্টর সারথি সুদাস। একটু দূরে তার অশ্ববাহিত রথটি দাঁড়িয়ে। সুদাস দেখছিল একটি পরিচিত অবয়ব বসে আছে টিলার চূড়ায়। দেখে মনে হয় যেন প্রস্তরমূর্তি। একটু পর নড়ে উঠল সেই প্রস্তরমূর্তি। হাতে ধরা ভূর্জপত্র একটু একটু করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিতে লাগল বাতাসে।

প্রথম থেকেই লক্ষণ ভালো লাগছিল না সিংহোদরের। তাকে বারবার বলা হয়েছিল—যেন গুপ্তগৃহ থেকে এক পক্ষকাল না বেরোয় সে। স্বয়ং পদ্মসম্ভব তাঁকে বিশেষভাবে নিষেধ করেছিলেন। সিংহোদরের এখন মনে হচ্ছে, সেই নিষেধাজ্ঞা তার শোনা উচিত ছিল।

গুপ্তগৃহটি এক অন্ত্যজ কিরাতপল্লীতে। দিনরাত, সেখানে পশুহত্যা, মাংসবিক্রয় লেগেই আছে। সিংহোদর সদ্ধর্মপন্থী, নিরামিষভোজী। পশুহত্যার দৃশ্য, রক্ত, মাংস, এসব দর্শনে তার বমনোদ্রেক হয়। সে পদ্মসম্ভবকে বলেছিল, 'প্রভু, দয়া করে এই নরকে আমাকে ফেলে যাবেন না।'

পদ্মসম্ভব সেই আর্তিতে কান দেননি। সুপক্ক অজমাংসের সঙ্গে কিরাতদের প্রিয় উগ্রগন্ধী ভাতপচা আরক পান করতে করতে বলেছিলেন, 'এখানেই পক্ষকাল থাকো। অন্ততপক্ষে যতদিন না চূড়ান্ত লড়াইটা হয়ে যায়।' সিংহোদর করুণস্বরে জানতে চেয়েছিল যে তার জন্য এই নরকটি পছন্দ করার কারণ কী। পদ্মসম্ভব জানিয়েছিলেন, তার দুইটি কারণ। প্রথমত, এই সংকীর্ণ এবং ঘনবদ্ধ কিরাতপল্লীতে প্রবেশের আগে চন্দ্রবংশের সৈন্যরা দুবার ভাববে। দ্বিতীয়ত, কেউ ভাবতেই পারবে না যে মল্ল সিংহোদরের মতো অহিংস সদ্ধর্মী এই মাংসবিক্রেতা কিরাতদের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।

সেই থেকে রয়ে গেছিল সিংহোদর। অত্যন্ত মুখরা এক কিরাত রমণী তাকে দুবেলা ভাত এবং সিদ্ধ নিরামিষ ব্যঞ্জন পরিবেশন করে যায়। তার কটুবাক্যের ভয়ে সেসব নিঃসাড়ে গলাধঃকরণ করে সিংহোদর।

তবে শান্তিতে ছিল না সিংহোদর। সে জানত যে, চন্দ্রবংশের গুপ্তচর বা রাজসেবকরা তাকে খুঁজছে। তার মুখ নিশ্চয়ই মনে রেখেছে কারারক্ষীরা। অন্তত সেতুরক্ষী তো বটেই। তারা নিশ্চয়ই তন্নতন্ন করে খুঁজছে কর্মান্তবাসক। হয়তো বা তার বাইরেও। প্রত্যহ সে ভয়ে ভয়ে থাকত, এই বুঝি তার কুটিরের দ্বার এক আঘাতে ভেঙে ফেলল কেউ। এই বুঝি তার হাত পা বেঁধে পশুর মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। এই বুঝি তার দেহে ভারী পাথর বেঁধে তাকে ছুড়ে দেওয়া হল এক মস্ত জলাশয়ে। ছটফট করছে সে, তার দিকে বিকট হাঁ করে এগিয়ে আসছে কুমির...

কতবার যে ঘুম ভেঙে ঘর্মাক্ত কলেবরে উঠে বসেছে সিংহোদর, নিজেও জানে না।

মাঝেমধ্যে পদ্মসম্ভব এসে দেখা করে যান। বিচিত্র সব ছদ্মবেশে আসেন তিনি। আর প্রতিবারই সেই নিখুঁত ছদ্মবেশ আর অসামান্য অভিনয় ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছে সিংহোদর।

কয়েকদিন ধরেই বড় বিষণ্ণ হয়েছিল সে। এক নিঃসঙ্গতা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল এই নির্বাসনে। শেষে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়েছিল সে।

কিরাতপল্লীর সংকীর্ণ এবং জটিল সরু পথ মুখস্থ হয়ে গেছিল সিংহোদরের। অসুবিধা হল পল্লী থেকে নির্গমনের পথটি খুঁজে পেতে। অবশেষে সেই পথ খুঁজে পল্লীর বাইরে বেরোতেই মন প্রসন্ন হয়ে গেল তার।

হেমন্ত শেষ হওয়ার মুখে। পথের পাশে ফুটে আছে বিচিত্র বর্ণের সব বনজ ফুল। একটু দূরে একটি অনুচ্চ টিলা। তার পাশে মেঘান্দ'র একটি ক্ষুদ্র শাখানদী। জনবহুল পথ। হেঁটে যাচ্ছে কৃষক, গৃহবধূ, জালিক, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এবং পণ্যবাহী শ্রমিকদের দল। দুদণ্ড দাঁড়িয়ে বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিল সিংহোদর। তারপর একটু এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করল। আস্তে আস্তে এতদিনের জড়তা কেটে যাচ্ছিল তার।

সিংহোদর দেখল, পল্লীপথের ঠিক সামনেই একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে জড়ো হয়েছে কয়েকজন। মিষ্ট অথচ তীব্র মদিরাগন্ধে চারিদিক ভরপুর। উঁকি দিয়ে দেখল, একটি খর্বকায় মানুষ হাঁড়িতে করে কোনও পুষ্পজাত মদিরা বিক্রয় করছে। তারই গন্ধে ম' ম' করছে চারিদিক। একটু পরেই সে বুঝতে পারল, এখানে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। আজ অবধি সে কোনও মূক এবং বধির মদিরাবিক্রেতা দেখেনি। অথচ এখানে এই খর্বকায় মূক ও বধির মানুষটি সাবলীল ও সহজভাবে তার ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করে চলেছে। সমস্ত ক্রয়বিক্রয় হচ্ছে অঙ্গুলি সঙ্কেতে, ওষ্ঠ সঞ্চালনে। আরও একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করল সিংহোদর। মূক এবং বধির মানুষটি অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। সে ক্রেতার ওষ্ঠ সঞ্চালন দেখেই তার উচ্চারিত বাক্যটি বুঝতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই নিরুচ্চার ক্রয়বিক্রয় দেখল সিংহোদর। ততক্ষণে মত্ত ক্রেতাদের অনেকেই বিহ্বল। সেই অবসরে সিংহোদর গিয়ে ইশারায় এক পাত্র মদিরা দিতে বলল তাকে।

মূক ও বধির বিক্রেতা তার দিকে কয়েকমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর নিষ্পাপ এবং অনাবিল হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ।

টিলার ওপর বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন অমিতাভভট্ট। সূর্য নেমে এসেছে দিগন্তের অনেক কাছাকাছি। সমুদ্রের বুক জুড়ে রক্তিম সন্ধ্যা ছেয়ে আসছে। প্রবল বাতাসে উড়ে যাচ্ছে অমিতাভভট্ট'র পোশাক। তাঁর কেশরাশি অবিন্যস্ত। মুখখানি গম্ভীর এবং থমথমে।

চারুদত্ত'র মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার করা পত্রটির ছিন্ন অংশগুলি অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে বাতাসে। কিন্তু তার অভিঘাত যেন এখনও ক্রুদ্ধ, অসহায় সর্পিণীর মতো পাক খাচ্ছিল তাঁর স্মৃতির মধ্যে।

সেই পত্রের প্রতিটি ছত্রে চারুদত্ত লিখে গেছেন প্রকাশচন্দ্র আর তাং সাম্রাজ্ঞী য়ু জেতিয়ানের যৌথ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। লিখে গেছেন প্রকাশচন্দ্র আর এই নাগিনীর বঙ্গদেশ অধিকারের শিহরন জাগানো কাহিনি। চারুদত্ত স্বীকার করেছেন কীভাবে কোন প্রলোভনে তিনি সহায়তা করেছিলেন এই পাপ কর্মে।

হত্যা করেছিলেন তাঁর সম্রাট রাজভটকে। মাদকদ্রব্য ব্যবহারে বশীভূত করেছিলেন ভাগিনেয়কে। তারপর প্রকাশচন্দ্রের হাতে তুলে দিয়েছেন এই দেশ শাসন করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

পত্রের শেষের দিকে ঝরে পড়েছে তীব্র আক্ষেপ। অনুশোচনার গ্লানিতে দীর্ণ চারুদত্ত লিখেছেন, 'সম্ভব হলে আমি সারমেয়'র মতো বঙ্গদেশের প্রতিটি গৃহদ্বারে গিয়ে চিৎকার করে বলতাম, এই পাপবুদ্ধিদের উৎখাত করুন। এদের ধ্বংস করুন। সবংশে নির্মূল করুন। কিন্তু হায়, আমি আজ অসহায়, নির্জীব। ঈশ্বর নিজহস্তে আমাকে পাপের শাস্তি দিয়েছেন। তবে আপনি পার পাবেন না প্রকাশচন্দ্র, আপনার জীবদ্দশাতেই, সজ্ঞানে, সুস্থ অবস্থায় আপনাকে আপনার পারিষদসহ অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। এই অভিশাপ দিয়ে গেলাম।'

আকাশের অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়েছিলেন অমিতাভভট্ট। সেই শূন্যতা গ্রাস করেছিল তাঁর মস্তিষ্ক, স্নায়ু, চৈতন্য, সব কিছু।

এদের জন্যই সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন তিনি? নিজের মন, বুদ্ধি, আত্মা, চেতনা—সব কিছু সমর্পণ করেছেন এদের কাছে? নিজের জীবন, যৌবন, আদর্শ, চরিত্র সব বিসর্জন দিয়েছেন এই কুৎসিতবাদের যূপকাষ্ঠে? সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গেছেন নিজের জন্মভূমিকে?

অসহ্য গ্লানি আর অপরাধবোধের আগুনে অন্তরাত্মা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল অমিতাভভট্টর। এই ঘৃণ্য পাপাত্মাদের জন্যই বিরুদ্ধমতের প্রত্যেককে সবংশে নিশ্চিহ্ন করেছেন তিনি, তাঁরা যতই শুভ চিন্তার, উন্নত চরিত্রের মানুষ হন না কেন। এই পাপ কর্মের জন্যই স্বমতাবলম্বীদের সমস্ত পাপ কাজ নির্বিকার চিত্তে সমর্থন করেছেন, তারা যতই নিকৃষ্ট চরিত্রের প্রাণী হোক না কেন। শিক্ষক থেকে ছাত্র, শ্রমিক থেকে কৃষক, বণিক থেকে ক্রেতা, রাজন্য থেকে অন্ত্যজ, সমাজের প্রতিটি স্তরে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করেছেন তিনি। উগ্র আকাঙ্ক্ষায় নষ্ট করেছেন সহনশীল সমাজস্থিতি। এক অসহিষ্ণু, ধর্ষকামী অন্ধকারের রাজত্ব বিস্তার করেছেন নিজের জন্মভূমির ওপর।

কেন? কীসের জন্য? কোন স্বার্থে?

তাঁকে এবং তাঁদের বোঝানো হয়েছিল, প্রকাশচন্দ্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই বঙ্গজাতির মুক্তির একমাত্র দিশা। আর সেই মুক্তির পথে সাধারণ নৈতিকতা কেবলমাত্র চারিত্রিক বিচ্যুতি ব্যতীত আর কিছু নয়। বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে, প্রকাশচন্দ্রের মতাদর্শের প্রতি নিঃসপত্ন আনুগত্য, এতেই বঙ্গজাতির মুক্তি। প্রকাশচন্দ্র যা বলেন তাই নীতি। প্রকাশচন্দ্র যা অনুমোদন দেন তাই নিয়ম। প্রকাশচন্দ্র যা আদেশ দেন তাই বিচার। প্রকাশচন্দ্রের উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষর পবিত্র, প্রকাশচন্দ্রের প্রতিটি আচরণ আচরণীয়, প্রকাশচন্দ্রের প্রতিটি আদেশ অবশ্যপালনীয়। সারাজীবন এই সত্যকেই ধ্রুব জেনে এসেছেন তিনি।

ঘনায়মান অন্ধকারে নিজের দু'হাতের দিকে অনেকক্ষণ স্থির চোখে চেয়ে আছেন অমিতাভভট্ট। বড় ভুল হয়ে গেছে সারা জীবন জুড়ে। মস্ত বড় ভুল। এই ভ্রান্ত, অন্ধ পথের পথিক হয়ে এতদিন দু'হাতে অজস্র কালি মেখেছেন তিনি। অপরিমেয় পাপের ভাগী হয়েছেন। আর কত মাখবেন? কেনই বা মাখবেন? কীভাবে হবে এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত?

সারথি সুদাস দেখল তার প্রভু স্খলিত পায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন টিলার একেবারে উপান্তে। দু'হাত ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপরে তুলে কী যেন বলছেন তিনি, মনে হয় যেন সর্বশক্তিমানের প্রতি কোনও গভীর অনুযোগ জানাচ্ছেন।

দু'চোখে ধাঁধা লেগে যায় সুদাসের। কী করবে সে এখন?

তবে বেশিক্ষণ দোলাচলের মধ্যে থাকতে হয় না তাকে। সুদাসের স্তম্ভিত এবং আতঙ্কিত চোখের সামনে তার প্রভু ঝাঁপ দিলেন টিলার মাথা থেকে।

নীচে পড়তে পড়তে হাত দু'খানি দুদিকে বাড়িয়ে দেন অমিতাভভট্ট। যেন উদাস উন্মুক্ত বাতাসকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন তিনি।

একটু পরেই তাঁর দেহটি একটি গ্লানিভারগ্রস্ত পাথরের মতো ডুবে গেল পূর্বসমুদ্রের জলে। সেই সঙ্গেই অন্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বঙ্গদেশের প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট'র।

মূক ও বধির মদিরা বিক্রেতার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে একটা সন্দেহ পাকিয়ে উঠছিল সিংহোদরের মনে। তাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

অবশ্য তখন তার স্থির হাঁটার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। পা টলায়মান। চোখদুখানি রক্তিম। মন বড় প্রসন্ন সিংহোদরের। শৌণ্ডিকটি বড় ভালো। একটিমাত্র কপর্দকের বিনিময়ে অন্তত অর্ধকলস মদিরা পান করতে দিয়েছে সিংহোদরকে। আকারে ইঙ্গিতে এও জানিয়েছে যে তার সঙ্গে গেলে আরও উৎকৃষ্ট সুরা এনে দিতে পারে সে। তার সঙ্গে সুন্দরী নারীও। না না, তার জন্য কিছুই দিতে হবে না সিংহোদরকে।

নারীসঙ্গ বহুকাল হয়নি সিংহোদরের। তার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, আপাতত পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন। অনেক দিনের রমণীবর্জিত শুষ্ক জীবন বড়ই পীড়া দিচ্ছিল সিংহদোরকে। তার ওপর এই মন উদাস করা মদিরাবেশ। আর এ তো মানুষের শরীর।

পথ ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে উঠছিল। প্রদোষকাল আসন্ন। পথে সুবেশ নাগরিকদের দল।

পথটি শেষে একটি সুসজ্জিত গৃহদ্বারে এসে শেষ হল। তার সামনে মধুপায়ী ভ্রমরগুঞ্জের মতো মদ্যপদের ভিড়। ততক্ষণে সিংহোদর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েছে। সে ইতিউতি চাইতে লাগল। এই স্থান তার চেনা। ভাঁড়ুদত্ত'র প্রসিদ্ধ শৌণ্ডিকালয়। তাকে এখানে আনা হল কেন?

ততক্ষণে মূক ও বধির মানুষটি ভিতরে চলে গেছে। একটু পরেই দেখা দিলেন স্বয়ং ভাঁড়ুদত্ত। উদার হেসে বললেন, 'কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য, স্বয়ং মল্ল সিংহোদর উপস্থিত যে! আসতে আজ্ঞা হোক। বসতে আজ্ঞা হোক। মায়া, দেখো কে এসেছেন। অতিথিকে ভেতরে নিয়ে যাও।'

সিংহোদরের মাথার মধ্যে একটা আশঙ্কা নড়ে উঠল। এক্ষুনি কিছু একটা ঘটে গেল যা হওয়া উচিত নয়। সঙ্গত নয়।

কিন্তু তার আশঙ্কা চাপা পড়ে গেল মায়াকে দেখে। মানুষ এত সুন্দরও হয়?

সেই মুহূর্তে মূক ও বধির মানুষটি বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে চোখের ইশারায় মায়ার দিকে ইঙ্গিত করে অশ্লীল হাসিতে ভরিয়ে তুলল তার মুখখানি। মায়াও একটি কামাতুর বিলোল কটাক্ষ উপহার দিয়ে বলল, 'আসুন স্বামী, উৎকৃষ্ট শিধু আছে। আর ক্লান্তি অপনোদনের জন্য শয্যাও প্রস্তুত।'

সিংহোদরের তৃষ্ণার্ত চোখে যেন সহস্র প্রদীপ জ্বলে উঠল। এ কি মানবী, নাকি যক্ষিণী?

অন্ধের মতো সে অনুসরণ করল মায়াকে। আহা, নিতম্ব দুটি কী মায়াময়, কী অনুপম।

পূর্ণিমার পূর্বরাত্রে দুগ্ধ ফেননিভ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে মেঘান্দ তীরবর্তী এই শ্মশান। রাতচরা পাখিদের ডাকে রাত্রি কর্ণময়। এদিকে ওদিকে দু-চারটি চিতা জ্বলছে। তবে অন্য মানুষজন ত্রিসীমানায় নেই। চারিদিকে রাজসেবকদের সতর্ক প্রহরা। তাদের নেতৃত্বে মাধব।

কমলাঙ্ক গ্রামের সেই লজ্জাজনক পরাজয়ের পর মাধবের জন্য চূড়ান্ত শাস্তিই ধার্য ছিল। কিন্তু কোনও এক অলৌকিক কারণে বেঁচে গেছে সে। সেই অভাবনীয় করুণার জন্য মহারানির প্রতি তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

মাধব জানে যে আজ এই মহাশ্মশানে বঙ্গদেশের মহামান্য মহারাজ্ঞী এবং মহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্র মহাভৈরবীক্রিয়ায় বসবেন। সঙ্গে থাকবেন অন্যান্য রাজন্যবর্গ। তবে তার কাছে সংবাদ আছে যে, রাজন্যবর্গের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন কেবলমাত্র রাজগুরু বিশুদ্ধকীর্তি এবং জিতসেন। আনন্দগুপ্ত আর শান্তঘোষের মৃত্যুসংবাদ এখন আর রাজসেবক বাহিনীর উচ্চ পদাধিকারীদের কাছে গোপন নেই। তাঁদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে মহাসান্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্র'র আকস্মিক অন্তর্ধান। গতকাল দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর একাই কোথায় যেন বেরিয়ে যান তিনি। কোথায় যাচ্ছেন কাউকে বলে যাননি। প্রধানমন্ত্রী গেছেন হরিকেল, মহারাজসচিবের বিশেষ 'অনুরোধে।'

একটু পরে একটি রথে চড়ে জিতসেন এবং বিশুদ্ধকীর্তি এলেন। মাধব এবং অন্যান্য রক্ষীরা অভিবাদন জানাল। জিতসেন অভিবাদন গ্রহণ করলেন, কিন্তু বিশুদ্ধকীর্তি কোনও উত্তর দিলেন না। আশ্চর্য হল মাধব। বিশুদ্ধকীর্তি অত্যন্ত রসিক এবং স্নেহময় মানুষ। কেউ প্রণত হলেই তিনি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করেন। দুজনে গিয়ে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। তারপর প্রতীক্ষা মহামান্য মহারানি এবং প্রকাশচন্দ্রের জন্য।

অর্ধকলস পুষ্পজাত মদিরার পর আরও দুই ঘট অতি উৎকৃষ্ট শিধু। তারপর মায়া নামের ওই কামিনী এতক্ষণ ভুমানন্দের চূড়ান্ত শীর্ষে রেখেছিল সিংহোদরকে! সেই আনন্দের তুলনা নেই। এতদিনের বুভুক্ষু কৃচ্ছ্রসাধনের পর আজ যেন ব্রতভঙ্গের উদযাপন চলছিল সিংহোদরের সমস্ত শরীর জুড়ে।

মায়া চলে গেছে কিছুক্ষণ হল। এই মুহূর্তে রমণক্লান্ত মদিরাবিষ্ট সিংহোদরের মাথার মধ্যে একটি অস্বস্তিকর চিন্তা খেলা করে যাচ্ছে।

কী যেন একটা ঠিক হয়নি। কিছু একটা ঘটেছে যা যুক্তিসংগত নয়। কিন্তু সেটি যে কী, তার মস্তিষ্কে ধরা দিচ্ছিল না।

সহসা চোখ খুলে গেল তার। দ্রুত উঠে বসল সে। তার মনে পড়ে গেছে কী সেই অসঙ্গতি। ভাঁড়ুদত্ত'র তো তাকে চেনার কথা নয়। আর মূক মানুষটির পক্ষেও ভাঁড়ুদত্তকে তার নাম জানানো একেবারেই অসম্ভব। তাহলে তিনি কী করে প্রথম দর্শনেই সিংহোদরকে নাম ধরে সম্বোধন করলেন?

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল সিংহোদরের। ফাঁদে পড়েছে সে। এ সব কিছুই পূর্বপরিকল্পিত। অর্থাৎ এরা জানত যে সিংহোদর ওই কিরাতপল্লীতেই আছে, কিন্তু পল্লীর ঠিক কোথায় সে ব্যাপারে অবগত ছিল না। তাই অনেকদিন ধরেই ওই মূক মানুষটি ওখানে শৌণ্ডিকের ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছিল। আর কুমার পদ্মসম্ভবের কথা না শুনে মূর্খের মতো সেই ফাঁদে পা দিয়েছে।

পোশাকের দিকে হাত বাড়াল সিংহোদর। যে করে হোক তাকে এই মুহূর্তে পালাতে হবে। নিজের মুর্খামির জন্য এত বড় সর্বনাশ হতে দিতে পারে না সে। কিছুতেই না।

কিন্তু তার আগেই খুলে গেল কক্ষের দ্বার। ভাঁড়ুদত্ত প্রবেশ করলেন। তার সঙ্গেই প্রবেশ করল আরও একজন যাকে দেখামাত্র সিংহোদরের হৃৎপিণ্ড কণ্ঠনালীতে আটকে গেল। সেই সেতুরক্ষী!

রঙ্গলাল উদার হেসে বলল, 'আরে মিত্র সিংহোদর যে। সংবাদ সব ভালো তো? মায়া তোমার যথোপযুক্ত যত্ন নিয়েছে তো?'

সিংহোদরের গলায় কোনও স্বর ফুটল না।

রঙ্গলালের পিছন পিছন দুজন ভীমদর্শন রাজসেবক প্রবেশ করল। তাদের শরীর বিশাল, হাতের অস্ত্র কুৎসিত এবং চোখ শীতল।

রঙ্গলালের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হল। বিগলিতস্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আবার কবে মিলিত হব সেই চিন্তায় রাতের ঘুম হচ্ছিল না হে। আজ অবশ্য নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। এখন গাত্রোত্থান করো দেখি। মহামান্য

রাজসচিব আবার তোমার সঙ্গে আলাপিত হওয়ার জন্য বড়ই উতলা হয়ে আছেন।'

প্রকাশচন্দ্র আর মহারানি এলেন রাত্রির প্রথম যাম পরে করে। রানি একটি কৃষ্ণবর্ণের শাটিকা পরিহিতা। ঘন কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশগুচ্ছ চূড়া করে বাঁধা। শরীর আভরণহীন। মুখখানি রুক্ষ, শুষ্ক এবং গম্ভীর।

প্রকাশচন্দ্রের মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। তিনি তাঁর স্বভাবজ নির্লিপ্তমুখে এসে আসন গ্রহণ করলেন। জিতসেন সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। বিশুদ্ধকীর্তি উচ্চারণ করলেন স্বস্তিবাচন। প্রকাশচন্দ্র নিরাসক্ত মুখে বললেন, 'আচার্য বিশুদ্ধকীর্তিকে আমার প্রণাম। মিত্র জিতসেনকে অভিবাদন।'

জিতসেন সশ্রদ্ধভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আজকের চক্রের কী আয়োজন প্রভু?'

প্রকাশচন্দ্র উত্তর দিলেন না। তার পরিবর্তে তিনি মাধবের দিকে ফিরে বললেন, 'মাধব, সমস্ত রক্ষীদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। আজ এই শ্মশানের ত্রিসীমানায় যেন কেউ না আসে।'

মাধব ইতস্তত করল। যদি কোনও অঘটন ঘটে যায়?

প্রকাশচন্দ্র তার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, 'দ্বিধার কোনও কারণ নেই মাধব। আজ কোনও অঘটন ঘটবে না। কারণ আজ কোনও মানুষ বা প্রাণীর এই শ্মশানভূমির নিকটস্থ হওয়ার ক্ষমতা নেই।'

মাধব মাথা নত করে প্রস্থান করল।

বিশুদ্ধকীর্তির মুখ দেখে বোঝা দুষ্কর, কী অবিশ্বাস্য প্রলয় তাঁর মনের মধ্যে ঘটছে। প্রিয়তম শিষ্য বুদ্ধগুপ্ত'র মৃত্যু সংবাদ, অগ্নিমিত্র'র সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ, মালিনীর বিষপ্রয়োগে অগ্নিমিত্র হত্যা, সবই ঘটে গেছে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে। মিত্রবর্গের কাউকে জানাতে পারেননি সেই সংবাদ। অগ্নিমিত্র'র মৃতদেহটি কোনওমতে তাঁর কক্ষের পশ্চাতবর্তী অরণ্যের মধ্যে এক গহ্বরে নিক্ষেপ করে এসেছেন। মালিনী স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তাকে একটি ভেষজ ঔষধি প্রয়োগে তিনি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন করে এসেছেন। এই চক্রশেষে তিনি শালিবন বিহারে ফিরে মৎস্যেন্দ্রনাথকে সব কিছু বিস্তারিত জানাবেন, এই স্থির করেছেন।

প্রকাশচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে ঘট থেকে জল নিয়ে বৃত্তাকারে ছিটিয়ে দিলেন। তীব্র কটুগন্ধে চারিদিক ভরে গেল। বিশুদ্ধকীর্তি নাসিকা কুঞ্চিত করলেন। কীসের গন্ধ?

প্রকাশচন্দ্র এবার একটি শুষ্ক কৃষ্ণ বৃক্ষশাখা তুলে নিলেন হাতে। বিশুদ্ধকীর্তি বুঝতে পারলেন বৃক্ষশাখাটি কী। বজ্রপাতে মৃত নিম্ববৃক্ষের শাখা। খুব সম্ভবত কোনও শ্মশানভূমিজাত। প্রকাশচন্দ্র তাই দিয়ে একটি অতি বৃহৎ বর্গক্ষেত্র আঁকলেন মাটিতে। সেই বর্গক্ষেত্রর মধ্যস্থানে রইলেন তাঁরা।

সতর্ক হলেন বিশুদ্ধকীর্তি। বজ্রযানে সিদ্ধ তন্ত্রবিদ তিনি। তিনি জানেন কোন কার্যে এই বজ্রপাতদগ্ধ শ্মশাননিম্বশাখার প্রয়োজন হয়। মায়াবন্ধন।

প্রকাশচন্দ্র যখন মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন, তাঁর দিকে তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে রইলেন বিশুদ্ধকীর্তি। মায়াবন্ধন সর্বোচ্চস্তরের বন্ধন। শুধু ভূবন্ধন নয়, মায়াবন্ধনে রূপ, সংজ্ঞা, বেদনা, সংস্কার আদি পঞ্চস্কন্ধ বদ্ধ হয়। বদ্ধ হয় সমগ্র প্রকৃতি। প্রতীত্যসমুৎপাদকে বদ্ধ করতে পারে এই বন্ধন।

এই বন্ধনক্ষেত্রে যাবতীয় কার্যকারণ অক্রিয়াশীল, যাবতীয় পঞ্চভূত সান্দ্র এবং যাবতীয় কালচক্র স্তব্ধ হয়ে থাকে। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং পারত্রিক, এই ত্রিভূতজগত মায়াবন্ধনে অধিষ্ঠান করে।

প্রকাশচন্দ্র এখানে মায়াবন্ধন করছেন কেন? কী এমন ঘটতে যাচ্ছে?

প্রকাশচন্দ্র বর্গক্ষেত্রটির উত্তরপূর্ব প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। দুহাত ওপরে তুলে অজানা ভাষায় কী যেন একটা উচ্চারণ করলেন তিনি। বিশুদ্ধকীর্তির মনে হল—এ কোনও এক জটিল মন্ত্র। তার সুর আদিম এবং অস্বস্তিকর। শ্রবণমাত্রে প্রাণে ভয় জাগে।

বিশুদ্ধকীর্তি অলক্ষ্যে নিজের দুহাতের আঙুল মুদ্রাবদ্ধ করলেন। তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, এখানে এমন কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, যা স্বাভাবিক নয়।

প্রকাশচন্দ্র সেই একই আচার বর্গক্ষেত্রটির বাকি তিন প্রান্তদেশে করলেন। বিশুদ্ধকীর্তির মনে হল শেষ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রটি ঘিরে এক একটি অদৃশ্য আবরণ নেমে এল।

জিতসেন এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন, কিছু বুঝতে পারছিলেন না। এর আগে একত্রে অনেক চক্রানুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু আজ প্রকাশচন্দ্র যা করছেন তা সম্পূর্ণ অন্যরকম।

প্রকাশচন্দ্র এবার এসে তাঁদের মধ্যে বসলেন। মাটিতে একটি চতুর্শীর্ষ নক্ষত্র আঁকলেন। শীর্ষগুলির প্রান্তদেশে রইলেন চারজন। নক্ষত্রের ঠিক মধ্যস্থানে কয়েকটি শুষ্ক বৃক্ষশাখ এবং গুল্মলতা এনে রাখলেন। কয়েকটি বৃক্ষশাখা চিনতে পারলেন বিশুদ্ধকীর্তি, অশ্বত্থ, দাড়িম্ব, বেল ইত্যাদি। কয়েকটি চিনতে পারলেন না। গুল্মলতাগুলি এতই প্রাচীন, এতই শুষ্ক যে তাদের দেখে চেনার উপায় নেই।

বৃক্ষশাখাগুলি দিয়ে একটি যন্ত্র প্রস্তুত করলেন প্রকাশচন্দ্র। তার মধ্যে গুল্মলতাগুলি রাখলেন। তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন।

অজানা ধূম্রগন্ধ ভেসে এল বিশুদ্ধকীর্তির নাকে। বহুপুরাতন, বহুপ্রাচীন আবেশ মিশে আছে সেই গন্ধে।

বাকিদের মুখের দিকে একবার তাকালেন বিশুদ্ধকীর্তি। জিতসেনের মুখে অস্বস্তি। মহারানির মুখে একটা চাপা উল্লাসের ভাব। তার মধ্যে একটা জান্তব ক্ষুধা মিশে আছে।

নিজের হস্তমুদ্রা দৃঢ় করলেন বিশুদ্ধকীর্তি। অত্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে চলেছে। তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় বলছে—একটা বিপদ আসন্ন! মহাবিপদ।

প্রকাশচন্দ্র গম্ভীরসুরে বললেন, 'আপনারা জানেন যে আজ আমরা মহাবিপদের সম্মুখীন। একদল বহিরাগত বিদ্রোহী আমাদের দেশের সর্বনাশসাধনে সমুদ্যত। তাদের মধ্যে যেমন সহজিয়া নামের বিকৃত সদ্ধর্মীরা আছে, তেমন রয়েছে কৌপীনধারী উচ্ছৃঙ্খল শৈব সাধকের দল। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের বঙ্গদেশের সুস্থিতি নষ্ট করা এবং শান্তি ভঙ্গ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা।

কিন্তু আমরা, দেশের এই সর্বনাশ হতে দিতে পারি না। আমরা চেষ্টা করেছি এদের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।'

এত পর্যন্ত বলে অতি দীর্ঘ শ্বাস নিলেন প্রকাশচন্দ্র। তারপর বললেন, 'আমরা মহারানির অধীনে অর্ধশতাধিক কালের কাছাকাছি এই ভূমি শাসন করে এসেছি। ক্রমে আমরা সপ্তরাজন্য মিলে রাজ্ঞীর ধর্মধ্বজতলে এই শাসন সুসংহত করেছি, সুসংগঠিত করেছি। আমাদের ধর্মের ধ্বজপতাকা উড়ছে সর্বত্র।

'কিন্তু তদসত্বেও এই বৌদ্ধপাষণ্ড আর বিপথগামী শৈবযোগীদের দল আমাদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র রচনা করেছে। তার মূল অনেক গভীর। আমরা বজ্রযোগিনী মন্দিরের ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রমাণ পেয়েছি আরও অনেক সূত্রে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, কালকের মধ্যেই আমি চূড়ান্ত আক্রমণের আশঙ্কা করছি।

'আমাদের উচিত ছিল এই কঠিন মুহূর্তে সঙ্ঘবদ্ধ থাকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সঙ্গীদের অনেকেই আমাদের সঙ্গে আর নেই। আনন্দগুপ্ত আর শান্তঘোষের হত্যাসংবাদ আপনাদের জানা। খানিক পূর্বেই আমি আমার সাধনার শক্তিবলে অবগত হয়েছি যে, খুব সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী অমিতাভভট্ট আর বেঁচে নেই...'

বিশুদ্ধকীর্তির হস্তমুদ্রা সঞ্চালন মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেল।

'মহাসান্ধিবিগ্রহিক অগ্নিমিত্রও আর আমাদের মধ্যে নেই।'

মুদ্রাসঞ্চালন দ্রুত হল।

'আজ তাই আমাদের আরও কঠিনভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সেই জন্যই বিশেষ পূজার আয়োজন করেছি। এই পূজার উদ্দেশ্য মহারানির জন্য এক অতিবিশিষ্ট অতিপ্রাকৃত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা। কারণ আমরা জানি যে, রানিই স্বয়ং বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশই সাক্ষাৎ রানি। তাই তাঁকে রক্ষা করাই আমাদের প্রধানতম দায়িত্ব।'

জিতসেন হতভম্বের মতো একবার বিশুদ্ধকীর্তি আর একবার প্রকাশচন্দ্রের দিকে তাকালেন। তাঁর মাথার মধ্যে কিছু ঢুকছে না।

প্রকাশচন্দ্র চারটি পাত্রে একটি মিষ্টগন্ধী ঘন কৃষ্ণবর্ণের তরল ঢাললেন। তারপর পাত্রগুলি সবার হাতে তুলে দিয়ে আদেশের সুরে বললেন, 'পান করুন।'

সেই সুমিষ্টগন্ধী তরল ঈষদুষ্ণ মদিরার মতো গলা বেয়ে নামতে লাগল বিশুদ্ধকীর্তির। এক উষ্ণ মাদকতা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর শরীরে।

'আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানা প্রয়োজন। আমি বা রাজ্ঞী এতদিন এই সংবাদ আপনাদের থেকে গোপন রেখেছিলাম। আমরা দুজন ছাড়া আর যেক'জন একথা জানতেন তাঁরা আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু এই তথ্য আপনাদের জানা প্রয়োজন।'

মেরুদণ্ড টানটান করে বসলেন বিশুদ্ধকীর্তি। তিনি বুঝতে পেরেছেন কী বলতে চলেছেন প্রকাশচন্দ্র, কোন মারাত্মক সত্য উন্মোচিত হতে চলেছে তাঁদের সামনে।

'আপনাদের জানাই যে আমাদের নেত্রী, বঙ্গদেশের মহারানি প্রকৃতপক্ষে কোনও মানুষ নন, একজন নাগকন্যা।'

শ্মশানভূমির মধ্যে চারজন মানুষ পদ্মাসনে বসে ধ্যানমগ্ন। সমগ্র স্থানটির মধ্যে এক রহস্যময় নীরবতা। কোথাও কোনও শব্দ নেই, প্রাণের সাড়া নেই।

বিশুদ্ধকীর্তি একটি আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে ছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন মহাশূন্যে ভেসে আছেন। তাঁর চৈতন্য আবিষ্ট, কিন্তু প্রখর। তাঁর চিন্তা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তীক্ষ্ণ। তাঁর একাগ্রতা এবং ধীশক্তি বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে, কিন্তু তার গতি তাঁর ইচ্ছাধীন নয়। তরলের মাদকতা তাঁকে বশীভূত করে ফেলেছে, বুঝতে পারছিলেন বিশুদ্ধকীর্তি। একটা স্থির উত্তেজনার স্রোত ক্রমেই তাঁর নাভিমূল থেকে ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হচ্ছিল, যেভাবে নিঃশঙ্ক শশকের দিকে একাগ্রচিত্তে এগিয়ে চলে ধূর্ত অজগর।

প্রকাশচন্দ্র তাঁদের একটি মন্ত্র দিয়েছেন জপ করার জন্য। মন্ত্রটি বিজাতীয়, শব্দগুলির প্রকরণ শুনে মনে হয়, এ যেন এই পৃথিবীর শব্দ নয়। তার প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণে মস্তিষ্কের কোষ শান্ত, শীতল এবং নিবিড় হয়ে আসে।

একটু পর একটা ক্ষীণ হিসহিসানির শব্দ কানে আসে বিশুদ্ধকীর্তির। কেউ যেন ধীরে, অতি ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। তিনি সেদিকে মনোযোগ দিলেন না, মন্ত্রধ্যান করতে লাগলেন।

হিসহিসানির শব্দ ক্রমে বাড়ছে। প্রথমে ক্ষীণ ও ধীরলয়ে। তারপর একটু দ্রুত এবং উচ্চকিত।

চোখ খুলতে গেলেন বিশুদ্ধকীর্তি। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে প্রকাশচন্দ্রের নির্দেশ ভেসে এল, 'মন্ত্র জপ করতে থাকুন আচার্য। এখনও সময় হয়নি।'

এর অর্থ, তাঁর মন দখল করে ফেলেছেন প্রকাশচন্দ্র। শুধু তাই নয়, নিজের মানসিক চিন্তাতরঙ্গকেও বিশুদ্ধকীর্তির মস্তিষ্কে প্রক্ষেপণ করতে পারছেন।

এতক্ষণে তরলের মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন বিশুদ্ধকীর্তি। এখন তিনি প্রকাশচন্দ্রের ক্রীড়নক মাত্র!

হিসহিসানির শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। আরও ধীর, আরও গভীর, আরও শীতল।

সহসা বিশুদ্ধকীর্তি অনুভব করলেন পারিপার্শ্বিকের তাপমাত্রা দ্রুত নেমে আসছে। এই শৈত্য হেমন্তের স্নিগ্ধ শৈত্য নয়। অনেক শীতল, অনেক হিংস্র।

বিশুদ্ধকীর্তির সর্বাঙ্গে সেই শৈত্য ধীর লয়ে কামড় বসাতে লাগল। তাঁর দাঁতে দাঁত লেগে যেতে লাগল। হাত পায়ের সাড় চলে যেতে লাগল। যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি। অজ্ঞান শৈত্যের মধ্যে যেন একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। কেবল থেকে যাচ্ছে সেই মৃত্যুশীতল হিসহিস শব্দ।

একটু পর সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটি ধূসর পর্দা কে যেন টেনে দিল। তার মধ্যে একটি একটি করে ফুটে উঠল অন্ধকারের বিন্দু। প্রথমে স্থির। ধীরে, অতি ধীরে তারা কম্পমান হল। কম্পন ক্রমে বাড়তে লাগল। একটু পরে সেই কম্পনে গতি এল, এল ছন্দ। এল তাল, এল লয়।

তারপর শুরু হল তাদের নাচ। নাচতেই নাচতেই বিন্দুরা একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যেতে লাগল। তৈরি হল বিন্দুসমষ্টি। তারপর সেই বিন্দুসমষ্টি আকার নিতে লাগল। তৈরি করল অবয়ব।

সেই অন্ধকার যেন তার সীমাহীন গর্ভের মধ্যে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে বিশুদ্ধকীর্তিকে।

সেই অবয়ব তৈরি করেছে বিভিন্ন চরিত্র। ছবি আরও স্পষ্ট হয়ে এসেছে। একটু পরেই শুরু হল ছায়ানাটিকা।

উন্মাদের মতো, আতঙ্কিত পশুদের মতো পালিয়ে যাচ্ছে একদল নরনারী। পিছনে জ্বলছে বনভূমি। তাদের মধ্যে এক শিশুকন্যা ভীতচোখে তাকিয়ে রয়েছে সেই সর্বগ্রাসী দাবানলের দিকে।

গভীর রাত্রি। উঁচু দুর্গপ্রাকার। ধীরে ধীরে সেই দুর্গপ্রাকার পেরিয়ে কারা যেন নেমে আসছে। তাদের হাতে প্রজ্জ্বলন্ত উল্কা, কটিবন্ধে করাল খড়্গ, চোখে জিঘাংসা। তারপর চারিদিকে আগুন আর আগুন।

এক নারী পেরিয়ে যাচ্ছেন শুভ্র তুষারাবৃত গিরিপথ। একটি কিশোর আর একটি শিশুকন্যার হাত ধরে। সঙ্গী একজন বৃদ্ধ আর দু-একজন বিজাতীয় কিশোর। পথের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে ফেলে আসা জন্মভূমির দিকে একবার সজল চোখে তাকালেন। তারপর চোখের জল মুছে চিবুক কঠিন করে মুখ ফেরালেন সামনের দিকে।

অন্ধকার গর্ভগৃহ। বিচিত্রদর্শন এক পাত্রে জ্বলছে আগুন। একদিকে একটি প্রস্তরনির্মিত নাগমূর্তি। তার সামনে একটি ধ্যানস্থ শিশুকন্যা বসে।

কোনও এক বিদেশীয় রাজগৃহ। অতুলনীয় বৈভব। সেই শিশুকন্যা এখন কিশোরী।

একটি বিশাল রাজশয্যা। একজন অসুস্থ মানুষ শেষ শয়ানে। সেই কিশোরী এখন যুবতী। সে ধরে আছে মৃত্যুপথযাত্রীর হাত। ধীরে ধীরে হাত খুলে গেল। উঠে দাঁড়াল সেই যুবতী।

যুবতীর কোলে সদ্যোজাত শিশুকন্যা। মৃতবৎ। রাজশকট ছুটে চলেছে পার্বত্য প্রদেশের পথ ধরে।

পুনরায় সেই অন্ধকার গর্ভগৃহ। প্রস্তরনির্মিত নাগমূর্তি। সেই মৃতবৎ শিশুকন্যাটি শুয়ে আছে নাগমূর্তির সামনে। যুবতী এখন সম্পূর্ণ নগ্ন। দুই হাত উপরে তুলে, দুলে দুলে এক অদ্ভুত ভাষায় মন্ত্র পড়ছে।

মন্ত্রের ভাষা যদিও পরিচিত। একটু আগেই প্রকাশচন্দ্র এই ভাষার মন্ত্রই জপ করতে বলেছেন বিশুদ্ধকীর্তিকে।

শিশুকন্যার চোখ খুলে গেল হঠাৎ করে। চোখের মধ্যে শুধু অন্ধকার। ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি। ধীরে ধীরে হাসি আরও প্রসারিত হল। দন্তহীন মুখখানি খুলে গেল।

ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি জিহ্বা। মানুষের নয়, সাপের!

আর পারলেন না বিশুদ্ধকীর্তি। সমস্ত মানসিক শক্তি সংহত করলেন। চৈতন্যকে স্থির করলেন সহস্রারে। তারপর প্রবল মানসিক শক্তিতে ধীরে ধীরে নিজের চেতনাকে টেনে তুলতে লাগলেন এই অন্ধকারের করাল গ্রাস থেকে। এই তো, একটু একটু করে চেতনা ফিরে আসছে তাঁর। মনে হচ্ছে যেন তমসার গভীর অন্তরাল থেকে ক্রমেই আলোর দিকে ফিরছেন তিনি।

অকস্মাৎ চোখ খুলে গেল বিশুদ্ধকীর্তির। প্রথমে কিছু দেখতে পেলেন না। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে সহস্র অশ্বের ক্ষুরধ্বনি। হাত-পা কম্পমান। এই শীতের মধ্যেও সর্বাঙ্গ স্বেদলিপ্ত।

একটু একটু করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে বিশুদ্ধকীর্তির। সামনের দিকে তাকাতেই ভয়ে আতঙ্কে বোবা হয়ে গেলেন তিনি।

তাঁর পাশে ধ্যানস্থ জিতসেন। চক্ষু মুদ্রিত। শরীর নিস্পন্দ। মনে হচ্ছে যেন মানুষ নয়, একটি প্রস্তরমূর্তি বসে আছে।

বিশুদ্ধকীর্তির ঠিক সামনে প্রকাশচন্দ্র বসে। তিনি তাকিয়ে আছেন বিশুদ্ধকীর্তির দিকেই। তাঁর পাশে বসে থাকার কথা মহারানির।

কিন্তু কোথায় তিনি?

মহারানি নেই। তার বদলে তাঁর আসনে কুণ্ডলীকৃত একটি অতিবৃহৎ, অতি বিশালকায়, মানুষপ্রমাণ কালনাগিনী। তার বিশাল ফণা স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে তাঁদের দিকেই। তার জান্তব এবং রক্তমদির চক্ষুদুটি ক্রূর ও শীতল। সেইদিকে তাকিয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল বিশুদ্ধকীর্তির। সেই নাগিনীর প্রতিটি গাঢ় হিসহিসানি যেন পাতালের বুক থেকে, নরকের আগুন থেকে, সর্বনাশের গর্ভ থেকে উঠে আসছে।

আতঙ্কিত এবং স্তম্ভিত বিশুদ্ধকীর্তির দিকে তাকিয়ে প্রকাশচন্দ্র বললেন, 'বিশ্বাস করুন আচার্য, আমি চাইনি এই দৃশ্য আপনি দেখুন। কিন্তু কিছু করার নেই। এখন আর ফেরার পথ নেই আমাদের।'

বিশুদ্ধকীর্তির কণ্ঠা দুবার ওঠানামা করল। কোনও স্বর ফুটল না।

উঠে দাঁড়ালেন প্রকাশচন্দ্র। সেই কালনাগিনী উদ্ধত ফণা তাঁর সমান উচ্চতার। তিনি বাম হাতটি নাগিনীর ফণার উপর স্নেহভ'রে রাখলেন। বললেন, 'আজ আর সত্যিই আমাদের ফেরার পথ নেই আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি। আমাদের স্বপ্ন, পরিকল্পনা, যা আমি আর রানি এতদিন ধরে গভীর সংগোপনে লালন করেছি, সবই আজ বিপন্ন। আমার গণনা বলছে, একটা চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। আর কালই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ।' সামান্য থামলেন প্রকাশচন্দ্র। ইত্যবসরে একবার জিতসেনের দিকে চাইলেন বিশুদ্ধকীর্তি। নিঃসাড়, নিস্পন্দ দেহ।

'তাই আজই এই অতি বিশেষ, অতিগূঢ় চক্রের আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছি। এর নাম মহানাগিনীচক্র। রানি পরবর্তী অষ্টপ্রহর এই মহানাগিনী অবতারে অধিষ্ঠান করবেন, এই দেহে বা মনুষ্যদেহে। এর মধ্যে তিনি অজেয়া, অযোধ্যা, অপরাজিতা। এই অষ্টপ্রহরের মধ্যে তাঁকে বিনাশ করতে পারে এমন মানুষ, মন্ত্র বা শক্তি ত্রিজগতে নেই।

'কিন্তু সেই পথে এখনও কিছু ক্রিয়া বাকি।

'এই মহানাগিনীরূপ ধারণ করতে হলে একটি বিশেষ অর্ঘ্যের প্রয়োজন হয়। তবেই নাগিনীক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।'

এতক্ষণে বিশুদ্ধকীর্তির স্বর ফুটল। স্খলিতস্বরে বললেন, 'কোন অর্ঘ্য প্রভু?'

স্থির চোখে বিশুদ্ধকীর্তিকে দেখলেন প্রকাশচন্দ্র। নাগিনীর ফণা আরও উচ্চ, আরও স্থির, নিষ্কম্প হিসহিসানির শব্দ হয়ে উঠল আরও তীব্র।

'অনুগত...'

নাগিনীর মুখগহ্বর উন্মুক্ত হল। আদিম জান্তব গন্ধ অসাড় করে দিল বিশুদ্ধকীর্তির নাসারন্ধ্র।

'ভৃত্যের...'

ফণা সামান্য পশ্চাদগামী হল।

'দেহকাণ্ড।'

আকস্মিক বিদ্যুৎঝলকে নাগিনীর ফণা নেমে এল স্থির এবং নিস্পন্দ জিতসেনের উপর। পরমুহূর্তেই ফণাটি ঊর্ধ্বমুখী হল। বিশুদ্ধকীর্তি বিস্ফারিত নেত্রে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখলেন। নির্মল আকাশে চতুর্দশীর চন্দ্রমা।

তার প্রেক্ষাপটে কোনও এক আদিম মহাকায় মহানাগ উদরসাৎ করছে তার শিকার। সেই উর্ধ্বোত্থিত নাগমুখে ধীরে ধীরে জিতসেনের মাথা, শরীর এবং শেষে পা'দুখানি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই অবিশ্বাস্য অতিলৌকিক দৃশ্য দেখে হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগল বিশুদ্ধকীর্তির। মনে হল যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন তিনি। তাঁর স্নায়ু আর সুস্থ নেই, তাঁর চৈতন্য বশে নেই।

সেই নাগিনী জিতসেনকে গ্রাস করে কুণ্ডলীকৃত হয়ে বসল। নিমীলিত হল তার ফণা।

প্রকাশচন্দ্র এবার ধীরেসুস্থে এসে বসলেন বিশুদ্ধকীর্তির সামনে। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'রানি অবশ্য আপনাকেই ভোগ হিসেবে পছন্দ করেছিলেন আচার্য। কিন্তু আমিই আপত্তি করলাম। কেন জানেন?'

বিহ্বলচক্ষে চেয়ে রইলেন বিশুদ্ধকীর্তি।

'কারণ আনুগত্য প্রশ্নহীন নয় এমন ভৃত্য মহারানির ভোগ হতে পারে না।'

বিশুদ্ধকীর্তির ওষ্ঠ কম্পিত হল মাত্র।

'মল্ল সিংহোদরকে তো নিশ্চয়ই চেনেন আচার্য। শত হোক, কুমার পদ্মসম্ভবের প্রিয়পাত্র। আপনাদেরও প্রিয়পাত্র। আপাতত তার শরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আমাদের সেবকবাহিনী সামান্য ব্যস্ত আছে।'

'অনেক কথাই অবশ্য সে আমাদের জানিয়েছে। তবে যে অবস্থায় তাকে দেখে এসেছি, খুব সম্ভবত বাকি কথা বলার অবস্থায় সে আর নেই। অগত্যা, রানির ভোগ হওয়ার সৌভাগ্য আর আপনার কপালে জুটল না।'

এই বলে স্মিতহাস্যে বিশুদ্ধকীর্তির সামনে এসে বসলেন প্রকাশচন্দ্র। বললেন, 'নিন, প্রথম থেকেই শুরু করুন দেখি। তারা এই মুহূর্তে সদলবলে কোথায় আছে?'

এতক্ষণ পর এই প্রথম স্বর ফুটল আচার্য বিশুদ্ধকীর্তির। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'শালিবন বিহারে।'

'আপনি সঠিক বলছেন এই পরিকল্পনায় বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই?'

'না যোগীবর, এর থেকে প্রকৃষ্ট সুযোগ আর পাবেন না। কাল পূর্ণিমা, মহারানির কামনাতৃপ্তির দিন। কাল প্রভাত থেকেই ঘোষকের দল কর্মান্তবাসক জুড়ে সমর্থ যুবকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। এদিকে প্রকাশচন্দ্র আজ প্রভাতে রওনা দেবেন হরিকেলের উদ্দেশে। আপনার পরিকল্পনায় সৈন্যদলের বৃহদংশ অন্যত্র ব্যস্ত। অর্থাৎ কর্মান্তবাসক প্রকৃতপক্ষে অরক্ষিত। এই সুযোগে মহাবীর গোপাল রাজ্যার্থী হয়ে মহারানির শয়নকক্ষে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করুন। আর আমাদের বাকি সহকর্মীরা না হয় কর্মান্তবাসকের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করুন।'

রাত্রির শেষ প্রহর। শালিবন বিহারের গুপ্তকক্ষে অধিবেশনে বসেছেন বিপ্লবের সমস্ত অধিকর্তারা। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি একটু আগেই ফিরেছেন চক্রানুষ্ঠান থেকে। এসেই তিনি এই পরিকল্পনা জানিয়েছেন। তাঁর মতে, কালই চূড়ান্ত আক্রমণের প্রকৃষ্টতম তিথি। তিনি চান কালই যেন চূড়ান্ত আক্রমণ করা হয়।

সমস্ত কিছু মনে মনে একবার পর্যালোচনা করে নিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তারপর বপ্যটের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আর্য বপ্যট, আপনার বাহিনী প্রস্তুত তো?'

অরণ্যবাসী কিরাত এবং শবরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি গুপ্তবাহিনী প্রস্তুত করেছেন বপ্যট। তাদের কর্মক্ষমতা শান্তঘোষ এবং আনন্দগুপ্ত বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে একবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ লোকেশ্বর, আমরা প্রস্তুত।'

'কুমার জয়াপীড়, কুমার পদ্মসম্ভব, আপনাদের কী মত?'

জয়াপীড় বললেন, 'আমি অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত। আপনার অনুমতি পেলেই হয়।'

পদ্মসম্ভব ইতস্তত করছিলেন। সেই দেখে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, 'কিছু বলবেন কুমার?'

পদ্মসম্ভব বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন আপনারা, আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে—আমাদের আরও ধৈর্য ধরা উচিত। কোথাও যেন কিছু একটা ঠিক হচ্ছে না।'

'কী ঠিক হচ্ছে না আর্য?'

'বেশ কিছু লক্ষণ সুসঙ্গত নয়। আপনার কি মনে হচ্ছে না লোকেশ্বর, যে সব কিছুই বড় সহজে হয়ে যাচ্ছে? মনে হচ্ছে না, যেন বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা অতি যত্নসহকারে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে?'

'এমত মনে হওয়ার কারণ?'

'আছে যোগীশ্বর, এবং তার স্বপক্ষে আমার কিছু যুক্তিও আছে।'

'যেমন?' প্রশ্ন করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ।

'প্রথমত, প্রকাশচন্দ্র জানেন যে বস্তুতপক্ষে তাঁর রাজধানী অরক্ষিত। বিদ্রোহীরা যে শুধু প্রবল প্রতাপে উদ্যত তাই নয়, তারা কর্মান্তবাসকেই কোথাও আত্মগোপন করে আছে। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, যে-কোনওদিন, যে-কোনও মুহূর্তে আঘাত নেমে আসতে পারে। তবুও তিনি প্রভাতে কর্মান্তবাসক ত্যাগ করছেন? এত আশঙ্কা মাথায় নিয়েও?'

কেউ কোনও উত্তর দিলেন না। বিশুদ্ধকীর্তির বুক কাঁপছে।

'দ্বিতীয়ত, মল্ল সিংহোদরের কাল থেকে কোনও সন্ধান নেই। আমি জেনেছি, গতকাল সন্ধ্যাবেলার সামান্য পূর্বে সে তার গুপ্তগৃহ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। কারণ অজানা। তারপর থেকে থেকে তার আর কোনও সন্ধান নেই।

'তৃতীয়ত, আচার্য বুদ্ধগুপ্তরও কোনও সংবাদ নেই অনেকদিন। সে বিষয়ে আমরা অনেকেই অন্ধকারে। তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর একজন। যদি বুদ্ধগুপ্ত এবং সিংহোদর ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষের দ্বারা ধৃত হয়ে থাকেন, তবে?'

সভাস্থ প্রত্যেকে চুপ করে রইলেন। বিশুদ্ধকীর্তির হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হল।

'চতুর্থত, আমরা জানি যে মহারানি সপ্তরাজন্য পরিবেষ্টিত হয়ে এই বঙ্গভূমি শাসন করেন। তাঁদের মধ্যে প্রকাশচন্দ্রকে বাদ দিলে বাকি থাকেন ছয় জন। তাঁদের মধ্যে আচার্য স্বয়ং একজন। বাকি পাঁচজনের মধ্যে শান্তঘোষ আর আনন্দগুপ্তর নিহত হওয়ার সংবাদ আমরা জানি। কিন্তু বাকি তিন জন, অমিতাভভট্ট, অগ্নিমিত্র এবং জিতসেন কোথায় আছেন, কী করছেন, সে সংবাদ আমরা জানি না। যদি শত্রুপক্ষের এই আপাত উদাসীনতা কোনও ষড়যন্ত্র হয়? যদি এমন হয় যে তাঁরা অপেক্ষা করে আছেন আমাদের এই ভুল পদক্ষেপের জন্য?'

পদ্মসম্ভবের বক্তব্য শেষ হলে সভাস্থলে অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য নেমে এল। প্রত্যেকে পদ্মসম্ভবের প্রতিটি বক্তব্যের যুক্তি বিচার করে দেখছেন।

মৃদু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন বিশুদ্ধকীর্তি, 'মল্ল সিংহোদরের অন্তর্ধানের ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। তবে কুমার পদ্মসম্ভবের অন্য তিনটি প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে।

'আপনারা নিশ্চয়ই প্রকাশচন্দ্রের একদা ঘনিষ্ঠতম সহযোগী চারুদত্তর ব্যাপারে অবগত আছেন। রাজমাতা কাঞ্চনাদেবীর ব্যাপারে বিশদে তিনিই জানিয়েছিলেন আমাদের। জানিয়েছিলেন তাঁকে উদ্ধারের পথও।

'আজ সন্ধ্যায় হরিকেল থেকে এক বিশেষ বার্তাবহ কর্মান্তবাসকে এসে পৌঁছেছে। সে জানিয়েছে, কয়েকদিন পূর্বে চারুদত্তর দেহাবসান ঘটেছে। তাঁর উপাধান থেকে একটি গোপন ভূর্জপত্র উদ্ধার হয়েছে। রক্ষীদলের মনে হয়েছে পত্রটি প্রকাশচন্দ্রের উদ্দেশে, এবং অত্যন্ত গোপন বিষয়ে লিখিত। সেই সংবাদ পেয়েই প্রকাশচন্দ্র দ্রুত হরিকেল রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

'সপ্তরাজন্য'র অপর তিনজনের ব্যাপারে কুমার পদ্মসম্ভব যে প্রশ্ন তুলেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং প্রাসঙ্গিক। অত্যন্ত গোপন সূত্রে আমি সংবাদ পেয়েছি যে অগ্নি মত্র, অমিতাভভট্ট, এবং জিতসেন, তিনজনই

এইমুহূর্তে মৃত। কোথায়, কেন, কীভাবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি দেব না, দেওয়া সম্ভব নয়। আপাতত আমার কথা সত্য বলে মেনে নিতে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে অনুরোধ করছি।'

আচার্য বিশুদ্ধকীর্তির বক্তব্য শেষ হলে সভাস্থলে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। মনে হল প্রত্যেকে শেষ সংবাদটির অভিঘাত সম্যকরূপে গ্রহণের চেষ্টা করছেন।

জয়াপীড় স্বভাবে কিঞ্চিৎ চঞ্চল। সবার প্রথমে তিনিই প্রশ্ন করলেন, 'কী বলছেন কী আচার্য? এই তিনজন মৃত? আপনি সত্য বলছেন?'

বিশুদ্ধকীর্তি কঠিন দৃষ্টিতে জয়াপীড়ের দিকে তাকালেন, 'আমার আহরিত সংবাদের যাথার্থ্যতা নিয়ে কি আপনার মনে কোনও শঙ্কা আছে কুমার?'

জয়াপীড় অপ্রতিভ হলেন, 'না, তা নয়। সংবাদটি এতই আকস্মিক যে সামান্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। প্রগলভতা মার্জনা করবেন।'

বপ্যট বললেন, 'কিন্তু আচার্য, সেক্ষেত্রে তো বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। যে সংবাদ আপনি জানেন, আশা করি তা প্রকাশচন্দ্রেরও অগোচরে নেই। সপ্তরাজন্য'র মধ্যে পাঁচজন মৃত, রাজধানী প্রকৃতপক্ষে অরক্ষিত, তা সত্ত্বেও তাঁকে আজই কর্মান্তবাসক ত্যাগ করতে হল?'

বপ্যটের প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহের সুরটি বিশুদ্ধকীর্তির কানে বাজল। তাঁর হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ বর্ধিত হয়েছে। অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি যা সত্য বলে জানি তাই আপনাদের জানালাম, আর্য বপ্যট। আমার মতে কালই চূড়ান্ত আঘাত হানবার প্রকৃষ্ট সময়। এখন যোগীশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ যা আদেশ করেন।'

সভার এক প্রান্ত থেকে দেদ্দদেবীর তরুণীকণ্ঠ ভেসে এল, 'আচার্য, আপনার প্রিয়তম শিষ্য বুদ্ধগুপ্ত কোথায়?'

সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন আচার্য, 'এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করছি আর্যা দেদ্দদেবী। কারণটি হৃদয়বিদারক।'

মন্দর্ভা কৌতূহলী হলেন, 'কী কারণ আচার্য?'

'বুদ্ধগুপ্ত পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাকে আমি বিশেষ স্নেহ করতাম। আমার অবর্তমানে সেই হতো শালিবন বিহারের আচার্য। কিন্তু, সে কামনার আগুনে নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছে।' এত অবধি বলে সামান্য থামলেন বিশুদ্ধকীর্তি। তারপর গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, 'শুনেছি ভাঁড়ুদত্তর শৌণ্ডিকালয়ের মায়া নামের জনৈক বারাঙ্গনার সঙ্গে সে পলাতক। সংবাদ পেয়েছি তারা বারেন্দ্রীর দিকে গেছে।'

জয়াপীড় হতাশার সুরে বললেন, 'যাহ, মায়া চলে গেল।' কথাটি বলেই জয়াপীড়ের চোখ পড়ল মন্দর্ভার দিকে। তিনি কঠিন চোখে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। ঢোঁক গিলে চুপ করে গেলেন জয়াপীড়।

কুমার পদ্মসম্ভব এবং দেদ্দদেবী মুখে স্মিত হাসি দেখা গেল। পদ্মসম্ভব ছদ্ম সহানুভূতির সুরে বললেন, 'দুঃখ কোর না ভাই। বঙ্গদেশে এমন সুস্তনী কিঙ্কিণীর অভাব নেই। আমি নিজেই কয়েকজনকে চিনি। তাদের সঙ্গে নাহয় পরে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।' বলেই তিনি হাসিমুখে দেবী মন্দর্ভার দিকে তাকালেন। মন্দর্ভার দৃষ্টি স্থির, কঠিন এবং অগ্নিবর্ষী।

দেদ্দদেবী একবার কুমার পদ্মসম্ভব আর একবার ভিক্ষুণী মন্দর্ভার দিকে তাকালেন। তারপর বস্ত্রাঞ্চল মুখে দিয়ে হাসি চাপলেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথ বিরক্তস্বরে বললেন, 'এই কি পরিহাসের সময়? এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি, আর আপনাদের এই প্রগলভ আচরণ?'

সভাস্থলে গাম্ভীর্য ফিরে এল। বপ্যট বললেন, 'লোকেশ্বর, তাহলে শেষাবধি কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি আমরা? আপনার কী অভিমত এই পরিকল্পনার ব্যাপারে?'

উঠে দাঁড়ালেন মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন বাতায়নের সামনে। তাঁর দিকে উৎকণ্ঠিত মুখে তাকিয়ে রইলেন কয়েকজন নারী এবং পুরুষ, যাঁরা নিজেদের জীবন পণ করে নেমেছেন এই মহাসংগ্রামে। মুঠোয় ধরেছেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর উদ্যত ফণা। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসায় উৎসর্গ করেছেন নিজেদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ--সব কিছু।

স্বচ্ছ আকাশের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়েছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। রাত্রি শেষপ্রায়। চতুর্দশীর চন্দ্রজোছনা এখন ম্লান। লালিম্ববন পাহাড়ের ঘনকৃষ্ণ অরণ্য সেই দুগ্ধধবল আলোয় ভারি আশ্চর্য, ভারি মায়াবী দেখাচ্ছে।

সেইদিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। এতদিন ধরে বহু প্রযত্নে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তিনি, প্রস্তুত করেছেন এক মহাবিদ্রোহের পটভূমি, কালই হয়তো তার অন্তিমক্ষণ উপস্থিত। এই দুখিনী, বঙ্গদেশের শতাব্দীব্যাপী দুঃশাসনকাল হয়তো কালই শেষ হবে।

কিন্তু যদি না হয়? যদি তাঁদের প্রস্তুতিতে কোথাও কোনও ত্রুটি থেকে থাকে? যদি তাঁদের পরিকল্পনায় এমন কোনও বিচ্যুতি থেকে যায়, যা তাঁরা লক্ষ করেননি?

পিছনে দাঁড়ান শ্রান্ত, উদ্বিগ্ন এবং উৎকণ্ঠিত মুখগুলি মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল মৎস্যেন্দ্রনাথের। এদের অধিকাংশই তাঁর সন্তানসম, কেউ বা তাঁর বয়স্য সহযোগী। তাঁর একটি সিদ্ধান্ত, তাঁর একটি হ্যাঁ বা না এদের এতদিনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। নিমেষে নস্যাৎ করতে পারে এদের এতদিনের উদ্যোগ।

তাঁর সিদ্ধান্ত। একমাত্র তাঁরই সিদ্ধান্ত।

দুই কর যুক্ত করলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। পদ্মপলাশতুল্য চোখ দুটি নিমীলিত হল। ভগবান তথাগত বলে গেছিলেন আত্মদীপ ভব, আত্মশরণ ভব, অনন্যশরণ ভব। নিজেই নিজের প্রদীপ হয়ে জ্বলে ওঠো, নিজেই নিজের আত্মশক্তির শরণ নাও। মানুষ নিজেই এক অনন্তশক্তির উৎস। সে চাইলে নিমেষে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবনের অধীশ্বর হতে পারে। মানুষই পারে মানুষের দুঃখকষ্ট মোচন করতে। মানুষই পারে দুর্দম শত্রুর কবল থেকে জীবন পণ রেখে জননীকে, জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে। কোনও ঐশী বা দৈবশক্তি নয়, মানুষই মানুষের একমাত্র আশ্রয়, শেষ অবলম্বন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত আগতপ্রায়। পুবদিগন্তে আবছায়া আলোর খেলা। জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যদেব উদিত হতে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে যুক্তকর মাথায় ঠেকালেন তিনি। হে আদিনাথ, হে পূর্ণেশ্বর, হে আমার বৈরাগ্যসুন্দর, তোমার সন্তানদের তুমি আশীর্বাদ করো। তাদের স্বপ্নগুলি যেন সার্থক হয়। এই জগতের সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত পাপ, সমস্ত অশিব পেরিয়ে তারা যেন জয়যুক্ত হয়, সদ্ধর্মপথযাত্রী হয়। হে নাথ, অপাবৃত হোক তোমার কল্পতরু মূর্তি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু।

ঘুরে দাঁড়ালেন মহাযোগীশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ। যে বরাভয়মূর্তি দেখে আসমুদ্রহিমাচল তাঁর শরণাগত হয়েছে, সেই মূর্তি ধারণ করলেন তিনি। বামহাতখানি পদ্মমুদ্রায় বক্ষলগ্ন। দক্ষিণহস্তে মৃগমুদ্রা। তার তর্জনী এবং কনিষ্ঠা প্রসারিত, অন্যান্য অঙ্গুলিগুলি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বদ্ধ। চোখ দু'খানি অবলোকিত।

উপস্থিত সভ্যরা শিহরিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা প্রণত হলেন মহাযোগী লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে। মৎস্যেন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমাদের জয় হোক।'

সভ্যরা হর্ষোল্লাস করে উঠলেন। কালই সেই দিন। শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় থেকে বঙ্গদেশের মুক্তির দিন।

বজ্রযোগিনী মন্দিরের সামনে ঘোষক উপস্থিত হতেই তার চারিপাশে ভিড় করে এল অপেক্ষমান জনতা। যদিও তারা জানে, কী ঘোষণা করা হতে চলেছে। তারা জানে যে এই ঘোষণার ফলাফল কী, জানে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তা সত্বেও এই পাক্ষিক ঘোষণা শোনার জন্য উৎসুক দর্শকের অভাব হয় না।

এককালে এই পাক্ষিক ঘোষণার পর পরেই কোনও এক বলিষ্ঠ যুবক এগিয়ে যেত ঘোষকের দিকে, ব্যক্ত করত তার মনোবাঞ্ছা। তার দু'চোখে থাকত স্বপ্ন, হৃদয়ে দুঃসহ স্পর্ধা, আকাঙ্ক্ষায় দুর্বার উচ্চাশা। সে নিশ্চিত থাকত যে মাত্র একরাত মহারানিকে তৃপ্ত করতে পারলেই এই বঙ্গদেশের অধীশ্বর হবে সে।

তখন উপস্থিত জনগণ উত্তেজনায় উদ্বেলিত হতো, উৎসাহিত হতো। ভাবত, সত্যিই বুঝি এই দেশে এমন কেউ আছে, যে নিজ পৌরুষবলে উদ্ধার করবে এই দীর্ণ বঙ্গভূমি। এমন কেউ আছে, যার বাহুবলে ভর করে উঠে দাঁড়াবে এই ছিন্নক্ষিপ্ত দেশ। তার দৃপ্ত শাসনের অধীন হবে সমতট থেকে পৌণ্ড্র, হরিকেল থেকে তাম্রলিপ্ত।

কিন্তু দিনে দিনে সেই আশা ক্ষীণ হতে হতে কবেই মিলিয়ে গেছে। এখন প্রতি পক্ষকালে ঘোষক আদেশানুসারে বজ্রযোগিনী মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায় বটে, উপস্থিত জনতাও অভ্যাসানুসারে তার সামনে এসে দাঁড়ায়; কিন্তু এখন তাদের উপস্থিতির সঙ্গে এক অর্থহীন তিক্ত নৈর্ব্যক্তিকতা মিশে গেছে।

বহুকাল হল ঘোষকের ঘোষণা শুনে আর কোনও স্পর্ধিত যুবক আসে না। সবাই জেনে গেছে এই অর্থহীন প্রচেষ্টার ফলাফল কী। এখন তাই জনসাধারণ আসে শুধুমাত্র রঙ্গ দেখতে। তারাও জানে, ঘোষকও জানে—এই ঘোষণার কোনও মূল্য নেই। কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে না ওই নাগিনীর ভোগ হওয়ার জন্য।

হ্যাঁ, ভোগ। এই অনুষ্ঠান এখন কেবলমাত্র বঙ্গদেশের মহারানির কামভোগের আয়োজন ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন রাজসেবকের দল প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে হিংস্র শ্বাপদের মতো শিকার করে বেড়ায় সমর্থ কিশোর বা যুবকের। তারা জানে যে, প্রতি পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যায় বঙ্গদেশের মহারানির একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ-শরীরের প্রয়োজন হয়। তারা জানে যে, রানির পূর্ণ কামতৃপ্তির পর রাজ্যশাসনের অধিকারের আশ্বাস কেবল একটি ফাঁদ মাত্র, মোহজাল। যেভাবে নারী ঊর্ণনাভ কামতৃপ্তির পর, উদ্দেশ্যসাধনের পর, তার পুরুষসঙ্গীটিকে উদরসাৎ করে, সেভাবেই এই কালনাগিনী তার এক রাতের পুরুষসঙ্গীটির জীবনদীপ নির্বাপিত করেন।

ঘোষক তার অভ্যাসানুসারে উচ্চনাদে ঢোলক বাজাতে লাগল। তার পাশে বেশ কয়েকজন রাজসেবক। তাদের শীতল ও সতর্ক চোখগুলি যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। জনতা অপেক্ষা করতে লাগল বহুশ্রুত বাক্যগুলির জন্য।

বেজে উঠল দ্রিমি দ্রিমি রব!

'শোনো শোনো শোনো বঙ্গবাসী। শ্রীমন্মাহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্রের আদেশানুক্রমে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, বঙ্গদেশের রাজসিংহাসন একজন সম্রাটের জন্য উৎসাহোন্মুখ। বঙ্গদেশের মহামান্যা মহারানি কামমতি হয়েছেন। যে সক্ষম যুবা একরাত্রের জন্য মহারানিকে পূর্নতৃপ্তির সন্ধান দিতে পারবে, সেই হবে বঙ্গদেশের পরবর্তী সম্রাট। স্বয়ং বঙ্গসম্রাজ্ঞী তাঁর অগ্রমহিষী হবেন, রাজসচিব হবেন তাঁর বিশেষ কিঙ্কর। এই আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী বঙ্গদেশ তাঁর শাসনাধীন হবে। বঙ্গদেশের অনন্তসামন্তচক্র হবেন তাঁর আজ্ঞাবহ বশংবদ দাস। শোনো শোনো শোনো, তোমাদের মধ্যে যাঁরা এই সৌভাগ্যের অংশীদার হতে চাও, তাঁরা এই মুহূর্তেই আমাদের সামনে এসো। এই সুযোগ নষ্ট কোরো না, এই আহ্বানের পূর্ণ উপযোগ...'

একটি বলিষ্ঠদেহী তরুণ ভিড় ঠেলে সামনে এসে বলল, 'ঘোষক, আমি এসেছি। আমি এই সুযোগের সুবিধা নিতে উৎসুক। আমাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে চলো।'

ঘোষক এতই অবাক হয়ে গেল যে তার বাক্যস্ফূর্তি হল না। তার স্মরণে নেই শেষ কবে কোন আত্মঘাতী মূর্খ এই প্রস্তাবে আগ্রহ দেখিয়ে এগিয়ে এসেছে। সবাই জানে এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর পথে চলে আসা। সে যুবকের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

যুবকের বামপার্শ্বে এক খর্বকায় তরুণী। তার খরতীব্র চোখ দর্শকের অস্বস্তি জাগায়। তরুণীর ঠিক পিছনে এক পিঙ্গলকেশ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সুদেহী সুপুরুষ যুবা। তার সামান্য পেছনে এক যুবতী। যুবতীর চেষ্টাকৃত ছদ্মবেশ তাঁর অনুপম স্নিগ্ধলাবণ্যকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর শান্ত চোখদুটি দেখে বর্ষাশেষের দিঘির কথা মনে পড়ে। যুবতীটির ঠিক ডানপাশে এক দৃপ্তদর্শন তাম্রাভবর্ণ পুরুষ। তাঁর সবল সুঠাম দেহে, পদ্মপলাশতুল্য আঁখিতে, গর্বোদ্ধত গ্রীবায়, এবং সতর্কচঞ্চল দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, ইনি সামান্য কেউ নন।

ঘোষকের সামান্য পিছনে দুজন মানুষ দাঁড়িয়েছিল। তাদের আপাত উদাস মুখে এখন খরতীক্ষ্ণদৃষ্টি। প্রথমজন প্রশ্ন করল, 'ইনিই গোপালদেব?'

মাধব উত্তর করল, 'হ্যাঁ রঙ্গলাল, ইনিই গোপালদেব।'

'কী করে বুঝলে?'

'মূর্খের মতো প্রশ্ন করো না। এই মহাবল পুরুষটিকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কমলাঙ্ক গ্রাম সন্নিহিত অরণ্যে ইনি একাই আমাদের সংহার করেছিলেন। কোনওমতে প্রাণ হাতে পালিয়ে এসেছিলাম। আমি ওঁকে চিনব না?'

'কিন্তু উনি তো একা নন মনে হচ্ছে। ওই যে সুদেহী তাম্রবর্ণ পুরুষটিকে দেখছ, ওঁকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। উনিই কুমার পদ্মসম্ভব।

'কিন্তু ওঁর আশেপাশে বাকি যাঁরা আছেন তাঁদের চেন?'

'পদ্মসম্ভবের পাশে যিনি আছেন, খুব সম্ভবত ভিক্ষুণী মন্দর্ভা। আর ওই পিঙ্গলকেশী গৌরবর্ণ পুরুষটি কুমার জয়াপীড় ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন না। কুমার গোপালদেবের পাশে যে তরুনীটি আছে তাঁকে চিনি না। গুপ্তচরেরা সংবাদ এনেছে, হরিকেলের মহামাত্য জয়নাথের সেই অপহৃতা ভাগিনেয়ী নাকি অলৌকিক মন্ত্রবলে জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে, যোগ দিয়েছে এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে। এই তরুণী জয়নাথের ভাগিনেয়ী হলে আশ্চর্য হব না।'

রঙ্গলাল নিমেষে উত্তেজিত হল, 'তাহলে তো কুচক্রীরা প্রায় সবাই একই সঙ্গে এখানে উপস্থিত। রাজসেবকদের ইঙ্গিত করা হোক। এই মুহূর্তে এদের বন্দি করি।'

মাধব দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ধৈর্য ধরো মিত্র। এই আত্মঘাতী হঠকারিতার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রথমত এরা নিরস্ত্র আসেনি এখানে। এদের প্রশিক্ষিত গুপ্তবাহিনীও আশেপাশেই আছে। তারা মুহূর্তে প্রত্যাঘাত করবে। তাতে গোপালদেবকে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

'দ্বিতীয়ত, আচার্য শান্তরক্ষিত এবং মহাবল বপ্যট সহ রাজদ্রোহের কাণ্ডারীদের অন্য অনেকেই এখানে অনুপস্থিত। তাদের জন্য প্রকাশচন্দ্র অন্য পরিকল্পনা করেছেন।

'তৃতীয়ত, প্রকাশচন্দ্রের আদেশ, পুরো ক্রিয়াকাণ্ডটিই যেন নিশ্চুপে সাধিত হয়। তিনি চান না এই নিয়ে কোনও উচ্চকিত গোলযোগ হোক।'

রঙ্গলাল চুপ করে গেল।

গোপালদেবকে সামান্য কৃশ এবং দুর্বল দেখাচ্ছিল। তিনি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তাঁর পাশে দাঁড়ানো তরুণীটি সবার অলক্ষ্যে তাঁর হাত চেপে ধরল, 'কুমার...'

গোপালদেব কিছু বললেন না, দেদ্দদেবীর হাতখানি দুর্বলহাতে চেপে ধরলেন।

'সাবধানে..'

'জানি আর্যা...'

'আর্য কমলশীলের আনা যন্ত্রটি...'

'সঙ্গে আছে আর্যা। ও নিয়ে চিন্তিত হবেন না।'

দেদ্দদেবীর হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন গোপালদেব। তর্জনী থেকে তর্জনীর ছোঁয়াটুকু মিলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে দেদ্দদেবী পুনরায় চেপে ধরলেন গোপালদেবের অঙ্গুলি। গোপালদেব থমকে গেলেন।

'কুমার!'

'বলুন দেবী!'

ওই কামুক ডাকিনীর সঙ্গে যেন...'

ত্বরিতে দেদ্দদেবীর দিকে ফিরে তাকালেন গোপালদেব। সেই দৃষ্টিতে কতখানি কৌতুক, কতখানি স্নেহ, আর কতখানি ভালোবাসা মিশে ছিল বলা অসম্ভব। দু'খানি পদ্মনয়ন চেয়ে রইল গোপালদেবের সতৃষ্ণ আঁখির দিকে।

ফিসফিস করে গোপালদেব বললেন, 'আমার দেহ, মন, আত্মা আপনারই দেবী, শুধু আপনারই। ওই বিদেশি নাগিনীর কী সাধ্য, আপনার নৈবেদ্য অপবিত্র করে?'

তর্জনি হতে তর্জনি বিযুক্ত হল। গোপালদেব ধীরপদে এগিয়ে গেলেন ঘোষকের দিকে।

নিজের শয্যায় স্থির এবং নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলেন প্রকাশচন্দ্র। তাকিয়ে ছিলেন নিজের প্রসারিত করতলের দিকে।

ঘরটি আশ্চর্যজনকভাবে অতি সাধারণ; প্রসাধন এবং আভরণহীন। বঙ্গদেশের সর্বময় কর্তা যে এরকম নিরলঙ্কার, নিরাভরণ ঘরে থাকতে পারেন সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

প্রকাশচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবনে বিশ্বাস করেন। তাঁর কাছে জাগতিক জীবনের যাবতীয় উল্লাস, আড়ম্বর, বিলাস, ব্যসন সবই অর্থহীন। তাঁর জীবনের একটিই উদ্দেশ্য, একটিই লক্ষ্য, বঙ্গভূমির সামূহিক সর্বনাশ। তিনি চান না কোনও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আহ্বান তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করুক। তিনি জানেন—তাঁর পুরস্কার ইহজীবনে নয়, লব্ধ হবে জন্মমৃত্যুর আবর্তনচক্রের চংক্রমণে।

নিজের দুই করতলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন প্রকাশচন্দ্র। তাঁর করতল প্রশস্ত ও সুন্দর। শুক্র এবং বৃহস্পতির স্থান সুউচ্চ। রবি অতি বলশালী, চন্দ্রমা ম্রিয়মান। শনি স্তিমিত এবং বক্রী। মঙ্গলের স্থান উচ্চ এবং দৃশ্যত রক্তিম।

কিন্তু করতল নয়, প্রকাশচন্দ্র তাকিয়েছিলেন তাঁর আঙুলগুলির দিকে। দুই হাতে দশটি আঙুল। বৃদ্ধাঙ্গুলি বাদ দিলে আটটি।

সপ্তরাজন্য আর মহারাজ্ঞী। আটজন। আটটি আঙুল।

নিজের হাতের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে ছিলেন প্রকাশচন্দ্র। দুই হাতের তর্জনীদুটি বাদে বাকি ছয়টি আঙুল ঘনকৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে।

প্রকাশচন্দ্র জানেন—এর অর্থ কী। ওই ছয় জন মৃত। এই মুহূর্তে একমাত্র তিনি আর রানি, এই ছাড়া তাঁর ঘনিষ্ঠবৃত্তের আর কেউ বেঁচে নেই। একমাত্র বিশুদ্ধকীর্তি ছাড়া। বিশুদ্ধকীর্তি!

একটি তিক্ত হাসির রেখা খেলে গেল প্রকাশচন্দ্রের মুখে। শত্রুর শেষ রাখেন না তিনি। তাঁর কাছে বিশুদ্ধকীর্তি ইতিমধ্যেই মৃত। আজকের রাতটিই আচার্যর জীবনের শেষ রাত।

রাজমাতা ইয়ু জেতিয়ান যে ক'টি অতি গুহ্য নাগসিদ্ধির অধিকার দিয়েছিলেন প্রকাশচন্দ্রকে, এইটি তার অন্যতম। ঘনিষ্ঠবৃত্তের প্রাণচিহ্ন ধারণের অধিকার। সপ্তরাজন্য আর রানি নিজে, যে আটজন মিলে এই প্রকাণ্ড মাৎস্যন্যায়ের আয়োজন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রাণচিহ্ন নিজ অঙ্গুলিদর্পণে ধারণ করেন তিনি।

নিজের হাতের প্রায় শুকিয়ে আসা ছ'খানি কালো আঙুলের দিকে নিরাসক্ত ভাবে চেয়ে ছিলেন প্রকাশচন্দ্র। এই মুহূর্তে শুধু তিনি আর রানি, এই দুজনেই বেঁচে আছেন নাগমাতা ইয়ু জেতিয়ান আর তাং রাজবংশের

শতাব্দীপ্রাচীন স্বপ্ন সফল করার জন্য। তাঁদের পাশে আর কেউ নেই।

এই যুদ্ধ তাঁদের জিততেই হবে। যেনতেন প্রকারেণ।

দ্বারে সামান্য শব্দ হল। কেউ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। প্রকাশচন্দ্র জানেন কে সে।

'বলো মাধব।'

দ্বারপ্রান্ত থেকে উত্তেজিত স্বর ভেসে এল, 'গোপালদেব রাজ্ঞীর প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন প্রভু। চূড়ান্ত আক্রমণের আদেশ দেওয়া হোক?'

হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন প্রকাশচন্দ্র। এই আক্রমণ, এই যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করবেন। প্রথম এবং হয়তো শেষবারের মতো।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা অতি সাধারণ। উপস্থিত কারোরই ইচ্ছে ছিল না আহার করার। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ জানেন খালি পেটে যুদ্ধ হয় না।

সমস্ত ব্যবস্থা দেখাশোনা করছিলেন মন্দর্ভা এবং দেদ্দদেবী। দেদ্দদেবীর মুখখানি ছলছল। সবার মুখ গম্ভীর, ভেতরে চাপা উত্তেজনা।

বপ্যট বললেন, 'দুপুরের পর থেকেই তাহলে আক্রমণ শুরু হোক?'

মৎস্যেন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সামনে রাখা অন্নপাত্রটি টেনে নিলেন। প্রথম গ্রাস মুখে তুলতে যাবেন, এমন সময় দরজার কাছে ত্রস্ত পদশব্দ। কারা যেন দৌড়ে আসছে। উপস্থিত সদস্যরা সতর্ক হলেন। জয়াপীড় এবং পদ্মসম্ভব উঠে দাঁড়ালেন। কারা আসছে?

তাঁদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। শালিবন বিহারের দুজন শিক্ষার্থী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে লোকেশ্বর, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

প্রত্যেকে নিমেষের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন। শান্তরক্ষিত ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে?'

'সর্বনাশ হয়েছে আচার্য, আমরা অত্যন্ত কুৎসিতভাবে প্রতারিত হয়েছি। ওরা জেনে গেছে—আপনারা এখানেই আছেন, এই শালিবন বিহারেই। ওরা এদিকেই আসছে।'

'ওরা বলতে কারা?' এগিয়ে এলেন বপ্যট।

'রাজসেবকদল, আর...আর...'

'আর?'

'তাদের নেতৃত্বে আর কেউ না, স্বয়ং প্রকাশচন্দ্র।'

উপস্থিত প্রত্যেকে বিপুলভাবে চমকিত হলেন। পদ্মসম্ভব দ্রুতবেগে এগিয়ে এলেন, তীব্রস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি কোথায়?'

শিক্ষার্থী দুজনের একটু পেছন থেকে কে যেন বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি নেই রাজকুমার। তিনি পালিয়েছেন। সঙ্গে পালিয়েছে তাঁর পোষ্য রক্ষিতাটিও। এবং শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে নিয়ে গেছেন শালিবন বিহারে রক্ষিত ধনসম্পত্তির একটি অতি বিপুল অংশও।'

সবাই তাকিয়ে দেখলেন এসে দাঁড়িয়েছেন শালিবন বিহারের উজ্জ্বলতম শিক্ষার্থী সিদ্ধার্থশর্মা। বিশুদ্ধকীর্তি বা বুদ্ধগুপ্ত'র অবর্তমানে বিহারের যাবতীয় দায়িত্বকর্ম ইনিই নির্বাহ করেন।

পদ্মসম্ভব অক্ষম আক্রোশে সজোরে পদাঘাত করলেন সামনে রাখা ত্রিপদীটির ওপর। সেটি মুহূর্তের মধ্যে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে আছড়ে পড়ল সামনের দেওয়ালে। মন্দর্ভা দ্রুত এগিয়ে এসে পদ্মসম্ভবের হাত ধরলেন।

শান্তরক্ষিতের মুখ পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করল। তিনি ভয়ার্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এবার কী হবে?'

মৎস্যেন্দ্রনাথ চুপ করে ছিলেন। তিনি উত্তরীয়টি কোমরে বাঁধলেন। তারপর শান্ত এবং দৃঢ়স্বরে বললেন, ‘এবার সংগ্রাম হবে ভন্তে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। আজ মুক্তির মন্দিরের সোপানতল আমাদের রক্তে রঞ্জিত হবে। বহু প্রতীক্ষিত সেই সময় আজ এসেছে ভন্তে, প্রস্তুত হন। আর্য বপ্যট, আপনার সেনাদল প্রস্তুত তো?’

‘তারা প্রস্তুত প্রভু। কিন্তু তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছতে কিছু সময় লাগবে। ততক্ষণ রাজসেবক-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে রাখতে হবে আমাদেরই।’

‘কুমার পদ্মসম্ভব? কুমার জয়াপীড়?’

সিংহবিদারী মহাবীর জয়াপীড়ের মুখমণ্ডল আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি প্রকাশচন্দ্রের মহাখড়্গ কোষ হতে নিষ্কাষিত করে বললেন, ‘আদেশ দিন লোকেশ্বর, শত্রুশোনিতে এই মহাখড়্গ স্নান করাই। পিতামহের পাপস্খালন করি। হর হর মহাদেব।’

পদ্মসম্ভব ইতিমধ্যেই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর কোমরে কুঠার এবং দা’ও। পিঠে তূনীর, হাতে নাগাঞ্চিভূমির খর্ব এবং অতি শক্তিশালী ধনু। তিনি শান্তস্বরে বললেন, ‘আহা, কতদিন পর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাব, শত্রুরক্তে স্নান করব, হত্যামদে মাতাল হব। আদেশ করুন লোকেশ্বর, যেন শত্রুঘ্ন হই।’

বপ্যট ধীরেসুস্থে তাঁর বহুযুদ্ধের সঙ্গী বিশালাকার খড়্গটি নিষ্কাশিত করলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, ‘দেবী চুন্দার সেবা করেছিলাম বহুদিন। দেবী প্রসন্ন হয়ে আমাকে দুটি অস্ত্র দান করেন। এক, গোপালদেব, আর দুই, এই খড়্গ। এই অস্ত্র মন্ত্রঃপূত, আজ অবধি শোনিতপান না করে কোষবদ্ধ হয়নি। আসুন লোকেশ্বর, এই প্রৌঢ়ের যুদ্ধকৌশল না হয় স্বচক্ষেই দেখে যান।’

মৎস্যেন্দ্রনাথ উজ্জ্বল চোখে সবার দিকে তাকালেন। দেদ্দদেবী ইতিমধ্যেই অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়েছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং দেবী একজটা সমরে অবতীর্ণ হতে চলেছেন। এমনকি আচার্য শান্তরক্ষিত এবং ভিক্ষুণী মন্দর্ভাও তুলে নিয়েছেন দুটি ত্রিশূল। এই ত্রিশূল মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুগত শৈবযোগীদের যুদ্ধাস্ত্র।

নিজ নিজ অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়ালেন প্রত্যেকে। হুঙ্কার দিলেন, ‘জয় গৌড়, জয় বঙ্গ, জয় শশাঙ্ক।’

প্রশস্ত অলিন্দ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন গোপালদেব। অল্প শীত করছিল তাঁর। প্রাসাদের এই প্রান্তে তেমন রোদ আসে না। চারিদিকে অন্ধকার স্যাঁৎস্যাঁতে ভাব।

তাকাতে তাকাতে বিস্মিত হচ্ছিলেন তিনি। কত মহার্ঘ আভরণে সাজানো এই প্রাসাদ। কত অনুপম দ্রষ্টব্যবস্তু ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রাসাদ সাজিয়ে তুলতে। চারিদিকে থরেবিথরে কত না শিল্পসৌন্দর্যের আয়োজন।

অথচ বঙ্গদেশের অর্ধেক মানুষ নিরন্ন, অনাহারক্লিষ্ট। তাদের জীবনের নিরাপত্তা নেই, অন্নের সংস্থান নেই। কিন্তু তাই বলে বঙ্গদেশের রাজপ্রাসাদের অলঙ্করণে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য হয়নি।

হাঁটতে হাঁটতে আরও একটি বিষয় অনুভব করলেন গোপালদেব। এখন বেলা দ্বিপ্রহর। সচরাচর এইসময় রাজপ্রাসাদে মানুষজনের আনাগোনা, কর্মব্যস্ততা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এই অংশটি একেবারে নির্জন। রঙ্গলাল নামের রাজকর্মচারীটি তাঁকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে সামনের পথ দেখিয়ে সেই যে চলে গেছে, তারপর থেকে আর একটিও মানুষের দেখা পাননি তিনি।

আশ্চর্য! এত বড় রাজপ্রাসাদে আর মানুষ নেই? নাকি কেউ সামনে আসছে না? পথ নির্দেশ করে দেবে এমন কেউও তো নেই!

অবশ্য পথনির্দেশের তেমন প্রয়োজন ছিল না। অলিন্দটি এঁকেবেঁকে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট দিকেই।

একটু পরেই অলিন্দপথ শেষ হল। সামনে একটি বিশালাকৃতির দ্বার। তার দেহ বিবিধ কারুকার্য খচিত।

গোপালদেব বুঝতে পারলেন, ক্রীড়ার অন্তিমচরণে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। কোমরে হাত দিয়ে একবার অনুভব করে নিলেন, কমলশীলের সযত্নে আনা তিব্বতী যন্ত্রটি সঙ্গে আছে তো?

মনে মনে একবার গৃহদেবী চুন্দার পাদবন্দনা করে নিলেন গোপালদেব। তারপর সুদৃশ্য দ্বার হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন।

ঘরের ভিতরটি সুঘ্রাণ ধূমে পরিপূর্ণ। কিছু দেখা যায় না। চারিদিক বড় মায়াময়। সেই মায়াবী ধূম্রজালের মধ্য হতে দুজন অতি অপূর্ব সুন্দরী কিঙ্কিণী বেরিয়ে এসে গোপালদেবের দুই হাত ধরল, 'আসুন কুমার, আসুন। মহারানি আপনারই অপেক্ষায় আছেন।'

চণ্ডকীর্তি অতি করুণদৃষ্টিতে বনচর সঙ্গীটির দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টিতে কাতর অনুনয়ের সঙ্গে মিশে ছিল অনেকখানি অসহায়তাও।

বনচর শবর অবশ্য বিন্দুমাত্র করুণাবিগলিত হল না। কর্কশ স্বরে বলল, 'তাড়াতাড়ি চল। আমাদের আজ বিকেল বা সন্ধের মধ্যেই যে করে হোক সেখানে পৌঁছতে হবে। প্রকাশচন্দ্র স্বয়ং অপেক্ষা করে আছেন সেখানে। নইলে তুই তো জানিস, আমাদের অনেকেই তোর নধর দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে।'

কথাটা শুনেই মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল চণ্ডকীর্তির। এই বিকট, উলঙ্গ নারীবাহিনীর পিছনে পিছনে যারা আসছে, তারা তো আরও ভয়াবহ! তাদের মধ্যে চণ্ডকীর্তিকে একবার ছেড়ে দিলে তো তার দেহের একটি অংশও খুঁজে পাওয়া যাবে না!

শিবাদল! চণ্ডকীর্তি আজ অবধি কখনও দেখেনি যে হিংস্র শিবাদলকেও পোষ মানানো যায়!

সামনে লালিম্ববনের গোপন গিরিখাত। এই পথে অতি দ্রুত শালিবন বিহারের প্রধান দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি এবং মহারাজসচিব প্রকাশচন্দ্র বাদে অতি অল্প কয়েকজনই এর সন্ধান রাখেন।

করুণ চোখে সঙ্গী শবরটির দিকে একবার তাকিয়ে সেই পথে পা রাখল চণ্ডকীর্তি।

মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং অন্যরা শালিবন বিহারের সামনের প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সামনের প্রান্তর শূন্য। শুধু লালিম্ববন পাহাড়ের দিক থেকে ধেয়ে আসছে প্রবল বাতাস।

একটু পর একটি অতি ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। হস্তীর বৃংহণ।

তারপর শব্দগুলি আরও স্পষ্ট হতে লাগল। সৈন্যদের ছন্দোবদ্ধ পায়ের শব্দ। রণহুঙ্কার। ঢাকের শব্দ। লালিম্ববনের পাহাড় ছুঁয়ে আসা বাতাসে এবার মিশতে থাকল ভয়। যেমন স্বচ্ছতোয়া নদীজলে মেশে রক্তের ধারা। ধীর, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী।

একটু পর দিগন্তের ঠিক মধ্যস্থানে দেখা গেল একটি দীর্ঘ লাঞ্ছনের শীর্ষাংশ। চন্দ্রবংশের শাসনদণ্ডের অগ্রভাগ।

একটু পর উজ্জ্বল নির্মল আকাশের বুকে আস্তে আস্তে ফুটে উঠল চন্দ্রশাসনদণ্ডের সম্পূর্ণ অবয়ব। একটি অর্ধচন্দ্র, এবং একটি বজ্র।

তারপর দেখা দিল একটি মস্তক। একটি অতি বৃহৎ হস্তীর মস্তক। বঙ্গদেশের হস্তীবাহিনীর প্রধানতম, বিশালতম এবং ভয়ালতম অস্ত্র বজ্রঘণ্টা'র মাথা।

তারপর ফুটে উঠল মানুষের মাথা। একটি দুটি করে তারা দিগন্তের প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠতে লাগল ঘোর অশনির মতো। এবার যুদ্ধহুঙ্কার আর ঢাকের শব্দ আরও প্রবল হয়ে উঠল। আরও ভয়ঙ্কর। আরও ভয়াবহ।

আর সবার শেষে দেখা গেল সেই ষণ্ডবাহিত রথটি। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন প্রকাশচন্দ্র। অশনি সঙ্কেতের মতো। স্থির বজ্রপাতের মতো। মহাকালের উদ্যত মহাশূলের মতো। একা। নিঃসঙ্গ। ভয়ঙ্কর।

বপ্যট উচ্চস্বরে আদেশ দিলেন, 'প্রত্যেকে একত্রিত হন। অস্ত্র হাতে নিন। আমাদের দুই পাশ রক্ষা করবেন পদ্মসম্ভব এবং জয়াপীড়। লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ মধ্যস্থলে থাকবেন। আর সামনে থাকব আমি। দেদ্দদেবী, আপনি আমার ডানপাশে থাকুন। মনে রাখবেন, বিচ্ছিন্ন হওয়া মানেই মৃত্যু।'

সন্ন্যাসী এবং যোগীদের দল নিজেদের অবস্থান সংহত করলেন। ত্রিশূলের গলায় বাঁধা ঘণ্টাগুলি ঝনঝন করে উঠল রৌদ্রস্নাত স্পর্ধার মতো।

বপ্যট বললেন, 'আমাদের শবরবাহিনীর কাছে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। তাদের এসে পৌঁছতে এক দণ্ডের কিছু অধিক সময় লাগবে। ততক্ষণ যে করে হোক এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে রাখতে হবে। সঙ্গীরা, মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য, ন্যায়ের জন্য এবং ধর্মের জন্য ঐক্যবব্ধ হও।'

প্রবল রণহুঙ্কার এবং ঢাকবাদ্যসহ ধীরে ধীরে রাজসেবকদল তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের চোখ শান্ত, শীতল ও ক্রূর। তাদের সর্বাঙ্গ বিচিত্র যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত। আর প্রত্যেকের ডানবাহুতে একটি ক্ষুদ্র তাম্রফলক বাঁধা।

তাম্রফলক দেখেই চিনলেন বপ্যট। এরা কালকূট বাহিনী। রাজসেবকদের মধ্যেও বিশিষ্টতম ঘাতক গোষ্ঠী।

কালকূট বাহিনীর ঠিক সামনে সেই দুর্মদ রণহস্তী বজ্রঘণ্টা। তার বিশাল দন্তদুটি লৌহকণ্টকে আবৃত। চোখ রক্তবর্ণ। অল্প অল্প মাথা নাড়ছে সে। একবার মাহুতের ইশারা, ব্যস। এই অল্প কয়েকজন বিদ্রোহীদের পায়ের তলায় পিষে মারতে সে একাই যথেষ্ট।

বাহিনীর শেষে এসে দাঁড়াল প্রকাশচন্দ্রের রথ। ষণ্ডদুখানির শ্বাসের শব্দ এখান থেকেও শোনা যাচ্ছিল। প্রকাশচন্দ্র একবার দেখে নিলেন যুদ্ধপরিস্থিতি। তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তে একটি ব্যঙ্গের হাসি খেলে গেল। কতক্ষণ পারবে এরা? এক দণ্ড? দুই দণ্ড?

বামহাতের তর্জনীটি একবার দেখে নিলেন তিনি। আঙুলটি জুড়ে নীল রঙের আভা। রানি এখন মহাকামমতী, মহাবিষমতী হয়েছেন। আজ তাঁর দংশন থেকে রক্ষা পাবে—এমন মরমানুষ এই পৃথিবীতে নেই।

প্রকাশচন্দ্রের ইশারায় রণহুংকার আর ঢাকের শব্দ বন্ধ হল। কালকূট বাহিনীর মধ্য থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এল একজন ঘোষক। সে উচ্চকণ্ঠে বলল, 'বিপথগামী বিদ্রোহীরা শোনো। বঙ্গদেশের মাননীয় মহারাজসচিব শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিদ্রোহীদের আহ্বান জানাচ্ছেন অস্ত্র সমর্পণ করে তাঁর শরণাগত হতে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি বিদ্রোহীদের সমস্ত অভিযোগ শুনবেন এবং তার যথাযথ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন। বিদ্রোহীদের নিরাপত্তা এবং সার্বিক কল্যাণ তাঁর দায়িত্ব। তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু...'

পদ্মসম্ভবের ধনুকটি উঠতে, আর তার জ্যা'তে শরারোপিত হতে বোধহয় এক পলের অধিক সময় প্রয়োজন হয়নি। ঘোষক দয়ালু শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র শর অব্যর্থ নিশানায় বিদ্ধ হল তার ভ্রূমধ্যে। তারপর পর পর আরও দুইটি, তার দুই চোখে।

কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। লালিম্ববন পাহাড়ের বাতাস হাহাকারের মতো বয়ে গেল দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে।

প্রকাশচন্দ্র ক্রুদ্ধভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ রাগে থমথম করছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'বজ্রঘণ্টা...'

প্রভুর স্বর শুনে উচ্চনাদে ডেকে উঠল সেই মহাহস্তী। তারপর দুলকি চালে দৌড়তে আরম্ভ করল শত্রুদের দিকে।

ঘরে ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলেন না গোপালদেব। এই দ্বিপ্রহরেও ঘরখানি ঘিরে আছে ঘন অন্ধকার। মনে হয় হেমন্তের রৌদ্রের প্রবেশ যেন এই ঘরে নিষিদ্ধ। বাতায়নগুলি চীনাংশুকের আবরণে আবৃত। তাদের মৃদু আন্দোলনে যেটুকু সূর্যরশ্মি এই ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়েছে, তাতেই এই ঘরখানি উদ্ভাসিত।

ঘন সান্দ্র সিক্ত ধ্রুম্রজালে ঘরের বাতাস ভারী। সেই ধূম আঘ্রাণমাত্রে গোপালদেবের শরীর জাগ্রত হয়ে উঠল! সারা শরীর জুড়ে বিন্দু বিন্দু কামবীজের ইশারা!

ইতিমধ্যে গোপালদেবের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তিনি লক্ষ করলেন, দরজা বন্ধ করে অন্তর্হিত হয়েছে কিঙ্কিণী দুজন। তাঁর সামনে একটি বিশাল পালঙ্ক। পালঙ্কের গায়ে আঁকা চিত্রবিচিত্র অলঙ্করণ। সবই নরনারীর যৌনক্রীড়ার আখ্যান।

চোখ তুললেন গোপালদেব।

পালঙ্কের ওপর একটি নারীশরীর শায়িত। তার ওপাশে ফেরানো সর্ব অঙ্গে একটি চিত্রিত রেশমবস্ত্রের আবরণ। শয্যায় বিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম।

গোপালদেব দু'পা এগোতেই শরীরটি নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বসলেন সেই নারী, তারপর এদিকে ফিরলেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গোপালদেব। নারীশরীর এত সুন্দরও হয়? কী অপরূপা এই রমণী! যেন স্বয়ং মদনদেব তিলতিল করে গড়ে তুলেছেন এঁকে। গাত্রবর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ। সামান্য টানা চোখ দু'খানি মদালস। নাকখানি সামান্য চাপা অথচ অনিন্দ্যসুন্দর। গাল দু'খানি রক্তিম। রেশমবস্ত্রটি কোনওক্রমে উদ্ধত স্তনদুটি আবৃত করার চেষ্টা করছে।

নারীটি গোপালদেবের দিকে তাকিয়ে মদালসনেত্রে সামান্য হাসলেন। তারপর কমনীয় হাত দুটি তুলে কবরীবন্ধন করতে করতে বললেন, 'এসেছেন প্রভু? আসুন, কত দণ্ড কত পল, কত অনুপল, আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

বলতে বলতেই রেশমবস্ত্রটি বক্ষের আকর্ষণ ত্যাগ করে রমণীর কোলের ওপর পড়ে গেল। উদ্ধত স্তন দু'খানি দর্শনমাত্র গোপালদেব শিহরিত হলেন। আহা, কী ঔদ্ধত্য, কী লাবণ্য, কী মায়াই না ঘিরে আছে ওই কমলপুষ্পদুটি।

কবরীবন্ধন শেষ হলে নারীটি পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়ালেন। মহার্ঘ রেশমবস্ত্রটি তাঁর পায়ের কাছে অকিঞ্চিৎকর ছিন্নপত্রের মতো পড়ে রইল। গোপালদেব দেখলেন নারীটির ক্ষীণ মধ্যদেশ। দেখলেন রাত্রির মতো গহীন নাভি, দেখলেন পেলব কদলীকাণ্ডের মতো দুই জঙ্ঘা আর দুই জঙ্ঘার মাঝে লাজুক ত্রিকোণদ্বীপ।

গোপালদেবের মস্তিষ্কের মধ্যে জান্তব ইচ্ছার প্রবণতা বুনে দিচ্ছিল সেই সান্দ্র, পিচ্ছিল ধূম্রঘ্রাণ। তাঁর শরীরে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে এক অবাধ্য পৌরুষ। যেমনভাবে কামার্ত হরিণ খুঁজে ফেরে ঘাইহরিণীকে, তেমনভাবেই সেই পৌরুষ খুঁজে নিতে চাইছে এই স্বয়মাগতা নারীকে।

নারী ধীরে ধীরে অনুপম ছন্দে এগিয়ে এসে দুই বাহু স্থাপন করলেন গোপালদেবের দুই কাঁধে। তারপর কামার্ত আঁখিদুটি গোপালদেবের চোখে রেখে বললেন, 'এই দুর্ভাগিনীর কথা কি এতদিনে মনে পড়ল নাথ? আসুন, এই অনাথিনীকে পূর্ণ করুন, গর্ভিণী করুন, সম্পূর্ণ করুন।'

বিহ্বল গোপালদেব তাঁর ঘর্মাক্ত হাতদুটি দিয়ে বঙ্গদেশের অধিশ্বরীর দুই গণ্ডদেশ ধারণ করলেন। তারপর তাঁর উদগ্র ওষ্ঠ নামিয়ে আনলেন নারীটির স্ফূরিত অধরের দিকে।

দেদ্দদেবী স্থিরচোখে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে ধাবিত ওই মহাভৈরবের দিকে। তিনি এই জীবনে একবার মরেছেন, দ্বিতীয়বার মরতে ভয় পান না। শুধু গোপালদেবের কথা ভেবে তাঁর কণ্ঠার হাড় দুবার ওঠানামা করল।

তাঁর এই ধর্ষিত, লাঞ্ছিত, অকিঞ্চিৎকর জীবন চলে যায় যাক। কিন্তু উনি যেন বিজয়ী হন, অখণ্ড গৌড়বঙ্গের রাজচক্রবর্তী সম্রাট হন। উনি পাটরানি সমভিব্যহারে রাজ্যশাসন করুন, অনিঃশেষ রাজসুখ ভোগ করুন। সুন্দরী স্ত্রী পাশে নিয়ে...

সুন্দরী স্ত্রী পাশে নিয়ে?

দেদ্দদেবীর কণ্ঠা ওঠানামা বন্ধ হল। গোপালদেবের শয্যায় অন্য কোনও নারী শুয়ে আছে, এই দৃশ্য কি নরকে গিয়েও সহ্য করতে পারবেন তিনি?

না। পারবেন না। তাঁকে বাঁচতে হবে। বাঁচতেই হবে।

বজ্রঘণ্টা দৌড়ে আসছিল তাঁর দিকে। তাঁর দিকে এবং লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথের দিকে। তার রক্তলাল চোখ থেকে, মদস্রাবী গণ্ড থেকে, উন্মত্ত যুদ্ধবৃংহণ থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল হিংস্র মৃত্যুর সঙ্কেত।

তাঁদের মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে। কমে আসছে মৃত্যু এবং জীবনের মধ্যে দূরত্ব। তীক্ষ্ণধার বল্লমটি একবার চেপে ধরলেন দেদ্দদেবী। কীভাবে, ঠিক কীভাবে এই মত্ত মাতঙ্গকে প্রতিহত করা যায়!

প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে গেছে বজ্রঘণ্টা। তাঁর রক্তাভ মদস্রাবী চোখ দেখে বুকে ভয় জাগে। ঠিক এই সময় কীসের প্রেরণায় বজ্রঘণ্টার দিকে দৌড়চ্ছেন তিনি।

বপ্যট দাঁতে দাঁত চিপে একটি অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনওপ্রকার অনুশাসন ভঙ্গ করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আর এই উন্মাদ তরুণী...

শুধু উন্মাদ তরুণী? চোখের কোণ দিয়ে তিনি দেখলেন—হাতে একটি দড়ির ফাঁস ঘোরাতে ঘোরাতে বজ্রঘণ্টার দিকে দৌড়ে আসছেন পদ্মসম্ভবও।

আশ্চর্য হলেন বপ্যট। না, পদ্মসম্ভবের এই দুঃসাহস দেখে নয়। আশ্চর্য হলেন দড়িটি দেখে। কামরূপের উত্তরাঞ্চলের গহীন জঙ্গলে এক ধরনের ঘাস পাওয়া যায়। সেই ঘাস শুকিয়ে তৈরি হয় এই দড়ি। এই দিয়ে অতি বৃহৎ বাণিজ্যতরী অবধি বাঁধা যায়, এতই শক্ত এর বাঁধন।

কই, এর কথা তো পদ্মসম্ভব ঘুণাক্ষরেও বলেননি তাঁদের।

পদ্মসম্ভবের দিকে তাকিয়ে রইলেন বপ্যট। তিনি বুঝতে পারলেন, আরও একজনও তাকিয়ে আছেন এই উত্তেজক ঘটনার দিকে। লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ।

অতিকায় হস্তিটির আগ্রাসন স্তব্ধ হল। সে বা তার মাহুত, কেউই ভাবতেই পারেনি যে আক্রান্ত মানুষেরা এত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারেন। তবে এ বিভ্রান্তি সাময়িক। উচ্চ বৃংহণে আকাশ বাতাস মুখরিত করে ফের ধাবিত হল বজ্রঘণ্টা। নিপুণ রণহস্তীটি ততক্ষণে যুদ্ধের স্বাদ পেয়ে গেছে।

তবে বেশীক্ষণ নয়। ততক্ষণে অব্যর্থ নিশানায় পদ্মসম্ভবের দড়ির ফাঁসটি এঁটে বসেছে উদ্ধত হস্তিশুণ্ড আর হস্তিদন্তের মাঝে। তারপর এক প্রবল টান!

কয়েক মুহূর্তের জন্য উপস্থিত প্রত্যেকে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল এই অসম সংগ্রাম দেখে। একদিকে বঙ্গবাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ রণদুর্মদ রণহস্তী বজ্রঘণ্টা, অন্যদিকে এক সামান্য মানুষ।

তবে উপস্থিত জনসাধারণ আরও স্তম্ভিত হল পরের ঘটনাপ্রবাহ দেখে।

এই আকস্মিক আক্রমণ বোধহয় বজ্রঘণ্টা আশঙ্কা করেনি। তাই সে নিজের ভারসাম্য রক্ষার্থে সামনের দুই পা একবার তুলেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আর তার প্রবল শুণ্ডচালনে পদ্মসম্ভবের হাতে ধরা দড়িটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তবে সেই মুহূর্তেই দ্রুত ধাবমান দেদ্দদেবী প্রথম লাফে বজ্রঘণ্টার দন্তাগ্রে এসে পড়লেন, এবং লাফিয়ে উঠলেন তার মাথা লক্ষ্য করে।

উপস্থিত জনতা স্তম্ভিত হয়ে দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য। একটি দেহ উড়ে যাচ্ছে বজ্রঘণ্টার মাথার দিকে। তার পা দুটি ভাঁজ করা। আর উত্থিত দুই হাতে শক্তমুঠিতে ধরা আছে একটি খর্বকায় তীক্ষ্ণধার ভল্ল। সূর্যের আলোয় ভল্লাগ্রটি একবার ঝিকিয়ে উঠল। তারপরেই সেটি আমূল বিদ্ধ হল বজ্রঘণ্টার মাথার ঠিক পিছনে, কাঁধ আর কানের মধ্যবর্তী নরম অংশটায়।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সেই মহামাতঙ্গ। তারপর এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল সে। তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল মাহুত। ততক্ষণে দেদ্দদেবী নেমে দাঁড়িয়েছেন একপাশে। তাঁর দিকে দৌড়ে আসছেন পদ্মসম্ভব আর জয়াপীড়।

প্রবলবেগে নিজের মাথা নাড়াল বজ্রঘণ্টা। ঝেড়ে ফেলতে চাইল ঘাড়ে বিঁধে থাকা অস্ত্রটাকে। তারপর তার সামনের পা দুটি একবার তুলেই প্রবল বেগে নামিয়ে আনল মাটিতে পড়ে থাকা মাহুতের বুকে। একরাশ রক্ত ছিটকে উঠল চারিপাশে। প্রবল আক্রোশে দেহটাকে উপর্যুপরি আঘাত করল এই আহত ক্রুদ্ধ মত্তমাতঙ্গ। হতভাগ্য মাহুতের শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে রক্তমাংসের দলায় পরিণত হল। তারপর সেই শরীরটাকে শুঁড়ে তুলে দূরে ছুঁড়ে দিল সে। তারপর যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদে চারিদিক মথিত করে সে দৌড়তে লাগল লালিম্বিবন পাহাড়ের দিকে।

বিস্ফারিত চোখে সমগ্র দৃশ্যটি দেখলেন প্রকাশচন্দ্র। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, এই সামান্য ক'জন বিদ্রোহীকে পরাস্ত করতে গিয়ে তাঁকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম রণহস্তীটি হারাতে হবে।

তিনি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, 'কালকূট সেনা, বন্দি করো ওই বিশ্বাসঘাতকদের। ওদের প্রত্যেকের মুণ্ড আমার চাই। আর বন্দি করো ওই দুই নারীকে। ওরা তোমাদের লুণ্ঠিত বস্তু, ওদের শরীর আজ তোমাদের ভোগ্য হোক।'

শিক্ষিত কালকূটসেনার প্রথম অংশ একই ছন্দে নিষ্কাশিত করল অসি। আর একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের বামহাতে উঠে এল খর্বকায় কুঠার। সামান্য নীচু হল তারা, একইসঙ্গে। তারপর সঙ্ঘবদ্ধ শিয়ালের মতো তারা ছুটে চলল সামনের দিকে।

চুম্বনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কী যেন একটা অস্বস্তি হল গোপালদেবের। মনে হল কে যেন তাঁর মুখটি সামান্য সরিয়ে দিল। দুটি ওষ্ঠ যেন বিকর্ষণ করছে পরস্পরকে।

নারীটি সামান্য অবাক হলেন। তারপর কামজড়িত স্বরে বললেন, 'কী হল প্রভু, আসুন, আমাদের অধরে অধরে প্রেমের পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক।'

পুষ্প শব্দটি শুনেই আচ্ছন্ন, বিহ্বল গোপালদেবের মাথার মধ্যে কী যেন একটি কথা ভেসে উঠল।

মৎস্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিশেষ ঔষধটি তাঁকে সেবন করানো হয়েছে, তার অনেক গুণাগুণের মধ্যে একটি হচ্ছে বিষবিকর্ষণ। যে কোনও বিষাক্ত বস্তু, দ্রব্য বা প্রাণী থেকে স্বতই বিকর্ষিত হওয়ার ক্ষমতা আছে এর।

কথাটা মাথায় আসতেই সচকিত হলেন গোপালদেব। মাথার মধ্যেকার ধোঁয়াশা ভাবটাও খানিক স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রথমেই তাঁর মাথায় যে প্রশ্নটা এল, কীসে বিকর্ষিত হল তাঁর দেহ?

টানা টানা চোখদুটির দিকে তাকালেন গোপালদেব। আহা, ঈশ্বর স্বয়ং যেন তাঁর তুলিতে নিপুণভাবে এঁকেছেন ওই আঁখিদুটি। কত মায়া, কত প্রেম, কত না বলা কথাই যেন জমে আছে ওই দুটি চোখে।

আর রক্তিম দাড়িম্বর মতো বক্ষদুটি, যেমন উষ্ণ, তেমনই নরম। গোপালদেবের ইচ্ছা হল সপ্রেম হস্তে দলিতমথিত করেন ও দুটি।

আর নদীর বাঁকের মতো ঠোঁটদুটির তো কথাই নেই। যেন নাম না জানা কোনও শিল্পীর অমর সৃষ্টি। আর সেই ঠোঁটদুটির ফাঁকে...

একটু থামলেন গোপালদেব। ক্ষণমুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হল—কী যেন একটা ওই ঠোঁটদুটির মাঝে উঁকি দিয়েই চলে গেল। কী ওটা?

বিদ্রোহীবাহিনীর উপর বন্যার মতো আছড়ে পড়ল কালকূটসেনা, যেভাবে ক্ষুদ্র দ্বীপের ওপর আছড়ে পড়ে প্রবল ঝঞ্ঝাসংক্ষুব্ধ ঊর্মিমালা, যেভাবে দাবানলের ওপর আছড়ে পড়ে বিপুল নির্ঝরপ্রবাহ।

জয়াপীড়ের প্রথম খড়্গাঘাতেই দুজন কালকূটসেনা মুণ্ডহীন হল। তাঁর রণহুঙ্কার পার্বত্যসিংহের মতো ভীষণ, গম্ভীর এবং ভীতিপ্রদ। তিনি সিংহবিক্রমে কালকূটসেনা সংহারে রত হলেন।

একটু দূরেই ছিলেন পদ্মসম্ভব। তাঁর এক হাতে দা'ও, অন্য হাতে ভীমদর্শন অসি। তিনি সব্যসাচী, তাঁকে দুই হাতে শত্রুসৈন্য নিপাত করতে দেখে মনে হল যেন বহুদিন বাদে অস্ত্রধারণ করতে পেরে ভারি প্রসন্ন হয়েছেন।

দেদ্দদেবীকে দেখে মনে হল যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রটি দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করছে। তাঁর দ্রুতচকিত চলন বিভ্রান্ত এবং বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল কালকূটসেনার সঙ্ঘ গঠন।

আর মৎস্যেন্দ্রনাথ! কে জানত যোগেশ্বর নিজে এমন দুর্দান্ত রণকুশল যোদ্ধা? অমিতবিক্রমে তিনি চালনা করছিলেন তাঁর ত্রিশূলটি। যেন আদিদেব মহাদেব স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন এই ধরাধামে।

কিন্তু এতদসত্বেও ঘটনাপ্রবাহ প্রথম থেকেই বিদ্রোহীদের বিপক্ষে যাচ্ছিল। প্রথমত, তাঁরা সর্বাংশে অপ্রস্তুত। দ্বিতীয়ত, কালকূট সেনা বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রণকুশল বাহিনী। তাদের প্রশিক্ষণ, যুদ্ধদক্ষতা, সঙ্ঘশক্তি প্রশ্নাতীত। শৈবযোগী আর সহজিয়া সন্ন্যাসীরা যতই উজ্জীবিত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন না কেন, রণচাতুর্যে কিছুতেই এদের তুল্য নন।

বিদ্রোহীদলের সদস্যরা একে একে আহত এবং নিহত হতে লাগলেন। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসতে লাগল।

বপ্যট একটি বিশাল খড়্গ হাতে দুই কালকূট সেনার সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি একবার চারিদিকে তাকিয়ে প্রমাদ গণলেন। কালকূট সেনা আহত হলেও তাদের দৈহিক সক্ষমতা অতুলনীয়, রণভূমি ছাড়ার প্রশ্নই নেই। তাই যুদ্ধরত কালকূট সেনার সংখ্যা খুব বেশি কমছে না। অথচ বিদ্রোহী সেনা সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে।

কালকূটসেনা কৌশলে এক এক জন বিদ্রোহী নেতাদের ঘিরে ছোট ছোট বৃত্ত রচনা করছে। তাদের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। মন্দর্ভা আর শান্তরক্ষিতকে ঘিরে বৃত্তটি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। আর হয়তো বেশিক্ষণ নয়। দেদ্দদেবী সেদিকে যেতে চাইলেও তাঁকে বাধা দিচ্ছে চারজন কালকূট সেনা।

ওদিকে মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁর ত্রিশূল নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করে করে চলেছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। এরই মধ্যে একবার আর্তনাদ করে উঠলেন মন্দর্ভা। বপ্যট তাকিয়ে দেখলেন, এক কালকূটসেনা সবলে টেনে ধরেছে তাঁর কেশরাশি। শান্তরক্ষিত নিরস্ত্র, তাঁর হাতের অস্ত্র খসে পড়েছে মাটিতে। একটি অসি উত্তোলিত হল, এই বুঝি ভূলুণ্ঠিত হয় ভারতের শ্রেষ্ঠতম আচার্য শান্তরক্ষিতের মাথা।

এই প্রথম কুমার গোপালদেবের অভাব অনুভব করলেন অসহায় বপ্যট। গোপালদেব একাই এই কালকূটসেনার অর্ধেকের স্পর্ধা দমন করতে পারেন। তিনি থাকলে আজ এই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হতো না তাঁদের।

কিন্তু সেই তীক্ষ্ণধার অসি আচার্য শান্তরক্ষিতের কণ্ঠায় নেমে আসার আগেই তীর ছুটে এল উত্তোলিত অসি লক্ষ্য করে। বপ্যট তাকিয়ে দেখলেন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন কুমার পদ্মসম্ভব, হাতে সেই খর্বকায় নাগাঙ্কি ধনু। তাঁর চারিপাশে মৃত কালকূটসেনার স্তূপ। তাঁর পেশি ফুলে উঠেছে সিংহের কেশরের মতো। উন্মুক্ত কেশরাশি উড়ছে আগুনের মতো। দুচোখে ক্রোধ। রক্তঘামে ভিজে গেছে সমস্ত দেহ।

এই প্রথম পদ্মসম্ভবের বিপুল বলের আভাস পেলেন বপ্যট, আর অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি চিরকাল পদ্মসম্ভবকে দেখে এসেছেন একজন সাধারণ বুদ্ধিমান কৌতুকপ্রিয় বঙ্গবাসী রূপে। একটু আগেই তাঁকে একবার উত্তেজিত হতে দেখেছিলেন, আর এখন দেখলেন ক্রুদ্ধ ভৈরবাবতারে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন পদ্মসম্ভব। তারপর ধনুর্বাণ ফেলে রক্তস্নাত দা'ও নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মন্দর্ভার উদ্ধারকল্পে।

শান্তচোখে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলেন প্রকাশচন্দ্র। আর কতক্ষণ? এক দণ্ড? দুই দণ্ড?

একবার বামহাতের তর্জনীর দিকে তাকালেন তিনি। আঙুলটি এখনও নীলাভ হয়ে আছে। রানি এখন মহাবিষে পরিপূর্ণ। একটিমাত্র দংশন। আর তারপরেই গোপালদেবের কর্তিত মুণ্ড নিয়ে ছুটে আসবে মাধব। সেই রকমই কথা হয়ে আছে।

প্রকাশচন্দ্র কালকূটসেনার দ্বিতীয় অংশকে আদেশ দিলেন আক্রমণের। এই আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব।

আরেকদল কালকূটসেনাকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রমাদ গণলেন বপ্যট। তাঁর কিরাত-শবর সৈন্যদল কোথায়?

ততক্ষণে মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং জয়াপীড়কে ঘিরে ফেলেছে কালকূটসেনার একটি বৃহৎ অংশ। দেদ্দদেবী এসে যোগ দিয়েছেন পদ্মসম্ভবের সঙ্গে। তাঁরা রক্ষা করার চেষ্টা করছেন শান্তরক্ষিত এবং ভিক্ষুণী মন্দর্ভাকে। জয়াপীড় একত্রিত হয়েছেন জালন্ধরনাথ, এবং বেঁচে থাকা অল্প কয়েকজন শৈব এবং সহজ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে।

প্রকাশচন্দ্র নির্ভারচিত্তে উঠে দাঁড়ালেন। আর অর্ধদণ্ড মাত্র। তারপরেই বিজয়লক্ষ্মী তাঁর...

তাঁর ভাবনা মনেই রইল। অগ্রসর দ্বিতীয় কালকূটসেনার দিকে উড়ে এল একঝাঁক তীর। উড়ে এল লালিম্ববনের ভেতর থেকে। সঙ্গে শত শত মোষের শিঙার ধ্বনি। তারপরেই জঙ্গলের আবরণ থেকে বেরিয়ে এল কৃষ্ণকায় ভীমদর্শন কিরাত-শবরের দল।

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন বপ্যট। তাঁর বাহিনী এসে গেছে।

প্রথমে স্তম্ভিত, তারপর ক্রোধদীপ্ত হলেন প্রকাশচন্দ্র। তুলে নিলেন তাঁর মহাখড়্গ। সারথিকে বললেন তাঁর রথ জয়াপীড়ের দিকে চালনা করতে।

রানি একটানে খুলে নিলেন গোপালদেবের উত্তরীয়। তারপর তাঁকে সবলে আলিঙ্গন করে লেহন করতে থাকলেন কর্ণমূল।

গোপালদেবের সুঠাম বুকে দুটি উদ্ধত এবং কোমল স্তন নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। কর্ণমূলে শিরশিরানির সঙ্গে ভেসে আসছে এক কামার্তা নারীর আকুল নিবেদন, 'আমাকে গ্রহণ করুন আর্য, বিদ্ধ করুন আপনার পৌরুষে। আমার নারীত্বের অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আমাকে সম্পূর্ণ করুন।'

যে কোনও সমর্থ পুরুষের শরীর এই আহ্বানে সাড়া দিতে, এই আগুনে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য। বহু তপস্যায় এমন বরবর্ণিনী তিলোত্তমা স্বয়মাগতা হয়। কিন্তু সেই স্পর্শে গোপালদেবের অস্বস্তি বহুগুণ বর্ধিত হল।

এক অবলা কামিনীর পেলব হাত দু'খানি এমন শক্ত, সবল, লৌহকঠিন হয় কী করে?

হাত দুটির স্পর্শ মাঝেমধ্যে এমন পিচ্ছিল, সর্পিল অনুভূত হচ্ছে কেন?

কর্ণমূলে যে শব্দগুলি ভেসে আসছে তার মধ্যে একটি অতি ক্ষীণ হিসহিস শব্দ শ্রুত হচ্ছে কেন?

গোপালদেব যেন আচম্বিতে সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়ে উঠলেন। জেগে উঠলেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, নিদ্রা থেকে জাগরণের দিকে, বিহ্বলতা থেকে সচেতনতার দিকে। তাঁর মনে পড়ে গেছে তিনি কেন এসেছেন এখানে।

শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করলেন গোপালদেব, তারপর সবলে নিজেকে মুক্ত করলেন সেই কামিনীপাশ থেকে।

নারীশরীর ছিটকে পড়ে গেল শয্যার ওপর। কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলেন বঙ্গদেশের মহারাজ্ঞী। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর চোখ দু'খানি একবার ধক করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে একটি হাসি ফুটে উঠল। আদুরে স্বরে তিনি বললেন, 'কী হল নাথ, অভাগিনীকে কি পছন্দ হল না? নাকি বিদ্রোহের ভার, যুদ্ধদ্যোগের ক্লান্তি আপনাকে গ্রাস করেছে? আসুন, এই শয্যায় একবার উপবেশন করুন প্রভু। আপনার শ্রান্তিভার লাঘব করিয়ে...'

'স্তব্ধ হ কুলটা নাগিনী।' ধমকে উঠলেন গোপালদেব, 'নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ। আজ তোর সমস্ত কামজ্বালা জন্মের মতো মিটিয়ে দিতে এসেছি, তোর আর তোর সঙ্গীদের এতদিনের পাপের প্রতিশোধ নিতে এসেছি।'

মহারানি কিছুক্ষণ সর্পিল চোখে চেয়ে রইলেন গোপালদেবের দিকে। তারপর ব্যঙ্গখলখল স্বরে বলে উঠলেন, 'মৃত্যু? আমার? তোর হাতে?' বলতে-বলতেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন রানি।

আর তখনই তাঁর মুখগহ্বরের দিকে চোখ গেল গোপালদেবের। তিনি দেখলেন রানির জিহ্বাটি মানুষী জিহ্বা নয়। অবিকল সাপের মতো, দু'ভাগে বিভক্ত।

গোপালদেব অসমসাহসী পুরুষ। তবু তিনিও মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলেন। কী বীভৎস! কী সাঙ্ঘাতিক!

তবে তাঁর আতঙ্কিত হওয়া তখনও বাকি ছিল।

গোপালদেবের ভীত, বিস্ফারিত চোখের সামনেই নারীদেহটি মোচড়াতে শুরু করল। মনে হল যেন অসহ্য যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে যাচ্ছে দেহটি। কিন্তু যন্ত্রণার আর্তনাদ নয়, প্রতিটি মোচড়ের সঙ্গে সেই নারীর গলা থেকে ভেসে আসছিল খলখল হাসি।

একসময় দেহটি গড়াতে গড়াতে শয্যার অন্য পাশে পড়ে গেল। হাসির শব্দ তখনও ভেসে আসছে। তবে ক্রমেই তার চরিত্র বদলে যাচ্ছিল। একটা তীব্র হিসহিস শব্দ ক্রমেই দখল করে নিচ্ছিল সেই বীভৎস হাসির স্বর।

একটু পরে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ঘর জুড়ে অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য।

তারপর গোপালদেবের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে শয্যার ওপাশে উঠে এল অতিকায়, অতি বিশাল, অতি বীভৎস এক মহাভুজঙ্গ। তার উদ্ধত ফণার উচ্চতা গোপালদেবের মাথা পেরিয়ে। তার দেহকাণ্ডের প্রস্থ মানুষ প্রমাণ। তার সমস্ত দেহ ঘন কালো। অতল রাত্রির মতো কালো, সর্বগ্রাসী সর্বনাশের মতো কালো।

বিশাল ফণাটি এদিক ওদিক দুলল খানিকক্ষণ। তারপর তার স্ফটিককৃষ্ণ চোখদুটি স্থির হল গোপালদেবের ওপর। রক্তলাল চেরা জিভটি বেরিয়ে এল। তার প্রান্তভাগ খানিক কাঁপল তিরতির করে। তারপর সেই মহাকায় ভুজঙ্গ শয্যা বেয়ে এগিয়ে আসতে থাকল গোপালদেবের দিকে।

প্রকাশচন্দ্রের যুদ্ধপারঙ্গমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বপ্যট।

তিনি নিজে মহাশূরবীর, শস্ত্রযুদ্ধে মহারথ। তাঁর পুত্র গোপালদেবও মহাবলশালী যোদ্ধা, সম্ভবত বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠতম শূরবীর। তিনি কুমার জয়াপীড় এবং কুমার পদ্মসম্ভবের অতিলৌকিক শারীরিক বল এবং যোদ্ধৃক্ষমতার ব্যাপারে সম্যকরূপে অবগত। কিন্তু তাঁরাও প্রকাশচন্দ্রের ধারেকাছে আসেন না।

প্রকাশচন্দ্র শত্রুনিধন করছিলেন এমন অনায়াসে, দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও কৃষক হেমন্তের শেষে নীবারকর্তনে রত। তাঁর একটি একটি খড়্গাঘাতে একাধিক বিদ্রোহী সৈন্য ধরাশায়ী হচ্ছিল। এত কুশলতার সঙ্গে, এত অনায়াসে, এত সাবলীল ভাবে যে শত্রুনিধন করা যায়, তা খণ্ডিতারাতি বপ্যটেরও স্বপ্নের অগোচরে ছিল।

যুদ্ধ হচ্ছিল সমানে সমানে। শবরের দল প্রশিক্ষণে কালকূটসেনার থেকে পিছিয়ে থাকলেও সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ। তাদের দৈহিক বল এবং দৈহিক আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও কালকূটসেনার সঙ্গে তুল্যমূল্য। তদুপরি তারা সংখ্যাতেও বেশি।

তবে তারা অসমসাহসী, প্রশিক্ষিত কালকূটসেনার সঙ্গে সমানে সমানে যুঝে চলেছিল তাদের আজন্মসঞ্চিত ক্রোধের ওপর ভর করে। ক্রোধ তাদের এই অবস্থার ওপর, এই শাসনের ওপর, এই শোষণের ওপর, এই মাৎস্যন্যায়ের ওপর। সেই মহাপবিত্র ক্রোধ যেন দাবানলের মতো ভস্ম করে দিতে চাইছিল কালকূটসেনাকে।

জয়াপীড় এবং তাঁর সঙ্গী কিরাত সৈন্যদল ভীমবিক্রমে ধ্বংস করছিলেন কালকূটসেনার দক্ষিণভাগ। পদ্মসম্ভব আজ মহাভৈরবরূপ ধারণ করেছেন। তিনি একাই সর্বগ্রাসী হুতাশনের মতো সংহার করছেন কালকূটসেনার উত্তরাংশ।

প্রকাশচন্দ্রের রথ অনায়াসে এসে উপস্থিত হল জয়াপীড়ের সামনে। জয়াপীড় এক আঘাতে এক কালকূটসেনার মুণ্ডচ্ছেদ করে রক্তস্নাত শার্দূলের মতো প্রকাশচন্দ্রের সম্মুখীন হলেন।

প্রকাশচন্দ্র ধীর, শান্ত অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপে অবতারণ করলেন রথ থেকে। তারপর নিজের অস্ত্র উত্তোলিত করে বললেন, 'তস্করের হাতে বহুমূল্য মণি আর শিশুর হাতে তীক্ষ্ণধার অসি শোভা দেয় না কুমার। ওই মহাখড়্গ মন্ত্রপূত। অনধিকারীর হাতে বিশ্রী দেখায়। ওটি আমার হাতে দিন।'

জয়াপীড় তাঁর খড়্গহাতে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রকাশচন্দ্রের ওপর।

গোপালদেব প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় পিছিয়ে গেলেন খানিকটা। তারপর দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে। বদ্ধ কক্ষে এই মহানাগিনীর সঙ্গে সংগ্রামে রত হওয়া আর মৃত্যুকে আহ্বান করে আনা একই। উন্মুক্ত প্রান্তরে যে কোনও সরীসৃপের আক্রমণ প্রতিহত করা বরং অনেক সহজ।

কিন্তু দরজাটি হাত দিয়ে টেনে বুঝলেন যে দরজাটি বন্ধ। তাঁর জীবিত থাকার কোনও সম্ভাবনাই রাখেনি শত্রুপক্ষ।

ঘুরে দাঁড়ালেন গোপালদেব। মহাসর্প ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। কটিদেশে হাত দিলেন গোপালদেব। বার করে আনলেন সেই মহাযন্ত্র, যা পোন পুরোহিতদের গোপন ভাণ্ডার থেকে বহু কষ্টে উদ্ধার করে এনেছেন ভন্তে কমলশীল এবং কুমার পদ্মসম্ভব।

যন্ত্রটির আকৃতি বড়ই অদ্ভুত। একটি লৌহনির্মিত নল, দৈর্ঘ্যে এক বিতস্তির কাছাকাছি। নলের শেষের এক তৃতীয়াংশ উল্লম্বভাবে বক্র। বাঁকানো অংশটি তুলনামূলক ভাবে অনেক স্থূল। তার গায়ে কাঠের আবরণ। সেই কাঠের মধ্যস্থল থেকে একটি স্থূল পলিতা বেরিয়ে আছে।

যন্ত্রটি প্রয়োগপদ্ধতি কিঞ্চিৎ জটিল। লৌহনলের সম্মুখভাগ লক্ষ্যের দিকে স্থির করে পলিতায় অগ্নিসংযোগ করতে হয়। তারপরেই মারণাগ্নি ধেয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে।

মূল পরিকল্পনা এই ছিল যে গোপালদেব প্রাসাদে প্রবেশ করে রানিকে বলপ্রয়োগে বন্দি করবেন। তারপর কাঞ্চনাদেবীর কথামতো রানির ভ্রূমধ্যে প্রয়োগ করবেন এই মারণ অগ্নি। তাতেই নিহত হবে সেই শতাব্দীপ্রাচীন নাগপিশাচী।

কিন্তু সে সম্ভাবনা এখন সুদূর পরাহত বললে কম বলা হয়।

সেই মহাভুজঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে গোপালদেবের ঠিক সামনে। তার অতি ভয়ঙ্কর, অতি ভীতিপ্রদ উপস্থিতিই কোনও সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত জড়ভরত করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। তার ঘনকৃষ্ণস্ফটিক চোখদুটি গোপালদেবের ঠিক মুখোমুখি। সেই স্থির, নিষ্কম্প, অচঞ্চল চোখদুটিতে একটিই বার্তা লেখা আছে। মৃত্যু।

গোপালদেব চকিতে ঝাঁপ দিলেন মেঝের ওপর। দরজার অন্যপ্রান্তে এখনও একটি দীপ জ্বলছে ক্ষীণভাবে। আগুন, সামান্য একটু আগুন চাই তাঁর এখন।

কিন্তু তার আগেই সেই মহানাগিনী দ্রুত জড়িয়ে ফেলল তাঁর দেহ। প্রথমে পা, তারপর কোমর, তারপর ঊর্ধ্বাঙ্গের অর্ধাংশ। আর হাতের যন্ত্রটি ছিটকে চলে গেল অন্যপ্রান্তে।

ধীরে ধীরে সেই নাগিনীর উদ্যত ফণা উঠে এল গোপালদেবের বুকের ওপর। উঠতে পারছিলেন না তিনি। ক্রমেই তাঁর দেহের ওপর চাপ বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ফুসফুসটি গলা দিয়ে বের হয়ে আসবে। মহাবলশালী তিনি। দেহে অযুতহস্তীর শক্তি ধরেন। তবুও তিনি এই আসুরিক শক্তির সামনে অসহায়ের মতো হাঁ করছিলেন একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য।

সেই বিশালাকার ফণাটি দুদিকে দুলল খানিক। তারপর অনেকটা নীচু হয়ে গোপালদেবের ঠিক মুখোমুখি স্থির হল। ক্রূর, শীতল দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল তাঁর বিস্ফারিত, আতঙ্কিত চোখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ হাঁ করল।

এক প্রাচীন পিশাচগন্ধ নাসারন্ধ্র বন্ধ করে দিল গোপালদেবের। যেন নরকের গভীর থেকে উঠে এসেছে এই পচিত, দূষিত কটুঘ্রাণ।

ফণাটি খানিক উঁচু হল। তারপর দু'খানি বিষদন্ত সজোরে নেমে এল গোপালদেবের বুকের ওপর।

গোপালদেবের পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল।

প্রকাশচন্দ্রের আক্রমণ কিছুটা সামলেই জয়াপীড় বুঝে গেলেন যে ইনি শারীরিক বলে এবং যুদ্ধকৌশলে তাঁর থেকে অনেক এগিয়ে। যেমন অদ্ভুত তাঁর খড়্গচালনা, তেমন দ্রুত তাঁর চলন। জয়াপীড় তাঁর খড়্গ চালনা করছিলেন দুই হাতে। আর প্রায় একই আকারের বিশাল খড়্গ প্রকাশচন্দ্র চালনা করছিলেন এক হাতে।

জয়াপীড়ের বিপুল আঘাত এড়িয়ে সরে দাঁড়ালেন প্রকাশচন্দ্র। জয়াপীড় খানিকটা এগিয়ে গিয়েই গড়িয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশচন্দ্রের খড়্গ আছড়ে পড়ল যেখানে জয়াপীড়ের মুণ্ডখানি ছিল। জয়াপীড় এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিহত করলেন পরের আক্রমণ। খড়্গে খড়্গে আগুনের ফুলকি ছুটল।

আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন জয়াপীড়। প্রায় দুই দণ্ড ধরে একনাগাড়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন তিনি। মহাবলশালী যোদ্ধা হলে কী হবে, তিনিও মানুষ, তাঁর জীবনীশক্তি অনিঃশেষ নয়। ক্রমেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন।

তাঁর পিঠ ঠেকে গেল প্রকাশচন্দ্রের রথে। এক লাফে রথে উঠে পড়লেন তিনি, তারপর রথধ্বজা ভেঙে সেটিকে ভল্লের মতো ছুঁড়লেন প্রকাশচন্দ্রের দিকে। প্রকাশচন্দ্র হেলায় সেটি দ্বিখণ্ডিত করলেন। তারপর তিনিও লাফিয়ে উঠলেন রথে। খড়্গ চালালেন জয়াপীড়ের মাথা লক্ষ্য করে। শরীরের সমস্ত ভারসাম্য দুই

উরুতে বজায় রেখে মাথাটি সম্পূর্ণ পিছন দিকে হেলিয়ে দিলেন জয়াপীড়। প্রকাশচন্দ্রের খড়্গ মৃত্যুর শিস তুলে বাতাসে কেটে গেল।

জয়াপীড় লাফিয়ে নামলেন মাটিতে। তারপর এক খড়্গাঘাতে রথের ধুরা আর যুগম কেটে দিলেন। ষাঁড়দুটি মুক্ত হয়ে খুরে খুরে ধুলো উড়িয়ে যুদ্ধরত সৈন্যদের দিকে ধাবিত হল।

প্রকাশচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে রথে সজোরে পদাঘাত করলেন। ওই একই আঘাতে রথটি বিপুল শব্দে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ভেঙে পড়ল। একটি চক্র ছিটকে এসে লাগল জয়াপীড়ের পেটে। জয়াপীড় পড়ে গেলেন। তাঁর খড়্গ ছিটকে গেল অন্যদিকে। জয়াপীড়ের সমস্ত জীবনীশক্তি শেষবিন্দুতে এসে দাঁড়াল।

প্রকাশচন্দ্র ধীরেসুস্থে এসে দাঁড়ালেন মাটিতে শুয়ে থাকা মৃতপ্রায় জয়াপীড়ের কাছে। তারপর হাঁপাতে থাকা জয়াপীড়ের মাথা লক্ষ্য করে খড়্গ তুললেন।

জয়াপীড় বহুকষ্টে তাঁর হাতের কাছে পড়ে থাকা একটি কাঠের টুকরো তুলে নিলেন। তারপর শরীরের জমে থাকা সমস্ত শক্তি দিয়ে গেঁথে দিলেন প্রকাশচন্দ্রের পায়ে।

প্রকাশচন্দ্র আর্তনাদ করলেন না বটে। তবে তাঁর ভারসাম্য সামান্য টলে গেল। তবে সে মুহূর্তের বিক্ষেপমাত্র। তারপর তিনি ফের তুলে নিলেন তাঁর খড়্গ। জয়াপীড়ের মুণ্ডচ্ছেদ কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সাঁই সাঁই শব্দ তুলে ছুটে এল একটি ভল্ল। সেটি প্রকাশচন্দ্রের খড়্গে আঘাত করে তাকে বিচ্যুত করল বহুদূরে। প্রকাশচন্দ্র চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর দিকে ভীমবেগে দৌড়ে আসছেন বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি, বপ্যট। তাঁর হাতে একটি ভয়ালদর্শন অসি।

প্রকাশচন্দ্র একলাফে পৌঁছলেন জয়াপীড়ের হস্তবিচ্যুত খড়্গটির কাছে, তাঁর অজেয় তাংদা'ও এর কাছে। যে মন্ত্রপূত মহাখড়্গ হাতে থাকলে তিনি অযোধ্যা, অপরাজেয়।

সেই মন্ত্রপূত খড়্গ হাতে প্রকাশচন্দ্র যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে দেখে মনে হল যেন বজ্র হাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন বৃত্রঘ্ন ইন্দ্র স্বয়ং। সেই দৃশ্য দেখে কালকূটসেনা হর্ষধ্বনি করে উঠল, 'জয় একেশ্বর প্রকাশচন্দ্রের জয়। জয় বঙ্গরাজ্ঞীর জয়।' সেই শুনে বিদ্রোহী কিরাত শবরসেনাও মহা হুঙ্কারে প্রতিধ্বনি করল, 'জয় গৌড়, জয় বঙ্গ, জয় শশাঙ্ক।'

মৃত্যুর নরম অন্ধকার জঠরে শুয়েছিল একটি প্রাণ। তার আকার নেই, অবয়ব নেই, মাত্রা নেই। শুধু প্রাণের উদ্দীপন আছে। জীবনের সাড়া আছে। যদিও সে না থাকার মতই। তার অস্তিত্ব, ইশারা, লক্ষণ—সবই এখন পিণ্ডমাত্র।

এক নীল অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে সব কিছু যেন তলিয়ে যাচ্ছিল। ক্রমে সেই নীল রঙ হয়ে উঠছিল আরও ঘন, আরও গহীন, আরও কালো। তার মাত্রা নেই, বেধ নেই, ঊর্ধ্ব নেই, অধঃ নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। শুধু আছে ঘূর্ণির টানে এক নিঃসীম অতলে তলিয়ে যাওয়া।

তলিয়ে যেতে যেতে ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর ঘুমে ঢলে পড়ছিল সেই প্রাণবিন্দু। তার অসাড় চৈতন্যে রেখাপাত করে যাচ্ছিল কয়েকটি শব্দ, কয়েকটি বাক্য, দুখানি আতুর, আকুল চোখ...

'কুমার...আমার বড় ভয় করছে...ওই কামুক ডাকিনীর সঙ্গে যেন...'

আলো। ক্ষীণ অথচ অস্পষ্ট কিছু আলোর বিন্দু। তারপর আলোর বিন্দুগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বপ্যট বিপুল বেগে আঘাত করলেন প্রকাশচন্দ্রকে। সেই ধাক্কায় কিছুটা পিছিয়ে গেলেন প্রকাশচন্দ্র। বুঝলেন যে এইবার একজন সমান বলস্পর্ধীকে পেয়েছেন তিনি।

দুই মহারথী বিপুল বিক্রমে একে অন্যকে আক্রমণ এবং অন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। খড়্গে অসিতে ঝনঝনানিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গতে মনে হল শালিবন বিহারের সামনে যেন পূর্বসমুদ্রের একটুকরো বিপুল ঝঞ্ঝা উঠে এসেছে।

খানিক পরেই বোঝা গেল দৈহিক বলে এবং অস্ত্রকৌশলে দুজনেই তুল্যমূল্য হলে কী হবে, বপ্যটের নড়াচড়া বা চলন প্রকাশচন্দ্রের তুলনায় সামান্য হলেও ধীর। তিনি প্রৌঢ় হয়েছেন, আর নাগসম্রাজ্ঞী য়ু জেতিয়ানের আশীর্বাদে প্রকাশচন্দ্র চিরযৌবনের অধিকারী।

লক্ষ করলেন প্রকাশচন্দ্রও। তিনি ঘুরে ঘুরে আক্রমণ করতে লাগলেন বপ্যটকে। চেষ্টা করলেন যাতে বপ্যটকে আরও বেশি নড়াচড়া করতে হয়, আরও ছুটতে হয়।

বপ্যট ইতিমধ্যেই যুদ্ধক্লান্ত ছিলেন। শ্রান্তি আর অবিরল রক্তক্ষরণ তাঁকে ক্রমাগত দুর্বল করে তুলেছিল। এই ক্রমাগত দ্রুতচলন তাঁকে আরও শ্রান্ত করে তুলছিল। তিনি হাঁপিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্রমেই আরও ক্লান্ত, আরও মন্থর হয়ে পড়ছিলেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিলেন বার বার।

একবার প্রকাশচন্দ্রের খড়্গ তাঁর বাম বাহু ছুঁয়ে গেল। রক্তপাত হতে লাগল সেখান থেকে। ক্রুদ্ধ বপ্যট তাঁর অসি দিয়ে ভীমবেগে আক্রমণ করলেন প্রকাশচন্দ্রকে। প্রকাশচন্দ্র নীচু হয়ে সরে গেলেন। তারপর খড়্গচালনা করলেন বপ্যটের পায়ের দিকে। বপ্যট লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর এতক্ষণের শ্রান্তি তাঁকে এইবার প্রতারিত করল। সামান্য বিলম্ব হয়ে গেল তাঁর। প্রকাশচন্দ্রের মহাখড়্গ তাঁর গুল্ফে আঘাত করে পায়ের প্রধান শিরাটি কেটে দিল।

পড়ে গেলেন বপ্যট। দ্রুত উঠে আসার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ডান পায়ের পাতা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই উঠে বসে প্রতিহত করলেন প্রকাশচন্দ্রের পরের আঘাত। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। প্রকাশচন্দ্র এক ঝটকায় তাঁর অসিটি দূরে ফেলে দিলেন। তারপর তাঁর তাংদাও প্রোথিত করে দিলেন বপ্যটের বুকে।

ভলকে ভলকে রক্ত উঠে যুদ্ধক্ষেত্রের মাটি ভিজিয়ে দিল। হাঁ করে একবার লম্বা শ্বাস নিলেন বহুযুদ্ধের নায়ক, খণ্ডিতারাতি বপ্যট। অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, ‘গোপাল, গোপাল।’ তারপর তাঁর মাথাটি একদিকে হেলে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দুচোখ খুলে গেল গোপালদেবের।

বহুদূর থেকে যুদ্ধের কোলাহল কানে আসছিল ওদের। শুনে বনচর মানুষটি ক্রমেই উতলা হয়ে উঠছিল। বার বার তাড়া দিচ্ছিল চণ্ডকীর্তিকে, ‘তাড়াতাড়ি চল শুয়ার। আর কত দেরি করবি, প্রভু যে আমাদের অপেক্ষায় আছেন।’ তার ব্যবহার ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছিল। ভাষা হয়ে উঠছিল অশ্রাব্য।

ভীত কুকুরের মতো এগিয়ে যাচ্ছিল চণ্ডকীর্তি। এগিয়ে যাচ্ছিল সংকীর্ণ গিরিপথটি বেয়ে। তার গলায় একটি রশি। তার শেষভাগ ধরে রেখেছে সেই বনচর মানুষটি। আর তার পেছনে পেছনে শত শত ভয়াবহ উলঙ্গ ডাকিনীর দল। প্রতি ডাকিনীর সঙ্গে তার পোষ্য শিবা!

ধীরে ধীরে গিরিপথের শীর্ষবিন্দুতে এসে উপস্থিত হল চণ্ডকীর্তি। তারপর একটি পাথরের আড়াল থেকে সামান্য উঁকি দিল।

শালিবন বিহার আর তার সামনের উন্মুক্ত প্রান্তর তাদের সামনে এখন স্পষ্ট।

খানিকক্ষণ স্থির শুয়ে রইলেন গোপালদেব। ধীরে ধীরে কক্ষের চিত্রবিচিত্র ছাদ তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

তাঁর সারা দেহ জুড়ে এক আশ্চর্য নির্ভার প্রশান্তি। প্রবল জ্বরের উপশম হলে যেমন বোধ হয়, ঠিক তেমনই বোধ করছেন তিনি।

ধীরে, অতি ধীরে ঘাড় ঘোরালেন গোপালদেব। বাঁদিকে কিছু নেই। এবার ডানদিকে।

ডানদিকে মেঝেতে ও কে শুয়ে? ও কার শরীর?

ধীরে ধীরে উঠে বসলেন গোপালদেব। তাঁর থেকে সামান্য দূরে একটি শীর্ণ, সম্পূর্ণ নগ্ন নারীশরীর শুয়ে আছে শীতল মেঝেতে।

এদিক ওদিক তাকালেন গোপালদেব। তাঁর অস্ত্রটি কোথায়?

স্তম্ভিত হয়ে গেল বিদ্রোহী বাহিনী। তাদের প্রধান নেতাকে নিহত হতে দেখে তাদের মধ্যে পরাজয়ের ভয় চারিয়ে গেল।

কালকূটসেনা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। তারা তখন জয়ের গন্ধ পাচ্ছে।

পরিস্থিতি বুঝলেন পদ্মসম্ভব। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'বাংলাদেশের সন্তানদল, তোমরা ভয় পাচ্ছ? ভয় পেও না। ওই দেখ, সমগ্র গৌড়বঙ্গ আজ তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। ওঠো, জাগো, উঠে দাঁড়াও। ফিরে তাকাও, প্রত্যাঘাত করো। ওরা চায়, ওদের দেখে আমরা কাঁপতে থাকি। আমরা কি ওদের সেই আশা পূর্ণ করব? আমরা কি সেই মায়ের ছেলে? মনে রেখো, এই দেশ তোমার জন্ম দিয়েছে, তোমাকে ধারণ করেছে, লালন পালন করেছে। আর আজ তোমরা সেই দেশের জন্য প্রাণ দিতে পিছপা হচ্ছ? সামনে তাকিয়ে দেখো, কয়েক হাজার কাপুরুষ দাস এক লোভী ঐন্দ্রজালিকের জন্য অস্ত্র ধরেছে। আর নিজেদের দিকে তাকাও, দেখো—আমরা নিজের মাতৃভূমিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাব বলে অস্ত্র ধরেছি। এসো, দেখিয়ে দিই আমরা কতটা ভয়ঙ্কর! ওদের মনে করিয়ে দাও যে আমরা সিংহজাতক, আমরা এই বঙ্গদেশের নির্ভীক দামাল সিংহজাতক...'

মরতে মরতেও উজ্জীবিত হয়ে উঠল কিরাতশবরসেনা। শেষবারের মতো অস্ত্র তুলে ধরল তারা। তাদের চেতনার মধ্যে চারিয়ে গেল এই মহামন্ত্র—হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু।

বঙ্গদেশের ভূমিপুত্ররা তাদের মাতৃভূমির নামে সংশপ্তক যুদ্ধে রত হল।

মৎস্যেন্দ্রনাথ দ্বৈরথ সমরে রত হলেন প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে। প্রকাশচন্দ্রের মুখে তখন ব্যঙ্গের হাসি। তাঁর মনোবল দ্বিগুণ। তিনি যেন অনেকটা খেলাচ্ছলেই প্রতিহত করতে লাগলেন মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিটি আক্রমণ।

এদিকে বিদ্রোহীদের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায়। অধিকাংশই আহত বা নিহত। কালকূটসেনা অনেক বেশি প্রশিক্ষিত, অনেক বেশি রণদক্ষ, অনেক বেশি কৌশলী। তাদের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও অনেক বেশি। তারা পুনরায় ছোট ছোট বৃত্তে ঘিরে ধরতে লাগল প্রতিটি বিদ্রোহী নেতাদের।

দেদ্দদেবী আর পারছেন না। তাঁকে ঘিরে অন্তত দশজন কালকূটসেনা। তাদের আড়ালে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না।

এদিকে যুদ্ধ করতে করতে পড়ে গেলেন শান্তরক্ষিত। দ্রুত তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলল একদল সৈন্য।

পদ্মসম্ভব আর মন্দর্ভা পাশাপাশি যুদ্ধ করছিলেন। ক্লান্ত শ্রান্ত পদ্মসম্ভব যতটা পারছিলেন আড়াল করে রাখছিলেন মন্দর্ভাকে। কিন্তু তাঁর অস্ত্রচালনা ক্রমেই লক্ষ্যহীন, অব্যবস্থিত, বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছিল। জয়ের গন্ধ পেয়ে কালকূটসৈন্যরা দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করল তাঁকে। সুযোগ বুঝে কেউ একজন সজোরে আঘাত করল তাঁর ডান হাতে। তাঁর দা'ও ছিটকে পড়ে গেল। অন্য হাতের অসিটি বহু আগেই ভগ্ন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত

তিনিও পারলেন না। দশজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। তাঁর দু'হাত চেপে ধরল চার জন বলশালী সৈন্য। পায়ে বেড়ি বেঁধে দিল কেউ।

মন্দর্ভার হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে কেউ একজন সজোরে চপেটাঘাত করল তাঁর গালে। তিনি পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল।

যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ থেমে গেলেন প্রকাশচন্দ্র। থমকে গেলেন মৎস্যেন্দ্রনাথও। নিজের মহাখড়্গ তুলে সেই দৃশ্যটি মৎস্যেন্দ্রনাথকে দেখালেন প্রকাশচন্দ্র। তারপর শান্তস্বরে বললেন, 'কী যোগীবর, এখনও যুদ্ধের সাধ আছে?'

সেদিকে বেশ কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাকিয়ে রইলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। তাঁর হাত থেকে ত্রিশূলটি মাটিতে পড়ে গেল ঝনঝন শব্দ তুলে।

অবশেষে তিনি পরাজিত। সর্বাংশে, সামূহিকভাবে পরাজিত। এই ধুরন্ধর ঐন্দ্রজালিকের কূটকৌশলের কাছে পরাস্ত হয়েছে তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনা, সমস্ত যুদ্ধপ্রস্তুতি। তাঁর বিপ্লবকল্পনার নায়কেরা সকলেই পরাজিত। মহাবীর জয়াপীড় অজ্ঞান, নিশ্চেষ্ট। যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ বপ্যট নিহত। খুব সম্ভবত গোপালদেবও ইতিমধ্যেই নিহত। পদ্মসম্ভব, শান্তরক্ষিত, মন্দর্ভা, দেদ্দদেবী ধৃত। অন্যান্য শৈবযোগী এবং সহজিয়া সাধকদের অধিকাংশই মৃত অথবা সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত। তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা এখন উলঙ্গ, মৃত বরাহের মতো অনাবৃত শুয়ে আছে নির্মম কসাইয়ের সামনে।

প্রকাশচন্দ্রের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই সমস্ত কর্মকাণ্ড আমারই ইঙ্গিতে চালিত হয়েছে আর্য প্রকাশচন্দ্র। আমিই এর একমাত্র দায়ভাগী, একমাত্র অপরাধী। যা শাস্তিবিধান এদের যোগ্য হয়, সে শুধু মাত্র আমারই প্রাপ্য। আমার কাতর অনুরোধ, এদের ছেড়ে দিন। বিনিময়ে আপনি আমাকে বন্দি করুন। কথা দিচ্ছি, যা শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।'

মৎস্যেন্দ্রনাথের বুকে সজোরে লাথি মারলেন প্রকাশচন্দ্র। মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিটকে পড়ে গেলেন সামান্য দূরে। ধীরে ধীরে সেখানে এসে দাঁড়ালেন প্রকাশচন্দ্র। একটা অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর নীচু হয়ে বাঁহাতে লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথের চুলের মুঠি ধরে তাঁকে সেই ধূলিধূসরিত রণভূমি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চললেন মন্দর্ভা আর পদ্মসম্ভবের দিকে।

ধীরে ধীরে বনচর মানুষটি উঁকি দিল গিরিপথের পাথরের আড়াল থেকে। তার মুখ দেখে তার মনোভাব বোঝা ভার।

তারপর তার পাশে মাথা বাড়াল আরও কয়েকটি উলঙ্গ নারী। তাদের মুখে এক দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল।

তারা যখন যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত, তখন একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছিল চণ্ডকীর্তি। আশা করা যায় যে এই পিশাচী ডাকিনীদলের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এবার সে নিশ্চিন্তে তার পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে সরে পড়তে পারে।

ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল সে। আর একটু ডানদিকে, ব্যস। তারপরেই একটি গোপন গিরিগুহা আছে, যার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলেই সে একেবারে নিশ্চিন্ত। গুহামুখটি চট করে বোঝা যায় না। আর পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলে তো কথাই নেই, এরা আর তার নাগাল পাবে না। গুহার অন্য মুখটি শালিবন বিহারের পিছনে মেঘান্দর তীরে কোথায় উন্মুক্ত হয়, তা সে ভালোভাবেই জানে।

আর দু'পা। আর একটা বাঁক। মুক্তি ঠিক তার সামনে।

ডানদিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সে। গুহামুখ খালি। কেউ নেই।

ডানদিকে ঘুরল চণ্ডকীর্তি। আর একটি মাত্র পদক্ষেপ। তারপরেই সে মুক্ত।

ঠিক তখনই পিছন থেকে কে যেন টেনে ধরল তার চুল। আর একটা বীভৎসদর্শন খড়্গ সবেগে নেমে এল তার কণ্ঠার ওপর। একেবারেই মুক্তি পেয়ে গেল চণ্ডকীর্তি।

মাটিতে পড়ে ধুঁকছিলেন পদ্মসম্ভব। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন শ্রান্তক্লান্ত পরাজিত সিংহকে ঘিরে ধরেছে একদল রক্তপিপাসু তরক্ষু।

প্রবল রক্তক্ষরণে অজ্ঞানপ্রায় দেদ্দদেবীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনল একদল কালকূটসেনা। তারপর হিংস্র শ্বাপদের দল ঘিরে ধরল কয়েকটি শ্রান্তক্লান্তক্ষিপ্ত মৃতপ্রায় শরীরকে।

মৎস্যেন্দ্রনাথকে সামান্য ভিক্ষুকের মতো টেনে আনতে দেখে উৎসাহে উল্লাসে ফেটে পড়ল সেই শ্বাপদের দল। তারপর তারা দাঁড়াল প্রকাশচন্দ্রকে ঘিরে।

নিজের রক্তস্নাত মহাখড়্গ কোষবদ্ধ করলেন প্রকাশচন্দ্র। তারপর প্রসন্নমুখে বললেন, 'অভিনন্দন, হে বিজয়ী বীরেরা। তোমাদের বলদর্পেই এই বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহীকূল পরাস্ত হয়েছে। এসো, এবার তোমাদের বিজয়স্মারক গ্রহণ করো। আপাতত এই দুই যুদ্ধবন্দিনী নারীদের ভোগ করে তোমাদের কামতৃষা মিটুক। জেনে রাখো, যুদ্ধবন্দিনী ধর্ষণ অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত, কারণ আমি, একেশ্বর প্রকাশচন্দ্র, তাকে বৈধ করেছি তোমাদের জন্য...'

বলতে বলতেই নীচু হয়ে মন্দর্ভার উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র টেনে নিলেন প্রকাশচন্দ্র। মন্দর্ভার বরাঙ্গের স্তনদুখানি অনাবৃত হয়ে পড়ল। নিরূপায় ব্যর্থ ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন পদ্মসম্ভব। সেই জান্তব চিৎকার শুনে কালকূটসেনার উল্লসিত হয়ে উঠল। তাদের অশ্লীল শিবারবে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক।

মৎস্যেন্দ্রনাথ সজল আঁখিদুখানি বন্ধ করলেন। হা, ঈশ্বর এও দেখতে হবে তাঁকে?

তারপর তিনি ধ্যানস্থ হলেন।

এই তো! এই তো সেই যন্ত্র!

গোপালদেব অতি দ্রুত সেই যন্ত্রটি হাতে তুলে নিলেন। তিব্বতের পোনপুরোহিতদের গোপন গুহা থেকে উদ্ধার করে আনা সেই মহাস্ত্র, চন্দ্রবজ্র সব কিছু ঠিক আছে তো?

ধীরে ধীরে সেই নগ্ন, শীর্ণ, ক্লান্ত নারীশরীর ফিরে তাকাল তাঁর দিকে।

একখানি দীপ তখনও জ্বলছিল দীপাধারে। গোপালদেব তাঁর যন্ত্রের পলিতাটি থরথর হাতে সেই দীপালোকে সংযুক্ত করলেন।

হা-হা করে হেসে উঠলেন প্রকাশচন্দ্র। ব্যঙ্গস্বরে বললেন, 'মহামান্য কুমার পদ্মসম্ভব দেখছি বীরগতি প্রাপ্তির জন্য বড়ই উতলা হয়ে পড়েছেন। ওরে, কে আছিস, এই অর্বাচীনের দেহটি এর প্রেয়সীর ওপরে ফেল। ওই বহুভর্তৃকা ডাকিনীকে ওর প্রেমাস্পদের রক্তে স্নান করা। তবেই তো আনন্দ অধিক হবে রে!'

কয়েকজন কালকূটসেনা টেনে হিঁচড়ে পদ্মসম্ভবের দেহটি উপুড় করে তুলে দিল মন্দর্ভার দেহের ওপর। বাকিরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

পদ্মসম্ভবের রক্তস্নাত চোখ দু'খানি চেয়ে রইল মন্দর্ভার দিকে। কত শতাব্দ-সহস্রাব্দের সঞ্চিত কথা যেন বয়ে গেল মৃত্যুক্ষুধাতুর দুই মানুষ মানুষীর দৃষ্টিসঙ্কেতে।

অত যন্ত্রণার মধ্যেও পদ্মসম্ভব ফিসফিস করে বললেন, 'আর্যা, দেখা হবে শীঘ্রই।'

চোখ বুজলেন মন্দর্ভা। এই মুহূর্ত থেকেই তিনি মৃত।

প্রকাশচন্দ্র পদ্মসম্ভবের মুণ্ডচ্ছেদের জন্য তরবারি তুললেন।

বহু কষ্টে ফিরে তাকাল সেই নগ্ন শীর্ণ নারী শরীর। তার সারা দেহ ভেঙে পড়েছে শ্রান্তিতে। প্রতি বিষপ্রয়োগের পর এই মৃত্যুগ্রাসী শ্রান্তি তাঁকে গ্রাস করে। তবে প্রতিবার সেই শ্রান্তিক্ষতে প্রলেপ দেয় একটি দৃশ্য। বিছানায় বা মেঝেতে শায়িত একটি মৃতদেহ।

এদিক ওদিক তাকালেন তিনি। কোথায় সেই কাঙ্ক্ষিত মৃতদেহ?

তারপর দৃষ্টি সামান্য ওপরে তুললেন তিনি।

তাঁর দুই ভ্রূর মধ্যে লক্ষ্যস্থির করে রয়েছে একটি ধাতব নল।

প্রকাশচন্দ্র তাঁর মহাখড়্গ তুললেন।

আর ঠিক সেই সময়েই একটি মহিষশিঙার তীক্ষ্ণ ধ্বনি সচকিত করে তুলল চারিদিক।

থেমে গেলেন প্রকাশচন্দ্র। স্তব্ধ হল কালকূটসেনাও। কোথা থেকে আসছে এই ধ্বনি? কে যুদ্ধহুঙ্কার তোলে কালকূটসেনার বিরুদ্ধে?

প্রত্যেকের দৃষ্টি ঘুরে গেল লালিম্ববন পাহাড়ের দিকে।

লালিম্ববনের ঠিক মধ্যস্থানে একটি উন্মুক্ত চাতাল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশালকায় নগ্নদেহ বনচারী মানুষের অবয়ব। তার ঠিক পিছনে অস্ত যাচ্ছেন দেব দিবাকর।

পদ্মসম্ভব বহুকষ্টে সেদিকে তাকালেন একবার। তারপর অস্ফুটস্বরে বললেন, 'শবরবজ্র!'

কজঙ্গলের অরণ্যসম্রাট শবরবজ্র দুহাত ওপরে তুলে ধরলেন। তারপর ভীমনাদে চিৎকার করে উঠলেন, 'কালী, কালী রে!'

মুহূর্তপর একটি খর্বকায় অথচ অতি সুঠাম নারীশরীর এসে দাঁড়াল তাঁর ডানপাশে। তার কোমরে বন্যাবাকলের আবরণ। ঊর্ধ্বাঙ্গের অতি সুডৌল স্তন দুটি অনাবৃত। কুঞ্চিত কেশরাশিদাম নেমে এসেছে কটিদেশ অবধি।

চোখ ভয়ঙ্কর লাল। তার গলায় ঝুলছে নরকরোটির মালা। তার ডানহাতে একটি অতি বৃহৎ, অতি বীভৎস, অতি ভয়াল দা'ও।

আর তার বাঁ-হাতে একটি মুণ্ড। চণ্ডকীর্তির কাটা মুণ্ড।

ধীরে ধীরে সেই উলঙ্গিনী খড়্গাধারী নারীমূর্তির পাশে এসে দাঁড়াল আরও শত শত উলঙ্গ রমণীর দল।

কালী নামের নারীটি একবার মুখ তুলে তীক্ষ্ণ উলু উলু ডাক তুলল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য নগ্ন ডাকিনীরাও সমস্বরে ডেকে উঠল উলু উলু ধ্বনিরবে। ডেকে উঠল শত শত শৃগালের দল।

সেই সমবেত তীব্র-তীক্ষ্ণ ভয়াল চিৎকারে চমকে উঠল লালিম্ববন পাহাড়। চমকে উঠল কলস্বিনী মেঘান্দ। চমকে উঠল বিশ্বচরাচর।

তারপর তারা নেমে আসতে থাকল লালিম্ববনের দেহ বেয়ে।

প্রকাশচন্দ্র স্তম্ভিত চোখে দেখলেন—লালিম্ববন পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে শত শত নগ্ন নারীদের দল। নেমে আসছে বন্যার মতো, উল্কার মতো, দাবানলের মতো, ধ্বংসের মতো। তাদের মুখে সেই হাড়হিম করে দেওয়া উলু উলু ধ্বনি।

আর তাদের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসছে ক্ষুধার্ত, হিংস্র, বন্য শিবাদল!

প্রকাশচন্দ্র ধীরে ধীরে পিছতে লাগলেন। পিছু হটতে লাগল তাঁর গর্বের কালকূটসেনাদলও। কারণ বন্য শিবাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেই।

বাতাস কেটে ভেসে আসা অগ্নিপিণ্ডটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন মহারানি। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর ভ্রূমধ্যে আছড়ে পড়ল সেই মৃত্যুর অগ্নিদূত। চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তাঁর কপাল। আর সেখান থেকে ছিটকে বেরোল একরাশ তরল।

না, লাল নয়, সেই রক্তের রঙ কালো। ঘন অন্ধকারের মতো কালো।

বঙ্গদেশের একচ্ছত্রাধিপ রানির দেহটি পড়ে গেল মাটিতে। আর ধীরে ধীরে সেই নগ্ন শীর্ণ দেহ গলে যেতে লাগল, মিশে যেতে লাগল সেই একরাশ ঘনকৃষ্ণ তরলের মধ্যে।

নিজের বাম হাতের তর্জনী তুলে ধরলেন প্রকাশচন্দ্র। কালো হয়ে গেছে সেটি।

তার মানে রানি মৃত? কিন্তু, কিন্তু কী করে?

অবাক হওয়ারও সময় পেলেন না প্রকাশচন্দ্র। সেই নরমাংসলোলুপ ডাকিনীর দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর সৈন্যদের ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়েছে রক্তপায়ী শৃগালের ঝাঁক।

উল্টোদিকে ফিরে ছুটতে শুরু করলেন প্রকাশচন্দ্র। এরা তাঁকে ধরতে পারবে না। দৌড়তে দৌড়তে তাঁর রথের বাহন একটি ষণ্ডকে সামনে পেয়ে গেলেন তিনি। তার ওপর চড়ে বসলেন প্রকাশচন্দ্র। তাঁর অবয়ব মিলিয়ে গেল বহুদূর।

আর খানিকক্ষণ থেকে গেলে দেখে যেতে পারতেন প্রকাশচন্দ্র, শালিবন বিহারের সামনের প্রান্তর থেকে অতি ভীমনাদে, শত সহস্র ভৈরবীকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠছে, 'জয় গৌড়, জয় বঙ্গ, জয় শশাঙ্ক।'

সেই মহাযুদ্ধের প্রায় এক পক্ষকাল পর এক শুক্ল ত্রয়োদশী। একদিন পূর্বেই খণ্ডিতারাতি বপ্যটসহ সমস্ত মৃত বিদ্রোহী নায়কদের শ্রাদ্ধবিধি সুসম্পন্ন হয়েছে। আচার্য শান্তরক্ষিত স্বয়ং সেই শ্রাদ্ধকার্যের ভার নিয়েছেন। মাতৃভূমির ধর্ম রক্ষার্থে, স্বাধীনতা রক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত প্রতিটি প্রাণ যেন তুষিতস্বর্গে স্থান পায়, অবলোকিতশ্বরের কাছে এই কামনাই করেছেন তিনি।

সেইদিন প্রভাত থেকেই বজ্রযোগিনী মন্দিরের সামনে ভেঙে পড়েছে উৎসাহী মানুষের ঢল। চারিদিকে স্বতস্ফূর্ত উৎসবের রেশ। প্রতিটি গৃহবাসী নিজ নিজ বাসস্থান ফুলমালা আর শোলার সাজে সাধ্যমত সাজিয়েছে। হেমন্তশেষের মৃদু উষ্ণ বাতাসে বসন্তের আগমনের বার্তা সুস্পষ্ট। সেই বাতাসে মুক্তির স্বাদ, স্বাধীনতার আস্বাদ। আর তারই ছোঁয়া পেতে দলে দলে শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতী ভিক্ষু বণিক সন্ন্যাসী সংসারী সবাই ছুটে চলেছে মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে।

মন্দিরের ঠিক সামনে স্থাপন করা হয়েছে বঙ্গদেশের রাজসিংহাসন। প্রশস্ত সিংহাসনটি স্বর্ণনির্মিত। তার চার কোণে চারটি অনুচ্চ রৌপ্যস্তম্ভ। স্তম্ভগুলি বহুবিচিত্র কারুকার্যখচিত। প্রতিটি স্তম্ভের মাথায় একটি করে সিংহমূর্তি।

সেই সিংহাসনের একদিকে বসে আছেন গোপালদেব। তাঁর পরিধানে পায়ের কণ্ঠা অবধি লম্বিত একখানি কাপাসবস্ত্রের ধুতি। তার শেষপ্রান্তটি ঘুরিয়ে এসে সামনে কটিবন্ধের সামনে দুলছে। তাঁর সুবিশাল ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। তাঁর ঘনকুঞ্চিত কেশদাম নেমে এসেছে কাঁধ অবধি। তাঁর উদ্ধত গ্রীবাদেশে, প্রশস্ত স্কন্ধে, আর

চন্দনচর্চিত বলিষ্ঠ বাহুদেশে রাজলক্ষণ সুস্পষ্ট। তাঁর ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ। তাঁর গলায় সোনার হার। তাঁর চোখদুটি শান্ত, গভীর এবং সমাহিত।

গোপালদেবের বাঁ পাশে বসে আছেন দেদ্দদেবী। দেদ্দদেবীর পরণে একখানি অতি শুভ্র রেশম শাড়ি, তার পাড় এবং আঁচলটি লাল রঙে ছোপানো। কোমল বক্ষ পটবস্ত্র আবৃত। শাড়ি এবং স্তনপট্ট মন্দর্ভার, তিনি ভগিনীসমা দেদ্দদেবীকে উপহার দিয়েছেন। দেদ্দদেবীর চোখ দু'খানি কাজলে আঁকা। কপালের মধ্যিখানে একখানি রক্তচন্দনের টিপ, তাকে ঘিরে অতি অপূর্ব শ্বেতচন্দনের কল্কা। দেবীর পায়ে লাক্ষারস অলক্তক। তাঁর দুহাতে অতি শীর্ণ দুখানি লৌহকঙ্কন, দুটি শঙ্খবালা এবং দুটি রক্তলাল প্রবালের চুড়ি। তাঁর সর্বাঙ্গে আর্দ্র চন্দনপঙ্কের চিত্রকলা। ঘনকৃষ্ণ কেশদাম সুউচ্চ চূড় করে বাঁধা। এই কবরীবন্ধন বড় সাধ করে বেঁধে দিয়েছেন শবরবজ্রের সঙ্গে আগত ভৈরবীরা। এই খোঁপা কজঙ্গলের নারীদের বড় প্রিয়।

একটু পরেই একটি অতি বৃহৎ জলপূর্ণ ঘট নিয়ে এগিয়ে এলেন আচার্য শান্তরক্ষিত। ঘট গোপালদেবের পায়ের কাছে রাখলেন। আর একে একে দশজন এগিয়ে এলেন তাঁদের হাতে ধরা মৃত্তিকাখণ্ড নিয়ে।

প্রথমে এগিয়ে এলেন শবরবজ্র, কজঙ্গলের বরাহদন্তমৃত্তিকা নিয়ে। তারপর এগিয়ে এলেন কমলাঙ্ক গ্রামের শবরপ্রধান, হস্তিদন্তমৃত্তিকা নিয়ে। ভিক্ষুণী মন্দর্ভা নিয়ে এলেন গঙ্গামৃত্তিকা। কুমার পদ্মসম্ভব নিয়ে এলেন লালিম্বিবন পাহাড়ের মাটি। কুমার জয়াপীড় নিয়ে এলেন প্রকাশচন্দ্রের রথষণ্ড দুটির শৃঙ্গধূলা। রাজবৈদ্য কুল্লুকভট্ট নিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদদ্বারের প্রস্তরখণ্ড। মহাসামন্ত ধর্মসেন নিয়ে এলেন বল্মীকস্তূপের মাটি।

সবশেষে এলেন ভাঁড়ুদত্ত আর তাঁর প্রিয়তম কিঙ্কিণী মায়া! আর এলেন বিশুদ্ধকীর্তি এবং তাঁর সাধের নন্দিনী। বহুবিধ মরণান্তিক অভিজ্ঞতার পর তাঁরা দুজনেই ফিরে এসেছেন কর্মান্তবাসকে। মায়া নিয়ে এসেছেন তাঁর গৃহদ্বারের মৃত্তিকা। বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা!

আচার্য বিশুদ্ধকীর্তি, আচার্য শান্তরক্ষিত এবং লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ সেই সব মৃত্তিকাংশ মিশিয়ে দিলেন জলপূর্ণ ঘটটিতে। তারপর সেই কলসটি তুলে ধরলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ। ধারাস্নানে অভিষিক্ত করে দিতে লাগলেন গোপালদেবকে। সঙ্গে চলতে থাকল মন্ত্রপাঠ, 'ওঁ রাজাধিরাজায় প্রসহ্য় সাহিনে। নমো বয়ং বৈশ্রবণায় কুর্মহে...'

ধারাস্নানে ভেসে যাচ্ছিল গোপালদেবের মস্তক। সেইদিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন শান্তরক্ষিত। তিনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, এই উপচারের প্রতিটি অর্থ জানেন। রাজা পর্বতশিখরস্থ মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক শোধন করবেন, অর্থাৎ শীতল মস্তিষ্কের দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করবেন। বল্মীকস্তূপমৃত্তিকা দ্বারা কর্ণশোধন করবেন, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও যেন তাঁর গোচরে আসে। হস্তিদন্তমৃত্তিকা শোধন করবে তাঁর দক্ষিণহস্ত, যাতে তাঁর বাণিজ্য বিষয়ে মতি হয়। ষণ্ডদন্তমৃত্তিকায় বর্ধিত হবে তাঁর বাহুবল, সৈন্যশক্তি। রাজপ্রাসাদদ্বারের মৃত্তিকাস্পর্শে রাজ্যাধিকার বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত হবেন। আর বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকায় তিনি রাজ্যের সর্ববিধ রূপগুণের উৎকর্ষসাধনে রত হবেন।

রাজ্যাভিষেকস্নান শেষ হওয়ার পর এগিয়ে এলেন বিনয়াদিত্য জয়াপীড়। প্রকাশচন্দ্রের মন্ত্রঃপূত অজেয় খড়্গ তুলে রাখলেন গোপালদেবের পায়ের কাছে। হাতজোড় করে নতমস্তকে বললেন, 'আশা করি এতদিনে পিতামহের কলঙ্কমোচন করতে সমর্থ হয়েছি। আজ থেকে কাশ্মীরবাসীরা বঙ্গদেশের কাছ হতে ঋণমুক্ত হল। আমি, কাশ্মীর নরেশ বিনয়াদিত্য জয়াপীড়, বঙ্গদেশের অধীশ্বর গোপালদেবকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি।'

এগিয়ে এলেন মহাসামন্ত ধর্মসেন, নিজের কটিবন্ধনটি খুলে গোপালদেবের পায়ের কাছে রাখলেন। তারপর অতি বিনীতভাবে বললেন, 'আজ হতে বঙ্গদেশের অনন্তসামন্তচক্র সম্রাট গোপালদেবের আজ্ঞাধীন হল। আমি, মহাসামন্ত ধর্মসেন, ন্যায় ও ধর্মের পথে থেকে সম্রাট গোপালদেবের জন্য জীবনপাত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম।'

এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ গৌড়াধিপতি জয়ন্ত। স্মিতহাস্যে বললেন, ‘আমি পুত্রহীন, উত্তরাধিকারীহীন। আমার জামাতা মহাবীর জয়াপীড় স্থির করেছেন যে তিনি সস্ত্রীক কাশ্মীরে ফিরে যাবেন, গৌড়শাসনের ভার তিনি নেবেন না। তাই গৌড় ও পুণ্ড্রের শাসনভার আমি এই দণ্ডেই মহামতি গোপালদেবের শ্রীহস্তে সমর্পণ করলাম।’

চারিদিক মহাহর্ষধ্বনিতে পরিপূর্ণ হল। বহুজনের বহুদিনের লালিত অখণ্ড গৌড়বঙ্গের স্বপ্ন এবার সত্য হতে চলেছে। কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, ‘জয় গৌড়, জয় বঙ্গ, জয় শশাঙ্ক। পালশাসন দীর্ঘজীবী হোক।’ উপস্থিত জনতা তাতে মুহুর্মুহু সায় দিল।

কোলাহল কিছু স্তিমিত হতে একে একে উঠে দাঁড়ালেন কজঙ্গল হতে আগত চৌষট্টিজন ভৈরবী ডাকিনী। তাঁরা সিংহাসন ঘিরে বিচিত্র আরণ্যস্তোত্র উচ্চারণে, বিচিত্রতর পূজা সমারোহে, অত্যদ্ভুত নৃত্য প্রদর্শনে আশ্চর্য মায়া সৃষ্টি করলেন। উপস্থিত জনতা মোহিত হয়ে সেই আশ্চর্য নৃত্যাভিষেক দেখতে লাগল।

নৃত্যাভিষেক শেষ হলে পর আটজন প্রধান যোগিনী একের পর এক দেদ্দদেবীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে গেলেন। তাঁর উজ্জ্বল গোধূমবর্ণ গণ্ডদেশ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। গোপালদেব মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

তারপর বিভিন্ন উপচার হাতে এগিয়ে এলেন কর্মান্তবাসকের সাধারণ জনবৃত্ত, সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা। সামন্ত থেকে আচার্য, বণিক থেকে কৃষক, সন্ন্যাসী থেকে সৈন্য, কৃষক থেকে কর্মকার, কুম্ভকার থেকে শৌণ্ডিক, শবর থেকে কিরাত, জালিক থেকে কৈবর্ত...

সবার উপহার নিবেদন শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন গোপালদেব। তাঁর পিছনে চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালেন সহজিয়া বৌদ্ধ এবং শৈবযোগীদের দল।

উদাত্ত মন্ত্রকণ্ঠে গোপালদেব বললেন, ‘আমি, সর্ববিদ্যাবিশারদ দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, মহাবল খণ্ডিতারাতি বপ্যটের পুত্র গোপালদেব, পরম কারুণিক তথাগত, ভগবান আদিনাথ, একাদশ রুদ্র এবং দশদিকাধিপতিদের সাক্ষী রেখে শপথ করছি, আজীবন সত্য, ন্যায় এবং ধর্মের পথে থেকে গৌড়বঙ্গের সেবা করব। আমি মনে রাখব, দেশের মাটির থেকে বড় মন্দির নেই, দেশের মানুষের থেকে বড় ঈশ্বর নেই, দেশসেবার থেকে বড় ধর্ম নেই। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার রাজশাসন যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, দীনাতিদীন মানুষেরও সেবায় সমর্থ হয়...।’

সবার শেষে একটি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন একজন পুরুষ এবং এক নারী। পুরুষটি বামদিকে সামান্য ঝুঁকে বললেন, ‘আর্যা, ওই রাজ্ঞীর আসনে কিন্তু আপনাকেও মন্দ মানাত না।’

মন্দর্ভা ছদ্মকোপে বক্তার বুকে কিল মারতে গেলেন। পদ্মসম্ভব সেই হাত দুটি ধরে তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। মন্দর্ভা চক্ষু বন্ধ করে বললেন, ‘আপনার জন্য আমি ইন্দ্রাণীর পদও প্রত্যাখ্যান করতে পারি নাথ। রাজশাসন তো তুচ্ছ।’

পদ্মসম্ভব তাঁর ঠোঁটদুটি ডুবিয়ে দিলেন প্রেয়সীর অধরে। মন্দর্ভা দুই হাত দিয়ে পদ্মসম্ভবের গলা জড়িয়ে ধরলেন।



সমাপ্ত